REGISTERED No. C. 192.

OR

THE AGRICULTURIST.

ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসনের মুখপত্র

শ্রীরামচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত

বৈশাখ,
১৩২৮

কলিকাতা; ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট শ্রীরাম প্রেসে,
শ্রীসারদাপ্রসাদ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

২২শ খণ্ড } বৈশাখ, ১৩২৮ সাল। { ১ম সংখ্যা।

লাউকুমড়া প্রভৃতির চাষ

সম্পাদক লিখিত।

শশাকী জাতীয় প্রায় সমস্ত উদ্ভিদই লতানীয়া কাণ্ড বিশিষ্ট। আকর্ষণী নামক

(Tendril) একটি প্রত্যঙ্গের সাহায্যে ইহারা কোন প্রকার কঠিন পদার্থ অবলম্বন করিয়া, মৃত্তিকা জড়াইয়া উঠে। প্রকারভেদে আকর্ষণীর গঠনের তারতম্য হইয়া

থাকে। মৃত্তিকার উপরিস্থিত লাউ, কুমড়া প্রভৃতি গাছের অগ্রভাগ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উহারা কোন প্রকার অবলম্বন অনুসন্ধান করিতেছে এবং এই প্রকার অবলম্বনের অনুসন্ধানে উহাদের কাণ্ড অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে।

শসাকী জাতীয় উদ্ভিদের অপরাপর লক্ষণাবলীর মধ্যে কতিপয় বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ইহাদের অধিকাংশই লতানিয়া কাণ্ড বিশিষ্ট। শ্বেত ও পীত বর্ণ ব্যতীত ফুলের আর কোন রঙ্ দেখিতে পাওয়া যায় না। শসাকী জাতির আর একটি প্রধান লক্ষণ এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক। এই জাতীয় সমস্ত গাছেরই পুষ্প এক লিঙ্গ; অর্থাৎ কেবল পুরুষ অথবা কেবল স্ত্রী। আবার এই জাতীয় গাছের অনেক 'প্রকার' গাছেই উভয় জাতীয় পুষ্প জন্মাইয়া থাকে, যেমন লাউ ও কুমড়ায়। কিন্তু অন্যান্য প্রকারে বিভিন্ন গাছে বিভিন্ন জাতীয় পুষ্প উৎপন্ন হয়, যেমন পটলে। অনেক স্থলে ক্ষেত্রে যে পটল উৎপন্ন হয় না তাহার

কারণ এই যে, ক্ষেত্রে শুদ্ধ পুরুষ কিম্বা স্ত্রী জাতীয় লতা রোপিত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে বিপরীত লিঙ্গ বিশিষ্ট লতা ক্ষেত্রে বসাইলে ফল উৎপন্ন হইতে থাকে। পুংপুষ্প ও স্ত্রী পুষ্পের পার্থক্য নির্দ্ধারণ করা বিশেষ কঠিন নহে। একটি সম্পূর্ণ উভলিঙ্গ পুষ্পের চারিটি আবর্ত্ত থাকে, যথা, নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম কুণ্ড (Calyx), দ্বিতীয় স্তবক (Corolla), তৃতীয় পুং নিবাস (Stamen) ও

চতুর্থ স্ত্রী নিবাস (Pistil)। এক লিঙ্গ পুষ্পে হয় পুং নিবাস কিম্বা স্ত্রী নিবাস থাকে। শসাকী জাতিতে কুণ্ডের নিম্নভাগ মিলিত ও উপরিভাগ পাঁচটি অংশ বিশিষ্ট; এই কুণ্ড নলের উপর অবস্থিত। পুং কেসরের সংখ্যা সাধারণতঃ ৩, কিন্তু কখনও কখনও ৫ বা ২ হইয়া থাকে। কুণ্ড নলের নিম্নে, মধ্যে অথবা উপরিভাগে পুং কেসর সংলগ্ন থাকে। কুমড়া প্রভৃতিতে ইহা দেখিতে অনেকটা ঢেউ খেলানে চুড়ির ন্যায়। স্ত্রী নিবাসের নিম্নভাগ স্থূল, মধ্যভাগ সূত্রবৎ এবং সূত্রবৎ অংশের উপর একটি, তিনটি বিভাগ বিশিষ্ট অংশ সন্নিবিষ্ট থাকে। আমাদের দেশে যে সমুদয় শসাকী জাতীয় উদ্ভিদ্ দেখা যায় তাহাদের স্ত্রীপুষ্প প্রায়ই একক অর্থাৎ পুংপুষ্পের ন্যায় গোছা গোছা হয় না, কেবল কুমড়ারই উভয় জাতীয় ফুল একক দৃষ্ট হয়। পটল, চিচিঙ্গা ও কুন্দরিকার প্রত্যেকের পার্শ্ব গুলি ঝালরের ন্যায় কাটা। লাউর পুংপুষ্প অপেক্ষা স্ত্রীপুষ্পের বোঁটা ছোট।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শসাকী জাতীয় সঙ্কর উৎপাদন প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল। সঙ্কর তিন প্রকার—বর্ণ সঙ্কর (Genus-hybrids), প্রকার সঙ্কর (Species-hybrids), এবং ভেদ-সঙ্কর (Variety-hybrids)। এস্থলে 'বর্ণ', 'প্রকার' ও 'ভেদে'র কিয়ৎপরিমাণে ব্যাখ্যা আবশ্যক। সংক্ষেপতঃ ইহা বলিতে পারা যায় যে, যে সমস্ত উদ্ভিদের পরস্পর এত নিকট সম্বন্ধ যে, তৎসমুদয়কে এক গোষ্ঠির অর্থাৎ এক পরিবারস্থ অন্য সকলের সহিত তুলনায় কতিপয় প্রধান প্রধান লক্ষণ এক বলিয়া প্রতীয়মান হয়; এই সকল উদ্ভিদ এক বর্ণ ভুক্ত। শসাকী জাতির অন্তর্গত 'লাফ্‌ফা'(Luffa) এইরূপ একটি বর্ণ। এক পরিবারস্থ এক একটির সহিত প্রকারের তুলনা করা যাইতে পারে। লাফ্‌ফা পরিবারে ঝিঙ্গে, তিত ঝিঙ্গে ও ধুন্দুল এইরূপ তিনটি প্রকার। ভেদ এবং প্রকার এতদুভয়ের বিভিন্নতা সময়ে সময়ে অতি অস্পষ্ট। জল, বায়ু, উত্তাপ ভূমির অধিক অথবা অল্প আর্দ্রতা এবং অন্যান্য আকস্মিক অবস্থা নিবন্ধন একই প্রকার বৃক্ষের নানা প্রকার আকারগত বৈষম্য সংঘটিত হয়। ছোট, বড়, ঋজু, বক্র প্রভৃতি নানাবিধ প্রকার ঝিঙ্গে তাহার উদাহরণস্থল। যখন এইরূপ বৈষম্য বহু পুরুষানুক্রমে সংঘটিত হইতে থাকে, তখন ঐ লক্ষণ সমূহ স্থায়ী হইয়া যায় এবং 'ভেদ' একটি 'প্রকারে' উন্নত হয়। দুইটি বিভিন্ন 'ভেদে'র মধ্যে সঙ্কর উৎপাদিত হওয়া যেমন সহজ, দুইটি প্রকারের মধ্যে সঙ্কর হওয়া তেমন সহজ নহে এবং দুইটি বর্ণের সঙ্কর উৎপাদন করা সুকঠিন। পটল এবং করলা দুইটি বিভিন্ন বর্ণভুক্ত। পটলের রেণু করলার স্ত্রী পুষ্পে প্রয়োগ করিয়া ফল উৎপাদিত হইতে দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু ঐ ফলের বীজ অঙ্কুরিত হয় না। শসাকী জাতির সঙ্করসমূহ সম্বন্ধে এত অধিক বলার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, সঙ্কর উৎপাদন দ্বারা আকস্মিক 'ভেদ'কে স্থায়ী

করিতে পারা যায়। কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে, এইরূপ নূতন 'ভেদ' উদ্ভাবন করা অনাবশ্যক এবং যে সকল 'ভেদ' পুরুষানুক্রমে উৎপাদিত হইয়া আসিতেছে তৎসমুদয়ই চাষ করিয়া গেলে আর কোনও ভাবনা থাকে না। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। যে জাতি যত সঙ্কর উৎপাদনে প্রবল তাহাকে ততই অধিক সঙ্কর উৎপাদন দ্বারা উন্নত করিতে হইবে। কারণ স্বভাবের উপর ভার দিলে অনেক সময় অবাঞ্ছনীয় সঙ্কর উৎপাদিত ফসলের অধোগতি হইতে পারে।

শসাকী জাতীয় উদ্ভিদ জমি ব্যতিরেকে টবেও উত্তমরূপে জন্মান যাইতে পারে। যাঁহারা ফটক, তারের ঘর ও বাঙ্গালা প্রভৃতি সাজাইবার জন্য বিদেশীয় লতা প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহারা ঐ সমস্ত লতার পরিবর্ত্তে, শসাকী জাতীয় কতিপয় লতা ব্যবহার করিতে পারেন। কাঁকরোল, চিচিঙ্গে, ছোট জাতীয় লাউ প্রভৃতিতে সুদৃশ্য ফটক প্রস্তুত হয়। এতদ্বারা বাগানের শোভা পরিবর্দ্ধিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক পরিমাণ আহার্য্য ফলও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইউরোপের মধ্যে ফ্রান্সে এবং আমেরিকায় শসাকী জাতীয় উদ্ভিদের যথেষ্ট আদর। লাউ, শসা, কাঁকড়ী ফুটি প্রভৃতি বহুল পরিমাণে উৎপাদিত হয় এবং বিদেশে রপ্তানি করা হইয়া থাকে। আমাদের দেশে শসা, কুমড়া, লাউ প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে বটে, কিন্তু উপযুক্ত নির্ব্বাচনের অভাবে দিনে দিনে অতি অপকৃষ্ট হইয়া দাঁড়াইতেছে। বিশেষতঃ তরমুজ, খরমুজ ও ফুটি প্রভৃতি এই জাতীয় যে কয়েকটি ফল অত্যন্ত উপাদেয় বলিয়া পরিগণিত হয়, সে কয়েকটিরও উৎকৃষ্ট 'ভেদ' সমূহ আজকাল আর প্রায় বাজারে দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে অপকৃষ্ট জাতীয় ফল দ্বারা বাজার প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। ইহার একমাত্র প্রতীকার নির্ব্বাচন। নির্ব্বাচন ব্যতিরেকে উৎকৃষ্ট জাতির সমুত্থান এবং নিকৃষ্ট জাতির নিরাকরণ সম্ভবপর হইবে না। পূর্ব্বেই সঙ্কর উৎপাদন দ্বারা উন্নত সাধনের বিষয় বলা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন দেশ হইতে বীজ প্রবর্ত্তন, দেশীয় বীজ সমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট বীজ নির্ব্বাচন এই সমুদয়ই উন্নতির অন্যতম উপায়।

লাউ, কুমড়া প্রভৃতি সমস্ত শসাকী জাতীয় ফসলই দোয়াঁশ মাটিতে উত্তমরূপে জন্মিয়া থাকে; বরং বালির পরিমাণ অধিক হইলে তাদৃশ ক্ষতি হয় না, কিন্তু কর্দ্দমের পরিমাণ অধিক হওয়া উচিত নহে। অনেক স্থলেই লাউ, কুমড়া, শসা প্রভৃতি গৃহ প্রাঙ্গনেই রোপিত হইয়া থাকে এবং গোয়ালের আবর্জ্জনা ও উনুনের ছাই সাররূপে ব্যবহৃত হয়। গোবর এবং ছাই উভয়ই শসাকী জাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে উত্তম সার। কিন্তু গোবরের আধিক্যে অনেক সময় গাছ কেবল বড় হইয়া থাকে এবং ফল হয় না। তজ্জন্য গোবর সার কিছু কম করিয়া দেওয়া আবশ্যক। বিঘা প্রতি ৮ মণ অসিক্ত (unslaked) ছাই এই সমস্ত উদ্ভিদের পক্ষে উত্তম সার

বলিয়া পরিগণিত হয়। ছাই প্রয়োগে জমির কৈশিক আকর্ষণ শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাহাতে গাছে অধিক পরিমাণে জল শোষিত হয় এবং ফলও বড় হইয়া থাকে। গাছে জল প্রয়োগ করার সময় যাহাতে গাছের গোড়ায় জল না জমে তৎসম্বন্ধে সাবধান হওয়া আবশ্যক। গাছের কাণ্ডে জল লাগিলে উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক হইয়া থাকে।

শসাকী জাতীয় উদ্ভিদের চাষ প্রণালী—সাধারণতঃ দোয়াঁশ মৃত্তিকাই প্রশস্ত।

সার (একর প্রতি)—নাইট্রোজেন	...	৫০ হইতে ৬০
পটাস	...	১৫০ হইতে ১৬০
ফস্ফরিক অম্ল	...	৮০ হইতে ১০০

শসাকী জাতীয় উদ্ভিদের বীজ হইতে সাধারণতঃ ১০ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে অঙ্কুরোদ্গম হয়। পটলের বীজ বুনিয়া চারা করা হয় না। পটলের গেঁড় বা মূল পুতিয়া চারা উৎপন্ন করিতে হয়।

মিঠা কুমড়া, বিলাতী কুমড়া—

(*curcunbita Maxima Duch*)

পশ্চিমে ডিঙ্গেলা, বাঙলায় কুমড়া, উড়িষ্যায় বৈতাড়, বিহারে কোঙরা বলে।

মৃত্তিকা—ভিটামাটী ও সর্ব্বপ্রকার নদীচর এবং মাঠান জমি গুলিতে ভাল জন্মে। ইহার পক্ষে অল্পোচ্চ ধরণের জমিই শ্রেষ্ঠ। এঁটেল ও দোয়াঁস উভয় মাটীই কুমড়ার পক্ষে উপযুক্ত।

আকৃতি ভেদে মিঠা কুমড়া তিন রকম দেখিতে পাওয়া যায়।

লম্বা ও গোল কুমড়া প্রায় বীরভুম ও বাঁকুড়া অঞ্চলে জন্মায়। হুগলী জেলায় গোল কুমড়ার চাষ প্রচুর পরিমাণে হয়। বৈদ্যবাটীর হাটে এই কুমড়া আমদানী হয়। পূর্ব্ববঙ্গে একপ্রকার চাকারমত কুমড়া জন্মায় তাহা এক একটা ওজনে এক মণ পর্য্যন্ত ভারী হইয়া থাকে। বৈদ্যবাটীর কুমড়া চৈত্র বৈশাখে আমদানী হয়। পূর্ব্বে কুমড়ার শ্রাবণ ভাদ্রে আমদানী অধিক হইয়া থাকে।

সার—পটাস প্রধান সার লাউ, কুমড়া, শসা চাষের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। এক একরে (তিন বিঘা) ৫০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন, ১৫০ পাউণ্ড পটাস সার এবং ১০০ পাউণ্ড গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক-অম্ল সার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। গোময়সার ও খৈল হইতে নাইট্রোজেন পাওয়া যাইবে, বিলাতী পানার ছাই, কলা পাতার ছাই হইতে পটাস পাওয়া যাইবে, হাড়ের গুড়া হইতে ফস্ফরিকান সার মিলিবে পাঁক মাটীতে যথেষ্ট পরিমাণে পটাস সার থাকে। কুমড়া ক্ষেতে পাক মাটী ছড়াইয়া গাছের গোড়ায় গোড়ায় গোময় ও খৈল মিশ্রিত সার তিন বারে মোট অর্দ্ধ সের মাত্র প্রদান করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। (কৃষি-রসায়ন সার পর্য্যায় দ্রষ্টব্য।) সাধারণ গোবর সার ও পুষ্করিণীর তোলা মাটীই ইহার পক্ষে উৎকৃষ্ট সার।

কাল নিরূপণ—এদেশে মাঘ মাসে বীজ বপন করিয়া চৈত্র মাস মধ্যে মিঠা কুমড়ার খুব বেশী ফসল হইতে দেখা যায়। বিজ্ঞ চাষী কখন কখন কার্ত্তিক মাসেই কুমড়ার বীজ বপন করিয়া থাকে। গাছ জন্মিয়া ছোট হইয়া থাকে পরে মাঘ ফাল্গুনে গজাইয়া উঠে ও ফল ধরে। শীতকালে চারা হইতে বিলম্ব হয় সেই জন্য কার্ত্তিক মাসে গাছ তৈয়ারী করিলে ভাল হয়। আবার বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ পুতিয়া ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক মধ্যেও কুমড়া ফলিতে দেখা যায়। কিন্তু বাসন্তী ফলন অপেক্ষা বর্ষাতী ফলন অনেক কম হয়।

বর্ষাকালে গাছ অতিশয় ধাপাইয়া যায়, সুতরাং সে গাছের ডগা কাটিয়া খাইলে তবে ফল ফলিতে আরম্ভ হয়। বর্ষার সময় গাছকে এদেশে মাচায় তুলিয়া দিতে হয়। ইহার গাঁইটে গাঁইটে শিকড় জন্মে সুতরাং লাউ কুমড়া গাছ মাটিতে লতাইতে পাইলে গাছগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক দূর ব্যাপ্ত হয় ও অধিক ফল প্রসবে সমর্থ হয়। ক্ষেতের মধ্যে যে গাছটি সমধিক তেজস্কর সেই গাছের সুপুষ্ট কুমড়া বীজের জন্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য। বীজের জন্য ভাল কুমড়া উৎপন্ন করিতে হইলে একটা গাছে দুই তিনটির অধিক ফল রাখিতে

নাই। বাঙলার সুনিপুণ চাষীরা বলে যে, যে কুমড়াটী বীজ রাখিতে হইবে, সেটী যে ডগায় জন্মে, সেই ডগাটীর শিকড় মাটীতে বসিলে, ঐ ডগার দুই বা আড়াই হস্ত পশ্চাৎ-ভাগ হইতে কাটিয়া মূল গাছ হইতে পৃথক করিয়া দিলে, ফলটী খুব বড় হয়। মাঠে যে লাউ, কুমড়া হয় তাহার ৬ ফিট × ৬ ফিট অন্তর মাদা প্রস্তুত করিতে হয়। এক বিঘা জমিতে কুমড়ার আবাদ করিতে ১০ তোলা বীজ আবশ্যক হয়। প্রতি মাদায় ৫ কিম্বা ৬টি বীজ বপন করিতে হয়। চারা জন্মিলে যে চারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তেজস্কর এমন দুইটি চারা রাখিয়া বাকিগুলি তুলিয়া ফেলিতে হয়।

ফলন—এক বিঘা জমি যাহার মাপ ১৪৪০০ ফিট তাহাতে ৪০০ কুমড়া গাছ বসিতে পারে। গাছের মরা হাজা বাদ ৩০০ গাছে ফল হইবে ধরিয়া লইলে এবং প্রত্যেক গাছে অন্ততঃ ৩টার অধিক কুমড়া ফলিলে এক বিঘায় ১০০০ কুমড়া হওয়া অসম্ভব নহে। উহা হইতে পচা ও খারাপ ফল বাদ দিয়াও আনুমানিক গড়ে ৫ সের ওজনের ৫০০ কুমড়া নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। সাধারণতঃ আমরা বুঝিতে পারি যে, একটা কুমড়া গাছ বীজ বপন হইতে আরম্ভ করিয়া ফলাইতে বড় অধিক হয়ত ৵ আনা খরচ পড়ে। উক্ত গাছে /৫ সের হিসাবে চারিটা কুমড়া হওয়া সম্ভব। চারিটা কুমড়ার দাম ১৲ টাকার কম নহে এবং ৵০ আনা খরচ বাদে ৸৵০ আনা লাভ হওয়া অসম্ভব নহে। কুমড়ার স্বতন্ত্র চাষে লাভ ত আছেই, আবার আলু ক্ষেতে কুমড়ার চাষ করিলে বাড়তিলাভ অনেক হয়। আলু গাছ তৈয়ারি হইয়া উঠিলে আলুর পটিতে কুমড়া বীজ বসান হয়। আলু উঠিয়া গেলে কুমড়া গাছ জোর করিয়া উঠে। আলু ক্ষেতে যে সার দেওয়া হয় তাহার সব আলুতে ব্যয় হয় না। পরিত্যক্ত সারে কুমড়ার ফসল খুব ভালই হয়। কুমড়া ক্ষেতের মাটি সরস থাকা চাই। শেষ পর্য্যন্ত অন্ততঃ ৩বার জল সেচন আবশ্যক।

দেশী কুমড়া, চাল কুমড়া, ছাঁচি কুমড়া

(Benicasia Cerifera Savi.)

মৃত্তিকা—ঘরের পোতার মাটী ও বাগানের জমিই উত্তম ; সাধারণ দোয়াঁস জমিতেই ইহার চাষ হয়।

সার—ঈষৎ ক্ষার মাটী, আবর্জ্জনা, এবং গোবর সারই উপযুক্ত।

কাল নিরূপণ—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসের বৃষ্টির সময় বীজ বপন করিতে হয়। মাদা

পালা শসা, বর্ষাকালে পালায় হয়, জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার বীজ বপন করিতে হয়। ভুঁই শসা বৎসরে দুই বার হয়—ফাল্গুন চৈতে একবার চারা হয় এবং আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে আর একবার চারা হয়। চৈতী চারায় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে ফল হয়, কার্ত্তিকী চারা ফাল্গুন চৈতে ফলে।

পালাশসা অপেক্ষা ভুঁই শসার ফলন অধিক। শসা ক্ষেতের পাইট অনেক এবং খরচও অধিক। শসা ক্ষেতের ঘাস চাঁচিয়া গাছের মাদা গুলি উঁচু করিয়া দিতে হয়। জল নিকাশের পথ পরিষ্কার থাকা চাই। ক্ষেতে জল বসিলে শসা গাছ অতি শীঘ্র পচিয়া যায়। পালা শসা অনেক প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে সবুজ লম্বা, শাদা লম্বা, কাঁটাযুক্ত সবুজ এই কয়প্রকার সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। দেশী পালা শসা ২ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। কিন্তু বিলাতী আমদানী একপ্রকার এমারল্ড শসা আছে ইহার বর্ণ ঘোর সবুজ, পাকিলে ঈষৎ রক্তাভ হয়, দেখিতে মনোহর, লম্বায় তিন ফিট পর্য্যন্ত হয়, তুলিবার পর অনেক দিন রঙের বৈলক্ষণ্য হয় না। আজ কাল অনেকেই এদেশে ইহার চাষ করিতেছেন। শসাক্ষেতে শিয়ালের উপদ্রব প্রায়ই হয়। এই জন্ত হইতে ফসল রক্ষা করিতে হইলে শসাক্ষেতে রীতিমত বেড়া দিতে হয়, দুই তিন ইঞ্চি ফাঁক বাঁসের বেড়া দিতে হয় এবং মাচান ও তদুপরি টঙ বাঁধিয়া রাত্রে ক্ষেতে পাহারা দিতে হয়। শসা চাষে যেমন পরিশ্রম আছে তেমন লাভ সমধিক, একবিঘা শসাক্ষেত হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হইতে দেখা গিয়াছে, ন্যূনকল্পে ৫০৲ টাকার কম লাভ হইবে না।

ভুঁই-শসা—ভুঁয়েতে হয় বলিয়া ইহার নাম ভুঁই শসা। দুইরকম ভুঁই শসা দেখা যায়, একরকম শাদা ও সবুজ মিশান রঙ, আকৃতি ঈষৎ বাঁকা। ঐ শসা গুলি ৬ কিম্বা ৮ ইঞ্চির অধিক বড় হয় না। আর এক রকম ইহা অপেক্ষা ছোট সোজা গোলাকৃতি। ইহার খোসা পুরু, কচি থাকিলেও কাঁচা খাওয়া যায় না। পাকিলে তরকারি খায়। প্রায় সব শসাই কিন্তু কচি অবস্থায় কাঁচা খাওয়া যায়। পাকিলে পাঁড় শসা বলা হয়, উহার তরকারি খাওয়া হয়। ভুঁই শসাই ফলে অধিক বলিয়া ইহার চাষে পালা শসা অপেক্ষা অনেক বেশী লাভ হয়। মাঠে, ভুঁয়ে চাষ হয় বলিয়া ভুঁই শসার ক্ষেতে জন্তু জানোয়ারের উৎপাত অধিক হয়।

পাকাশসা যাহাকে পাঁড় শসা বলে তাহা হইতে বীজ বাহির করিয়া লইয়া রন্ধনার্থ ব্যবহার করা যায়। ইহা সাতিশয় সুখাদ্য তরকারি। চিঙড়ী মাছের সহিত ইহা বেশ মজে! ফল হিসাবে কাঁচা শসার ব্যবহার অধিক। খাইতে ঠাণ্ডা ও মুখরোচক। শসাতে পিত্ত নাশ করে এবং ইহা বড় রুচীকর। শসার সরবৎ ও চাট্‌নি সাতিশয় মুখপ্রিয়। শসাখণ্ড পেষণ করিয়া লইয়া তাহাতে লেবুর রস, আদার রস, চিনি, কিঞ্চিত লঙ্কার গুঁড়া, অল্প সরিষার তৈল, ঈষৎ লবণ সংযোগ করিলে উপাদেয় চাট্‌নি প্রস্তুত হয়।

বীজের পরিমাণ—পালা শসা চাষে ৫ তোলা বীজ বিঘা প্রতি যথেষ্ট। কিন্তু ভুঁইশসা বীজ হাতে ছিটাইয়া বোনা হয় সেই জন্য বীজ ১০ তোলারও অধিক লাগে। গাছ বাহির হইলে ক্ষেত্রের মাঝে মাঝে তেজাল গাছগুলি রাখিয়া অন্য গাছগুলি তুলিয়া ফেলিতে হয়। পরে ক্ষেত চাঁচিয়া গাছের গোড়ায় গোড়ায় মাটি দিতে হয়। পালা শসার চারা মাদা করিয়া বসান বিধি।

খেঁড়ো

(Cucumis (round variety)

মৃত্তিকা—বেলে দোয়াঁস ও চর জমি।

সার—পলিমাটি উত্তম সার। শসাতে গোবর প্রভৃতি যে সার দেওয়া হয় ইহাতেও সেই সার দিতে হয়।

কাল নিরুপণ—কাঁকুড় ফুটির ন্যায় মাঘ, ফাল্গুনে ইহার চাষ। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে ফসল তৈয়ারী হয়।

বীজের পরিমাণ—বিঘা প্রতি তিন তোলা। ৪ ফিট অন্তর মাদা দিতে হয়।

খাইতে শসার মত। শসারমত কাঁচা ও ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খাওয়া যায়। বীরভূমে ইহা খুব উৎপন্ন হয়।

কাঁকুড় কাঁকড়ী

(Cucumis Melo Lium.)

মৃত্তিকা—বালি দোয়াঁস। নদীর চরে খুব ভাল জন্মায়।

সার—পলিমাটিই উত্তম সার। লাউ কুমড়ার অন্য সারও দেওয়া হয়।

কাল নিরূপণ—চৈত্র বৈশাখ মাসে বীজ বপন করিতে হয়।

চাষের প্রণালী কুমড়ারই মত। ভুঁই শসার মত বীজ ছিটাইয়া বুনিতে হয়। এক বিঘা জমিতে দশ তোলা বীজ বোনা হয়। মাটি সরস থাকা আবশ্যক কিন্তু অধিক আর্দ্র হইলে গাছ পচিয়া যায়। আবশ্যকমত জল সেচন করিলে ভাল হয়। কাঁচায় ইহার ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খায়। কাঁকুড় পাকিলে তাহাকে ফুটী বলে। তখন ইহা গুড় চিনি কিম্বা মধু দিয়া খাইতে হয়।

কাঁকুড়ী কাঁকুড় প্রায় এক জাতীয় ফল, উভয়ের চাষ একই প্রকার। কাঁকুড়ী অনেকটা শসার আকার একটু বাঁকা। পশ্চিম দেশে ইহার চাষ অধিক হয়।

গোমুখ ফুটী

(Cucuaries Momordica.)

কাঁকুড় পাকিলে তাহাকে ফুটি বলে, বটে, কিন্তু আসল ফুটিতে আর এই

ফুটিতে তফাৎ আছে। কাঁকুড় কাঁচা অবস্থায় মিষ্ট, তরকারি রাঁধিয়া খাওয়া যায় কিন্তু ফুটি কাঁচা তিক্ত, ইহার তরকারি খাওয়া যায় না। ফুটি লম্বা ও গোল এই দুই রকম হয়। কাঁকুড় হইতে যে ফুটি হয় আসল ফুটি পাকিলে তাহা অপেক্ষা নরম ও রঙ অপেক্ষাকৃত শাদা হয়। গোমুখ, ফুটির একটা প্রকার মাত্র। গোমুখ পাকিলে ফুটি অপেক্ষা রঙ শাদা হয়। ইহার গাত্র সম্পূর্ণ মসৃণ, ফুটি বা কাঁকুড়ের ন্যায় ডোরা কাটা হয় না। চাষ প্রণালী কাঁকুড়েরই মত। পাকিলে গুড় চিনির রস, বা মধু দিয়া খাইতে হয়। ফুটি ও তরমুজের, খরমুজার সুন্দর সরবৎ হয়।

তরমুজ

(Citrulus vulgaris.)

ফাল্গুন চৈত্র মাসে বীজ বুনিতে হয়। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে ফল পাকে। তরমুজ পাকিলে ইহার সবুজ রঙ ঈষৎ ফিকে হয় এবং আঙ্গুলের টোকা দিলে ফাঁপা বলিয়া বোধ হয়। এদেশের মধ্যে গোয়ালন্দের তরমুজই খুব বড় হয়। এক একটা ৩০ সের পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। আমেরিকান তরমুজেরও এদেশে চাষ হইতেছে। তাহার এক একটার ওজন ৫০ সের পর্য্যন্ত। ভাগলপুর, সাহারাণপুর ও সাজাহানপুরের তরমুজের খুব খ্যাতি আছে। পদ্মা যমুনা প্রভৃতি বালির চড়ায় বালির ভিতর প্রকাণ্ড তরমুজ হইয়া থাকে। মরুভূমি বালুকাস্তূপ হইতে তরমুজ খুঁজিয়া পথিক তাহাদের তৃষ্ণাদূর করে। চাষের জন্য বিঘা প্রতি দশ তোলা বীজের অধিক আবশ্যক হয় না।

তরমুজ অনেক প্রকারের আছে লম্বা, গোল এবং বোতলাকৃতি এই তিন রকমই সচরাচর দেখা যায়। গোয়ালন্দের তরমুজ লম্বাকৃতি গোল তরমুজের চাষ হুগলী জেলাতেই অধিক, ২৪ পরগণায় গোল এবং লম্বা দুই রকমই আছে। লম্বা তরমুজ-গুলিই আকারে বড় ও ভারি হয়। সাহারাণপুরে বোতলাকৃতি তরমুজ পাওয়া যায়।

কুমড়ায় ন্যায় ৪ কিম্বা ৫ হাত অন্তর মাদা দিতে হয়। নদীর চরে এক বিঘা জমিতে পচা সড়া বাদ, বড় হইলে ৫০০ তরমুজ পাওয়া বিচিত্র কথা নহে ও ছোট হইলে আরও বেশী হয়।

খরবুজা (লক্ষ্ণৌ)

সুমিষ্ট লক্ষ্ণৌ খরবুজা, ফলের মধ্যে উপাদেয়। অযোধ্যা বা আধুনিক ফরক্কাবাদ, লক্ষ্ণৌ, বড়বাঁকী প্রভৃতি জেলার যে যে স্থান দিয়া ঘর্ঘরা, সরযু ও শোণ নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই সমস্ত নদীতীরস্থ চর জমিতেই প্রচুর পরিমাণে খরবুজা উৎপন্ন হয়। খরবুজা ঠিক আমাদের দেশীয় গোলাকার কাঁকুড়ের ন্যায়। ইহার

ইংরাজী নাম Sweet melon (সুইট মেলন)। অনেক স্থানে ইহা জন্মায় বটে, কিন্তু লক্ষ্ণৌয়ের খরবুজা এবং সফেদা আম্রের সুমধুর রস, প্রায় অন্য স্থানে আস্বাদন করিতে পাওয়া যায় না।

চাষ এবং কাল নিরূপণ—খরবুজা প্রধানতঃ নদীর চর এবং বালুকাময় জমিতেই উৎকৃষ্ট জন্মায়। পশ্চিম দেশীয় কৃষকেরা মাঘের ১৫ই হইতে ফাল্গুনের শেষ মধ্যে নদীর চরে দুই বা আড়াই হস্ত অন্তর একটী একটী মাদা করিয়া তাহা এক এক টুকরী পুরাতন গোবর সারে পূর্ণ করতঃ তাহাতে তিনটি হিসাবে বীজ পুতিয়া দেয়। আর আবশ্যক বোধ করিলে চারা না হওয়া পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে অল্প অল্প জলসেচন করিয়া থাকে। তরমুজ, খরমুজ, কাঁকুড় প্রভৃতি খন্দ অধিক পরিমাণে অনাবৃষ্টি সহ্য করিতে পারে। পশ্চিমে বারিপাত খুব কম. কিন্তু তথায় ইহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণ জন্মায়। খরবুজা, কাঁকুড় এবং তরমুজ যতই গরম বাতাস বহিতে থাকে ততই আকারে একটু বড়, পুষ্ট এবং সুস্বাদু হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পশ্চিম দেশে খরবুজার ক্ষেতের নিকট দিয়া গেলে খরবুজার সৌরভে প্রাণমন পুলকিত হইয়া থাকে। যিনি কখন লক্ষ্ণৌ নগরীর এই সমুদয় ক্ষেতের অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনিই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বাঙ্গালায় কালনিরূপণ এবং বপন প্রণালী—বাঙ্গালায় বারিপাত অধিক হয় এবং কীটপতঙ্গাদির অধিক উৎপাত দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য খরবুজা অধিক হয় না। এদেশে পৌষ হইতে মাঘ মাস মধ্যে যেমন একবার বৃষ্টি হইবে, অমনি নদীচর এবং তন্নিকটবর্ত্তী খোলা ময়দান গুলিতে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে মাদা প্রস্তুত করিয়া পরিমাণ মত সার দিয়া ৩।৪টী হিসাবে খরবুজার বীজ পুতিতে হইবে। ঐ সকল হইতে চারা-গুলি ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে। খরবুজার গাছ দেখিতে ঠিক কাঁকুড় গাছের ন্যায়, গোলাকার চাকা পাত বিশিষ্ট। ইহা ত্রৈমাসিক ফসল। ইহার বীজ প্রায় কাঁকুড়ের বীজের ন্যায় কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট ও মোটা। গাছগুলি লতাইতে আরম্ভ করিলে ঐ সকল ক্ষেত ভাল করিয়া কোপাইয়া, বা পাতা লতা কুটী প্রভৃতি যাহা কিছু সুবিধা হইবে তাহাই বিছাইয়া দিতে হইবে। উহার উপর গাছ লতাইয়া ফল ধরিতে থাকিবে। নতুবা বালুকার উত্তাপে গাছ বা ফল উভয়ই হাজিয়া যাইতে পারে। লক্ষ্ণৌ ছাড়া, মুঙ্গের, ভাগলপুর, আগ্রা জেলার নদীকুলেও প্রচুর পরিমাণে খরবুজা উৎপন্ন হয়। ইহা ব্যতীত মধ্যভারতের অন্তর্গত উজ্জয়িনীতেও খরবুজা জন্মায়। কিন্তু এ সকল অপেক্ষা লক্ষ্ণৌ এবং আগ্রার খরবুজাই উৎকৃষ্ট। অন্যান্য স্থানের ফল তত সুস্বাদু নহে। প্রকৃত লক্ষ্ণৌ এবং আগ্রা নগরীর খরবুজা খাইবার সময় খাঁটি দুগ্ধের সুমিষ্টতা বা সুগন্ধযুক্ত ক্ষীর ভোজনের ন্যায় ভ্রম হয়।

অন্য প্রদেশে খরবুজার রপ্তানি—ক্ষেতে লক্ষ্ণৌ খরবুজা পাকিবার প্রথম হইতে

শেষ পর্য্যন্ত স্থানীয় বাজারে প্রতি সের ৵০ বিক্রয় হয়। খরবুজা নূতন উঠিলে ॥০ সেরও বিকায়। ফলগুলি দেখিতে গোলাকার, গাত্রে কাল কাল দাগ আছে। এই ফল বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকিলে স্থানীয় মহাজনেরা প্রত্যহ শত শত টুকরি ভরিয়া নানাস্থানে রেলওয়ে পার্শেলে রপ্তানি করিয়া বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করে। খাঁটী লক্ষৌ খরবুজা কলিকাতার বাজারে আমদানী হইতে দেখা যায়।

সব্জীর বাগান

শ্রীশশি ভূষণ সরকার লিখিত।

আজ কাল এই কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে বা অন্যান্য সহর নগরে ফল তরকারী কত দুর্ম্মূল্য ও দুস্প্রাপ্য তাহা কাহাকেও বলিতে হইবে না। বাজারে খরিদ্দার অনেক, কিন্তু জিনিষ অল্প যখন প্রত্যহই এই প্রকার ঘটিতেছে, তখন কোনও বিচক্ষণ লোকের মাথায় কি এমন ভাবের উদয় হয় না যে, পয়সা দিয়া পসারিদের কটু বোল শুনিয়া ফিরি কেন চেষ্টার অসাধ্য কোন কাজ নাই, কেনই বা দুই কিম্বা চারি বিঘা জমি লইয়া একটা মালী রাখিয়া তরকারীর বাগান না করি? ইহাতে নিজের উপকার ও দেশের উপকার। আর ইহাও যে একটা নূতন বিষয় তাহা নহে; কারণ প্রায়ই দেখিতেছেন, অমুক বাবু অমুক স্থানে বাগান করিয়াছেন ও প্রত্যহ মালী তাঁহাকে তরকারী ফলমূলাদি আনিয়া দিতেছে। বাজারে মাল কম, খরিদ্দার অধিক, সেই জন্য এত টানাটানি। বাগান করিতে পারিলে নির্ব্বিঘ্নে খাওয়া চলে, উপরন্তু উদ্বৃত্ত দ্রব্য বেচিয়া পয়সা হয়।

অনেকে টাকা লোহার সিন্দুকে বা বাক্‌সে জমা রাখিয়াছেন, বা সুদের লোভে কোন কারবারীর নিকট দিয়াছেন, বা চাকুরি পাইবার সময় দু পাঁচ হাজার টাকা আনামত রাখিয়া ৪৫৲।৫০৲ টাকার চাকুরি পাইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন। যে টাকা আমানত রাখিয়া চাকুরি করিতেছেন, সেই টাকায় বাগান ও চাষ বা অতি সামান্য চাউল, ধান্য বা বিচালীর ব্যবসা করিতেন, তবে ঐ ৪০৲ টাকা কি স্বাধীনভাবে পাইতে পারিতেন না? যাঁহাদের বেশী টাকা আছে, ও সংসার চালাইবার উপযুক্ত আয় আছে, তাঁহারা তো বাজার খরচের জন্য তত ব্যস্ত হইবেন না; ৵০ আনার জায়গায় ।০ আনা গেলে তাঁহাদের কি যায় আসে? তাঁহাদের এই সামান্য বিষয় লইয়া আন্দোলন বা চিন্তা করিয়া মাথা ব্যথা করা ভাল নয়, কিন্তু আমার

ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই মনে হয় আমরা প্রত্যেকে অথবা না হয় দুই চারি জন বন্ধু মিলিয়া বা জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী খুলিয়া, তরকারি, ফল ফুলাদির বাগান করি, তাহা হইলে যে কেবল সব্জী বা ফল পাইব, এমন নহে, আপাততঃ দৈনিক বাজার খরচ বাঁচিয়া যাইবে এবং ভবিষ্যতের একটা উপায় হইয়া দাঁড়াইবে। ইহাতে আমোদও আছে, এবং বিশেষ লাভ এই যে, আর সব্জীর জন্য অন্যের মুখাপেক্ষা করিতে হইবে না বা শুক্না তরকারি খাইয়া মরিতে হইবে না। উপরন্তু উন্মুক্ত বাতাসে মৃত্তিকা চালনা করিতে করিতে শরীর দৃঢ় ও কর্ম্মঠ হইবে। শারিরীক ও মানসিক স্বাধীন বৃত্তিগুলি পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। চাষাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করিতে করিতে তাহাদের সহিত সৌহৃদ্য স্থাপন হইবে এবং আমরা প্রকৃত স্বাবলম্বী হইতে পারিব।

যাঁহারা একাকী বা চার কিম্বা পাঁচ জন বন্ধু মিলিয়া সব্জীর বাগান করিতে চাহেন, তাঁহারা ২৫।৩০ বিঘা জমি লইয়া সব্জীক্ষেত আরম্ভ করিলে সময় মত সর্ব্বরকম দ্রব্য পাইতে পারিবেন। ইহাতে যে বেশী টাকা ফেলিতে হইবে তাহা নহে; সাধারণ গৃহস্থের প্রতি মাসে তরকারি ক্রয় করিতে যত টাকা লাগে তাহার ২০ গুণ একজনে দিয়া একটী যৌথ বাগান করিতে পারিলে তরকারির জন্য দুই তিন মাস অপেক্ষা করিয়া, পরে ক্রমাগত তরকারি উৎপন্ন করিতে পারিলে তরকারির কষ্ট দূর হইবে এবং ভবিষ্যতের জন্য বাগান বাড়াইয়া ক্রমশঃ এই সঙ্গে একটা ফলের বাগান প্রস্তুত করা চলিবে। ক্রমশঃ ঐ বাগান হইতে মাছ, দুধ, ফল, তরকারি পাওয়া যাইবে তাহাতে নিজেদের অভাব মিটিবে এবং উদ্বৃত্ত সামগ্রী বিক্রয়ে লাভ হইবে ইহা সুনিশ্চিত। উৎকৃষ্ট ফল, তরকারি, বিশুদ্ধ দুধ উপযুক্ত মূল্যে পাইয়া অনেকে ধন্য হইবে।

কলিকাতা বা কলিকাতার খুব সন্নিকটে সাধারণ চাষের জমি মেলা ভার। জমি পাইতে হইলে কলিকাতার বাহিরে চারি বা পাঁচ ক্রোশ দূরে বা আরও দূরে চেষ্টা করিলে পাইতে পারেন। কিন্তু এইটী বিশেষরূপে দেখিতে হইবে, যেন তাহা রেল বা ষ্টীমারের নিকটবর্ত্তী হয়। তাহা হইলে যখন ইচ্ছা তখনই সবান্ধবে যাইয়া তাহার পরিদর্শন করিতে পারিবেন ও প্রত্যহ মালী উৎপন্ন দ্রব্যাদি আনিয়া দিতে পারিবে, হাটে বাজারেও মাল পাঠাইবার সুবিধা হইবে। এরূপ ক্ষেত্রস্থাপন করিতে হইলে, প্রথমে মৃত্তিকা বিচার আবশ্যক, আয় ব্যয়ের অবস্থা বুঝা কর্ত্তব্য এবং ঐস্থান কোন্ কোন্ ফল শস্যের উপযোগী তাহার চিন্তা প্রয়োজন। জলের যোগান চাই। জল সংস্থান জন্য পুকুর বা ঝিল না থাকিলে চাষাবাদের কার্য্য সুচারুরূপে চলিবে না।

যে কয় বিঘা জমি লওয়া হইবে, তাহাতে সব্জীক্ষেত রচনা করিতে হইলে, তাহার চারিদিকে দুই বা তিন হাত চওড়া ও দুই হাত গভীর খাদ খনন করিয়া বাগান রক্ষার উপায়ও করিতে হইবে। তোলা মাটির উপর শাক, সব্জী যাহা লাগান যাইবে

তাহা অপেক্ষাকৃত ভাল হইবে। মধ্যে মধ্যে ক্ষেতে মাটি উঠাইবার জন্যও এইরূপ পগারের আবশ্যক।

সজীক্ষেতের নিকট কিম্বা ঐ বাগানের মধ্যস্থলে একটী জলাশয় খনন করা আবশ্যক; কারণ গ্রীষ্মকালে শাক সজ্জীতে জল সেচন করিতে হইবে। পুষ্করিণী গভীর করা তত আবশ্যক নহে, কিন্তু বড় হওয়া চাই। পুষ্করিণী খনন করিয়া যে মৃত্তিকা পাওয়া যাইবে, তাহাতে অন্যান্য জমি অপেক্ষা বাগান উচ্চ হওয়াতে জলমগ্ন হইবার ভয় থাকিবে না; অধিকন্তু তোলা মাটিতেই গাছ পালা শীঘ্র বৃদ্ধি পাইবে বাগানের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী খাদের ধারে ধারে আতা, লেবু ও পীচের চারা ঘন ঘন করিয়া বসাইলে বেড়ার সাহায্য হইবে ও সময়ে বেড়ার গাছ হইতে ফলও পাইবেন। খাদের উপরিভাগে উচ্চ জমিতে ১২ হাত অন্তর একটী করিয়া কলা গাছ ও প্রত্যেক কলা গাছের মধ্যে দুইটী করিয়া পেঁপে গাছ লাগাইলে ও পেঁপে গাছের মধ্যে দুই কিম্বা একটী ঢেঁড়স গাছ (রামতরুই) লাগাইতে পারিলে একটা বাঁধা আয়ে বাগান তৈয়ারি হইয়া উঠে। খাদের ধারে জমি বাগানের ভিতর দিকে একটু ঢালু হওয়া আবশ্যক, আর সেই ঢালু জায়গায় লতানে গাছ ২০ হাত লম্বা স্থানে এক এক প্রকার যথা—লাউ, কুমড়া, পুঁই লাগাইতে হয়। সীম, বরবটী ধারে ধারে পালায় উঠাইয়া দেওয়া যায়। পুষ্করিণী ও খাদের মধ্যবর্ত্তী জমি সমান করিয়া কেয়ারী করিয়া প্রত্যেক প্রকার শাক সজ্জীর জন্য অন্ততঃ ২০ হাত দীর্ঘ ১২ হাত প্রস্থ স্থান রাখিবেন, যখন যে শাক সজ্জী লাগাইতে হইবে, তাহার বীজ একবারে বপন করিতে নাই, দুই ভাগ করিয়া, এক ভাগ বপন করা কর্ত্তব্য। যখন দেখিবেন যে, গাছ বাহির হইয়াছে, তখন অবশিষ্ট বীজ আর দুই স্থানে বপন করিবেন। ফসল পাকিলে যখন দেখিবেন যে বীজ হইতেছে, তখন এক কেয়ারী বীজের জন্য রক্ষা করিয়া অন্য সকল স্থান পরিষ্কার করিয়া দুই চারি দিন পরে অন্য শাকের বীজ বপন করুন।

সস্তা বীজ বালিগঞ্জের ও বৈঠকখানার হাটে পাওয়া যায়, বিদেশীয় শাক সজ্জীর বীজের প্রাপ্তিস্থানের বা নসরির অভাব নাই। বীজ কিন্তু জানাশুনা ভাল জায়গা হইতে সংগ্রহ করাই বিধেয়। হাটের বীজ সব সময় ভাল হয় না। বাগান প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমেই মালী রাখার আবশ্যক হয় না, কুলী (ধাঙ্গড়) বা দেশী মজুর দ্বারা ভূমী খনন করাইলে কম খরচ পড়ে। পরে ভূমি সমান করা হইলে পর কেবলমাত্র একটি মালী রাখা কর্ত্তব্য। কারণ সে কেবল মাত্র কেয়ারী প্রস্তুত বীজ বপন ও আবশ্যমত জল সেচন করিবে। এস্থলে ছোট বাগানের কথা ধরা হইতেছে। জমি খনন বা সমান করিবার ভার মালীর উপর দিলে ঠিক সময়ে শাক সজ্জীর বীজ সকল স্থানে বপন করা হইবে না। বাগানের পরিসর অনুযায়ী মজুরের সংখ্যা কম বেশী করিতে হয়। প্রত্যহ মালীকে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া যাইতে হইবে

ও তৎপর দিবস সেই কাজ হইতেছে কি না, তাহা দেখিতে হই ও করাইয়া লইতে হইবে। মালী অলস হইয়া বসিয়া বা ঘুমাইয়া বেতন লইলে চলিবে না। ফলের বাগান করিতে ইচ্ছা থাকিলে দুইটি কলা গাছের মাঝে মাঝে আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, বিলাতী আমড়া, জামরুল, গোলাপ জামের চারা বা কলম লাগাইতে হয়। এক জাতীয় গাছ এক লাইনে লাগাইলে দেখিতে সুন্দর হইবে। পুষ্করিণীর চারিধারে ৮ হাত অন্তর নারিকেল চারা ও তাহাদের নিকট অপর সারিতে এক একটা সুপারি চারা লাগান চলে। পথের দুই ধারে (৩ হাত চওড়া পথ থাকা আবশ্যক) তিন হাত অন্তর সুপারির চারা লাগাইলে বাগান সুদৃশ্য হয়। সৌন্দর্য্যের জন্য গোলাপ, বেল মল্লিকা ফুলের কলম মাঝে মাঝে লাগাইতে পারা যায়। অথবা চৌকা করিয়া কেয়ারিতে ঐ সকল গাছ লাগান ভাল, সংখ্যায় অধিক হইলে ফুল গাছ হইতে আয় হওয়া অসম্ভব নহে। পুষ্করিণীতে বর্ষাকালে মৎস্যের ডিম্ব বা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যপোনা পাঁচ ছয় টাকার ফেলিলেও লাভ আছে। যদি পুষ্করিণীতে বার মাস জল থাকে ও চৈত্র বৈশাখে ৩।৪ হাত জল থাকে, তবে চালা মাছ যেমন ডিম হইতে বড় মাছ ছয় মাস মধ্যে হইয়াছে, সেই প্রকার ১০৲।১৫৲ টাকার ক্রয় করিয়া তাহাতে ছাড়িয়া দিতে পারা যায়। দ্বিতীয় বৎসরে প্রত্যেকটী প্রায় এক সের ওজনের মাছ হইবে এবং মাছ হইতেও একটা আয় দাঁড়াইতে পারে।

বাগানের জমির অভাব নাই। যদি ই, বি, রেলের ধারে, এদিকে সোদপুর, কিম্বা দক্ষিণে গড়িয়া, সোণারপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে চেষ্টা করেন, তবে পাইতে পারিবেন। বিশেষতঃ গড়িয়ার খাল ধারে গভর্ণমেণ্টের ও অন্যান্য জমিদারের অনেক জমি পতিতাবস্থায় আছে; অল্প খাজনায় বন্দোবস্ত করিয়া লইলেই পাইতে পারেন। বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলওয়ের নিকটেও ৬।৮ ক্রোশ দূরে অনেক জমি পাওয়া যায়।

বাগান প্রস্তুত হইলে, এক বা দেড় বৎসর কাল পরে আর নিজেদের আবশ্যকমত তরকারী ও ফলের কষ্ট পাইতে হইবে না। কিন্তু যখন দেখিবেন যে, ঐ বাগান হইতে উৎপন্ন দ্রব্য হইতে জমির খাজনা, চাকরের বেতন ছাড়া আরও লাভ দাঁড়াইয়াছে, তখন আরও নিকটস্থ জমি লইয়া বাগান বড় করিতে চেষ্টা করা উচিত। এরূপ চেষ্টা থাকিলে দেখিবেন বন্ধুবান্ধবেরা সর্ব্বদাই অনুরোধ করিবেন, যেন তাঁহাদের জমি লইয়া বাগান করা হয়। প্রথমে কিছু সকলেই এই কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইবেন না, ভয় করিবেন, পাছে টাকা মাটী হয় বা ঠকেন। কিন্তু একবার ভাল লোকের পরামর্শ মতে ২।৪ জন কার্য্য আরম্ভ করিলে ক্রমশঃ জমিরও অনাটন হইবে এবং জমির মূল্য বৃদ্ধি হইবে। তখন সকলকেই সস্তার জমির জন্য দূরে যাইতে হইবে। যদি জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী খুলিতে চাহেন, তবে অন্ততঃ ২০ জন ততোধিক অংশীদার লইয়া কার্য্যারম্ভ করা বিধেয়।

সকলে বর্ত্তমানে ৫০৲ টাকা করিয়া অংশ লউন ৬ মাস পরে আর ৫০৲ টাকা করিয়া

দিবেন। অন্ততঃ ৮০ বিঘা জমি লইয়া এক সঙ্গে বাগান করুন। যে প্রকার ছোট ছোট বাগানের নিয়ম দেওয়া হইয়াছে, সেই মত বড় বাগানের জন্যও আবশ্যক মত খাত ও জলাশয় খনন করা আবশ্যক। জলাশয় একটা একটু বৃহৎ বা চারি পাঁচটি ছোট ছোট হওয়া আবশ্যক। এই বাগান যদি খালের বা নদীর ধারে হয়, বা যথায় জোয়ারের জল উঠে তবে ঐ সকল জলাশয়ের দুই মুখ খোলা রাখিয়া বাড় বা আবশ্যকমত দ্বারবদ্ধ করিবার জন্য যদি কপাট থাকে, তাহা হইলে মাছের যোগাড় সহজে হয়। ইহাতে বর্ষার জলের মাছ অমনি পাইবেন, যে মাছ ছাড়া হইয়াছে তাহা পলাইবে না এবং তথায় মাছ বাড়িবে। ৫।৬ বিঘা জমিতে একজন মালী (দেশীয় বা উড়ে) রাখিলে এবং মাঝে মাঝে নগদ মজুর ধরিলে ভাল কাজ চলিবে। বাগানের অতি সন্নিকটে বা গ্রামে এক বিঘা জমি লইয়া মালীদের থাকিবার ঘর ও বৈঠকখানা এবং গরু বা মহিষ রাখিবার জন্য গোয়ালঘর করিতে হইবে।

বাগানের জমি প্রস্তুত হইলে প্রত্যেক প্রকার সব্জীর জন্য অন্ততঃ ২।৩ বিঘা জমি পৃথক রাখিতে হইবে ও সপ্তাহ অন্তর ১০ কাঠা জমীতে বীজ বপন ও চারা রোপণ করিলে পরে পরেও ক্রমান্বয়ে সব্জী পাওয়া যাইবে ও ইচ্ছা মত দরে বিক্রয় করিতে পারা যাইবে। একখানা গরু বা মহিষের গাড়ি রাখিতে হইবে। ঐ গাড়িতে রেলওয়ে ষ্টেসনে মাল পাঠাইবার আবশ্যক হইবে। মাল অধিক হইলে লুইস এণ্ড কোং যে প্রকার গাড়ী ব্যবহার করিতেছেন সেই মত হওয়া আবশ্যক। তন্মধ্যে দুই তিন থাক বা সেল্‌ফ থাকা চাই। ঐ সকল সেল্‌ফে বাজার সপ্লাই তরকারীর ডালা বা চুপড়ী থাকিবে। ২।৩ প্রকার দরের বাজার রাখা আবশ্যক। ৴০ আনার ৶০ আনার ও ।০ আনার, ভালমন্দ অনুসারে দর হইবে। যে সময় যে ফসল উৎপন্ন হইতেছে, সেই মত কিছু কিছু করিয়া প্রত্যেক প্রকার দ্রব্য সাজাইয়া ডালাতে রাখিতে হইবে। ক্রমশঃ সস্তায় ভাল জিনিস দিতে চেষ্টা করিতে হইবে এবং অধিক জিনিষের যাহাতে আমদানী হয় তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। গাড়ীতে ঐ প্রকার বৈকালে ডালা সাজাইয়া গাড়ী মধ্যে বন্ধ করিয়া ১০।১১টা রাত্রে গাড়ী ছাড়িয়া দিলে ১২।১৪ মাইল দূর হইতে কলিকাতায় অতি প্রাতে আসিবে। যখন গাড়ী লইয়া বড় রাস্তা দিয়া বিউগল বাজাইয়া দুইটী লোক (চাকর) প্রত্যেক গৃহস্থকে জানাইয়া দিবে যে, বাজার সপ্লাইয়ের গাড়ী আসিয়াছে; তখন যাঁহার দরকার তিনি তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া বাজার লইবেন, বা কত দরের ডালা আবশ্যক জানাইলে চাকরেরা বাটীতে পৌঁছিয়া দিয়া মূল্য আদায় বা ধারে হইলে ভাউচার স্বাক্ষর করাইয়া গাড়িতে বাবু থাকিলে, তাঁহার হাতে দিবে নতুবা বাগানে লইয়া যাইবে। যে সংসারের যাহা আবশ্যক তাহা ফরমাসমত সপ্লাই করা যাইবে। সুপক্ক ফল তরকারী আবশ্যক হইলে গাড়ীর নিকট আসিয়া দর করিয়া লইয়া যাওয়ার

বিধিই ভাল। পূজা পার্ব্বণে অধিক পরিমাণে দ্রব্যাদির আবশ্যক থাকিলে, পূর্ব্ব দিবস অর্ডার লিখিয়া দিলে, উপযুক্ত সময়ে তাহা দেওয়া সম্ভব হইবে। যাঁহারা ধারে বাজার লইবেন, তাঁহাদের নিকট কিছু অগ্রিম লইয়া পরিশেষে প্রত্যেক সপ্তাহের বা মাসের শেষে হিসাব দাখিল করিয়া টাকা আদায় করিয়া লইবেন।

তরকারীর গাড়ী যেন ৭॥০ টার পর কলিকাতায় না থাকে; কারণ মহিষ বা বলদ দুই প্রহরের মধ্যে বাগানে ফিরিয়া আহারান্তে ২।৩ ঘণ্টা বাগানে চাষ দিতে পারে। শীতকালে বিদেশীয় শাক সব্জী ও গোল আলু পুষ্করিণীর ধারে লাগান আবশ্যক; যেন সহজে জল সেচন করা যাইতে পারে।

এই প্রকারে যদি কার্য্যারম্ভ করেন, তখন এক বৎসর পরে দেখিবেন যে, আর ৪০৲ টাকার চাকুরীর জন্য ২।৪ হাজার টাকা জমা রাখিয়া, ভয়ে ভয়ে প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে চাকুরি করিতে যাইতে হইবে না; ১০০০৲ টাকা খরচ করিয়া ঘরে বসিয়া স্বাধীন উপায় অবলম্বন করিয়া ৩০৲ ৪০৲ টাকা পাইবেন। আর যদি ইচ্ছা হয়, তবে ঐ জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানী স্থাপন করিয়া আর কিছু মূলধন লইয়া ইহার সহিত ধান্য, চাউল, বিচালীর কারবার করিয়া কলিকাতায় চালান দিলে আরও নিশ্চয় লাভ হইবে। এই রকমের আরম্ভ দেখিলে আমরা আনন্দিত হই এবং ভারতীয় কৃষিসমিতি এতদর্থে বহুবিধ সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। পত্রের দ্বারা তাঁহাদের নিকট বিশেষ খবর জানিতে পারিবেন।

অৰ্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে পল্লী গ্রামের কৃষি শিল্পাদি

(আমি একেই বৃদ্ধ, তাহার উপর দুর্ব্বিসহ শোকে ও রোগে আমার শরীর ভগ্ন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি। স্মরণ শক্তির বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। তজ্জন্য আমার লিখিত প্রস্তাবে ভ্রম প্রমাদ ও পুনরুক্তি দোষ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আশা করি সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ আমার ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।)

অৰ্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে গ্রামের সমস্ত জমিরই স্থানীয় শ্রমজীবী ও কৃষাণ দ্বারা আবাদ কার্য্য সম্পন্ন হইত। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতে স্থানীয় লোক দ্বারা আর গ্রামের সমস্ত জমির আবাদ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে না। ধানের আবাদের সময় (আষাঢ় শ্রাবণ, ভাদ্র) ও ধান কাটার সময় (অগ্রহায়ণ পৌষ) বাঁকুড়া ও মানভূম জেলা হইতে সাঁওতাল

প্রভৃতি শ্রমজীবী না আসিলে আবাদ কার্য্য ও ধান কাটা সম্পন্ন হয় না। পূর্ব্বে স্থানীয় লোক দ্বারা গ্রামের সমস্ত জমির আবাদ কার্য্য সম্পন্ন হইত ও ধান কাটা হইত এখন হয় না কেন? এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হইয়া থাকে। এখন সম্পন্ন না হইবার ৩টী কারণ বলিয়া মনে হয়। ১ম কারণ,—পূর্ব্বে প্রায় সকলেই সবল ও পরিশ্রমী ছিল, এখন কার মত রুগ্ন ও দুর্ব্বল ছিল না, তখনকার একজন কৃষাণে যে কার্য্য করিত, এখনকার দুইজন না হইলে আর সেই কার্য্য করিতে পারে না। ২য় কারণ এপ্রদেশে পূর্ব্বাপেক্ষা লোক সংখ্যা অনেক কমিয়া যাওয়ায় শ্রমজীবী ও কৃষিজীবীর সংখ্যা কম। ৩য় কারণ পূর্ব্বে যে সকল লোক স্বহস্তে কৃষি কার্য্য সম্পন্ন করিত এক্ষণে তাহাদের অনেকেরই বংশধরগণ আর স্বহস্তে কৃষি কার্য্য সম্পন্ন করে না তজ্জন্যই ভিন্ন স্থান হইতে শ্রমজীবী না আসিলে এপ্রদেশের অধিকাংশ ভূমিই আবাদ হইত না। আবাদের সময় ও ধান কাটার সময় উপস্থিত হইলেই ভিন্ন স্থানবাসী জন মজুরের অপেক্ষায় থাকিতে হয়। ভিন্নস্থানবাসী মজুরের উপরই এপ্রদেশের আবাদ এক্ষণে সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিতেছে। ইহা ব্যতীত আর একটী কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে নানাল জমিমাত্রেই প্রায় ধান বোনা হইত, এখন আর ধান বপন করিতে দেখা যায় না। এখন প্রায় সকল জমিতে ধান চারা রোপণ করা হইয়া থাকে। ধান বোনা হইলে আর রোপণ করিতে হয় না, তজ্জন্য আবাদের সময় অনেক পরিশ্রমের লাঘব হয়। নিড়ান সময় কিছু অধিক পরিশ্রমের আবশ্যক হয়। বোনা ধান গাছের সহিত ঝড়া (এক প্রকার ধান গাছ) মিশ্রিত থাকে। নিড়ান সময় ধান গাছগুলি রাখিয়া ঝড়া গুলি উপড়াইয়া ফেলিয়া দিতে হয়। ধান গাছ ও ঝড়ার প্রভেদ যে সামান্য আছে, তাহা এখানকার কৃষকেরা অনুভব করিতে পারে না। তজ্জন্য ঝড়া উপড়াইতে গিয়া ধান গাছ উপড়াইয়া ফেলে। ধানের শীষ বাহির হইবার সময় অনেক ঝড়া দেখা গিয়া থাকে। ঝড়াও একপ্রকার ধান গাছ। ঝড়ার ধান পাকিবার পূর্ব্বেই তাহার ধানগুলি ঝরিয়া ভূমিতে পড়িয়া যায়;—তাহাতে কৃষকের কোন উপকার হয় না। আগেকার কৃষাণেরা কোনটী ধান গাছ আর কোনটীই বা ঝড়া তাহা নিরূপণ করিয়া নিড়াইবার সময় ঝড়া গুলি উপড়াইয়া ফেলিত। এখন আর সেরূপ কৃষাণ না থাকায় বোনা ধান নিড়াইবার সময় নিঃশেষে ঝড়া তুলিয়া ফেলিতে পারে না। ধানের জমিতে একারণ অনেক ঝড়া থাকিয়া যায়। বোনা ধানের জমিতে বেশী ঝড়া থাকিলে কৃষকের বিশেষ ক্ষতি হয়। একারণ বোনা ধানে চাষ প্রায় এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে।

*ধান কাটিয়া গৃহে আনিবার সময় ধানের শীষ হইতে অনেক ধান স্খলিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া থাকে; সেই ধান ৩।৪মাস রৌদ্রে পড়িয়া থাকে জমির মাটী ফাটিলে, সেই ধান মৃত্তিকা মধ্যে নিহিত হয়। জমির উপরেও কতক পতিত থাকে; কতক

বা পক্ষীতে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে জমিতে যো পাইয়া চাষ মৃত্তিকার উপরিস্থিত ধান মাটী চাপা পড়ে। বৃষ্টির জল পাইয়া সেই ধান হ চারা বাহির হয়। সেই চারাকে "নাম ধান" কহে। নাম ধান পাকিলে ত শীষ হইতে সকল ধান ঝরিয়া পড়ে না। কতক কতক ঝরিয়া ভূমিতে পড়ে। ধান হইতে যে চারা বাহির হয়, তাহাই ঝড়া নামে খ্যাত। সেই ধান সম্পূর্ণ পাকিবার পূর্ব্বেই সমস্ত ধান ঝরিয়া যায়। সেই ঝরার ধান হইতে যে চারা ব হয় তাহাতে ঝরাই হইয়া থাকে। ধান গাছ হইতে ঝরা বাছিয়া বাহির করা সুব বলিয়া এখন আর বোনা ধানের তত প্রচলন নাই। যাহারা প্রাচীন বিজ্ঞ তাহারাই ঝরা চিনিতে পারে। রোপিত ধানের জমির মধ্যেও ঝরা হইতে গিয়া থাকে। বীজ নির্ব্বাচনের ত্রুটীতেও রোয়া ধানের মধ্যেও ঝরা দেখা গিয়া থা ধান্য চারা রোপণ করিবার পূর্ব্বেও জমিতে অনেক ধান গাছ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সে ধানের শীষ হইতে স্খলিত ধান হইতে গাছ হইয়া থাকে; অনেক স্থলেই সেগু অধিকাংশই ঝড়া হইয়া থাকে। এজন্য শ্রেণী বদ্ধ ভাবে ধান্য চারা রোপণ করি তাহার আশে পাশে যে ধান গাছ গুলি চাষ ও মই দেওয়ার পর জীবিত থ সেগুলি ঝড়া হইবার ভয়ে কৃষকেরা নিড়াইবার সময় উপড়াইয়া দেয়। সেগু মধ্যে যেগুলি নাম ধান আছে তাহার সমস্ত ধান ঝড়িয়া পড়ে না। ঝ শীষ বাহির হইলেই সকলেই তাহা ঝড়া বলিয়া চিনিতে পারে। ক্ষেত্রস্বামী অ যে কেহ শীষ সহ সেই ঝড়ার গাছ কাটিয়া আনিয়া গরুকে খাওয়ায়। শীষ বহি হইবা মাত্র ঝড়ার গাছ কাটিয়া না আনিলে, তাহা হইতে স্খলিত ঝড়া ভূমিতে প আগামী বৎসরে বহু সংখ্যক ঝড়ার গাছ জন্মিবে। তজ্জন্য ঝড়ার শীষ বাহির হ মাত্র কাটিয়া ফেলিয়া থাকে। বোনা ধানের জমি নিড়াইতে ও পাকিলে ধান কাটিতে রোয়া ধান অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে হয়।

অৰ্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এ প্রদেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী ছিল। তখন ভদ্র কি ইতর প্রায় সকলেই কৃষি কার্য্য দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদন চালাইতেন। তজ্জন্য লো কৃষিকার্য্য তখন যে রূপ যত্ন ও উৎসাহ লক্ষিত হইত, এমন আর তাহার কিছুই না তখন যেরূপ বহুল পরিমাণে কার্পাস চাষ হইত ঘরে ঘরে যে রূপ চরকা চলিত এ তাঁতের যেরূপ বহুল প্রচলন ছিল, এখন যদি তাহার অৰ্দ্ধেকও বর্ত্তমান থাকিত, ত দেশে তদ্রূপ বস্ত্র কষ্ট কদাচ হইত না। তখনকার লোকে যেরূপ মোটা কাপ সন্তুষ্ট হইতেন, এখনকার লোকের আর সেরূপ হন না। দেশীয় মিলের অর্থাৎ বঙ্গল কটন মিলের এবং বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের মিলে যে কাপড় প্রস্তুত হয়, তাহার স্থ মোটা বলিয়া এখনকার ভদ্রলোকের কথা দূরে থাকুক, দরিদ্র লোকেও বিলাতী কা অপেক্ষা শস্তা থাকা স্বত্ত্বেও ক্রয় করিয়া পরিধান করিতে সম্মত হয় না। অপেক্ষার

খাদ্য দ্রব্য পাক করিয়া খাওয়া ভাল নহে। অন্ন ব্যঞ্জনাদি রন্ধনের পক্ষে মৃত্তিকা নির্ম্মিত পাত্রই উপযোগী ও উপকারী। ইহাতে কোনরূপ অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই। কুম্ভকারের নির্ম্মিত মৃন্ময় পাত্র এখন ও নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে অধিক পরিমাণে লোক খাওয়াইবার জন্য মৃত্তিকা পাত্রে রন্ধন, ডাল তরকারী রাখিবার জন্যও মৃত্তিকা পাত্র ব্যবহৃত হইত; এখন আর সেরূপ দেখা যায় না,—অনেক স্থলেই পিত্তলের পাত্রে অন্নাদি পাক করা হয়! ইহাতে অন্ন, ডাল তরকারী ইত্যাদি কিয়ৎ পরিমাণ বিষাক্ত ও বিস্বাদ হইয়া থ্যকে। একারণ নিমন্ত্রণের ভোজে খাইতে যাইয়া এখন অনেকেই অসুস্থ হইয়া পড়ে। পূর্ব্বে খাদ্য দ্রব্য রন্ধন মৃত্তিকা নির্ম্মিত হাঁড়ীতে সম্পন্ন হইত; পাক করা ডাল তরকারী ইত্যাদি মৃত্তিকা নির্ম্মিত ডাবায় রাখা হইত ইহাতে অন্ন ব্যঞ্জনাদি খাদ্য দ্রব্য বিষাক্ত বা বিস্বাদ হইত না। একারণ মৃন্ময়পাত্রেরই ব্যবহারই বিশেষ উপযোগী ও প্রয়োজনীয়।

এখন অনেক কুম্ভকারের পুত্র লেখা পড়া শিখিয়া চাকরীর জন্য লালায়িত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা বুঝে না যে, ২৫।৩০ টাকা বেতনের চাকরি করিয়া পরাধীন থাকা অপেক্ষা নিজ ব্যবসায়ে উন্নতি সাধন করিলে চাকরী অপেক্ষা অনেক লাভ আছে। এখন যে মৃত্তিকা পাত্রের মূল্য যেরূপ অত্যধিক বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে একজন কুম্ভকার যদি মনোযোগ ও পরিশ্রম সহকারে হাঁড়ি, কলসী, ডাবা ইত্যাদি মৃন্ময় পাত্র গঠন করে তবে সে মাসিক অন্যূন ৪০।৪৫ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে। এখন কি কৃষিজীবি কি শিল্পিজীবি সকলই প্রায় বিলাসী, অলস ও অপরিণামদর্শী হইয়া পড়িয়াছে। তজ্জন্য দেশে এত অন্ন কষ্ট বলিয়া আমরা মনে করি। কেবল কুম্ভকার বলিয়া নহে দেশের সকল শিল্পীর অবস্থাই শোচনীয়।

পূর্ব্বাপেক্ষা এখন সূত্রধরের কর্ম্ম অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে চেয়ার টেবিল, বেঞ্চ আলমারী খাট ইত্যাদির এত অধিক প্রচলন ছিল না। পাশ্চত্য সভ্যতার সহিত এই সকল দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের ন্যায় পল্লী গ্রামের মধ্যবিত্ত লোকের বাটীতে ঐ সকল দ্রবা দেখিতে পাওয়া যাইত না। পাশ্চত্য সভ্যতায় বৃদ্ধির সহিত ঐ সকল দ্রব্যের প্রচলন ও বর্দ্ধিত হইয়াছে। সহরের লোক যত চেয়ার টেবেল ব্যবহার করেন, পল্লীগ্রামের লোক তত ব্যবহার করে না। সহরের লোকে এখন যেমন চিয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর কাগজ পুস্তক রাখিয়া লেখা পড়া করেন, পল্লী গ্রামের লোকে এখনও মাদুরে বসিয়া ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। আমাদের এখানকার পল্লীগ্রামের সূত্রধরেরা চিয়ার, টেবিল আলমারী প্রভৃতি দ্রব্য নির্ম্মাণে অভ্যস্থ নহে।

আমাদের এখানকার অধিকাংশ লোকের গৃহ মৃত্তিকা নির্ম্মিত ও বিচালীর ছাদনে আচ্ছাদিত। খুঁটী, সাঙ্গা (আরা) সাল কাষ্ঠের এবং চালের কাট তালের। এখানকার সূত্রধরেরা ঐ সকল ঘর কাটাম করিয়া থাকে। দ্বার জানালা তৈয়ার করিয়া থাকে। এখনকার

অনেকে মাটীর ঘরে ছুতার মিস্ত্রি দ্বারা কাষ্ঠের ও ডোম দ্বারা শলা ইত্যাদির সূক্ষ্ম কারুকার্য্য সম্পন্ন করাইয়া থাকেন। এখনকার মাটীর দেওয়ালের মত ইমারতের ন্যায় একত্রে সংলগ্ন ২।৩।৪ কুঠরী করে না। এক এক খানি ঘর এক এক কুঠরী ২।১ খানি ঘর ও দুই কুটরীর দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে সূত্রধর ও ডোম দ্বারা যেরূপ কাষ্ঠে ও সলা ইত্যাদির কারুকার্য্য সম্পন্ন হইত, এখন সেরূপ করিয়া ঘর খুব কম লোকেই করিয়া থাকে। ঐরূপ এক একখানি ঘর তৈয়ার করিতে সহস্রাধিক টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। দ্বারে (বারাণ্ডায়) খুটীর উপরি ভাগে যেখানে সাঙ্গার (আড়ার) সহিত সংলগ্ন হয়, তাহার উপরি ভাগে কাষ্ঠের সূক্ষ্ম কারু কার্য্য সম্পন্ন তিলেট বা পাড় এবং তাহার নিম্ন ভাগে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য সম্পন্ন কাষ্ঠের সাম বেঁধে দেওয়া হয়। খুটীর সহিত সাঙ্গার সংযোগ স্থল হইতে কারুকার্য্য সম্পন্ন কাষ্ঠের হস্তী শুণ্ডাকৃতি নিম্নদিকে বাহির হইয়া সামনেঁধিকে ধারণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে খড়ো ঘরে যেরূপ কারুকার্য্য অনেক ঘরেই দৃষ্ট হইত এখন আর তত দেখা যায় না। পূর্ব্বে যেরূপ কম খরচে কার্য্য হইত, এখন আর তাহা হয় না। বর্দ্ধমান অঞ্চলে ভাল ইট হয় না; হইলে ও তাহা ভাল মজবুত হয় না পাকা ঘর তৈয়ার করিলে অধিকাংশ স্থলেই অল্প দিনের মধ্যেই দেওয়াল ফাটিয়া গৃহবাসের অনুপযোগী হইয়া পড়ে। এজন্য অনেক সঙ্গতিপন্ন মধ্যে কিন্তু লোকে ইমারত না করিয়া কারুকার্য্যবিশিষ্ট খড়ো ঘর করিয়া থাকেন। বাড়ীর ভিতরকার ঘর অপেক্ষা চণ্ডীমণ্ডপ বা বৈঠকখানাতে খড়ো ঘরে অধিক কারুকার্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখন ঐরূপ ঘর করা বহু ব্যয় বাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। তজ্জন্য সঙ্গতিপন্ন লোক ব্যতিত ঐরূপ ঘর করিতে পারে না। পূর্ব্বে সকল দ্রব্যেরই মূল্য খুব কম ছিল। পূর্ব্বাপেক্ষা কাষ্ঠের মূল্য ও পরিশ্রমের মূল্য অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বে একজন ছুতার মিস্ত্রির মাসিক বেতন ৫৲ টাকা ও খোরাকি ছিল। এখন খোরাকি ব্যতীত ছুতার মিস্ত্রীর বেতন ২০।২৫ টাকা হইয়াছে। সাল কাষ্ঠের মূল্যও ৮।১০ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে।

এমন সূত্রধরের কার্য্য বৃদ্ধি পাওয়ায়, সূত্রধরের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ন্যূন হওয়ায়, সূত্রধর জাতীয় ব্যক্তির দ্বারা কাষ্ঠের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয় না। অন্যান্য জাতীয় লোকেও ঐ সকল কার্য্যে শিক্ষিত হইয়া ঐ সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে।

পূর্ব্বাপেক্ষা স্বর্ণকারের কার্য্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এখনকার ন্যায় পূর্ব্বে এত স্বর্ণালঙ্কারের প্রচলন ছিল না, একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের ন্যায় পল্লীগ্রামে স্বর্ণলঙ্কারের প্রচলন খুব কম ছিল। পূর্ব্বে এ প্রদেশের পল্লীগ্রাম সমূহের মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যে খুব কম লোকের স্ত্রীলোকেরাই স্বর্ণলঙ্কার ব্যবহার করিতেন। তখন বরং মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোকেই রৌপ্যালঙ্কার ব্যবহার করিতেন। মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যে যাঁহাদের অবস্থা উন্নত, তাঁহাদের স্ত্রীলোকেরাই [illegible] করিয়া স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করিতেন। পূর্ব্বকালের স্বর্ণকার

দিগকে স্বর্ণাপেক্ষা রৌপ্যের অলকারই অধিক নির্মাণ করিতে হইত। সোণার গহনা খুব কমই তৈয়ার হইত। এখন নানা প্রকার স্বর্ণালঙ্কার আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে এ সকল গহনার নাম এখনকার স্ত্রীলোক কেন,—সহরের স্ত্রীলোকেরা জানিতেন কি না সন্দেহ। পূর্ব্বে মধ্য বিত্ত গৃহস্থের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ধনশালী লোকের স্ত্রীলোকেরা যে সকল স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করিতেন, এখন সে সকল স্বর্ণলঙ্কারের আর প্রচলন নাই। এখন আর রৌপ্যালঙ্কার মোটেই নাই বলিলেই হয়। পূর্ব্বে মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যে উন্নত অবস্থাপন্ন লোকের স্ত্রীলোকেরা ও রৌপ্যালঙ্কার ব্যবহার করিতেন। হাতের নীচে পাইচে বাউটী, জনীরে লোহা, উপর হাতে তাবিজ, কোটীদেশে চন্দ্রহার, গোট বা বিচা, পায়ে মল, গুজরি পঞ্চম পাইজোর রৌপ্য নির্ম্মিত হইত। গলায় কণ্ঠমালা, তেনল পাঁচনল, কর্ণে ফুল ঝুম্‌কা, টেরি পাশা, মাথায় শিঁথি নাসিকায় নথ। দক্ষিণ হস্তে বাজু স্বর্ণ নির্ম্মিত হইত। বিশেষ অবস্থাপন্ন স্ত্রী লোকদের নীচে হাতে বালা, নারিকেল ফুল, মুড়কী মাদুলি, উপর হাতে তাবিজ, বাজু গলার মত সাত নল স্বর্ণ নির্ম্মিত ছিল।

পূর্ব্বে এখনকার অপেক্ষা সোনা অনেক সস্তা ছিল। তখন বিশুদ্ধ স্বর্ণের ভরি ১৬৲ টাকা করিয়া ছিল। এখন যেমন প্রতি সপ্তাহেই স্বর্ণের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। তখন ১৩।১৪ টাকা ভরি স্বর্ণের অলঙ্কার প্রস্তুত হইত। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন স্বর্ণের মূল্য প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। বিশেষ সঙ্গতিপন্ন লোকের স্ত্রীলোক ব্যতিত পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করিতে পারিতেন না। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে রৌপ্যের ভরি ১/০ করিয়া ছিল, মধ্যে রৌপ্যের মূল্য খুব কমিয়া গিয়া ৷৵০ আনা ভরি হইয়াছিল। আবার কয়েক বৎসর হইতে রৌপ্যের মূল্য খুব বৃদ্ধি হইয়াছিল। সম্প্রতি রৌপ্যের মূল্য কিছু কম হইয়াছে। পূর্ব্বে স্বর্ণ রৌপ্যের মূল্য নির্দ্দিষ্ট ছিল; তজ্জন্য খাদ দেওয়া স্বর্ণ রৌপ্য কষ্টী পাথরে কসিয়া স্বর্ণ রৌপ্যের মূল্য স্থিরীকৃত হইত। পূর্ব্বে বিশুদ্ধ স্বর্ণের ভরি ১৬৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল, তখন খাদ দেওয়া ১৩৲ টাকা ভরি স্বর্ণেও অলঙ্কার নির্ম্মিত হইত। বিশুদ্ধ স্বর্ণ ও রৌপ্য কিছু কোমল, একারণ অলঙ্কার ও মুদ্রা প্রস্তুত কালীন বিশুদ্ধ স্বর্ণ রৌপ্যে রৌপ্য বা তাম্র সামান্য পরিমাণে মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। দেশে যে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন আছে। তাহাতে সামান্য পরিমাণ তাম্র মিশ্রিত আছে। পূর্ব্বে অনেকেই স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা গলাইয়া অলঙ্কার নির্ম্মাণ করাইবেন। একণে রাজ নিয়মে তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

একণে স্বর্ণকার জাতির সংখ্যা খুব কম হইয়াছে, অথচ পূর্ব্বাপেক্ষা স্বর্ণালঙ্কারের প্রচলন বহু পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। স্বর্ণকার মাত্রেই অলকার গঠন কালে খুব মূল্যের গাইন প্রয়োজনাতিরিক্ত উক্ত লাগাইয়া অলঙ্কারের ভার বৃদ্ধি করিয়া স্বর্ণ অপহরণ করিয়া থাকেন।
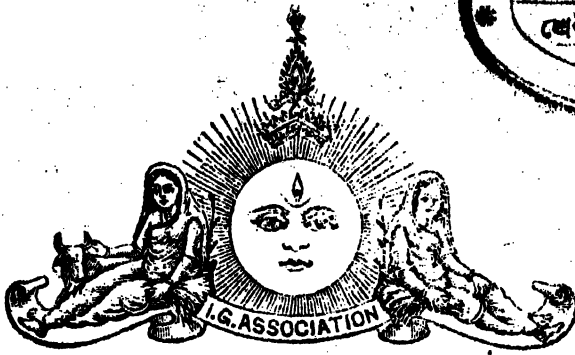
(ক্রমশঃ)

বৈশাখ ১৩২৮ সাল

ধলভূমগড় কৃষি আবাস

১ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া একটি কৃষি শিল্প সমিতি (Indian Industrial and Agricultural Association) স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত কোম্পানি ধলভূম গড়ে ৪২০০ বিঘা জমি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং জমির আয়তন ক্রমশঃ ১০,০০০ বিঘা পর্য্যন্ত বাড়াইতে পারিবেন এরূপ আশা ও কল্পনা কোম্পানির আছে।

এরূপ কোম্পানি বা সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্য কি তাহা বোধ হয় সকলেই অনুমান করিতে পারেন। দেশে দিন দিন খাদ্য শস্য, ফল, সব্জী, দুধ, মাছ প্রভৃতির অভাব ক্রমশঃ স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে অতএব এই সকল সামগ্রী যাহাতে দেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয় ও সহজ প্রাপ্য হয় তাহা সকলেই ইচ্ছা করিয়া থাকেন। সমিতি আপাততঃ যে ৪২০০ বিঘা জমি সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা হইতে ১০০০ বিঘা জমি লইয়া একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিবেন। ইহাতে স্থানীয় মৃত্তিকা ও আবহাওয়ার উপযোগী সর্ব্বপ্রকার ফল শস্য উৎপাদন করা হইবে, এতদ্ব্যতীত এখানে গো ও পশু পক্ষী পালন, মাছের চাষ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ আয়কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হইবে। ক্ষেত্রটি চাষাবাদে সাজসরঞ্জামে পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণাবয়ব হইবে এবং স্থানীয় কৃষক মণ্ডলীর আবাদ বিদ্যা শিক্ষারও সুযোগ এখানে ঘটিবে।

কৃষি ক্ষেত্রদ্বারা অধিকৃত স্থানে ব্যতিরিক্ত ৩২০০ বিঘা জমি উক্তস্থানে চাষাবাদে কর্ম্মেচ্ছু ব্যক্তিগণের মধ্যে ৫০ বিঘা পরিমিত এক এক খণ্ডে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। ভবিষ্যতে ইহা বাঙলীর একটা উপনিবেশে পরিণত হয় ইহা সমিতির প্রধান [illegible]। সমিতির কার্য্য তত্ত্বাবধানের ভার ভারতীয় কৃষি সমিতির (Indian

Gandring asociation Ltd) উপর ন্যস্ত হইয়াছে। উপযুক্ত হস্তে কাজের ভার পড়িয়াছে। ভারতীয় কৃষি সমিতি ১৮৯৭ শালে স্থাপনকালাবধি যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা এখন কাজে লাগাইতে পারিবেন। উপরন্ত ভারতীয় কৃষি সমিতির যে পরামর্শ সভা আছে তাহারা যুক্তি পরামর্শ দ্বারও কৃষি শিল্প সমিতির প্রভৃতি কল্যাণ সাধিত হইবে পরামর্শ সভার নিম্নলিখিত কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি আছেন।

জে, সি, চৌধুরী টকিও কৃষি কলের প্রত্যাগত, রেশমতত্ত্ববিদ্ ও কৃষিতত্ত্ববিদ্

আর দাস গুপ্ত F. R. H. S. (Loud) Late Dy Director of Agri culture Bengal.

এস, ডি বন্দ্যোপাধ্যায়—M. A. M. Sc. Ph. D. রসানতত্ত্ববিদ্

নিকুঞ্জ বিহারী দত্ত —M. R. A. S. (Eng) উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্

কানাই লাল ঘোষ F. R. H. S. (Loud) কৃষি ও উদ্যানতত্ত্ববিদ্

শরচ্চন্দ্র বসু—M. R. A. S. (Eng) কৃষি রসায়নতত্ত্ববিদ্

যে কোন ব্যক্তি ধলভূমগড়ে উক্ত কোম্পানির নিকট হইতে চাষাবাদের জায়গা লইতে পারিবেন। উক্ত জমি নিম্নলিখিত সর্ত্তে বিলি হইবে

১। প্রত্যেক গ্রাহককে কোম্পানির অংশীদার হইতে হইবে এবং তাঁহাকে ১০৲ টাকা হিঃ অন্যূন ৫ খানি অংশ গ্রহণ করিতে হইবে এবং প্রত্যেক ১০৲ টাকার সেয়ারের জন্য ২৲ টাকা অগ্রীম আবেদন পত্রের সহিত পাঠাইতে হইবে।

২। ৫০ বিঘা পরিমিত এক একটি লট বিলি করা হইবে। প্রথম বৎসর করশূন্য, দ্বিতীয় বৎসর ।০ আনা, তৃতীয় বৎসর ॥০ আনা বার্ষিক খাজানা দিতে হইবে এবং যত দিন জমি জোতে থাকিবে ততদিন ॥০ বার্ষিক খাজানায় চলিবে এবং প্রত্যেক গ্রাহককে ৩ বৎসর মধ্যে বিঘা প্রতি ৩৲ টাকা সেলামি দিতে হইবে।

এরূপ একটি কোম্পানির পরিপুষ্টিতে ধলভূগড় কৃষি-আবাসের প্রজা সাধারণের উপকার হইবে। কোম্পানি এখানে একটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও শস্য গোলা স্থাপনে করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ব্যাঙ্ক হইতে সকলেই অর্থ সাহায্য ও শস্য গোলা হইতে চাষের জন্য শস্য বীজ পাইবেন। অত্রস্থানে কেবল চাষ আবাদের কার্য্য চলিবে এমন নহে যাহাতে ক্রমশঃ পশুপালন, গো রক্ষা, কুটীর শিল্পের প্রবর্ত্তন হয় কোম্পানির কার্য্য তত্ত্বাধারকগণ সর্ব্বদাই উদ্যোগী থাকিবেন।

অল্পে অল্পে রেশম শিল্পের ও কার্পাস বস্ত্র বয়নের ব্যবস্থা করা হইবে। দুগ্ধচূর্ণ প্রস্তুত ও ফল সংরক্ষণের চেষ্টা করা হইবে। দশজনে একত্র হইয়া, দশের শক্তি সামর্থ্য এক যোগে প্রয়োগ করিয়া যাহা কর সম্ভব তাহা করা হইবে। সঙ্ঘবদ্ধ শত শত জনে মিলিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষি-আবাস গঠন করিয়া তুলা অসম্ভব হইবে না। অনেকে প্রশ্ন তুলিতে পারেন যে আমরা বাঙ্গলার লোক, বাঙলা

ছাড়িয়া যাই কেন ?—তাহার অনেক কারণ আছে—(১ম) বাঙলায় এক সঙ্গে এত অধিক জমি মিলে না। (২য়) বাঙলার জমির খাজানা অধিক। (৩য়) বাঙ্গালার অধিকাংশস্থান ম্যালেরিয়া বিষে জর্জ্জরিত। (৪র্থ) বাঙ্গালার মাটিতে ও রোগদুষ্ট জলহাওয়ায় দীর্ঘকাল বাস করিলে শরীর মন শিথিল হইয়া যায় বলিয়া। (৫ম) বাঙলার বাহিরে গেলে বাঙ্গালী একত্র হইয়া অধিকতর দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করিতে পারে বলিয়া। (৬ষ্ঠ) বাঙলার চাষী মজুরের বড় অভাব বলিয়া। (৭ম) কঠোর সভ্যতার মাঝখানে, সহর নগরে কল কারখানার কোলাহল হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিব বলিয়া।

প্রাণ মন সচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে থাকিবে বলিয়া আমরা সিংভূমের অরণ্যবাসে আমাদের কৃষি আবাস স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি।

এই সম্বন্ধে খবর পাইতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিতে হইবে।

Indian Gardening Association Limited, Managing Agents, Indian Industrial and Agricultural Association Limited.

Reg. Office 162 Bowbazar Street Calcutta.

উদ্ভিদের আহার

মনুষ্য ও জীব জন্তুর যেমন আহারের প্রয়োজন হয়, উদ্ভিদেরও তদ্রূপ আহারের আবশ্যক। মূল, কাণ্ড, পত্র ও পুষ্প এই চারিটি উদ্ভিদের অঙ্গ। মূল মৃত্তিকা হইতে রস সংগ্রহ করে—মূলই তাহার মুখ। মূল মৃত্তিকা হইতে আহার আহরণ করে, কাণ্ড তাহা বহন্ করিয়া পত্রে লইয়া যায়, পত্রে সেই আহরিত পদার্থের পরিপাক কার্য্য সম্পন্ন হয়।

মৃত্তিকায় উদ্ভিদের আহার সঞ্চিত থাকে। উদ্ভিদের আহারোপযোগী সার বিশেষতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যেমন নাইট্রোজন প্রধান, ফস্ফারাস প্রধান, পটাস প্রধান ও চুণ প্রধান সার। পোটাসিয়ম নাইট্রেট, অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইড প্রভৃতি ধাতব পদার্থ, মৎস্য, রক্ত প্রভৃতি জান্তব পদার্থ, খৈলাদি উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে উদ্ভিদের আহারোপযুক্ত নাইট্রোজেন সংগ্রহ হয়।

হাড়চূর্ণ, হাড়ভস্ম অথবা এপেটাইট ও সুপার প্রভৃতি ধাতব পদার্থ কিম্বা গুয়ানো হইতে ফস্ফরাস সংগ্রহ হয়। গোময়, কাষ্ঠ কিম্বা চারা গাছ বা পচানীভস্ম অথবা কাইনাইট, পোটাসিম সালফেট বা মিউরিয়েট প্রভৃতি ধাতব পদার্থই পটাস প্রাপ্তির

উপায়। এতদ্দেশীয় মৃত্তিকায় চূণও অল্প বিস্তর বিদ্যমান আছে। চূণ কিন্তু প্রত্যক্ষ-ভাবে বৃক্ষলতাদির আহার নহে, উহা পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের আহারকার্য্যের সহায়তা করে। মৃত্তিকাস্থিত যাবতীয় সার পদার্থকে উহা গলাইয়া রস রূপে পরিণত করে। তখন ঐ সকল সার উদ্ভিদের আহারোপযোগী হয়। বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ তাহাদের নিজ প্রয়োজন অনুরূপ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করে। অনাহারে বা অল্পাহারে মানুষের যেমন কষ্ট হয় উদ্ভিদের তদ্রূপ কষ্ট হয়। অল্পাহারে তাহারা ক্ষীণ হয় এবং অধিককাল অনাহারে তাহারা বিনিষ্ট হয়।

কিন্তু কি প্রকারে উদ্ভিদ তাহাদের আহার সংগ্রহ করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তাহারা মূল দ্বারা আহার করে। মনুষ্য ও অধিকাংশ জন্তু যেমন মুখদ্বারা তাহাদের খাদ্য ভাল করিয়া চর্ব্বণ করে ও লালা প্রভৃতি রস মিশ্রিত করিয়া তাহাদের খাদ্যবস্তু পোষণোযোগী করিয়া লয়, উদ্ভিদ তাহা পারে না। উদ্ভিদ মূলদ্বারা কেবল মাত্র মৃত্তিকাস্থিত রসাকর্ষণ করিতে সক্ষম। সুতরাং উদ্ভিদের পোষণোপযোগী সমুদয় খাদ্য এই রসে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। জলই উদ্ভিদের খাদ্য সমূহ দ্রব করে। জলদ্বারা দ্রব না হইলে উদ্ভিদ তাহা কখনই গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং জল যে উদ্ভিদের আহারের এক প্রধান সামগ্রী তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। যথোপযুক্ত আহার বিদ্যমান থাকিলেও উদ্ভিদ জল বিনা অনাহারে করিতে পারে। জল উদ্ভিদের আহারের প্রধান উপাদান। মৃত্তিকা নিহিত কঠিন পদার্থ সমুহ সহজ অবস্থায় উদ্ভিদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রথমে সে গুলি জলের সাহায্যে তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং তৎপরে উদ্ভিদ মূলদ্বারা নিজাভ্যন্তরে টানিয়া লয়, সুতরাং জলই উদ্ভিদের কেবল মাত্র আহার নহে, উহা উদ্ভিদের আহার বহন করিবার আধার। এই জন্য প্রায়ই দেখা যায়, জল না পাইলে উদ্ভিদ ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং অবশেষে মরিয়া যায়। ধান, যব প্রভৃতি গুচ্ছ মূলধারী শস্যের মূল মৃত্তিকার নিম্নে অতি দূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে না, তাহাদের ভাসা শিকড় জল না পাইলে শীঘ্র মরিয়া যায়। বড় লম্বা মূলধারী উদ্ভিদ মৃত্তিকার অধিক নিম্নদেশ ভেদ করিয়া জল সংগ্রহ করে, সেই জন্য অতি রৌদ্রের সময়েও তাহাদের বিশেষ ক্ষতি হয় না। সুতরাং বেশ বুঝা যায় যে, উদ্ভিদ মূলদ্বারা এই কার্য্য সম্পাদন করে। মৃত্তিকাস্থিত রস মূলাণু কোষের প্রাচীর ভেদ করিয়া কোষান্তরে প্রবেশ করে। মূল এবং কাণ্ড অসংখ্য কোষে গঠিত। মূল এবং কাণ্ড কোষ সমষ্টি মাত্র। রস মূলাণুকোষে প্রবেশ লাভ করিয়া কোষ হইতে কোষান্তরে নীত হয়, অবশেষে কাণ্ডের নবজাত অংশপথ বহিয়া পত্রে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মনুষ্য শরীরে যেমন শোণিত প্রবাহ উদ্ভিদ শরীরে জল প্রবাহও প্রায় তদনুরূপ।

উদ্ভিদ মানুষের ন্যায় যেমন মূলদ্বারা আহার তেমনি তাহার শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া

সংসাধিত হইয়া থাকে। বায়ুস্থিত অক্সিজেন শ্বাস, প্রশ্বাসে গ্রহণ না করিলে কোন্ প্রাণীই জীবিত থাকিতে পারে না। প্রচুর আহার সত্ত্বেও জলাভাবে যেমন প্রাণী বাঁচে না, বায়ু অভাবেও কোন প্রাণী বাঁচিতে পারে না। বিশুদ্ধ অক্সিজেন কিন্তু আমাদের শ্বাস, প্রশ্বাস গ্রহণের উপযোগী নহে। অক্সিজেন সকল বস্তুকে দগ্ধ করে, কিন্তু অক্সিজেন বাষ্প, বায়ুমণ্ডলস্থিত নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসের সহিত মিশ্রিত থাকায় উহা প্রাণী মাত্রেরই গ্রহণোপযোগী। পত্রান্তর্গত রস ও পত্রাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট অক্সিজেন বাষ্প এতদুভয়ের মিলনে উদ্ভিদের দেহ নির্ম্মাণের উপকরণ সমূহ উৎপন্ন হয়। জল ও বায়ুর ন্যায় উদ্ভিদজীবনে আর একটি অত্যাবশ্যক পদার্থের প্রয়োজন—সেটি সূর্য্যালোক। সূর্য্যালোক দ্বারাই উদ্ভিদের পরিপাক ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি হয়। উদ্ভিদের পত্রকোষে একপ্রকার হরিদ্বর্ণ পদার্থ দৃষ্ট হয়। এই হরিদ্বর্ণ খণ্ডগুলি দ্বারা উদ্ভিদের পরিপাক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই হরিদ্বর্ণ খণ্ডগুলির অভাব হইলে পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত হয়। সূর্য্যালোকের অভাব হইলে হরিদ্বর্ণ খণ্ড শাদা হইয়া যায়, তখন আর সেগুলি পরিপাক কার্য্যে সহায়তা করিতে পারে না। সূর্য্যালোকেই হরিদ্বর্ণ খণ্ড গুলির জন্ম এবং সূর্য্যালোকেই তাহার কার্য্যকারিতা।

প্রাণী মাত্রেই যেমন জীবিত থাকিয়া সন্তুষ্ট নহে, নূতন জীবন উৎপাদনে তাহারা ব্যগ্র। উদ্ভিদেও সে প্রবৃত্তি বিদ্যমান আছে। সেই জন্য তাহারা তাহাদের অঙ্গ বিশেষে পুষ্টিকর পদার্থ সমূহ সঞ্চিত করিয়া রাখে। ধান, যব, গম, মটর, মসুর প্রভৃতি ও অধিকাংশ ফলের গাছের বীজে এই পুষ্টিকর পদার্থ সঞ্চিত হয় এবং সেই সকল বীজ হইতে পুনরায় গাছ হয়। কতকগুলি মূলজ খন্দের, যথা—গোল আলু, লাল আলু মূলা, সালগম, বীট, গাজর প্রভৃতির পুষ্টিকর পদার্থ মূলে কিম্বা কাণ্ডে সঞ্চিত হয়। এই জাতীয় কয়েকটির যেমন গোল আলুর মূল কিম্বা কাণ্ড হইতে ফসল জন্মিয়া থাকে।

উদ্ভিদের আহার ও পরিপাক ক্রিয়ার বিষয় অবগত হইলে আমাদের এই সুবিধা হয় যে, আমরা মৃত্তিকায় উদ্ভিদের আহারোপযোগী কি কি পদার্থ আছে, তাহা দেখিতে চেষ্টা করিব। কোন উদ্ভিদের কি আহার আবশ্যক তাহার বিচার করিব। জমিতে রসাভাব না হয় তাহার ব্যবস্থা করিব এবং ব্যবস্থা করিব এবং অবস্থা বুঝিয়া জল সেচনের ব্যবস্থা করিব, ক্ষেতে বা বাগানে কখন বায়ু চলাচলের পথ রোধ না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিব এবং উদ্ভিদ কখন সূর্য্যালোকের অভাব অনুভব না করে, তাহার যথাসম্ভব বন্দোবস্ত করিব, কিম্বা ছোট কচি গাছগুলিকেও প্রচণ্ড সূর্য্যাতপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ছায়া প্রদান করিব। তবেই উদ্ভিদের পরিপাক ও পোষণ সম্পূর্ণ হইবে. তবেই উদ্ভিদ পরিপুষ্ট হইবে এবং যথোপযুক্ত ফল ফুল প্রদান করিবে।

বাগানের মাসিক কার্য্য

জৈষ্ঠ মাস

কৃষিক্ষেত্র—এই সময় আমন ধান বোনা হয়, পাট ও আউস ধানের ক্ষেত নিড়াইতে হয়, বেগুণ ডাঁটি বান্ধিয়া দিতে হয়। জৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত অরহর বীজ বপন করা চলে। আদা, হলুদ, কচু, ওল প্রভৃতি জৈষ্ঠ মাসেও বসাইতে পারা যায়। শাঁকালুর বীজ বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

সব্জী বাগ,—এই মাসে ভুট্টা বীজ বপন করা উচিত। কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন। জলদি ফসল হইতে ইতিমধ্যে ভুট্টা ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে লাউ, কুমড়া, ঢেড়স, পালা ঝিঙ্গা, পালা শসার বীজও এই মাসে বপন করা চলে। বর্ষাতি মূলা ও নানা জাতীয় শাক বীজের বপন কার্য্য জৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই শেষ করিতে হইবে। জলদি ফুল কপি পাইতে গেলে এই সময় হইতে পাটনাই ফুল কপি বপন করিয়া চারা তৈয়ারি করিতে হইবে।

ফুলবাগিচা—এই সময় জিনিয়া, দোপাটী, গাঁদা বীজ বপন করিতে হইবে। ডালিয়া বীজও এই সময় বপন করা চলে। কেহ কেহ ডালিয়ার মূল এই সময় বসাইতে বলেন আমরা কিন্তু বলি আমাদের দেশের অত্যধিক বর্ষায় মূলগুলি পচিয়া যাইবার ভয় আছে, সেই জন্য বর্ষান্তে বসাইলেই ভাল। কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র ফুলের মুখ দেখিতে গেলে একটু কষ্ট স্বীকার না করিলে চলে না। পূর্ব্বে কথিত ফুল বীজ ব্যতীত আমরান্থস কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, রাধাপদ্ম, ধুতুরা, মার্টিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ বপনের এই সময়।

ফলের বাগানের এখন বিশেষ কোন পাট নাই। ফল আহরণ এখন একমাত্র কার্য্য। তবে কুল, পীচ, লেবু প্রভৃতি যে সকল গাছের ধাপকলম করিতে হইবে তাহার বন্দোবস্ত এখন হইতে করিতে হয়।

পার্ব্বত্য প্রদেশে ঋতুর পার্থক্য হেতু বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। সেখানে এখন ডালিয়া ফুটিতেছে। তথায় মটর ও সীম ফলিতেছে। বাঁধা কপি ও ফুলকপির বীজ এখন বপন করা যায়।
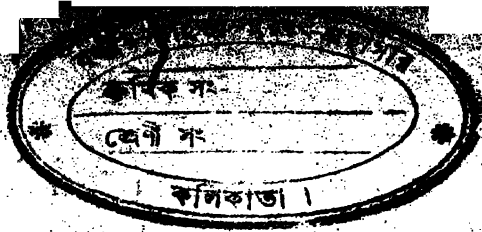
কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

২২শ খণ্ড } জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ সাল। { ২য় সংখ্যা।

ফলগু জাতীয় অনাবৃষ্টি সহ ধান

আমরা এ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশীয় বিল, জোল, আবাদ, দেয়াড়া, দীরা, চর, জলগণ্ড, আটমাসা বিল, তরাই প্রভৃতি ফলা সম্ভব যাবতীয় ধানের জমির অনেকটা পরিচয় প্রদান করিয়াছি ইহাতে কৃষি পিপাসু পাঠকগণের তো, কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার সাধিত হইতে পারে। সমগ্র বঙ্গবাসীর হৃদয়ে যে ধীরে ধীরে এই কৃষিই একমাত্র আদরের ধন, তাহার উন্মেষণ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা অনেক প্রমাণ দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু শিক্ষিত সমাজ, দেশীয় ধনীদিগের সাহায্য সমবেত হইয়া কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইলে, ফলের আশা করা কঠিন, তবে, দেশের অর্থাগমের পথ যেরূপ রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে অবিলম্বেই যে কৃতবিদ্যদলকে কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি। ইতি পূর্ব্বে "কৃষকে" অনেক কৃষি-পিপাসু পাঠকের অনাবৃষ্টিসহ ধান্য বীজের জন্য ব্যগ্রতা সহকারে অনুসন্ধান করিতে দেখিয়া, এই প্রবন্ধ লিখিতে বাধ্য হইলাম। শ্রীযুক্ত বাবু কানাই লাল ঘোষ, "কৃষক" সহকারী সম্পাদক মহাশয় যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোমুখী যুক্তিপূর্ণ পরামর্শ বটে ; কিন্তু তাহাতে অনুসন্ধীৎসু ব্যক্তির কার্য্যের একটু বিলম্ব হইতে পারে, কারণ গ্রাহক মহাশয় সম্ভবতঃ বর্ত্তমান বর্ষেই ঐ প্রকার ধানের আবাদ আরম্ভ করিয়া গত বৎসরের ন্যায় অনাবৃষ্টি জনিত আশঙ্কা হইতে মেদিনীপুরের অধিবাসীকে রক্ষা করিবার পন্থা স্থির করিয়াছেন, সুতরাং আমার যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি "কৃষক" সম্পাদক এবং গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি সহানুভূতি সহকারে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার ফলগু জাতীয় অল্প জলের, অনেকটা অনাবৃষ্টি সহ ধান্যের নামকরণ পূর্ব্বক আমূল বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া উভয়ের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য প্রয়াস পাইলাম। ইহাতে সাধারণের কিছু মাত্রও উপকার সাধিত

হয়, তাহা হইলে, লেখনী চালনা স্বার্থক জ্ঞান করিব। বাস্তবিক কানাই বাবুর দূরদর্শিতা পূর্ণ পরামর্শের বিষয় আলোচনা করিয়া, মনে নিরতিশয় আনন্দের উদয় হইতেছে। ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন ও "কৃষক" পত্রিকা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের মঙ্গল সাধনে ব্রতী হইয়াছেন।

ধানের নাম	আশু	বোয়া	হৈমান্তিক
		•	•
সূর্য্যমণি	ঐ	•	•
বন্থই	ঐ	•	•
দিঘা	ঐ	•	•
চৈত্র বোয়া	•	ঐ	•
বোইত্র	•	ঐ	•
সুন্দর শাইল	•	•	আশু ছোটনা।
কার্ত্তিক শাইল	•	•	ঐ
কাঁটা রাঙ্গী	•	•	ঐ
শাল ভোগ	•	•	ঐ
নলোচ	•	•	ঐ
কাহ্নয়ী	•	•	ঐ
খাঁন্দী	•	•	ঐ

উপরোক্ত কয়েক জাতীয় আশু অথচ অতিশয় ফলণ্ড জাতীয় ধান্যকে, অতি অল্প জল বিশিষ্ট কোমল জমিতে বপন ও রোপণ করতঃ উত্তমরূপে ফসল উৎপন্ন করা যাইতে পারে। আর ইহারা বাঙ্গালা দেশের যশোহর, বরিশাল, বাঘেরহাট প্রভৃতি নিম্ন জলা ভূমি ব্যতীত পশ্চিম উত্তর বঙ্গের সর্ব্বত্রই সমান ভাবে আবাদ করিয়া প্রচুর পরিমাণে ফসল প্রস্তুত করা যাইতে পারে। অনাবৃষ্টি কালে, অত্যল্প জলে বিশেষ কোন অনিষ্ট ঘটে না। তবে দৈবাৎ যদি প্রচুর বৃষ্টি হইয়া যায়, তাহাতে বরং ভালই হয়। ইহারা অতি দুঃখের সময় গৃহস্থকে অন্ন দানে জীবিত রাখে। এই সকল জাতীয় ধান্যের গাছে, ধান্য অপেক্ষা তৃণ কম জন্মে। কিন্তু সূর্য্যমণি, কাঁটারাঙ্গী, এই দুই জাতীয় ধান রোপণ অপেক্ষা বপনেই অধিক ফলন পাওয়া যায়। ইহারা জলোচ্ছ্বাসের ডাঙ্গা জমিতেও ভাল হয়। অধিকন্তু কথিত জাতীয় ধান্যের মণ প্রতি অর্দ্ধেকেরও অধিক চাউল হয়। বিশেষতঃ সূর্য্যমণি ধানকে ভাদ্র মাসে ক্ষেত্র হইতে কর্ত্তন করিয়া লইয়া সেই জমির চারিদিকে একহস্ত পরিমাণ উচ্চ করিয়া আইল বা জেড়ী বন্দী করিয়া দিয়া বর্ষার জল বন্ধ করিয়া রাখিলে পুনরায় অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমেই উহার দ্বিতীয় বারের ফসল হইতে বিঘা প্রতি

আরও একটী আশাপ্রদ ফসল পাওয়া যায়। আর বর্ষাকালে, কৃষকের গবাদির আহারেরও বেশ খাদ্য সংস্থান হয়। বোরা ধান প্রায় বার মাসই চাষ করিয়া ধান পাওয়া যায়। ইহার বিশেষ কোন জাতি গত নাম নাই। কালিন্দী ধানকে, আষাঢ় ও ভাদ্র এই দুই মাসে রোপণ পূর্ব্বক, বোরো এবং আশু ছোটনা ধান্যে পরিণত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। তবে ইহার ফলন তত অধিক হয় না।

আমাদের দেশীয় মূর্খ কৃষকেরা এই সমুদয় গুণাগুণ বুঝিতে না পারিয়া, কেবল মান্ধাতার আমল হইতে একই নিয়মে পরিচালিত ও সঙ্কুচিত জ্ঞানে কাজ করিয়া, দেশের এই অভাব ঘটাইতেছে, বিশেষতঃ পাট চাষে, আশু বেশ টাকা পাইবার আশায়, ধানের আবাদ বন্ধ করিয়া দিতেছে, সুতরাং অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক কৃষকের যত পরিমাণ জমি থাকে, তাহার বার আনা ভাগ জমিতে পাট, আর সিকি পরিমাণ ভূমিতে ধান করিয়া থাকে। পূর্ব্বে যে সকল জমিতে প্রচুর পরিমাণে আশু ধান হইত, এক্ষণে সেই সকল স্থানে পাট ও গোল আলু জন্মিতেছে। তবে বাঙ্গালার দক্ষিনাংশস্থ আবাদী জমিতে কেবল হৈমন্তিক জাতীয় ধান্য জন্মায় বলিয়াই দেশে শস্যের অনাটন হইয়া উঠিয়াছে। একথা আমরা অনেক স্থলে দর্শাইয়াছি। কথিত ধান্য ব্যতীত আরও ২০।২৫ প্রকার ফলগু জাতীয় ধান্য আছে, আশু ধান্যের মধ্যে যে কয় প্রকার ফলগু জাতীয় ধান্যের নামোল্লেখ করা গেল, তাহাদের মধ্যে সূর্য্যমণি. পরাঙ্গী, ধলুই প্রভৃতি সকল গুলিকেই এই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের "যো" বৃষ্টি হইয়া জমি ঠাণ্ডা হইলেই যে কোন প্রকার অল্লোচ্চধরণের ভূমিতে বপন দ্বারা ফসল উৎপন্ন করিতে হয়। ইহাদের চাষ প্রায় বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই একরূপ ভাবে করিতে দেখা যায়। রোপণ চাষে ফলন ভাল হয় কিনা, বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত হয় নাই। ইচ্ছা করিলে, কৃষিপিপাসু পাঠকগণ চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। কথিত ফলগু ধান, জেলা ২৪ পং, নদীয়া, যশোহর, খুলনা, প্রভৃতি জেলা সমূহের অধিকাংশ স্থানে, বিঘা প্রতি (ভাল জমি হইলে) ৮০ তোলার ওজনের সেরের ১০।১২ আড়ি হিসাব ফলন হইতে দেখা যায়। ইহাতে সামান্য জল পাইলেই ভাল হইতে পারে। চারি কাঠিতে এক আড়ি হয়। কিন্তু এই ধান্যের ক্ষেত্রকে, চারা বাহির হইলে, (জাওলা) অবস্থা বুঝিয়া পাটের ন্যায় দুই তিন বার বিদা (আঁচড়া) দ্বারা ক্ষেত্রের অন্যান্য ঘাস জঙ্গল মারিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দিতে হয়। কিন্তু জাওলা এক বিঘতের উচ্চ হইয়া উঠিলে, তখন বিদার পরিবর্ত্তে নিড়ানি দিয়া, পরিষ্কারকরতঃ কতকাংশ চারা উঠাইয়া ফেলিয়া, পাতলা করিয়া দিলেও গোড়ায় বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের উপায় করিয়া দিলে, গাছের তেজস্কারীতা অনুসারে ফলনের বৃদ্ধি হয়। আর রৌদ্র ধান জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্য ক্ষেতের "যো" বুঝিয়া রোপণ করিলে, উৎকৃষ্ট ফলন, কিন্তু রোপণ করিতে একটু বিলম্ব হইলে, গান্ধ ও শীষে, পোকা ধরিয়া মরিয়া যায়। সুতরাং,

ইহাতেই স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায় যে, এই জাতীয় ধান বর্ষা অবসানের মধ্যেই রোপণ, ও কর্ত্তন করিয়া লইতে না পারিলে, ধান ভাল হয় না। ইহার ফলন, মধ্যম প্রকার। তবে ইহা কৃষকের অতি অসময়ের জীবন রক্ষক ধান। চৈত্র বোরো ধান, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাস মধ্যে নিম্ন অথবা ঠাণ্ডা চর জমিতে বপন করিয়া, ফাল্গুন চৈত্র মাস মধ্যে পরিপক্ক হইয়া উঠিলে, কাটিয়া লইতে হয়। ইহার ফলনও নিতান্ত মন্দ নহে। বিশেষতঃ যদি কোন বার দৈবযোগে জলপ্লাবন হইলে ঐ প্রকার বাঁধা বিলাদির সমুদায় ফসল নষ্ট হইয়া যায়, তৎকালে এই চৈত্র বোরো জাতীয় ধান্যের চাষ করিলে সে প্রদেশের লোকের অনায়াসে জীবন রক্ষা হইতে পারে। অধিকন্তু সবজীতৃক জীবেরও প্রাণ বাঁচিয়া যায়।

গত পূর্ব্বে যে হৈমন্তিক ফল্গুজাতীয় মিহিধান্যের নাম তালিকাভুক্ত করিতে বাদ গিয়াছিল; তাহাদের নামও ইহার অন্তর্ভুক্ত করা গেল। যথা—

মিহি ধান্য

দুধে বালাম, চাঁদশই, ঘৃতশাইল, মোহনভোগ, কানাইশাইল, হলকুল, কালীমথে ইহাদের অত্যন্ত অধিক ফলন হয়। আর চাউলও অত্যন্ত বেশী জন্মে, অথচ সুগন্ধ বিশিষ্ট। সাধারণ পাঠকের ধারণা থাকিতে পারে যে, এই বালাম কেবল বাখরগঞ্জ জেলাতেই জন্মে, বাস্তবিক তাহা নহে। ইহার সর্ব্বপ্রকার জোয়ার ভাটা বিশিষ্ট ক্ষেত্রেই উত্তম ফলন হয়। কথিত স্থান সমূহে প্রতি বিঘায় ৮০ তোলা ওজনের সেরের, ধান্যাদি পরিমাপক পালি বা দনের ওজনের আড়িতে, ১২।১৪ আড়ি হিসাবে ধান জন্মে। পূর্ব্ববারে শস্য পরিমাপক আড়ির হিসাব দেখান গিয়াছে, আর এই হিসাব সর্ব্বস্থানে সমান নহে। /৫ সের ওজনের ৮ পালিতে ১ মণ পূর্ণ হয়, সুতরাং ৮০ তোলার হিসাবে /৭ সের পালির হিসাবে আড়ি গণনা করিয়া বিঘা প্রতি ১২।১৪ আড়ি ফলন হইলে, বিঘাপ্রতি এই হিসাবে কত মণ করিয়া ফলন হইল, ইহা পাঠকগণ সহজেই অনুমান করিয়া লইয়া কার্য্য করিতে পারেন।

ফল্গুজাতীয় মোটাবড়ান

হয়কচ, হামাই, দুধেবোটা, চঁপ্‌বাইভেলে, হনুমানজটা বরারবাঁট, তালমুগুর, সোণাবোকড়, খেজুরছড়ি, রামশাইল কেলেমেদিনী, ওড়াশাইল, তুলাশাইল, কাজলী, বনকুমার, মল্লিজমুটি, মল্লিকশাইল, পানবোট, গোখুপী, লোথা, কাজলা, লক্ষ্মীশাইল, বাঁশবীর, দুধরাজ, ঘীকজ, বাঁশীরাজ, জলবীর, ভোগলস্কর, বাঁশপাইড়, কলাডেমা, বীরিনী কালমাণিক ইত্যাদি আরও দুই চারি জাতীয় মোটা ধান আছে, ইহাদিগকে শ্রাবণ মাসের ১৫ই তারিখের পরে রোপণ করিলে মাঘ মাস মধ্যে কাটিয়া

লইতে হয়। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের মধ্যে বর্ষার অবস্থা এবং মৃত্তিকার "যো" বুঝিয়া এই সময় মধ্যে বপন করিলে, উপরোক্ত সময়ে কর্ত্তন করিয়া লওয়াই বিধেয়। ইহারা এত অধিক কন্তুজাতীয় যে একমণ ধান্তে পঁচিশ সেরেরও অধিক চাউল হয়। আর অত্যন্ত শ্বেতসার যুক্ত ও সুমিষ্ট সুতরাং জীব শরীরের পক্ষে অতীব উপকারী। ইহার ভাত এত সুমিষ্ট যে, সামান্ত ঘৃত সংযোগে, আহার উপযোগী সমুদায় ভাত খাইয়া ফেলা যায়, অন্ত ব্যঞ্জনের প্রয়োজন হয় না; তবে অনেক স্থলে, অদূরদর্শী বাবুরা, মোটা বলিয়া তত পছন্দ করেন না। কিছুদিন ধরিয়া গমের আটা খাইলে, শরীরের যেমন পুষ্টি সাধন হয়, সেই পরিমাণ সময় এই ধান্তের আতব চাউলের অন্ন আহার করিলেও ঠিক তদ্রূপ ফললাভ হয়। ইহাদের আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, ক্ষেত্রে জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গোছেরও অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই ধান খর্ব্বাকৃতি এবং শীষের গাঁথনী খুব ঘন ঘন। তবে অধিক জলে জন্মান হেতু, খড় অত্যন্ত মোটা এবং বেশী হয় বটে, কিন্তু গবাদি পশুগণ তত রুচিপূর্ব্বক তাহা ভক্ষণ করে না।

খৈই ও মুড়ীর ধান

কনকচূর্ণ, হেতেগড়, লক্ষীকাজল, মরিজমুট, লক্ষীদীঘল, রায়েদা, নম্‌মা, কাজলা। এই কয় জাতীয় মোটা ধান্তে ভাল খই ও মুড়ী জন্মায়; আর ইহাদের মধ্যে কয়েকজাতীয় ধান্তের গাছ, ক্ষেত্রে হঠাৎ বন্যার জল বৃদ্ধি হইলে, কলমী লতার ন্যায় এই সকল ধানের গাছ জলের উপর ভাসিয়া ভাসিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আকস্মিক জল বৃদ্ধি হেতু তাহাদের কোন বিশেষ ক্ষতি হয় না, ইহাদের ফলনও অত্যন্ত অধিক। সাধারণতঃ পাতলা তুঁষ এবং সামান্ত কুঁড়া বিশিষ্ট ধান্তেরই খই ও মুড়ী হয়। সুতরাং ইহা ব্যতীত মিহি জাতীয় ধান্তেরও খই হয়, যথা কালিন্দী, সুন্দরশাইল, রাঙ্গাকপটী, পাটনাই ইত্যাদি কথিত খই ও মুড়ীর ধান্ত রোপণ করা ব্যতীত বপন করা উচিত নহে, কারণ ইহাদের বপনে, ফসলের অনেক কম হয়; আর সাধারণতঃ বপন অপেক্ষা রোপণে ধান ভাল হয়; কারণ এদেশীয় রোপণের প্রথানুসারে, গোছের মূল সুন্দররূপে বায়ু সঞ্চালিত হইতে পায় বলিয়া গাছ খুব ঝাড়াল এবং "শীষ" মোটা ও লম্বা হইতে পায়। বান্তসহ কয়েক জাতীয় গাছ ব্যতীত অপরগুলিতে সুন্দর লম্বা লম্বা বিচালী বা খড় জন্মে, সুতরাং কনকচূর্ণ, পাটনাই, সুন্দরশাইল ধান্তের বিচালীতে একটী সুগন্ধ নির্গত হয় বলিয়া, গৃহপালিত পশ্বাদি বেশ রুচি পূর্ব্বক আহার করে। এই খড়ের ও ধান্তের মূল্যও সাধারণ ধান খড় অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হয়। 'খইয়ান' ধান্তের চাউলের ভাতে তত মিষ্টাস্বাদ নাই বলিয়া, লোকে ইহাকে অন্নরূপে ব্যবহার না করিয়া খই ও মুড়ীতে পরিণত করে। কনকচূর্ণ, পাটনাই ধান্তের শীষগুলি দেখিতে অতি সুশ্রী ও শাদাবর্ণ, আর কালিন্দী, মরিজমুট, ধান,নামে খ্যাত এবং হেতেগড়, লক্ষীকাজল, লক্ষীদীঘল, সুন্দরশাইল, ইত্যাদি

ধান দেখিতে লোহিতবর্ণ। এই সকল ধান একটু পুরাতন ভাবাপন্ন না হইলে, খই ও মুড়ীর আধিক্য পরিলক্ষিত হয় না, ইহার প্রকৃত কারণ কি বলিতে পারা যায় না। চলিত কথায় ধান্তের এই অবস্থাকে "বোট বা বুটাপড়া" বলে। কথিত যাবতীয় ধান্তই বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই এতদবস্থাপন্ন মৃত্তিকাতেই ভালরূপ জন্মিতে পারে। কারণ ইহাদের সারাল পদার্থ একই প্রকার। আর ইহাদেরও বিঘাপ্রতি ফলনের হার পূর্ব্বোক্ত প্রকার।

বালাম ধান্য।

এ পর্য্যন্ত যত প্রকার বালাম ধান্ত দেখা গিয়াছে, তাহাদের সকলগুলির আকৃতি একই—লম্বাকৃতি। তবে উহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ স্থূল ও চিক্কণ মাত্র প্রভেদ। এই ধান্তের পক্ষে, অধিক জলের প্রয়োজন, সুতরাং নদীর উপকূল বা কোলচর জমিতেই ভাল হয়।* সাধারণ লোকের একটি সংস্কার আছে যে, বাখরগঞ্জ জেলা ব্যতীত অন্যত্র এই ধান জন্মায় না; এ সংস্কার ভ্রান্ত বলিয়াই বোধ হয়, কারণ পূর্ব্ববঙ্গ স্বাভাবিক অবস্থায় নিম্ন এবং অধিক নদীসঙ্কুল, ইহা ছাড়া প্রায় বন্যার জলে প্লাবিত হইয়া অধিক জল দাঁড়ায়। আজকাল এই ধান অধিকাংশ স্থানের জোয়ার ভাটা বিশিষ্ট ভূমিতে জন্মিতেছে ও বিঘা প্রতি ১২।১৪ আড়ি ফলন হইতেছে। শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বে পল্লী গ্রামের কৃষি শিল্পাদি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কিন্তু স্বর্ণকার পাইন দিয়া ভরি প্রতি ৩।৪ টাকার স্বর্ণ অপহরণ করিত। একণে স্বর্ণালঙ্কার গঠনের পরিশ্রমিক খুব বৃদ্ধি হইয়াছে। ভরি প্রতি ৩ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত মজুরি হইয়া থাকে। পূর্ব্বাপেক্ষা পাইন দ্বারা স্বর্ণাপহরণ কিয়ৎ পরিমাণে কম হইয়াছে। কিন্তু অলঙ্কারনির্ম্মাতা স্বর্ণের বিশুদ্ধতা ঠিক রাখিবে বলিয়া বানি বেশি লয় বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইতে দেখা যায় না। স্বর্ণকার জাতির সংখ্যা কম হইলেও অন্যান্য অনেক জাতিই একণে স্বর্ণলঙ্কার গঠন করিতেছে। বিশেষতঃ কর্ম্মকার জাতিগণ স্বীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অনেকেই অলঙ্কার নির্ম্মাণের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে। একণে আমাদের এপ্রদেশে আর স্বর্ণকার জাতি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। এ প্রদেশে অলঙ্কার নির্ম্মাতা মাত্রেই প্রায় কর্ম্মকার।

এখন অনেকেই মনে করেন যে স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার নির্ম্মাণও কর্ম্মকার জাতির অন্তরতর জাতি ব্যবসায়। স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার নির্ম্মতা মাত্রেই লোভ বশত আপনাদের স্বভাব বিশুদ্ধ রাখিতে পারে না। পাইন দ্বারা কিছু না কিছু স্বর্ণ অপহরণ করিবেই করিবে। শুনিয়াছি সুবর্ণ বণিক ও স্বর্ণকার জলাচরণীয় জাতি ছিল, সুবর্ণ অপহরণ জন্য আর জলাচরণীয় জাতি মধ্যে গণ্য নহে; লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্রাদি নির্ম্মাণই কর্ম্মকারগণের জাতীয় ব্যবসায়; কর্ম্মকারগণের জাতীয় ব্যবসায় বিশুদ্ধ। ইহাতে পরিশ্রমিক ব্যতীত অন্য কোন রূপ অপহরণ নাই। যে সকল কর্ম্মকার স্বীয় পবিত্র ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া লোভ পরতন্ত্র হইয়া স্বর্ণকারের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন অবশ্যই তাঁহারা সাধারণের দৃষ্টির ঘৃণিত। স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার নির্ম্মাতাগণের মধ্যে অনেকেই অসদুপায়ে পারিশ্রমিকের অধিক উপায় করিয়া থাকে। অনেকে স্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে পাইনের সহিত রূপার বা তামার পাত লাগাইয়া ভার বৃদ্ধি করিয়া থাকে। পুরাতন স্বর্ণালঙ্কার লইবার কালীন এরূপ প্রতারণা পূর্ণ কার্য্য আমরা অনেক দেখিয়াছি। এখন অনেক কারিকর বলিয়া থাকেন ভরি প্রতি ৪৲ টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক দিলে স্বর্ণের বিশুদ্ধতা না কমিয়া ঠিক থাকিবে। কিন্তু কার্য্যত তাহা হয় না। অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধতা নষ্ট না হইয়া কিয়ৎ পরিমাণেও বিশুদ্ধতা নষ্ট হইয়া থাকে।

এখন স্বর্ণের মূল্য নির্দ্দিষ্ট নাই। প্রতি সপ্তাহেই স্বর্ণের মূল্যের ন্যূনাধিক্য হইতেছে। পূর্ব্বে যখন বিশুদ্ধ স্বর্ণের মূল্য ১৬৲ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল, তখন স্বর্ণ ব্যবসায়ী ও অন্যান্য অনেকেই খাদ দিয়া গড়ন গড়িতেন। বিশুদ্ধ সোণার ভাল গড়ন হয় না সেইজন্য এইরূপ করাইতেন। এমন কি পূর্ব্বে প্রতি ভরিতে দুই আনা হইতে ছয় আনা পর্য্যন্ত খাদ দিয়া অলঙ্কার প্রস্তুত করান হইত। এখন প্রায়ই তত অধিক পরিমাণে খাদ দেওয়া হয় না। গিণিতে যে পরিমাণে থাকে, সেই পরিমাণে তামার খাদ দিয়া অলঙ্কার গড়ান হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বিশুদ্ধ স্বর্ণের সহিত রৌপ্য ও তাম্র খাদ দেওয়া হইত। এখন যেরূপ সকলেই অলঙ্কার প্রিয় হইয়াছেন পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না পূর্ব্বে লোকের অবস্থা উন্নত হইলেও অলঙ্কারের এত বাহুল্য ছিল না। অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বে লোকের মনে ধর্ম্মাস্থা প্রবল ছিল। পূর্ব্বে লোকের অবস্থা উন্নত হইলে বস্ত্রালঙ্কারের ব্যয় বাহুল্য না করিয়া ধর্ম্মোচিত কার্য্যে ব্যয় বাহুল্য করিতেন হিন্দুর অবস্থা উন্নত হইলে বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা, শিব প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা ব্রতাদি দুর্গোৎসব, ব্রাহ্মণ ভোজন, স্বজাতি ভোজন, কাঙ্গালী ভোজন, পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে ব্যয় করিতেন। এখনকার লোকের অবস্থা উন্নত হইলে বস্ত্রালঙ্কারে প্রচুর ব্যয় করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত কোম্পানীর কাগজ খরিদ ও ভূসম্পত্তি খরিদ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বের ন্যায় এখনকার লোকের মনে ধর্ম্মাচার প্রবল

থাকিলে, এত বহু সংখ্যক পুষ্করিণী এঁদো হইয়া অপেয় পাণীয় জলে পরিণত হইত না আমাদের বর্দ্ধমান জেলার ন্যায় এত বহু সংখ্যক পুষ্করিণী অন্য কোন জেলায় আছে কিনা সন্দেহ! পূর্ব্বেকার লোকের মনে ধর্ম্মভাব প্রবল থাকার জন্যই যে এরূপ সুবৃহৎ পুষ্করিণীর এত আধিক্য সে বিষয় সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে অনেক প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাই জল কষ্ট নিবারণ জন্য নিঃস্বার্থ ভাবে স্থানে স্থানে সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই জানিতেন যে, জল দানের ন্যায় অক্ষয় পুণ্য আর কিছুতেই নাই। কি হিন্দু কি মুসলমান অনেক মহাত্মাই সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া স্থানে স্থানে পুষ্করিণী খনন করিয়া দিয়াছেন। এখনকার লোকের মনে সেরূপ ধর্ম্ম ভাব ও নিঃস্বার্থ ভাব নাই। তজ্জন্য ঐ সকল মহাত্মাগণের বংশধরগণ সাধ্য স্বত্বেও পূর্ব্ব পুরুষ প্রদত্ত মজিয়া যাওয়া পুষ্করিণীর অল্প ব্যয় সাধ্য পঙ্কোদ্ধার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিতেও ইচ্ছুক হয়েন না। এক প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মুসলমান মহাত্মার বিষয় নিম্নে বর্ণিত হইল।

আমাদের গ্রামের উত্তর অর্দ্ধ ক্রোশ দূরবর্ত্তী খালিনাগ্রামে একশত বৎসর পূর্ব্বে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার নাম তোড়ামামুদ। ইঁহার প্রপৌত্র এখনও বর্ত্তমান আছেন। ইনি ধনীর সন্তান ছিলেন না। কৃষিকার্য্যই ইহার পিতার অবলম্বন ছিল। ইনি যৌবন কালে চাষ ব্যতীত তুলার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েন। সে সময়ে এখনকার ন্যায় বিলাতী বস্ত্রের প্রচলন থাকা দূরে থাকুক, বিলাতে যে ভবিষ্যতে এ দেশের পরিধানোপযোগী বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া এ দেশে আসিয়া এখনকার লোকের লজ্জা নিবারণ করিবে, এ ধারণাও তখনকার লোকের মনে একদিনের জন্যও হয় নাই। তখনকার লোকে যে তুলার চাষ করিত বা তুলা চরকায় সুতা কাটিয়া বস্ত্র প্রস্তুত করিত এবং অনেক বিধবা স্ত্রীলোক চরকার কাটা সুতা দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে দ্বিগুণ আড়াই গুণ তুলা লইত একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে মহাত্মা তোড়ামামুদ তুলা ও সুতা বিক্রয় করিত সুতা দ্বারা বস্ত্র বয়ন করাইত তাহা বিক্রয় করিতেন। তিনি নিজে মাথায় করিয়া তুলা, সুতা বস্ত্র বহন করিয়া ফেরি করিয়া হাটে বা বাজারে যাইয়া বিক্রয় করিতেন। তাঁহার অলৌকিক হৃদয় স্বর্গীয়ভাবে পূর্ণ ছিল। তাঁহার দয়া প্রবণ হৃদয় স্বতঃই পরদুঃখে বিগলিত হইয়া উঠিত। দুঃখীর দুঃখ দূর, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, তৃষ্ণার্ত্তকে সুপেয় পানীয়, শীতার্ত্তকে বস্ত্রদান জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে তাঁহার নিত্য ব্রত ছিল। অদ্যাপিও তাঁহার বহুসংখ্যক কীর্ত্তি এপ্রদেশে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। যদিও তাঁহার ভৌতিক দেহ শতবর্ষ পূর্ব্বে পঞ্চভূতে মিলিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তি ঐ প্রদেশে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। যেস্থানে জল কষ্টের সংবাদ তাঁহার শ্রুতি-গোচর হইয়াছে, সেইস্থানেই তিনি সুবৃহৎ পুষ্করিণী করাইয়া দিয়াছেন। তুলা বায়

তিনি জলকষ্ট নিবারণোদ্দেশে নয় বুড়ি নয়টা অর্থাৎ ১৮৯টী পুষ্করিণী ভিন্ন স্থানে খনন করাইয়া দিয়াছেন। এখনও ঐ সকল পুষ্করিণী অনেক তৃষ্ণার্ত্ত লোকের তৃষ্ণা শান্তি করিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে, এপ্রদেশের দুইটী বাদসাহী রাস্তার পার্শ্বে যে স্থানে সুপেয় পানীয় জলের অভাব ছিল, তাহা পূরণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। অধিকাংশ স্থলেই তিনি নিস্বত্ব হইয়া নিঃস্বার্থভাবে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তিনি জাতিতে মুসলমান, পাছে, তাঁহার খাত করা পুষ্করিণীতে হিন্দু জলপান না করে, এককারণ তিনি প্রায় সমস্ত পুষ্করিণীই নিজ ব্যয়ে হিন্দু দ্বারা প্রতিষ্ঠা করাইয়া অনেক পুষ্করিণীর ঘাট বান্ধাইয়া এবং ঘাটের নিকট বিল্ব ও বট, অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করাইয়া পুষ্করিণীর স্বত্ব ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার বাসগ্রাম খালিনা ও আমাদের গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে প্রধাবিত একটী সুবিস্তৃত বহুকালের জীর্ণ বাদসাহী রাস্তা আছে। তিনি রাস্তার অনেক অংশ মেরামত করিয়া দিয়া ও স্থানে স্থানে আবশ্যক মত পাকা সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সেই সকল সেতু এখনও জীর্ণ অবস্থায় তাঁহার অলৌকিক মহত্ত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এরূপ সাত্ত্বিকভাবে দান এখন আর দেখা যায় না। এখনও যে দাতা নাই, তাহা নহে, কিন্তু এরূপ সাত্ত্বিকভাবে পরোপকার ও দান খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন নাম কিনিবার ও রাজ প্রদত্ত উপাধিলাভের জন্যই দাতা দান করিয়া থাকেন। সাত্ত্বিকভাবে দান খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি স্বহস্তে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ও মাথায় মোট বহন করিয়া এরূপ সৎকার্য্যে সাধ্যাতীত অর্থ ব্যয় করিতে পারেন; তাহার হৃদয় কত স্বর্গীয় ভাবে পরিপূর্ণ! পূর্ব্বে অনেক মহাত্মাই সাধারণের উপকারের জন্য সাত্ত্বিকভাবে অর্থ ব্যয় করিয়া অর্থের সার্থকতা সম্পাদন করিতেন। জলদান অতীব পুণ্যজনক কার্য্য একারণ অনেক মহাত্মাই জলদানের জন্য পুষ্করিণী খনন করাইয়া রাখিয়াছেন। তজ্জন্য আমাদের এপ্রদেশে পুষ্করিণীর সংখ্যা এত অধিক।

কাঁসারীর কার্য্যও পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে খাদ্য দ্রব্য পাক করিবার; পাক খাদ্যদ্রব্য রাখিবার জন্য মৃণ্ময় পাত্র ব্যবহৃত হইত। এখন অনেকস্থলেই ঐ সকল কার্য্য ধাতু নির্ম্মিত পাত্রে সম্পন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে লোকজন খাওয়াইবার সময় পাক করা ডাইল, ব্যঞ্জনাদি মৃণ্ময়পাত্রে রক্ষিত হইত। পাকের কার্য্যও পূর্ব্বে মৃণ্ময়পাত্রে সম্পন্ন হইত।

এখন হয় পিতল পাত্রে না হয় কলাই করা তাম্রপাত্রে সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাম্র পাত্রে খাদ্যদ্রব্য পাক করিলে বা পাক করা খাদ্যদ্রব্য রক্ষিত হইলে, ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য বিষাক্ত হইয়া উঠে। তজ্জন্য তাম্র পাত্রের উপরিভাগে রঙ্গের কলাই করা হইয়া থাকে। ঐ সকল পাত্র বহুদিন ব্যবহার করিলে কলাই উঠিয়া গিয়া তামা বাহির হইয়া পড়ে। এজন্য তাম্র পাত্রকে মধ্যে মধ্যে কলাই করিতে হয়। কলাই উঠিয়া গিয়া যদি

তামা বাহির হইয়া পড়ে এরূপ পাত্রে খাদ্যদ্রব্য পাক করিলে বা কিছুক্ষণ পাক করা খাদ্যদ্রব্য রাখিলে, ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য বিষাক্ত হইয়া উঠে। ঐরূপ খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ বা পান করিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে।

পিতল মিশ্র ধাতু, উহাতে অধিক পরিমাণে তাম্রের ভাগ থাকায়, পিতল নির্ম্মিত পাত্রে খাদ্যদ্রব্য রন্ধন ও বহুক্ষণ রাখা ও নিরাপদ নহে। পিতলে তাম্রের সহিত দস্তা মিশ্রিত থাকায়, তাম্র পাত্রের ন্যায় প্রাণ নাশক অনিষ্ট কর নহে। কিন্তু পিতলপাত্রে পাক করা খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিলেও বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাজ নারায়ণ বিশ্বাস আহারবেলঙ্গা, বর্দ্ধমান।

ডেয়ারিফার্ম্মিং এবং পক্ষিচাষ

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার মেম্বর লণ্ডন ডেয়ারি ষ্টুডেন্স ইউনিয়নের, লিখিত।

ডেয়ারিফার্ম্মিংএ সাফল্যলাভ করিতে হইলে আমাদের কি কি করা দরকার তাহা আলোচনা করাই উদ্দেশ্য। আমাদের দেশে যে সকল প্রতিকুল বিধিগুলি পাশ্চাত্য বণিক সম্প্রদায়কুলের হিতের জন্য প্রতিষ্ঠিত আছে, সেইগুলিকে পরিবর্ত্তন করিয়া ভারতবাসী এবং বিদেশী বণিকও সদাগর-সম্প্রদায়ের অনুকূল করিতে হইবে; সে গুলি ক্রমশঃ আলোচনা করিব।

বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে আমরা গোরক্ষার জন্য আদৌ কিছুই করি নাই। পূর্ব্বে প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবারে ২।১ টি করিয়া গাভী পালিত হইত। এখন বিদেশে খাদ্য সম্ভারের অবাধ রপ্তানিতে পশুখাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি হওয়ায়, দেশের লোভী জমীদার এবং প্রজার দ্বারায় প্রাচীন যুগের চারণ ভূমিগুলি গ্রাসিত হইয়াছে এবং গো খাদ্যের মূল্যাধিক্যহেতু গৃহস্থগণ এবং মধ্যবিত্ত অধিবাসীগণ বাধ্য হইয়া গো পালনে বিরত হইয়াছেন। দেশের অধিবাসীগণের নিস্বতাই ইহার অন্যতম কারণ তাহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বোম্বাই প্রদেশে সুরাটের সন্নিকটস্থ মঙ্গোলের গদীর মহান্তমহারাজ পীর মোতাদীয়া মহারাজের আদেশে বম্বাইপ্রদেশে প্রত্যেকগৃহে একটি করিয়া গাভীপালন করিবার আদেশ জারিকরা হইয়াছে; বাঙ্গলাতেও কিছুদিন পূর্ব্বে ৺তারকেশ্বরাধিপ শ্রীলশ্রীযুক্ত স্বামী সতীশ্চন্দ্র গিরি মহান্তরাজ এইরূপ আন্দোলন দেশে উত্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু এই নভেলী স্বর্গে প্রাণহীন অন্তঃসারশূন্য বাঙ্গলাদেশে তাহা ফলবতী হয় নাই। বিহার প্রদেশে পুর্ণেন্দুনারায়ণ-ও কুমার নারায়ণ, লাদবাবু উকীল চারণ রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু কাজে কিছুই করিতে পারেন নাই। পাঞ্জাবে পণ্ডিত লালাজি

লাজপৎ রায়, লক্ষ্ণৌতে আনন্দ বিহারিলাল, কলিকাতায় এই লেখক, অমূল্যধন আচ ও রায় রাধাচরণ পাল মহাশয় গোহত্যা নিবারণে বিশেষ চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হন ১৯০০ সাল হইতে বঙ্গীয় মাহিত্য সমিতি বঙ্গীয় কৃষকরগুলীর মেরুদণ্ডস্বরূপ দাঁড়াইয়া এই আন্দোলনে যোগ দেয়; কিন্তু ১৯১৭ সাল হইতে ১০নং ওল্ডপোষ্ট আপিষ ষ্ট্রীট কলিকাতার ঠিকানায় অখিল ভারতীয় গো কনফারেন্সের অধিনায়কত্বের যে দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন সময় মধ্য ভারতের রাটোনায় নব কশাইখানা স্থাপনের সূত্রপাত হয়, তাহাতে মাননীয় সম্পাদক সারজন উড্রোফ এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে মাননীয় মিঃ W. E গ্রীভস্ যে সব অভিভাষণ দেন, তথ্য সংগ্রহ করেন ও আবেদনপত্রিকা গভর্ণমেণ্টে পাঠান, তাহাতে দেশের লোকের প্রকৃতই রুদ্ধ চক্ষুর দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। বঙ্গীয় কৃষকসমিতি ও বঙ্গীয় মাহিত্য সমিতি দ্বয়ের পক্ষ হইতে এই লেখক ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট তথা ভারতসচিব সদনেও বহুবার আবেদনপত্র পাঠাইয়া নিশব্দে দেশের কাজ করিতেছেন। এই সকল কাজে সুফলই আশা করা যায়। ভারতবন্ধু কর্ণেল ওয়েজউড্ এবং মহাত্মা আন্দ্রুজও এবিষয়ে বিশেষ সাহায্য দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন দেশের যেরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে কেবলমাত্র বিলাতী সাহেবদের বা বণিক সম্প্রদায়কে দেখিলে চলিবেনা, এখন হইতে ভারতবাসীগণের স্বার্থ দেখিতে হইবে, নচেৎ কল্যাণ নাই।

এখন চাই আমাদের দেশে অবাধ গোহত্যা বন্ধকরা বা বিধিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা। চাই আমাদের প্রাচীন চারণ ভূমিগুলির রক্ষা এবং উদ্ধার সাধন। এ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা আমি বিগত ১৩২২ সালের মাঘ সংখ্যা আলোচনা পত্রিকায় "কৃষি শিক্ষা এবং বঙ্গের ভবিষ্যৎ উন্নতি শীর্ষক প্রবন্ধে যৎ সামান্য আলোচনা করিয়া স্বদেশবাসীগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। তাহা সকলেরই পাঠকরা কর্ত্তব্য। আর চাই জলে স্থলে গো নয়ন শুল্ক সমীকরণ; যাহাতে খাঁটী উৎপাদকগণের হিতকল্পে এক দেশ হইতে অপর দেশে জনন গো বৃষ, ছাগল ঘোড়া, মেষ, পাখী, মহিষাদি পশু পাশ্চাত্যদেশের অনুকরণে সামান্য রেল বা জাহাজখরচায় নীত হইতে পারে তাহার বিধি-আশু প্রবর্ত্তিত হওয়া কর্ত্তব্য। এসম্বন্ধে অখিল ভারতীয় গো কনফারেন্স, বঙ্গীয় কৃষক সমিতি এবং বঙ্গীয় মাহিত্য সমিতি রাজসদনে দরখাস্ত পাঠাইয়াছেন। বড়লাটদপ্তরে মাননীয় বন্ধু সতীশচন্দ্র ঘোষ ও মাননীয় গিরিধারীলাল আগরওয়ালা এবিষয়ে বিশেষ আন্দোলন করিবেন এবং প্রস্তাব আনয়ন ও পেশ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতিদান করিয়াছেন। তাঁহারা গোরক্ষার জন্য নব বিধিপেশ করিবেন বলিয়াছেন এবং সেইজন্য উল্লিখিত "বৃষ ও চারণ বীল" চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। আশাকরি এইবার কিছু কাজ হইতে পারে। গো কনফারেন্স প্রকৃত কাজের কাজ আরও বেশী মাত্রায় করিতে পারিতেন, যদি নিস্বার্থ কর্ম্মী তাঁহাদের মধ্যে থাকিতেন।

যাহা কর্ত্তৃক বহুবাধা বিপত্তি ও অন্তরায় সত্ত্বেও তাঁহারা এই স্বল্পকাল মধ্যে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছেন যাহাতে আমাদের রুদ্ধজ্ঞান চক্ষুর উন্মীলন হইয়াছে। সাহিত্য সমিতি তথা ভারতীয় গো কনফারেন্স সমিতির শেষ আবেদন পত্রে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তাহা জন সাধারণ মাত্রেরই যত্নে পাঠকরা কর্ত্তব্য। তাই বলি, ভাই বঙ্গবাসী, যদি বাঁচিতে চাহ, দেশের মধ্যে জন সংঘেরও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র আন্দোলন উত্থাপিত কর, সকলের মনোযোগ আকর্ষণ কর যাহাতে দেশের গোচর ও গোধনের উন্নতি ও রক্ষা হয়। এই কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে হইলে দেশের রাজার সাহার্য্য ও সহানুভূতি চাহি, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কারণ নূতন আইনের প্রবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজন, খোঁয়াড় আইনের তথা ২৯৫ ধারাহওবিধি আইনের সময়মত পরিবর্ত্তন করা চাহি, সে কথা আমি বহু ইংরাজিও বাঙ্গলা সংবাদপত্রিকায় বলিয়াছি এবং এই বিষয় ভিন্নপ্রদেশের লাট দপ্তরে লইয়া যাইবার জন্য পণ্ডিত মদনমোহন দ্বারিকানাথ, পুর্ণেন্দু নারায়ণ, সুরেন্দ্রনাথ রায়, মহেন্দ্রনাথ রায়, কামিনী কুমার চণ্ড প্রভৃতি বহু বন্ধুগণকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছি। কিন্তু এবিষয়ে তাহাদের সহানুভূতি ও কৃপাদৃষ্টি পাই নাই। সকলেই নিজের নাম প্রচারে ব্যগ্র, দেশের প্রকৃত কল্যানে আস্থা নাই। কৃষি গোরক্ষাই যে ভারতবাসীর প্রধান কার্য্য তাহা কি আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে? প্রাচীনগোপ্রচারগুলি প্রত্যেকগ্রামের মধ্যেই আছে, সেইগুলি অস্বাভিক সম্পত্তি; ধর্ম্মশাস্ত্রের বলে তাহাদের উপর না রাজার, না প্রজার না জমিদারের অধিকার আছে বা থাকিতে পারে দশশালাবন্দোবস্তের আইনের ৮ আর্টিকেলের ৭ ধারার মতে গভর্ণমেণ্টে যে ক্ষমতা সমষ্টীভূত হইয়া ন্যস্ত আছে তাহার বলে সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট চারণগুলিকে নিশ্চ ই জমীদার ও প্রজাবর্গের কবল হইতে রক্ষা করিতে পারেন। দশশালা চিঠা ও পরবর্ত্তী জরিপের চিঠা সমূহে এই সকল গোপ্রচার সমূহের নিদর্শন আছে। মূলবন্দোবস্তের সময় কেবল খাজনারই হার ধার্য্য হয়, জমীর মোট বন্দোবস্ত হয়; কাজেই যে ভূমির উপর কর আদৌ বসিতে পারেনা, যে ভূমি স্মৃতির যুগ হইতে বৌদ্ধ মুশলমান যুগ অতিক্রম করিয়া রাজা বা প্রজা কাহারও নহে, তাহার উপর কর বসিবে কিরূপে এবং জমীদার বা প্রজা মণ্ডলী কিরূপে তাহা গ্রাস করিতে পারেন, তাহা সুধিবৃন্দের বিবেচনার কথা। অধিকন্তু পার্ব্বত্য ও জঙ্গল মহালে সরকার যে কর বসাইতেছেন, তাহাও অন্যায় ও আইন সঙ্গত নহে। ইহার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন আবশ্যক। সংবাদপত্রের অধিনায়কগণ কি এদিকে দৃষ্টিদান করিবেন? এবং সহৃদয় দেশহিতৈষী দপ্তরের মেম্বরগণ এবিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসাও নূতন বিধি প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিবেন কি? আর আমাদের নিদ্রার সময় নাই। পরবর্ত্তী পত্র হইতে আসল বিজ্ঞাটার সম্বন্ধে বলিব। (ক্রমশঃ)

দেশের কথা।

পথের কথা।

কেহ কেহ বলিতেছেন, সহযোগিতা-বর্জ্জন ত করিব, খাইব কি ? যেন সহযোগিতা-করিলেই খাবার মিলে—নহিলে নহে। মনসবদারী কয়টা—মোটা চাকরী কয়টা ? চাকরীতে পেট ভরে না।

"বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্দ্ধেক চাষ,
রাজসেবা কত খচমচ !"

বাণিজ্য ব্যয়সাধ্য ; কিন্তু এই কৃষি প্রধান দেশে চাষের পথ ত বিঘ্নবহুল নহে। বিশেষ এ দেশ যখন কৃষি প্রধান এবং এ দেশের শিল্প ব্যবসা যখন—যে কারণেই হউক—নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তখন নূতন করিয়া তাহার পত্তন করিতে হইলে কৃষি হইতেই তাহার আবশ্যক মূলধন সংগ্রহ করিতে হইবে। মার্কিণে তাহাই হইয়াছে—কৃষির উন্নতি সাধিত করিয়া—নূতন নূতন শস্য ফল প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া আমেরিকা যে অর্থলাভ করিয়াছে তাহাতেই তাহারা শিল্পের মূলধন সংস্থান করিতে পারিয়াছে। ভারতবর্ষেই বা তাহা হইবে না কেন ? অতিবৃষ্টিতে নষ্ট হয় না এমন ধানের বা পাটের বীজ উৎপন্ন করা যায়, অনাবৃষ্টিতে নষ্ট হয় না—অধিক ফলন হয় এমন বীজ বাছাই করিয়া উৎপন্ন করা দুষ্কর নহে। সঙ্গে সঙ্গে গবাদি পশুর উন্নতিসাধন, হাঁস মুরগী প্রভৃতির চাষ, মাছের চাষ—এ সকলও বিশেষ প্রয়োজন। বিলাতে দুধ যে দরে বিকায় কলিকাতায় দুধের দর তদপেক্ষা অধিক ! এ দেশে ফলের ব্যবসা যাহারা করে, তাহাদের দোষে ফল নষ্ট হয়—চালানের সুব্যবস্থা নাই। আর এই দেশেই কুলু নীলগিরি প্রভৃতি স্থানে য়ুরোপীয়রা ফলের বাগান করিয়া লাভবান হইতেছে। আর স্বর্ণ প্রসূ দেশের সন্তান আমরা, আমরা অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছি। এ দেশে কৃষি অজ্ঞ লোকের ব্যবসা হওয়াতেই কৃষির অধঃপতন। এখন শিক্ষিত লোককে এই কাজে হাত দিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে আমরা এ দেশে দুইটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের কথা বলিতে পারি :—

(১) কলিকাতা ১৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীটস্থ ভারতীয় কৃষি সমিতি (Indian Gardening Association) ধলভূমগড় কৃষি আবাসের ব্যবস্থা করিতেছেন। তাঁহারা ৪২০০ বিঘা জমী সংগ্রহ করিয়া ১ লক্ষ টাকা মূলধনে এক যৌথ কারবার আরম্ভ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য—"সর্ব্বপ্রকার ফলশস্য উৎপাদন করা" তদ্ব্যতীত "এড়ি ও অন্যান্য তৈলশস্যের আবাদ চলিবে" এবং নানাবিধ ফলের চাষ হইবে। পশুপক্ষী

পালনও ইহার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। এখানে কতটা সমবায় রীতিতে সকলেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে চাষ করিতে পারিবেন; মূল সমিতি তাহাতে সাহায্য দান করিবেন স্থানটিও স্বাস্থ্যকর।

এই অনুষ্ঠান কেবল আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু—(২) আর একটি অনুষ্ঠানের কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। জিলা সাঁওতাল পরগণায় মাসেরা (মালুটী পোষ্ট) গ্রামে এক "কৃষি সমিতি" যৌথকারবার হিসাবে চলিতেছে। সমিতি প্রথমে ১ শত বিঘা জমীতে চীনের বাদামের চাষ করেন। মোট ১ হাজার ৮শত ৯২ টাকার জিনিষ বিক্রয় হইয়াছে। ইহার মধ্যেই কোম্পানী অংশীদারদিগকে শতকরা ১৫ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ দিতে পারিয়াছেন। সমিতি কাজ দিন দিন বাড়াইতেছেন।

উপরে যে দুইটি কোম্পানীর কথা বলা হইল, সে দুইটিই বাঙ্গালীকে তাঁহাদের কাজে সাহায্য করিতে আহ্বান করিতেছেন। এ দেশে কৃষিকার্য্য সুপরিচালিত হইলে যে লাভের হইবেই সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। দেশের শিক্ষিত লোককে কৃষিকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে—গতানুগতিকের মত চাকরীতে ও ওকলাতীতে আত্মনিয়োগ না করিয়া নূতন নূতন পথের পথিক হইতে হইবে—নহিলে উন্নতি হইবে না।

মূলধনের কথা উঠিতে পারে। মূলধনের অভাব কি? আমরা যদি সমবায় নীতিতে কাজ করি, তবে কাহাকেও অধিক মূলধন বাহির করিতে হইবে না। এ সব কাজে অর্থ অপেক্ষা উদ্যম অধিক প্রয়োজন; একনিষ্ঠ হইয়া সোৎসাহে কাজ করিতে হইবে। লর্ড ক্যানিং এ দেশের বড়লাট ছিলেন। তিনি যখন বিলাতের পারলামেণ্টে সদস্য হয়েন, তখন তাঁহার পিতা তাঁহার খরচের জন্য তাঁহাকে খানিকটা জমী দিয়াছিলেন। তিনি সেই জমীতে শাক সবজীর চাষ করিয়া আপনার খরচের অর্থ সংগ্রহ করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, অনেক দিন তিনি বাজারে দাঁড়াইয়া আপনার ক্ষেত্রজ বীট প্রভৃতি বিক্রয় হইতে দেখিয়াছেন।

আমেরিকায় চাষের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তথায় চাষে এরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে যে, মার্কিনের লোক নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছে বলা যাইতে পারে।

এদেশে সেরূপ হয় না কেন? এদেশের শিক্ষিত লোক কৃষিকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন না বলিয়া। গ্রামে ম্যালেরিয়া—জলকষ্ট। গ্রামের শিক্ষিত লোক যদি গ্রামত্যাগ না করিয়া গ্রামে বাস করেন এবং গ্রামেই উদরান্ন সংস্থান চেষ্টা করেন, তবে এমন হয় না—হইতে পারে না। পূর্ব্বে কোন ভাই "বিদেশে" চাকরী বা ব্যবসা করিতেন, কোন ভাই "দেশে" থাকিয়া বাড়ী ক্ষেত-খামার দেখিতেন। এখন আর তাহা হয় না। এখন দিনকাল যেরূপ তাহাতে সকলকেই অর্থার্জনের উপায় দেখিতে হয়। যাহাতে গ্রামে থাকিয়া অর্থার্জন করা যায় তাহাই করিতে

হইবে। গ্রামে থাকিয়া কৃষিকার্য্য, উটজ শিল্প—এসব করা যায় এবং গ্রামের পণ্য সংগ্রহ করিয়া চালানী ব্যবসাও করা যায়। যে গ্রামে ১০ জন তন্তুবায় আছে সে গ্রামে প্রত্যেক তন্তুবায়ই যদি কাপড় বেচিতে ও সুতা কিনিতে প্রতি হাটে যায় তবে তাহাদের যে সময় ও অর্থ নষ্ট হয় তাহা সামান্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। যদি এক জন সে ভার গ্রহণ করেন, তবে তাঁহারও যেমন লাভ হয়, তন্তুবায়গণেরও তেমনই লাভ হয়। এসব বিষয়ে আমাদিগকে মামুলী পথ ত্যাগ করিয়া নূতন পথের পথিক হইতে হইবে।

আয়ার্ল্যাণ্ড আমাদের দেশেরই মত দরিদ্র দেশ; তথায়ও বৃটিশনীতির ফলে শিল্প নষ্ট হইয়াছে—কৃষিই লোকের সম্বল। কিন্তু তথায় হোরেস প্ল্যাংকেট প্রভৃতি স্বদেশহিতৈষীর চেষ্টায় যে সমিতি গঠিত হইয়াছে তাহারই চেষ্টায় পল্লীর পুনর্গঠন হইতেছে ও হইয়াছে। সে সমিতি সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্র—সরকারের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। সেই সমিতি যেমন ভাবে কাজ করিয়াছেন, আমরা তাহারই আদর্শ গ্রহণ করিয়া দেশোপযোগী পদ্ধতির উদ্ভাবন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি। যাহাতে কৃষির উন্নতি হয়—জমীতে অধিক ফসল উৎপন্ন হয়—নূতন নূতন লাভজনক চাষের প্রবর্ত্তন হয়—এ সব করা শিক্ষিত লোকেরই কর্ত্তব্য—শিক্ষিত লোক ব্যতীত আর কাহারও দ্বারা এ কাজ সম্ভব হইতে পারে না। আমরা এ বিষয়ে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের—বিশেষ শিক্ষিত যুবকদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। আশা করি, তাঁহারা গতানু-গতিকবৃত্তি ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে নূতন পথের পথিক হইবেন; চাকরীর চেষ্টায় "ফেকো উঠিতেছে মুখে সাধি জনে জনে" অবস্থায় দ্বারে দ্বারে লাঞ্ছনা ভোগ করিবেন না।

কেরাণীগিরীতে বা জজীয়তিতে, ওকালতীতে বা ইঞ্জিনিয়ারীতে শিক্ষার সার্থকতা হয় না; শিক্ষার সার্থকতা হয়—মনুষ্যত্বের বিকাশে আর দেশের সমৃদ্ধিবৃদ্ধিতে। শিক্ষার এই দুই দিক। আমাদের প্রাচীন শিক্ষা মনুষ্যত্বের বিকাশের দিকে অধিক দৃষ্টি দিত বটে, কিন্তু অন্যদিকও উপেক্ষা করিত না বলিয়াই, তখন দেশে এত হাহাকার ছিল না। তখন দেশের পণ্যে দেশের অভাব দূর হইত—বিদেশে পণ্যরপ্তানীও হইত। বাঙ্গালার নাবিকেরা বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর জন্য বাঙ্গালার পণ্য বিদেশে লইয়া যাইত; "শতমুখে বাণিজ্যের স্রোত" বাঙ্গালায় অর্থ আনিত।

আজ আমাদিগকে আবার সেই সব পথ ধরিতে হইবে—গ্রাম রক্ষা করিতে হইবে। নহিলে জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হইবে।

সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, কলিকাতার মাছসরবরাহের কাজটা জনকতক লোকের একচেটিয়া, তাহারা যাহা ইচ্ছা করেন; সরকারের চেষ্টাতেও সেই সব Fish kingএর একচেটিয়া ব্যবসা ক্ষুণ্ণ করা যায় নাই। দেশের শিক্ষিত লোক যদি ইহাদিগের সহিত

একযোগে কাজ করেন, তবে এক পক্ষের অভিজ্ঞতা ও অপর পক্ষের শিক্ষার সংযোগে যে সুফল উৎপন্ন হয়, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

এইরূপ অনেক কাজের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ দেশে কৃষি হইতে বহু ব্যবসাই উন্নতিসহ। উন্নতির জন্য শিক্ষার—উদ্যমের ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। শিল্পব্যবসা ব্যতীত কোন দেশের দারিদ্র্য দূর হইতে পারে না—চাকরীতে পেট ভরে না। চাকরীতে কেবল "দাসবৃত্তির" অনুশীলন হয়। পথের অভাব নাই—কিন্তু আমাদের দেশের লোক পুরাতন পরিচিত পথ ত্যাগ করিয়া নূতন পথে যাইতে চাহে না। আমাদিগকে এই ভাব ত্যাগ করিতে হইবে—উদ্যোগী হইতে হইবে। সেই জন্যই আমরা বহুদিন হইতে এ সব কথা আলোচনা করিয়া আসিতেছি। আজ দেশ নূতন শক্তির স্পন্দন অনুভব করিয়াছে—দেশের ভাগ্যাকাশে নবসূর্য্যোদয় সূচিত হইয়াছে। তাই আমরা আশা করি, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় আর এ সব বিষয়ে উদাসীন থাকিবেন না।—বসুমতী।

তরল সার ও তাহার কার্য্য

শ্রীশশীভূষণ সরকার লিখিত।

গোবর, খোল প্রভৃতি পদার্থকে জলের সহিত মিলিত করিয়া বৃক্ষ লতাদিতে দেওয়া হইয়া থাকে। এই জলীয় পদার্থকে তরল সার কহে। তরল সারের কার্য্য অতি দ্রুত, এমন কি বৃক্ষ লতাদিতে উহা প্রয়োগ করিবার পর ৮।১০ দিবসের মধ্যে উদ্ভিদ শরীরে উহার কার্য্য স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তবে এমনও দেখিয়াছি, অনেকে তরল সার ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কোন ফল পান নাই, এবং এরূপ অভিযোগও অনেক শুনিয়া থাকি। কথা হইতেছে, মূল তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ না করিলে কোন বিষয়েরই সারসংগ্রহ করিতে পারা যায় না। পুস্তক পড়িয়া বিদ্যালাভ হয় না বা কাহাকেও বিদ্যা দেওয়া যায় না। শিক্ষার মর্ম্ম কি, তাহার গূঢ়তত্ত্ব কি, তাহা যতক্ষণ না আয়ত্ব করিতে পারা যায়, ততক্ষণ তাহার কার্য্য—ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ; কিন্তু তত্ত্ব জ্ঞাত থাকিলে দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় সকল দিক সামঞ্জস্য করিয়া কার্য্য করিতে পারা যায় এবং আশানুরূপ ফলও পাওয়া যায়।

তরল সার কি, তাহা প্রারম্ভেই বলিয়াছি, এক্ষণে তাহার কার্য্যের কথা বলিব, তাহার পূর্ব্বে উহার তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বিগত পঞ্চদশ বৎসর কাল কার্য্যক্ষেত্রে

নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিয়া নানা বিষয় পরীক্ষা করিতে ক্রটী করি নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় পরীক্ষায় পিয়াস এখনও মিটিল না, বোধ হয় মিটিবে না। যাহা হউক এই দীর্ঘকাল মধ্যে সময়ে অসময়ে নানাবিধ বৃক্ষলতাদিতে তরল সার ব্যবহার করিয়াছি কোথাও সফল হইবার জন্য, কোথাও বিফল হইবার জন্য, আবার কখন কুতূহল চরিতার্থের জন্য। বিফল হইবার জন্য শুনিয়া পাঠক হয় ত বিস্মিত হইতে পারেন, কেননা সময়ক্ষেপণ করিয়া পরিশ্রম করিয়া, ও অর্থব্যয় করিয়া কে কবে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিফলমনোরথ হইতে চেষ্টা করে? বিফল হওয়ায় একটা সুখ আছে, নিষ্ফলতার একটা মূল্য আছে, সে মূল্যটাকে আমি সাফল্যের মূল্য অপেক্ষা অধিক মনে করি ও বিশ্বাস করি। যা'ক্—

গত বৎসর বাড়ীতে চারিটী লাউবীচি পুঁতি। যথাক্রমে কয়েক দিন পরে দুইটী চারা জন্মিল, দুইটীর জন্মিল না। যে দুইটী জন্মিয়াছিল, তাহার মধ্যের একটীর নিতান্ত মরণাপন্ন অবস্থা, অপরটী তাহাপেক্ষা কিঞ্চিৎ বলিষ্ঠ। বীজ কয়টী ভাদ্র মাসে পোঁতা যায়। গাছ দুইটী যথানিয়মে প্রতিদিন জল পাইতে লাগিল, এবং সময়ে সময়ে গাছের মাদাটাও পরিষ্কৃত হইতে লাগিল। গাছ দুইটী ২।৩ হাত বাড়িল, তখন ছাদের উপর হইতে দড়ি ঝুলাইয়া দেওয়া গেল। সবল গাছটী দড়িতে ঝুলাইয়া রহিল, ১৫।২০ দিনে ২ ইঞ্চিও বাড়িল না, রুগ্ন গাছটী 'তথৈব চ' দেখিয়া উঠাইয়া ফেলিয়া দেওয়া গেল। এক্ষণে একমাত্র গাছটীর উপর লক্ষ্য রহিল। গাছ আর বাড়ে না; ক্রমে ছোট হইয়া যাইবার উপক্রম হইতে লাগিল। একদিন অপরাহ্নে গাছটীর নিকট অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। কি উপায়ে গাছটীকে বাঁচাইয়া ফলাইতে পারি? মনটা তখন লাউগাছ-গত হইয়াছে। মনে হইল যে, এই লাউগাছটাকে যদি ফলাইতে না পারিলাম, তবে পনর বৎসর কি করিলাম। ইত্যাদি চিন্তা করিতে করিতে প্রাঙ্গনের একপার্শ্বে দেখি, উনুনভাঙ্গা মাটী পড়িয়া আছে। তৎক্ষণাৎ সেই মাটি খানিকটা আনিয়া চূর্ণ করিয়া মাদার মাটীর সহিত বিমিশ্রিত করিয়া দেওয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে এক ঘড়া জলও তাহাতে ঢালিয়া দেওয়া গেল। ৫।৬ দিন মধ্যে তিন দিন ঐরূপ জল দেওয়া হইলে, দেখি গাছটীর কাণ্ড হইতে ৩।৪টী পত্র-মুকুল (leaf bud) বাহির হইয়াছে,—মনে কিছু আশার সঞ্চার হইল। ক্রমে তাহা শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট হইয়া একতলা ছাদ পর্য্যন্ত উঠিল। ৮।১০ দিবস অন্তর সেই উনুনভাঙ্গা অবশিষ্ট মাটী অল্প অল্প করিয়া পূর্ব্ববৎ দিতে লাগিলাম। গাছ খুব জোর করিয়া উঠিল এবং প্রথম মাটী দিবার একমাস মধ্যে শাখা প্রশাখা সমেত গাছটী দোতলার ছাদে গিয়া পড়িল। কার্ত্তিক মাস পড়িল গাছের বৃদ্ধির হ্রাস নাই, গাছের ফুলের নাম গন্ধ নাই। নিজবাটীর ৩।৪টী ছাদ বিস্তৃত হইয়া গেলে দুই একটা ডগা পার্শ্ববর্ত্তী বাটীতে হেলাইয়া দিলাম,—সে ছাদও ঘেরিয়া লইল। অসাক্ষাতে গাছের শাখা প্রশাখার প্রতি গৃহিণীর বিলক্ষণ নজর পড়িয়াছে। তিনি প্রায় প্রতিদিনই ছোট ছোট ছেলেদের দ্বারা ছাদের উপর হইতে বিস্তর ডগা কাটিয়া, এ বাড়ী

ও বাড়ী, আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী প্রভৃতিকে বিতরণ করিয়া উদারতার পরিচয় দিতেছেন। সাক্ষাতে দুই এক দিন এ প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু প্রাণ ভরিয়া আমি রাজি হইতে পারিলাম না, কাজেই চুপি চুপি কার্য্য সারা হইতেছে। আর এ বুড়া বয়সে দেওয়াল বহিয়া কি করিয়া ছাদে উঠি—শেষে কি লাউ গাছের জন্য পৈতৃক প্রাণটা খোয়াইব? আর লোকে বলিবে কি? তারপর ভাবিলাম এত শাখা প্রশাখা কাটা হইয়াছে, অথচ গাছের তেজ মরিতেছে না। সুতরাং ফলনের উপায় করিতে হইবে। স্থির করিলাম—

গাছকে একটা দৈবশক্তি (sudden start) দিতে হইবে। আর অন্যমত না করিয়া তরল সার দেওয়া স্থির করিলাম এবং তৎক্ষণাৎ দুই এক সের খোল (সরিষার) আনাইয়া একটা গামলায় ভিজাইতে দিলাম এবং গামলার মুখ ঢাকিয়া দিলাম। তৃতীয় দিবসে দেখি খোল পচিয়াছে অন্ততঃ আমার কার্য্যোপযোগী হইয়াছে। তখন জলটা ঘোলাইয়া আর এক কলসী জল দিয়া সারটা পাতলা করিয়া লওয়া গেল। ক্ষণকাল পরে জল থিতাইলে, সেই জল মাদায় ঢালিয়া দিলাম,—যতক্ষণ মাটী রস টানিতে লাগিল, ততক্ষণ ঐ সার দেওয়া হইল, এবং পরেও হইত। এইরূপে জল দিবার পরে মাদায় সূক্ষ্ম ছাই ছড়াইয়া দিতাম। গাছে অন্য জল দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলাম, যখনই জল দিবার আবশ্যক হইত, তখনই ঐ তরল সার দিবার ব্যবস্থা করিলাম। প্রথম সপ্তাহে দুইবার সার দেওয়া হয় এবং একবার মাটী নিড়াইয়া ঝুরা করিয়া দিই। একদিন কি দুইদিন রৌদ্র লাগিয়া মাটী বেশ শুষ্ক হইয়া গেলে আবার সার দেওয়া হইত এবং ছাই চাপা দেওয়া হইত। গামলায় যে খোল ভিজান হইয়াছিল গাছে সার দিবার পরে, আবার তাহাতে অন্য জল মিশাইয়া রাখিতে হইত। সুতরাং এক সের খোল ভিজাইয়া পাঁচ ছয় দিন গাছে দেওয়া চলিত এবং তাহা ক্রমে নিস্তেজ ও ক্ষীণ হইয়া গেলে নূতন খোল আনিয়া ভিজান হইত। দশ দিন মধ্যে তিনবার তরল সার দিবার পরে, আমার বেশ স্মরণ হইতেছে,—

গাছে ফুল দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে তরল সার দেওয়া চলিতে লাগিল। গাছের শাখা প্রশাখার বৃদ্ধির গতি তখন রোধ হইয়া, ফল প্রসবের দিকে গতির সঞ্চার হইয়াছে। তরল সার দ্বারা যেমন হুহু করিয়া গাছে ফল ধরিতে লাগিল, ফলের বৃদ্ধিও তেমনি দ্রুত হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য একটী বীজফল ভিন্ন অন্য কোনটীকে অর্দ্ধপক্কও হইতে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু ইহাদিগকে পূর্ণ কাল পর্য্যন্ত গাছে রাখিলে স্বভাবতঃ বড় বড় হইত, অল্পকাল মধ্যে অপূর্ণ অবস্থাতেই ফল সকল তত বড় হইয়াছিল, ইহা স্পষ্টই দেখা গেল। কারণ পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীতে আর একটী লাউ গাছ ছিল, তাহার বয়ঃক্রমও আমার গাছের সমান ছিল, কিন্তু সেই গাছে ৮।১০টীর অধিক ফল হয় নাই কিন্তু অগ্রহায়ণ ও মাঘ মাস মধ্যে আমার উক্ত লাউগাছে ৬০টী লাউ অতি উপাদেয়—অতি কোমল লাউ হইয়াছিল। মাঘ মাসের প্রথম হাওয়া পড়ায় গাছ কাটিয়া দেওয়া গেল নতুবা আরও ২।১০টী ফলিত।

উদাহরণ অনেক দেওয়া যায় তবে লাউয়ের বিষয়টী বলিলাম এই জন্য যে, গরীব গৃহস্থ ও ধনী সকলেই ইহা পরীক্ষা করিতে পারিবেন। এক্ষণে দেখা গেল যে, পোড়া বা উনুনভাঙ্গা মাটিটী খুব শুষ্ক বলিয়া অধিক রস টানিতে পারিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ অগ্নির সহিত সংযুক্ত থাকায় উহাতে কার্ব্বণের ভাগ বেশী ছিল, সুতরাং বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন বা য়্যামোনিয়া সমধিক পরিমাণে আকর্ষণ করিয়া উদ্ভিদ শরীরে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কার্ব্বণের গুণ এই যে উহা স্বীয় পরিমাণ অপেক্ষা ৯৯ গুণ অধিক য়্যামোনিয়া আকর্ষণ ও ধারণ করিতে পারে। বলা বাহুল্য, য়্যামোনিয়া নামক পদার্থটা উদ্ভিজ্জীবন পোষণের বিশেষ উপাদান। তারপর—

তরল-সার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উদ্ভিদ শরীরে সহসা জোর আনিতে হইলে উহাই প্রকৃষ্ট উপকরণ। সারের কার্য্য উদ্ভিদের বল বৃদ্ধি করা। গাছে যে শুষ্ক সার প্রদান করা যায় তাহার কার্য্য অতি ধীর এবং অপেক্ষাকৃত সময় সাক্ষেপ, সুতরাং উহার অনেক সার ভাগ মৃত্তিকার সহিত সম্মিলিত হইয়া উদ্ভিদ হইতে এতদূরে গিয়া পড়ে যে উদ্ভিদগণ সম্পূর্ণ রূপে উহার ফল ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। তাহা ব্যতীত সূর্য্য ও বায়ুর প্রভাবে উহার জলীয় ও বাষ্পীয় অংশের বহুল পরিমাণ পদার্থ বায়ুমণ্ডলে চলিয়া যায়। এই সকল কারণে শুষ্ক সারের কার্য্য অতি ধীর ও অল্প। কিন্তু তরল সার দ্বারা উপকার এই যে, গাছের গোড়ায় উহা প্রয়োগ করিবার অব্যবহিত কাল মধ্যেই উদ্ভিদগণ উহা আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করে এবং জলীয় অংশ শুষ্ক হইয়া যাইবার পূর্ব্বে অনেক পরিমাণ সার গ্রহণ করিয়া ফেলে। সহসা এইরূপ জোর পাইলে গাছের বৃদ্ধির গতির রোধ হয় এবং ফল পুষ্প প্রদানে গতি সঞ্চালিত হয়। গাছের বৃদ্ধি যতদিন খুব সতেজ থাকে, ততদিন উহাতে ফল ফুল সহজে আসে না, এবং যদিও আসে তবে তাহা সামান্য। তরল সার দ্বারা গাছের বৃদ্ধির গতি যেমন রোধ করিয়া ফল পুষ্পের দিকে চালিত করা যায়, তেমনি সেই তরল সারে যদি ফস্‌ফরাসের অভাব থাকে, তাহা হইলে কিন্তু তেমন ফল হয় না। সরিষার খোল সারে ঐ পদার্থ সমধিক পরিমাণে পাওয়া যায় বলিয়া ফলের দিকে গাছের গতি এত শীঘ্র হয়।

গাছে তরল সার দিবার পরে যে উহাতে ছাই দেওয়া হইত, তাহার কারণ এই যে, উক্ত সারান্তর্গত য়্যামোনিয়া কার্ব্বণে বাষ্পটাকে আটক রাখিবে। সার হইতে য়্যামোনিয়া যদি উবিয়া না উড়িয়া (escape) না যায় তবেই যথার্থ সারের কার্য্য হইল। জ্বালিত কাষ্ঠের ছাই মধ্যে সমধিক পরিমাণে কার্ব্বণ থাকে সুতরাং ঐ ছাইটা য়্যামোনিয়াকে বাহির হইয়া যাইতে দিত না সুতরাং উদ্ভিদ ইচ্ছামত উহা আহরণ করিত, এবং অতিরিক্ত অংশ ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য মজুত থাকিত। ছাইয়ে পটাসের মাত্রা যথেষ্ট থাকে তাহাও ফল পুষ্ট ও মিষ্ট করিতে প্রয়োজন।

প্রবন্ধ বাড়ীয়া যায় সুতরাং অদ্য এইখানে শেষ। বারান্তরে এ বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শিক্ষা-ক্ষেত্রে নূতন ব্যবস্থা কলিকাতায় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে বাঙ্গালার মাষ্টারদের এক মজলিস হইয়াছিল। এই মজলিসে, বহু মতের সাহায্যে এমন কি সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কার্য্যে পরিণত করিবার সঙ্কল্প ধার্য্য হইয়াছে :—

প্রথম—অতঃপর মাতৃকুলেশন পরীক্ষায় পদার্থ-তত্বের এবং ব্যবসায় গত বা ব্যাপার-গত শিক্ষার প্রচলন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য মাতৃকুলেশনের পাঠ্যের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে হইবে। পদার্থ-তত্বের এবং ব্যবসায়গত শিক্ষার প্রচলন করিতে হইবে। আর বিশেষ কথা এই যে, ইংরেজী সাহিত্য ছাড়া অন্য সকল বিষয়ের পঠন-পাঠন প্রাদেশিক ভাষায়—মাতৃভাষা বাঙ্গালায় চালাইতে হইবে। এই প্রস্তাব লইয়া খুব আন্দোলন ও আলোচনা হইয়াছিল, এগারজন ইহার বিরুদ্ধে মত দেয়।

দ্বিতীয়—ইংরেজী, গণিত, ভূগোল, ইংলণ্ডের এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস এই কয় বিষয় অবশ্য-পাঠ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। অতঃপর মাতৃকুলেশন পরীক্ষার্থীদিগের নিম্নতম বয়স চৌদ্দ বৎসর ধার্য্য হইল।

মাতৃকুলেশনের পাঠ্য এইভাবে পরিবর্ত্তিত হইলে, আই-এ আই-এস-সিও পরিবর্ত্তিত করা হইবে। ব্যবসায়-গত শিক্ষার মধ্যে চর্‌কা চলিবে, ছেলেদের কামার, কুমার ছুতারের কাজও শিখান হইবে, Mensuration, Surveying প্রভৃতিরও পুনঃ প্রচলন হইবে। সঙ্গে সঙ্গে হাতের Caligraphy লেখার উন্নতিসাধন জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত হইলে আরও ভাল হইত। স্যর আশুতোষ, মনে হয় সে পক্ষে উদাসীন থাকিবেন না।—নায়ক।

ব্যবসা ও বাণিজ্য—বঙ্গদেশ হইতে ১৩২০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯২১ সালের ৩১ শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরে ২২৩০৭৩২৮৩ পাউণ্ড চা বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসরের ফেব্রুয়ারি মাসে বিদেশ হইতে কলিকাতার বন্দরে মোট ১৮৬৩১০৫৮৲ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি আসিয়াছে আর ঐ মাসে কলিকাতা বন্দর হইতে মোট ৬৫৪৮২৬৪৭৲ টাকা মূল্যের দ্রব্য বিদেশে গিয়াছে।

১৯২০ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯২১ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত এগার মাসে কলিকাতার বন্দরে ১০৯৭৭৪৫৭৯৩৲ টাকা মূল্যের বিদেশজাত দ্রব্য আসিয়াছে আর এই বন্দর হইতে ১০৫৫৯৫২৮৫৮৲ টাকা মূল্যের এদেশজাত দ্রব্য বিদেশে গিয়াছে।

গত ২রা এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে কলিকাতা সহরে ৩৬০৯৭ গাঁট এবং কলিকাতার চতুর্দ্দিকের চটকলগুলিতে ৫৩৯৬৯ গাঁট পাট আমদানি হইয়াছে।

সলেহা বা শলাই বৃক্ষ

গবর্ণমেণ্ট বিদেশ-জাত দেশলাইএর উপর টেক্স বসাইবার বিল পাশ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে যদি দেশে কতকগুলি দেশলাইএর কারখানা হয় তাহা হইলে দেশের উপকার হয়, গরীব প্রজাও সস্তায় দেশলাই কিনিয়া বাঁচে। ভারতের নানা স্থানে দেশলাইএর কাঠি ও বাক্স প্রস্তুতের উপযোগী বিস্তর গাছ জন্মে। মধ্যপ্রদেশে ও মধ্যভারতে সলেহা বা শলাই নামক একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে; ইহা হইতে স্বচ্ছন্দে দেশলাইএর কাঠি ও বাক্স তৈয়ারী হইতে পারে। আমাদের দেশে বাগানে বেড়া দিবার জন্য যে কচা-গাছ রোপিত হয়, সলেহা তাহারই অতিবড় বৃহৎসংস্করণ। তাজা গাছ কাটিলে পড়িবার আঘাতে তাহার ডাল-পালা ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যায়। এক-একটি গাছ খুব বড় হয় এবং তাহা হইতে কয়েক সহস্র বাক্স দেশলাই হইতে পারে। ঐ প্রদেশে একটি দেশলাইএর কারখানায় এই গাছ ব্যবহৃত হইতেছে। গত ১৯১৮-১৯ সালের শীতকালে আমি যখন বি এন্ আর এর তরফ হইতে নূতন লাইন সার্ভে করিতে কোরিয়া নামক একটি ক্ষুদ্র করদ রাজ্যে গিয়াছিলাম তখন ঐ প্রদেশে এই বৃক্ষ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দেখিয়া আসিয়াছি। আমাদের লাইনে পড়ায় বহু সলেহা বৃক্ষ আমাদের কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল। এই কাঠে খুব শীঘ্র আগুন ধরে। এই প্রদেশের অরণ্যচারী লোকেরা একখণ্ড ক্ষুদ্র সলেহা-কাষ্ঠ লইয়া তাহাতে একটি ছিদ্র করিয়া অপর একটুক্‌রা অন্য যে কোনও কাষ্ঠ ঐ ছিদ্রে প্রবেশ করাইয়া দিয়া দুই পায়ে সলেহা কাঠের টুক্‌রাটি ধরিয়া দুই হাত দিয়া অপর কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা মন্থন করিতে করিতে অগ্নি উৎপাদন করিয়া তামাক খাইত। কোন কোম্পানী কোরিয়া-রাজের নিকট এই কাঠের বন্দোবস্ত লইতে পারেন। বি এন্ আর বিলাসপুর-কাটনি সেক্‌সনের পেণ্ড্রারোড্ ষ্টেসনে নামিয়া কোরিয়া যাইতে হয়। শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়। প্রবাসী।

চর্‌কার সূতা শক্ত করা

সমগ্র দেশ জুড়ে চর্‌কা ঘুর্‌তে সুরু হয়েছে। মহাত্মা বলেছেন এই চর্‌কা ঘুরে ঘুরেই স্বরাজ আন্‌বে—দেশের লোকেও বুঝেছে তাই।

দিন-কয়েক হ'ল ছেলেমেয়েরা সূতা কাট্‌ছিল—তখন সেখানে বসে একটি মণিপুরী মেয়েও ওদের সূতা কাটা দেখ্‌ছিল, আর একটু একটু হাসছিল।—হাস্‌বার কারণ, ওরা এবিষয়ে সিদ্ধহস্ত, ওস্তাদ।—আর একটা কারণ বোধ হয়, ক্রোচেট আর সেলাই নিয়ে যাদের সব সময় বসে থাক্‌তে দেখেছে তাদের হাতে এই 'চক্র' দেখে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, এই হাতের কাটা সুতার মতো শক্ত হয় না কেন? তখন সে বল্‌লে, 'হবে না কেন! খুব হয়।—এই হাতে কাটা সূতাকে দু'দিন জলে ভিজায়ে রেখে তারপর এই জলের মধ্যে ভাল করে সিদ্ধ করে নিলে, ঠিক বিলাতী সূতার মতো শক্ত হয়।' এভাবেই ওরা হাতের কাটা চর্‌কার সূতা দিয়ে কাপড় লেপ ইত্যাদি বোনে।—

আমরা পরীক্ষা দেখেছি অনেকটা তার কথা ফলেছে। শ্রীসত্যভূষণ দত্ত। প্রবাসী।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ সাল।

ধলভূম গড় কৃষি-আবাস

ভারতীয় কৃষি-শিল্প-সমিতি (Indian Industrial and Agricultural Association Ld.) সিংহভূম জেলায় ধলভূমগড় মৌজায় একটি কৃষি-আবাস স্থাপন করিতেছেন। সমিতির মূলধন ১ লক্ষ টাকা মাত্র। কমবেশ ৪০০০ বিঘা জমি সংগ্রহ হইয়াছে এবং ১০০০০ বিঘা পর্য্যন্ত ইহার আয়তন বৃদ্ধি করা হইবে। ভারতীয় কৃষি সমিতির পরামর্শ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আছেন।

শ্রীযুত গিরীশ চন্দ্র বসু M A. M. R. A. C.

শ্রীযুত জে, সি, চৌধুরী Late of Imperial Agricultural college. Tokio Japan.

শ্রীযুত শ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় M Sc. Ph. D.

শ্রীযুত নিকুঞ্জ বিহারী দত্ত M. R. A. S. (Botanist.)

শ্রীযুত কানাই লাল ঘোষ F. R. H. S. (London)

শ্রীযুত রাজেশ্বর দাস গুপ্ত M. R. A. S. (London)
Dy Directer of Agriculture Bengal

উক্তসমিতির কার্য্যতত্ত্বাবধারণ ভার ভারতীয় কৃষি-সমিতির (Indian gardening association Ld. Managing Agents). উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ভারতীয় কৃষি সমিতি বিগত ২৫ বৎসর চাষাবাদের কাজে লিপ্ত থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা ধলভূমগড় কৃষি-আবাসের কাজে লাগাইতে ত্রুটী করিবেন না।

ধলভূমগড় কৃষিক্ষেত্রে তুলায় চাষের সুবিধা আছে। তুলা চাষের আয় ব্যয়ের একটা হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল। সিংভূমে তুলার আবাদের হিসাব দৃষ্টে স্থির করা যায় যে ধলভূমগড়ে তুলা চাষের আয় ব্যয় নিম্নলিখিতরূপ হইবে—

এক একর জমিতে তুলা চাষে আয় ব্যয়

আয়—

উৎপন্ন সূত্র এক একরে (৩ বিঘার) ৩০০ পাউণ্ড ।০ হিসাবে		৭৫৲
তুলা বীজের দাম	৩৲ মণ হিঃ	১৮৲
		৯৩৲

ব্যয়—

জমির খাজানা		১॥০
বীজ /৫ সের		২৲
চাষের খরচ		১৫॥০
কাপাস সংগ্রহ		৩৲
বীজ ছাড়ান		৩৲
সার—		
খৈল	১৫০ পাউণ্ড	৩৲
সুপার	১০০ পাউণ্ড	৫৲
আয়		৯৩৲
ব্যয়		৩৯৲

তুলাচাষে ন্যূনকল্পে ৫৪ টাকা দেখান হইল কিন্তু সুপ্রণালীমতে চাষ হইলে একরে ১৫০ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হওয়া অসম্ভব নহে।

সিংভূমে মাটবাদামের চাষ

একর চাষে আয় ব্যয়

উৎপন্ন বাদামের পরিমাণ এক একরে	১৫ মণ ৫৲ মণ হিঃ	৭৫৲

খরচ—

চাষের খরচ	১৫৲
বীজ /২॥০সের	১৲
জমির খাজানা	১॥০
ফসল সংগ্রহ	৪॥০
সার ও অন্য খরচ	১৫৲
	৩৭৲

মাট বাদামের দাম ক্রমশঃ অতিমাত্রায় বাড়িতেছে। উহার তৈল নানা কাজে ব্যবহার করা চলে। এই চাষে একরে ১২০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে।

ধলভূমগড় কৃষি-আবাসে ফলের বাগান করা চলিবে। এতদঞ্চলে নাগপুরী সান্ত্রা, পাতিলেবু, কাশির, পেঁপেয়া, আতা, পেঁপিয়াব আবাদ করিলে বিশেষ ফল লাভের সম্ভাবনা। বাগান তৈয়ারি হইলে একরে ৩০০৲ টাকা আয় এবং খরচ বাদে ২০০৲ লাভ হইবে। একরে ফলের বাগান তৈয়ারীর খরচ ১৩০৲ টাকা। ফলের বাগান তৈয়ারী

হইতে অর্থাৎ গাছগুলি পূর্ণমাত্রায় ফল প্রদানের উপযুক্ত হইতে ৩ বৎসর সময় লাগে এই ৩ বৎসর গাছগুলি রক্ষা করিবার ব্যয় আছে কিন্তু সে ব্যয় ফলগাছের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মাটবাদাম প্রভৃতির চাষ করিয়া সঙ্কুলান করা হইতে পারে।

গাছে জল সেচন, বাগান মেরামত রাখা, সার প্রয়োগ, ফল সংগ্রহ প্রভৃতি বাৎসরিক খরচ আছে। সমুদয় যোগ করিলে একুনে বাৎসরিক ১০০৲ টাকার অধিক হইবে না এবং খরচ বাদে ২০০৲ টাকা বাৎসরিক লাভ সহজেই হইবে।

কোম্পানি এখানে ১০০০ বিঘা জমি লইয়া আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিতেছেন।

ফলের বাগান	খরচ	আয়	মুনাফা
২০০ বিঘা	৬৫০০৲	২০০০০৲	১৩,৫০০৲
আলু ও অন্য সবজী			
৩০০ বিঘা	১২০০০৲	৩৬০০০৲	২৪০০০৲
তুলা			
২০০ বিঘা	২৬০০	৬০০০	৩৪০০
মাটবাদান			
১০০ বিঘা	১২০০	২৫০০	১৩০০
রেড়ী			
১০০ বিঘা	১০০০	২০০০	১০০০
অন্য তৈল শস্য			
১০০ বিঘা	১২০০	২৫০০	১৩০০
১০০০ বিঘা	২৪৫০০	৬৯০০০	৪৪৫০০

এখন আমরা দেখিতে পাইব মোটামোটি লাভ কিরূপ দাঁড়াইল,

জমি সংগ্রহবাবত মূলধন নিয়োগ করিতে হইবে—

১০০০ বিঘা	৪০০০৲
জমি চাষের উপযোগী করা ও সেচের জলের সুবিধা করা ১৫৲ হিঃ	১৫,০০০৲
হালগরু কৃষিযন্ত্র প্রভৃতি	২৫০০৲
ঘর দুয়ার	২৫০০৲
জল তুলিবার এঞ্জিন প্রভৃতি	১২৫০৲
রাস্তা ঘাট ও অন্য খরচ	৪৭৫০৲
	৩০,০০০৲

প্রাথমিক খরচ যদি ৩০,০০০ হাজার ধরা যায় এবং ইহা যদি ১০ বৎসরে তুলিয়া লইতে হয় তাহা হইলে বৎসরে খরচ ৩০০০৲ টাকা ধরিতে হইবে এবং তদ্‌বাদে ধরিতে হইবে জমির খাজনা লোক জনের মাহিনা, ছাপার খরচ, অফিস খরচ, যাতায়াত খরচ তাহাও মোটি বাৎসরিক ৪০০০৲ টাকা। ইহাতে মোট বাৎসরিক খরচ দাঁড়াইতেছে ৭০০০৲ টাকা।

আমরা ধরিয়া লইব যে ২ বৎসরে বিশেষ কিছু আয় দাঁড়াইবে না কিন্তু আমাদের বাৎসরিক খরচ ৭ হাজার হিসাবে চলিবে অতএব আমার ৭,০০০×২+১৪,০০০৲ টাকা ব্যয় হইয়া যাইবে।

কিন্তু ভবিষ্যতে আমরা ১০০০ বিঘায় নিশ্চয়ই ২৫,০০০৲ টাকা লাভ করিতে পারিব এবং তৃতীয় বৎসর হইতে আমাদের কিছু কিছু নেট মুনাফা হইবে এবং এই আয় ক্রমশঃ বাড়াইতে পারা যাইবে। আমাদের চাষাবাদের জন্য ও জমির উন্নতিকল্পে মূলধন নিয়োগ করিতে হইবে মোটামুটি ৩০,০০০৲ টাকা এবং ১৪,০০০৲ টাকা ২ বৎসর খরচ যোগাইতে হইল, এবং চাষ বাবত ৬০০০ টাকা হাতে থাকিবে সুতরাং ৫০,০০০৲ হাজার ব্যয় করিয়া আমরা ভবিষ্যতে ২৫,০০০৲ টাকা বাৎসরিক আয় দাঁড় করাইতে পারি। ইহাও বিচার করা উচিত ১৪,০০০৲ টাকা এককালে লোকসান হইবে না সম্পূর্ণ না হউক কতক মুনাফা প্রথম দুই বৎসরে পাওয়া যাইবেই এবং এতদ্ব্যতীত ঐ টাকা জমির উন্নতি কল্পে বিশেষ কাজে লাগিবে এবং জমির মূল্য বহুগুণ বৃদ্ধি করিবে। আর একটি লাভের কথা এই জমির মধ্যে অন্যূন ১০০০ বিঘায় শাল জঙ্গল আছে তাহাতে প্রায় লক্ষাধিক শালগাছ আছে সুতরাং সেই জঙ্গল হইতে আমরা বৎসরে ১,০০০৲ টাকার কাঠ বিক্রয় করিতে পারিব

আমরা পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিতেছি যে আমরা জঙ্গল হইতে মহুয়া, শিমূল তুলা, কবিরাজী গাছগাছড়া সংগ্রহ করিয়া কিছু আয় নিশ্চিত করিতে পারিব।

এখানে লাক্ষা চাষ ও রেশম পোকা পালনের'ও বিশেষ সুবিধা আছে। মিঃ জে, সি, চৌধুরি একজন রেশম তত্ত্ববিদ্। তিনি রেশম শিল্প পরিচালনের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবেন। একটি ধর্ম্ম গোলা ও কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া নিয়মমত কার্য্যারম্ভ করিলে আমরা ছোট খাট অনেক শিল্পের উদ্যোগ করিতে সমর্থ হইব।

এই ত গেল কোম্পানির তরফ হইতে নিজচাষে লাভালাভের কথা। এই জমির কতকাংশ কৃষি কার্য্যানুরাগী ব্যক্তিগণের মধ্যে কোম্পানির তরফ হইতে বিলি করা হইবে। কোম্পানির সেয়ারের মূল্য ১০ টাকা ; ৫ খানি সেয়ার ক্রয় করিলে প্রত্যেক ব্যক্তি ৫০ বিঘা জমি পাইবেন এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে।

জমির খাজনা—প্রথম বর্ষ কর শূন্য, ২য় বর্ষ—।০ আনা প্রতি বিঘা, ৩য় বর্ষ—॥০ আনা।

বাৎসরিক বিঘা প্রতি ॥০ আনা খাজনার অধিক খাজানা বাড়িবে না। জমিতে সত্ত্ব মোকর্‌রি মৌরাশি। জমির সেলামী বিঘা প্রতি ৩৲ টাকা হিসাবে অগ্রীম দেয়। ক্ষেত্রটি কলিকাতা হইতে ১৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। বি, এন, রেলওয়ের ধলভূমগড় ষ্টেসন হইতে ১॥০ হইতে ৩ মাইলের মধ্যে অবস্থিত। স্বাস্থ্য ও জলহাওয়া ভাল, প্রাকৃতিক দৃশ্য সুন্দর। ক্ষেতের কাজের জন্য জন মজুর সস্তায় এবং সহজে মিলে।

এখানে এই প্রকার বন্দবস্তে জমি লওয়ার লাভ—

১ম—কোম্পানির লাভে-শেয়ার ক্রয়কারী হিসাবে তিনি লাভবান হইবেন।

২য়—কোম্পানির প্রত্যেক জমির গ্রাহককে চাষের জন্য জলের সুবিধা ও চাষবাসের সুবিধা করিয়া দিয়া তাঁহাদিগের স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যথোপযুক্ত সাহায্য করা হইবে।

পরস্পর সাহায্য ব্যতীত কোন কার্য্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারে না। কৃষি ও ব্যবসা এক সঙ্গে এক যোগে পরিচালিত হইলে আবার দেশের সুদিন ফিরিয়া আসিতে পারে এবং আবার আমরা সাবলম্বী হইতে পারি। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদ্দ্ধং কৃষি কর্ম্মনি ইহা নিতান্ত ভুয়া কথা নহে। আমারা ইচ্ছা শূন্য, প্রাণ শূন্য তাই সকল বিষয়েই প্রমাদ গননা করি।

ধলভূমগড় কৃষি-আবাসের জল হওয়া ভাল সুতরাং ইহাকে স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত করা যাইতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র স্বাস্থ্য নিবাসের জন্য সহস্র সহস্র মুদ্রা খরচ না করিয়া যাহাতে স্বাস্থ্য রক্ষা এবং অন্নসংস্থান উভয় কার্য্য একযোগে সমাধা হয় তাহাই করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

আর একটি বিশেষ সুবিধা এই যে এখানে পশু পক্ষী পালনের যথোপযুক্ত সুবিধা আছে, কারণ পাহাড়ের জঙ্গলে পশুপক্ষী চরিবার যথেষ্ট স্থান আছে এবং অতি অল্প খরচে মাংসের জন্য পশুপক্ষী পালন করা যাইতে পারে। পশমের জন্য মেষপালন ও এখানে অনায়াসে চলিতে পারে। কৃষি-শিল্পে মনোযোগী হইলে বোধ হয় আমাদের দেশের অন্নসমস্যার সমাধান হইতে পারে। আজ কাল চাকুরি জুটান দায় এবং এমন চাকুরি মেলে না যাহাতে গ্রাসাচ্ছাদনের সম্পূর্ণ সংকুলান হয়। তার উপর চাকুরির লাঞ্ছনাত আছেই। স্বাধীন বৃত্তিতে যত খাটিব লাভটা আমার সম্পূর্ণ কিন্তু চাকুরিতে প্রাণপাত করিয়া খাটিলে লাভ ধণীর। সেই জন্যই বার বার বলা যে সাবলম্বন ভিন্ন আমাদের গতি নাই। ধলভূন গড়ে যে জায়গা লওয়া হইয়াছে তাহার কোন একাংশে এক প্রকার কাল পাথর পাওয়া যায় তাহাতে বাসন প্রস্তুত হইতে পারে। ধলভূমগড় আবাস স্থাপন করিয়া কারিকর দ্বারা বাসন প্রস্তুত করাইতে পারিলে কোম্পানির লাভ এবং যিনি ঐ কাজে অর্থ ও সময় নিয়োগ করিবেন তিনিও দুপয়সা রোজগার করিতে পারিবেন। স্থূলতঃ কার্য্য সিদ্ধির কতক কতক উপায় নির্দ্দেশ করা গেল। কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া আরও পথ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতে পারে। চাই একাগ্রমনে কার্য্যারম্ভ করা এবং দৃঢ়তার সহিত কাজে লাগিয়া যাওয়া এমতাবস্থায় সিদ্ধি হইবেই হইবে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমি বিলি হইবে সুতরাং জমি লইতে হইলে ভাল জমি নির্ব্বাচনের সুবিধা থাকিতে থাকিতে জমির জন্য আবেদন করুন। প্রত্যেক আবেদন কারীকে আবেদন পত্রের সঙ্গে ২৲ টাকা পাঠাইতে হইবে।

ভারতীয় কৃষি সমিতি, কার্য্য তত্ত্বাবধারক। ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Indian Gardening Association Ltd. manuging agents, Indian Industrial Association Ltd. Reg.Office 162, Bowbazar Street.

পত্রাদি।

কৃষি-নিবাস স্থাপন—খেজুর গুড়ের কথা

শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—ইন্দোর—

মহাশয় আপনাদের প্রেরিত "কৃষক" আজ পাইলাম। আমরা নিয়মিত ভাবে আপনাদের গ্রাহক ভুক্ত হইয়া উত্তরোত্তর আপনাদের পরামর্শে ও সহায়তাতে অনেক উপকৃত হইব, বিশ্বাস করি। আমি Book post যোগেআমাদের কিছু Prospectus ইত্যাদি পাঠাইলাম ও খেজুর গাছ ও আক্ সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সামান্য প্রবন্ধ আমি প্রকাশ করিয়াছি তাহা পাঠাইলাম। আপনাদের "কৃষকের" ২৭-২৮-২৯পৃষ্ঠাতে ধলভুম গড় কৃষি-আবাস করিবার জন্য আপনারা যে প্রস্তাব করিয়াছেন, সেই প্রণালী অনুসারে আমাদের এখানেও Bengalees' colnization করিয়া কতকগুলি বঙ্গীয় যুবক ও জনকতক সিউলী আনিয়া বাঙ্গালীদের একটা উপনিবেশ দৃঢ় করিতে পারিলে আমরা ঐBengal Colonies দের ক্রমশঃ মহাউপকার করিতে পারিব; এবং বঙ্গীয় যুবকদের অনুকরণ জন্য অত্রত্য বহুলোক আমাদের কোম্পানি ভুক্ত হইয়া এ প্রদেশের স্থানে স্থানে কৃষিকার্য্য ও খেজুরের ও আকের গুড় চিনির কর্ম্ম করিয়া অনেক লাভ করিতে পারিবে। ইন্দোর, গোয়ালিয়র, ধার, ভোপাল ইত্যাদি অনেক বিস্তীর্ণ রাজ্যে লক্ষ্য লক্ষ্য খেজুর গাছ অনেক গ্রামেতে স্বতঃ জন্মিয়াছে ও আছে। তাহা হইতে রস নির্গত করার লোক এদেশে নাই; সুতরাং কতক-গুলা বাঙ্গালী সিউলী (গাছি) বা বেহারের (গয়া আরা জেলার) পার্শী বা উড়িষ্যার সিউলী আনিয়া যদ্যপি বাস করান যায় তাহা হইলে এখানকার গ্রামবাসী কৃষক ও মজুরগণ সে কার্য্য ১।২ বৎসরের মধ্যে সহজেই শিখিতে পারিবে। যত পরিমাণে আমাদের এখানে বঙ্গীয় উপনিবেশ প্রণালী মতে কাজ করিতে থাকিবে ও এতদ্দেশীয় লোক সমূহ গাছ চাঁচার সহজ কর্ম্ম শিখিবে, সেই পরিমাণে আমরা বিস্তর জমি ও খেজুর বন সংগ্রহ পূর্ব্বক এ কার্য্যের উত্তরোত্তর উন্নতি ও বৃদ্ধি করিতে পারিব।

উল্লিখিত প্রস্তাবটি আমি মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া থাকি, ফলে কিছুই হয় না। কেননা, প্রকৃতপক্ষে, উহা ক্ষণেক মানসিক উৎসাহ। মাত্র কোন কোন ভদ্রলোক কেবল লম্বা লম্বা পত্র পাঠায় তাহাতে নানা প্রশ্ন থাকে। যথা ইন্দোর কত দূর, রেলভাড়া কত, জল হাওয়া কেমন বাগ সর্পাদির ভয় আছে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এরূপ না করিয়া যদ্যপি আপনাদের পরামর্শ সভার দুজন সুপণ্ডিত ডিরেক্টর দেশবাসীগণের প্রতিনিধি স্বরূপ আসিয়া আমাদের কল্পিত কার্য্য-প্রণালী ও এ প্রদেশের কৃষিকার্য্য ও গুড় চিনির উপযোগিতা স্বচক্ষে ও অনুসন্ধান দ্বারা

দেখিয়া শুনিয়া যান, তাহা হইলে আপনাদের সম্মতি দ্বারা রীতি মত জন সমাজে প্রচার ও ধলভূমগড়ের মত আমাদেরও এতদঞ্চলে বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপন সত্বর সিদ্ধ হইবে। বিশেষ আগ্রহ সহকারে আমি নিবেদন ও প্রার্থনা করিলাম। আমার বিশ্বাস যে আমি এখানে বসিয়া, অথবা আমার নিজবাটী কলিকাতাতে গিয়া (59 A. Lansdown Road, Bhowanipur,) যতই প্রবন্ধ লিখি না কেন, বা লোককে বুঝাইয়া বলিনা কেন, তাহা দ্বারা এ প্রদেশে বা আমার লেখার ফলে এখানকার লোকে খেঁজুর গাছ কাটা, রস সংগ্রহ ও গুড় তৈয়ারি করা শিখিয়া যাইবে এরূপ আশা করাও যায় না।

যে সকল বাঙ্গালী শিউলি সমভিব্যাহারে উপনিবাস জন্য আসিবে, তাহারা কেবল শীতকালের ৪।৫ মাস থাকিয়া চলিয়া গেলে, লাভের গুড় পিপড়ে খাবে, অর্থাৎ যাতায়াতের রেল ভাড়াতে সব খরচ হ'বে, আর দেশে ঘরে ফিরে যাইবার প্রবল ইচ্ছাতে কার্য্য ভালরূপ করিবে না। কেননা, বিশেষ কথা এই যে আমরা চাষের জন্য জমি দিব। সমস্ত বৎসর ফসল উৎপন্ন করিতে হইবে। আমাদের গোপালন, দুধ মাখম ইত্যাদি নানা কার্য্য হইবে। এই সকল কার্য্যের ভার লইয়া, কিছু কার্য্যে দক্ষতা হইলেই তাহাদিগের স্বতন্ত্র কেন্দ্রে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া স্বাধীন ভাবে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিব। প্রশস্ত মধ্য ভারতে রাজ দরবারের বিস্তর জমি আবাদ করা বাকী আছে। প্রত্যেক গ্রামে ২।৩।৪।৫ হাজার খেজুর গাছ বৃথা জন্মিয়া রহিয়াছে ও জন্মিতেছে। সুতরাং আমাদের কোম্পানি ভুক্ত হইয়া কার্য্যনিপুণতা ও স্থানীয় পরিচয় অভিজ্ঞতা হইলেই অনেকেই স্থানে স্থানে, জেলায় জেলায় ও রাজ্যে রাজ্যে কর্ম্মকেন্দ্র বিস্তীর্ণ হইবে।

বাঙ্গালীরা কোমর বান্ধিয়া এ কার্য্যে অগ্রসর হইয়া তৎপর আমাদের প্রবর্ত্তিত কার্য্যে যোগদান না দিলে এই সমস্ত মধ্য প্রদেশে যেমন জমি ও খেজুরের বিস্তীর্ণ জঙ্গল সকল পড়ে আছে, তাহাই থাকিবে। আমি অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়স্ক; একা আমি কিছুই করিতে পারিব না এবং অবর্ত্তমানে একাজ করিবার লোক থাকিবে না। অনেক বাঙ্গালীরা বিস্তর টাকা ব্যয় করে পুত্রদিগকে বিলাতে ও আমেরিকাতে ব্যারিষ্টার, ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার ইত্যাদি হবার জন্য পাঠায়। কলিকাতাতে কালেজে পড়িবার জন্য বোর্ডিং রাখিয়া বিস্তর অপব্যয় করিতেছে। আমি নিজে ৬০,০০০ টাকা ব্যয় করে তিনটী ছেলেদের বিলাতে পাঠাইয়া কিছুই ভাল করিতে পারি নাই। তথাচ ৮।১০ জন মাজারি অবস্থার বাঙ্গালী ছেলেদিগকে খরচ দিয়া ১বৎসর আমাদের কাছে রাখিয়া এই প্রশস্ত ও ভবিষ্যতে লাভ জনক কার্য্যে শিক্ষিত করিবার জন্য কেন প্রস্তুত হইবে না বুঝিতে পারি না। এরূপ করিতে সম্মত হয়, তো, বৃথা আর গরীব ছেলেদের স্কুল কালেজে না পড়াইয়া, কলিকাতার বিলাসিতা ত্যাগ করাইয়া কেবল রাহা খরচ দিয়া পাঠাইলে কি ক্ষতি হইবে? আমরা থাকিবার ঘর দিব, হাতের লাঙ্গল দিব, গাছ কাটিবার "দা" দিব, গোরু বাছুর

প্রতিপালন করাইব, গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে চরকা প্রণালীর প্রতিষ্ঠা করিব। ১।২ বৎসরের মধ্যে ঐ যুবকগণ সব কর্ম্ম বুঝিতে ও চালাইতে পারিবে এবং যে যে না করিবে তাহারা ঘরে ফিরে যাইবে। সাবলম্বন ব্রত অবলম্বন করিতে কেবল "মহাত্মা গন্ধির জয়" বলিয়া চীৎকার করিলে কিছুই হ'বে না।

"গৃহ শিল্প" প্রণেতা শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসন্ন চক্রবর্ত্তী মহাশয় Sirker Lane Muktaram Babu's Street) অনেক কথা লিখিয়াছেন। তাঁহাকেও আমি পত্র লিখিয়াছি। আপনাদের Committee তে তাঁহাকে আপনারা আহ্বান করিবেন।

ক্রমশঃ

ভারতীয় গুপ্ত পাণ্ডুলিপির পুনরুদ্ধার।

উপাদানের অভাব বশতঃ ভারত ইতিহাসের পাঠকবর্গ সতঃই হতাশ হইয়া আসিতেছেন। ফলতঃ ভাবের প্রসারতা এবং চরিত্রের নিষ্কর্ষতা সম্যকরূপে পরিস্ফুট হইতে পারে, এরূপ জাতীয় উপকরণের বিপুল আয়োজন তাহাদের নাই। তাহাদের সম্বল যে একেবারে ক্ষুদ্র সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। পাণ্ডুলিপি ত দূরের কথা, মুদ্রিত কোন গ্রন্থ সংগ্রহও নিতান্ত কষ্ট সাধ্য। সুতরাং ভারত ইতিহাসের উন্নতি-কল্পে উপকরণ সংগ্রহের বড়ই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতার ইম্পিরিয়াল এবং বাঁকীপুরের খোদাবক্স লাইব্রেরী এই উদ্দেশ্যে ইতিপূর্ব্বেই কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহারা যে সুযোগটুকু সম্মুখে ধরিতেছেন গবেষণাকারিগণ সেই সুবিধার সম্যক সদ্ব্যবহারের ত্রুটী করিতেছেন না। আধুনিক যে সকল অমূল্য গ্রন্থরাজি লিখিত হইতেছে, তাহাদের প্রায় অধিকাংশই এই সকল লাইব্রেরী এবং কতিপয় বে সরকারী লাইব্রেরীর শুভ অনুষ্ঠানের ফল প্রসূত। আমি ভরসা করি, যিনি এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বে-সরকারী লাইব্রেরীর তিমির গর্ভ হইতে লুপ্ত রত্নরাজি সংগ্রহ করিতে পারিবেন তিনিই শ্রেষ্ঠতর পুরস্কারের প্রকৃত অধিকারী হইবেন। যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং বিহারের প্রায় অধিকাংশ জেলাই উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর আদিস্থান। আমাদের সহিত এখনও এরূপ অনেক ব্যক্তির সাক্ষাৎকার হয় যাহাদের নিকট এইরূপ অমূল্য পাণ্ডুলিপি এবং মুদ্রিত গ্রন্থরাজি পাওয়া যাইতেছে। বড়ই সমস্যার বিষয় এই যে, এই লাইব্রেরীগুলি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত এবং এই সকলের স্বত্বাধিকারীর সাহায্য ব্যতিরেকে প্রকৃত প্রমাণ সংগ্রহ করা সুদূর-পরাহত। যদি আপনার কোন পাঠক ভারত ইতিহাসের যে কোন অধ্যায়ের হিন্দুস্থানী, হিন্দী, পঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রী, ইংরেজী অথবা পারস্য ভাষায় লিখিত কোন পুরাতন পাণ্ডুলিপির স্বত্বাধিকারী হন, অথবা এরূপ স্বত্বাধিকারীর সহিত পরিচিত থাকেন, তাহা হইলে আমাকে পত্র লিখিয়া জানাইলে অত্যন্ত বাধিত হইব। আমরা সেই মুদ্রিত পুস্তক অথবা পাণ্ডুলিপির জন্য উপযুক্ত মূল্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইতেছি। যদি তাহারা উহা হস্তান্তর করিতে অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে সেই পাণ্ডুলিপির অনুলিপি প্রস্তুত

করিবার অনুমতির জন্য তাঁহাকে উপযুক্ত ভাতা প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। দয়া করিয়া নিম্ন লিখিত ঠীকানায় চিঠীপত্রাদি প্রেরণ করিবেন। ডক্টর্ এস এ খাঁ, এম্ এ, ইউনিভারসিটির ইতিহাসের অধ্যাপক, এলাহাবাদ, ইউ, পি।

আম গাছের ফল ঝরা—

শ্রীযুত বি, এল বন্দ্যোপাধ্যায়, আগ্রা।

উত্তর—ফলঝরার প্রতিকার করা চলে, দুইটী কারণে ফল ঝরিতে পারে—গ্রীষ্মাধিক্যবশতঃ বৃক্ষ রসশূন্য হইলে ফল ঝরিয়া যায়—কিংবা পোকা লাগিলে ফল ঝরে।

পোকা লাগার প্রতিকার—গাছে মুকুল ধরিবার সময় হইতে মাঝে মাঝে যদি ধোঁয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে উপকার হয়। গাছের শুকনা পাতা কুড়াইয়া ধোঁয়া দিবার সুবিধা হয়। গাছের অতি নিকটে আগুন করিলে গাছে তাত লাগে সে বিষয় সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। বোলের সহিত কেরোসিন তৈল মিশাইয়া গাছে ছিটাইলে পোকার উপদ্রব কমে।

গ্রীষ্মাতিশয্যের প্রতিকার—গাছের গোড়ায় জল দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। মুকুল ধরিতে আরম্ভ হইলেই জল দিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। মুকুল হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে গাছে জল সেচন বিধেয় নহে কারণ তাহাতে গাছের গরম কমিয়া যায়। গরম কমিয়া গেল ভাল মুকুল বাহির হয় না। গাছে আমের গুটী দেখা দিলে মাঝে মাঝে শিতল জলের পিচকারি দিয়া গাছটি শিক্ত করিলে উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু মুকুল অবস্থায় পিচকারী দিলে ফুলের মধু ধুইয়া গিয়া অপকার হয়।

নিয়মিত জল সেচন ও উপযুক্ত সার প্রয়োগ দ্বারা গাছের ফল ঝরা রোগ নিবারণ করা যায়।

ফসলের পোকা নামক পুস্তক খানিতে পোকার প্রতিকার বিশেষ ভাবে নির্দ্দেশ করা আছে; মূল্য ১॥০; কৃষক অফিসে পাওয়া যায়।

চালমুগরার ভেষজগুণ—কুষ্ঠরোগের চিকিৎসায় চালমুগরা—চালমুগরার গুণ, প্রসিদ্ধ চিকিৎসক স্যার লিউনার্ড রজার্স সংবাদ দিতেছেন যে, তিনি কুষ্ঠরোগের বীজাণু ধ্বংস করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—এই বিষয়ে তিনি যতটা অগ্রসর হইয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে আর কোন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ততটা অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তিনি কয়েকজন কুষ্ঠরোগীকে তাঁহার উদ্ভাবিত চিকিৎসার দ্বারা আরাম করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ফিলিপাইন দ্বীপ নিবাসী আমেরিকান চিকিৎসক ডাঃ হিসার এই বিষয়ে গবেষণা করিতেছিলেন। ডাঃ রজার্স তাঁহারই প্রদর্শিত পথে চলিয়া এই আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ডাঃ হিসার চালমুগরার তেল রোগীর দেহে প্রবেশ করাইতেন। এই তেলের মধ্যে কুষ্ঠ রোগের বীজাণু ধ্বংস করিবার শক্তি নিহিত আছে।
—[illegible]র লোক।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

আষাঢ় মাস।

সব্জীবাগান—শীতের চাষের জন্য এই সময় প্রস্তুত হইতে হইবে। আমন বেগুনের তলা ফেলিতে হইবে। এই সময় শাকাদি, সীম, লঙ্কা শীতের শশা লাউ, বিলাতী বেগুণ পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই সালগম ইত্যাদি দেশী সব্জী বীজ বপন করিতে হইবে

পালম শাক, টমাটোর জল্দি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতী সব্জী বীজ বপনের এখনও সময় হয় নাই।

মকাই (ছোট মকাই) এবং দে-ধান চাষের এই সময়।

হলুদ, আদা, জেরুজালেম আর্টিচোক, এরোরুট প্রভৃতির গোড়ায় মাটি দিয়া দাঁড় বাঁধিয়া দিতে হইবে। দাঁড় বাঁধিয়া দিলে গাছগুলির বৃদ্ধি হয় এবং গাছগুলির জলে গোড়া আল্গা হইয়া পড়িয়া যায় না।

ফুলবাগিচা—দোপাটি, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা) এমারন্থস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম (Sunflower) মার্টিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুলবীজ লাগাইবার সময় এখন গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া অন্যত্র রোপণ করা উচিত।

গোলাপ, জবা, বেল, যূঁই প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষের কাটিং করিয়া চারা তৈয়ার করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলী যূঁই বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ফলের বাগান—বর্ষা নামিলে আম, লিচু, পিয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ বসাইতে হয়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন—ঘন ঘন বৃষ্টিপাত হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়, কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া শিকড় পচিয়া না যায়। আম, লিচু, কুল, পিচ, নানা প্রকার লেবু গাছের গুল কলম করিতে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এই সময় কলম করা যাইতে পারে। এই প্রকার কলম করাকে লেয়ারিং (layering) করা বলে।

আনারসের মোকা বা মোথা (শীর্ষ) বসাইয়া আনারসে আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পিচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ার করিতে হয়। পেঁপে বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

আম, নারিকেল লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বর্ষার জল খাওয়াইবার এই সময়, কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ার মাটি খোঁড়া উচিত, এই সময় ঐ সকল গাছের গোড়ায় গোবর দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। হাড়ের গুড়াও এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ, যথা শিশু, সেগুন, মেহগ্নি, খরিদ, কৃষ্ণচূড়া, কাঞ্চন, প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

যাহারা বেড়ার বীজ দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন, তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি দস্তুর মত গজাইয়া উঠিবে।

শস্যক্ষেত্র—কৃষকের এখন বড় মরশুম বিশেষতঃ বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যা ও আসামের কতকস্থানে কৃষকেরা এখন আমন ধান্যের আবাদ লইয়া বড়ই ব্যস্ত। পাট বোনা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে কোন কোন স্থানে পাট তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। তথা হইতে নূতন পাট এই সময় বাজারে আমদানী হয়। দক্ষিণ-বঙ্গে পাট কিছু নাবি হয়, কিন্তু এখানেও পাট বুনিতে আর বাকি নাই। ধান্য রোপণ শ্রাবণে শেষে হইয়া যায়।

বর্ষাকালে ঘাস এবং আগাছা ও কুগাছার বৃদ্ধি হয় সুতরাং এখন সব্জী ক্ষেত্র মধ্যে মধ্যে নিড়ানী দেওয়া উচিত। ক্ষেত্রে জল না জমে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখাও আবশ্যক। ফলের বাগানের আগাছা কুগাছাগুলি উপড়াইয়া তুলিয়া দিলে ভাল হয়। আগাছাগুলির বীজ পাকিয়া মাটিতে পড়িবার পূর্ব্বে তাহাদের বিনাশ করিতে পারিলে তাহাদের বংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না।

পার্ব্বত্য প্রদেশে কপিচারা ক্ষেত্রে বসান হইতেছে। পূজার পূর্ব্বেই পার্ব্বত্য প্রদেশে হইতে কলিকাতায় কপি, কড়াইশুঁটী প্রভৃতি আমদানি হয়।

এই সময় পার্ব্বত্য প্রদেশে সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, কস্মকোষ, কেপ গাঁদা, দোপাটী প্রভৃতি ফুল বীজ বপন করা হইতেছে।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

২২শ খণ্ড। { আষাঢ়, ১৩২৮ সাল। } ৩য় সংখ্যা।

ফলের বাগান তৈয়ারীর সহজ প্রণালী

উদ্যানতত্ত্ববিদ্—শ্রীশশিভূষণ সরকার লিখিত।

দশ-কূপ-সমা বাপী দশ-বাপি-সমো হ্রদঃ।
দশ হ্রদ-সমঃ পুত্রো দশ-পুত্র-সমোদ্রুমঃ॥

ফলের বাগান সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে দেশী প্রথা অনুসারে কি প্রকারে একটী আয়কর অথচ সুন্দর বাগান প্রস্তুত করা যাইতে পারে তাহা সহজে বুঝাইবার জন্য নিম্নে একটী নক্সা সন্নিবেশীত করিলাম। বিলাতী ধরণের নূতন প্রণালীতে বাগান তৈয়ারীর প্রথা ক্রমশঃ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

নক্সা উল্লিখিত বাগাটীর পরিমাণ ১০০ বিঘা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। বাগানের চতুর্দ্দিকে পগার বা খানা কাটা থাকা আবশ্যক। খানা কাটায় কতকটা জমি বৃথা নষ্ট হয় বটে কিন্তু খানা কটায় বিশেষ লাভ আছে। প্রতি বৎসর বাগানের ধোয়াট মাটী ঐ খানায় সঞ্চিত হয়। ধোয়াট মাটীর সহিত বৃক্ষাদির পোষণোপযোগী সার পদার্থ থাকে সুতরাং বৎসর বৎসর ধোয়াট মাটী গুলি চাঁচিয়া বাগানে ছড়াইয়া দেওয়া উচিত।

পগার বা খানার ধারে ধারে ভিতর দিকে ৫ হাত অন্তর গুপারি গাছ রোপন করিতে হইবে এবং দুই দুইটী গুপারি গাছের মধ্যে মধ্যে একটী কাগজী, সরবতী প্রভৃতি লেবু গাছ বসাইলে ভাল হয়, গাছগুলি বর্দ্ধিত হইলে বাগানের একটী চিরস্থায়ী বেড়ায় পরিণত হইবে অথচ ঐ বেড়ার ধারের গাছ হইতে অল্পবিস্তর আয় দাঁড়াইবে।

বেড়ার পর শ্রেণীতে আয়কর কাষ্ঠের গাছ যথা, মেহগ্নি, শিশু, মহুয়া, তুঁত (Toon) ইত্যাদি রোপন করা উচিত। এতদ্ব্যতীত ঝিলের পশ্চিম ও উত্তর পাড়ে "চ" চিহ্নিত অংশে স্থানে স্থানে বাঁশ, খর্জ্জুর, বাবুল ও কোন এক জায়গায় দু একটী তেঁতুল আমলকী, হরিতকী' জাম, আঁশফল প্রভৃতি গাছ বসাইয়া রাখিতে হয়।

A
L
TANK
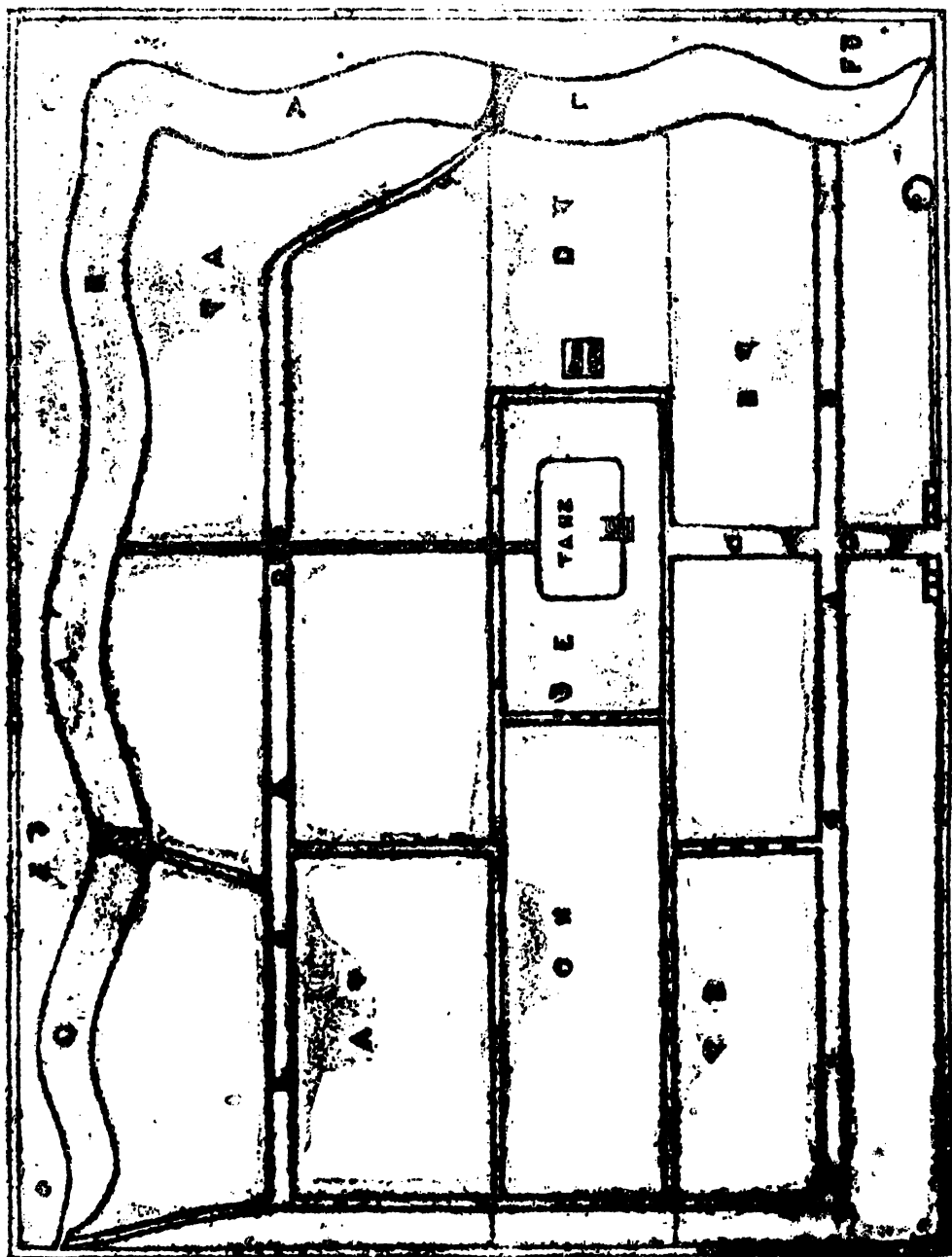
ঝিলের দুইপার্শ্বে পাড়ের উপর নারিকেল বৃক্ষ রোপন করা উচিত এবং ঝিলের ঢালু পাড়ে গবাদি পশুর জন্য রিয়ানা বা জাতিবাস ও গিণিঘাস তৈয়ারী করিবে।

উপস্থিত নক্সায় বাগানের প্রবেশ দ্বার পূর্ব্বদিকে। মনে রাখা উচিত যে বাগানের পূর্ব্ব দক্ষিণ অপেক্ষাকৃত ফাঁকা রাখিতে হইবে। নক্সার বাগানের মধ্যস্থিত ছোট বড় রাস্তা গুলি রেখা দ্বারা চিহ্নিত আছে এবং ঝিলটী পুষ্করণীর সহিত একটী পয়োনালায় দ্বারা সংযুক্ত আছে সেটীও রেখাঙ্কিত।

বাগানের প্রবেশ দ্বারের উত্তর দিকে মালির থাকিবার জন্য ও ফলশস্য রাখিবার ঘর বাঁধিতে হইবে।

বাগানে প্রবেশ করিয়া বামে ও দক্ষিণে যে দুই টুকরা লম্বা জমি আছে তাহাতে আয়কর বৃক্ষ যথা কর্পূর, দারুচিনি, তেজপত্র ইত্যাদি ও অন্য ছোট জাতীয় ফলবৃক্ষ রোপন করিবে।

বাগানের খ চিহ্নিত অংশ দুইটীতে ও তন্মধ্যস্থিত অংশটীতে তুঁত, পিচ, পিয়ারা, নাসপাতি, জামরুল, ইত্যাদি ছোট জাতীয় বৃক্ষ রোপন করিবে।

গ চিহ্নিত অংশে সবজী বাগান হইবে। ঙ চিহ্নিত অংশে একটী পুষ্করণী থাকিবে এবং পুষ্করণীর চারি পাড় নানাপ্রকার পুষ্প পাতাবাহার গাছ দ্বারা সাজাইতে পারা যায়।

ঘ চিহ্নিত অংশে একটী বাসোপযোগী ইমারত থাকা আবশ্যক। ইমারতের উত্তরাংশে একটী কৃত্রিম পাহাড় নির্ম্মাণ করিয়া এবং তাহার দক্ষিণে প্রচণ্ড দক্ষিণ বাতাস প্রতি-রোধকারী লতা পত্রাদি মণ্ডিত বেড়া দিয়া, তাহাতে আঙ্গুর, দাড়িম্ব, কাবুলীবাদামাদি বিজাতীয় পাহাড়ী গাছ রোপণ করিয়া কথঞ্চিৎ সখ মিটান যাইতে পারে।

ক চিহ্নিত অংশে আতা, গোলাপজাম, কমলালেবু প্রভৃতি ছোট গাছ রোপণ করিবে। তাহার উত্তর অংশস্থিত জমিতে লিচু, লকেটফল, সপেটা ইত্যাদি বসাইবে; তাহার উত্তর অংশে কলমের আমগাছ চালতা, আলিগট, বিলাতী গাব, কামরাঙ্গা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত দর্ঘাকৃতি গাছগুলি বসাইবে।

বাগানের পশ্চিমাংশে ঝিল ও রাস্তার মধ্যে আঁঠীর চারা আম, কাঁটাল, রুটী বৃক্ষ, কাজুবাদাম বেল প্রভৃতি বড় জাতীয় বৃক্ষ সমূহ রোপণ করিবে।

বাগানের সর্ব্ব দক্ষিণাংশে রাস্তা ও পথের মধ্যে কলা, আনারস ইত্যাদি রোপণ করিবে।

বাগানের উত্তর-পশ্চিম কোণে ঝিলের পরপারে গোয়ালঘর ও সার ও আবর্জ্জনা [illegible] দু একটী গর্ত্ত থাকা আবশ্যক। হাললাঙ্গল ও ভারবাহী বলদ না থাকিলে বাগবাগিচা হয় না সুতরাং বাগানে তাহাদের থাকিবার ঘর থাকা চাই। বাগানের উত্তর পশ্চিমাংশে তাহাদের থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিবে।

১০০ শত বিঘা বাগানে অন্ততঃ ১০ বিঘা জলকর থাকা আবশ্যক। নক্সা উল্লিখিত

বাগানের পুষ্করিণীর পরিমাণ ২॥০ বিঘা ; ঝিলের পরিমাণ ৭॥০ বিঘা ; উক্ত বাগানের রাস্তায় প্রায় ২॥০ বিঘা স্থান অধিকার করিয়াছে।

আমাদের প্রাচীন আর্য্যঋষিরা বৃক্ষের বিশেষরূপ উপকারিতা বুঝিয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই বৃক্ষগুলিকে পুত্র সম যত্ন করিতেন। বাস্তবিক ধর্ম্ম ধন বজ্জিত পুত্র অপেক্ষা ফল-ছায়া যুক্ত তরু শত গুণে শ্রেয়স্কর। তাই আজ অন্যান্য বিষয় ছাড়িয়া বৃক্ষাবলী সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা করিয়াছি। ফলের বাগান তৈয়ারি করিবার বিষয়েই কিছু চেষ্টা পাইব। এতদ্দেশে কত প্রকার সুস্বাদু ফল পাওয়া যায় তাহা গণনা করা যায় না এবং অধিকাংশ ফলই আমাদের শারীরিক প্রক্রিয়ার সহায়তা করে। সুতরাং প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে ফলের বাগান যে অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

একটী বাগান প্রস্তুত করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে স্থান নির্দ্দেশ আবশ্যক, কারণ সকল প্রকার ফলের গাছ সকল স্থানে ভাল হয় না। বেদানা, ডালিম, আখরোট, কিস্‌মিস বা আঙ্গুর গাছ শীতপ্রধান পার্ব্বত্যপ্রদেশেই জন্মিয়া থাকে। কলা ও নারিকেলাদি বৃক্ষ দক্ষিণবঙ্গের সিংহল, কচ্ছদ্বীপ, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানের মত অন্যত্র হইতে দেখা যায় না। বোম্বাই আম বোম্বাইয়ে যেরূপ ভাল হয়, বাঙ্গালায় সেরূপ হয় না, কাশীর পেয়ারা ২৪ পরগণায় হয় বটে কিন্তু তেমনটী হয় না মধ্য ও পশ্চিম বাঙ্গালায় কাশির পেয়ারা ও কাশির কুল খুব ভালই হয়, কিন্তু এদেশে পশ্চিমের ন্যায় তদ্বির করার অভাবেই একটু খারাপ হয়। পশ্চিমে এই দুই প্রকারের ফলের গাছ ৮।৯ হাত অন্তর শ্রেণীবদ্ধভাবে রোপণ করিয়া, বৎসরে দুই তিনবার তদস্থ জমিতে লাঙ্গল চাষ দেওয়া এবং কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে মধ্যে মধ্যে গোড়ায় জল সেচন করায় ফল ভাল হয়। এদেশের মাটী অপেক্ষাকৃত সরস থাকিলেও ঐ সময় একেবারে টানিয়া যায়, সুতরাং ঐ প্রণালী অবলম্বন করাই উচিত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে খানেই কেন বাগান করা যাউক না, সেই বাগানে বিশেষরূপ যত্ন করিলে নানা দেশীয় নানা জাতীয় ফল ফলান যাইতে পারে, কিন্তু স্থান মাহাত্ম্যে ফলের আকৃতি ও গুণগত বিভিন্নতা অনিবার্য্য এই প্রবন্ধে আমরা বাঙ্গালা দেশের ফলের বাগানের কথা বলিব।

বাঙ্গালা দেশে জলাশয় খনন সহজেই হইতে পারে। পুষ্করিণী দীর্ঘিকা বা ঝিল খনন করিয়া তাহার চতুষ্পার্শে বাগান করাই প্রশস্ত। পতিত জমির বন কাটাইয়াও বাগান করিলে সুন্দর বাগান প্রস্তুত হয়। বাগান দীর্ঘ প্রস্থে একটু বিস্তৃত না হইলে আশানুরূপ ফল লাভ হয় না। অনেকে সামান্য স্থানে অর্থাৎ বিঘাপরিমিত জায়গায় ফলের বাগান করিতে যান, কিন্তু তাহা দুরাশা মাত্র। ফলের বাগান নাতি উচ্চ নাতি নিম্ন অর্থাৎ সমতল স্থানে হও। উচিত। দোয়াঁশ মাটী ফলের বাগানের পক্ষে মন্দ নয়। শুধু দোয়াঁশ মাটী নয়। বাগানের স্থাননির্দ্দেশ করিয়া জমি পরীক্ষা করতঃ দেখিতে হইবে যে, দোয়াঁশ কি আঠাল মৃত্তিকা। মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া পরে বিভিন্নপ্রকার সারসংযোগে নানাজাতীয়

ফল উৎপন্ন করা যাইতে পারে। জমির পরিমাণ অন্ততঃ একশত বিঘা হইলেই ভাল হয়। তবে সাধারণের পক্ষে ইহা অসম্ভব, সুতরাং অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

এইরূপে বাগানের জন্য যে স্থানটী নির্ণীত হইবে, তাহার মাটী দুই তিন বার কোদাল দ্বারা খুড়িয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া শুষ্ক করিতে হইবে এবং তদুপরিস্থ আগাছা ও গাছের শিকড় আদি উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। পরে পুরাতন পুষ্করিণী বা দীর্ঘিকা থাকিলে তাহার পঙ্কোদ্ধার করিয়া ঐ মাটী খনিত শুষ্ক মাটীর উপর ছড়াইয়া দিতে হইবে। যদি পুরাণ জলাশয়াদি না থাকে পগার, পয়ঃনালা, ঝিল এবং প্রশস্ত পুষ্করিণী, এই চারি প্রকারে জমিখানি ছোট করিয়া ফেলা উচিত নহে। কিন্তু আমার মতে চারি দিকে আড়াই হস্ত পরিসর পগার কাটিয়া ঐ জমির মধ্যে ১২।১৪ হস্ত চৌড়া করিয়া গোলাকার ঝিল খনন করতঃ বাগানের শোভা, জমির সরসতা বৃদ্ধি, জল সেচনের সুবিধা, জমির পরিমাণ রক্ষা, মৎস্যের উৎকর্ষ সাধন, ইত্যাদি অনেকগুলি কাজ একেবারে হইয়া, বিশেষ আয়কর হইবে। একশত বিঘা বাগানে অবশ্য এক স্থানে দশ বিঘা না হইয়া মধ্যস্থলে পুষ্করিণী ও উত্তর পশ্চিম পার্শে ঝিল থাকিলে ভাল হয়। জল নিকাশের ও জল সেচনের সুবিধার জন্য বাগানের জমি এরূপভাবে সমতল করা চাই যাহাতে পুকুরের ও ঝিলের দিক হইতে তাহার চারি পার্শ ক্রমনিম্ন হয় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। জল সেচনের জন্য বাগানের মাঝে মাঝে পয়ঃনালা রাখা উচিত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাগানের চতুষ্পার্শে আড়াই হস্ত পরিমিত পরিসর খানা বা খাদ খনন করা উচিত। ইহাতে প্রতি বৎসর বাগানের আবর্জ্জনা ও মৃত উদ্ভিজ্জাদি নিক্ষিপ্ত ও সঞ্চিত হইয়া বর্ষাশেষে বৃক্ষাদির অতি উৎকৃষ্ট সার রূপে পরিণত হয় এই জন্য প্রতি বৎসর কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে পগার ঝালাইয়া উহার মাটী বাগানের উপর ছড়াইয়া দেওয়া উচিত। খানার পাড়ের উপর হইতে বেড়া প্রস্তুত করা উচিত।

এখন দেখা যাউক কিরূপে সহজে বাগান প্রস্তুত হয়। খনার একটী বচন আছে।

আগে পুতে কলার ঝাড়।
বাগান করবে তার পর ॥
কলা গাছে না শুকায় মাটী।
বাগান হয় তার পরিপাটী ॥

বাগান করিতে হইলে যে কলার চাষ করা উচিত, তাহার প্রধান কারণ এই যে, কলা গাছ শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া চারা গাছগুলিকে ছায়া দান করে এবং কলার গাছ হইতে বৎসর বৎসর উদ্ভিজ্জজাত বৃক্ষ সকলের পোষণোপযোগী সার পাওয়া যায়। আরও দেখা যায় যে, কলা গাছের আবাদ হইতে যে আয় হয় তাহা হইতে প্রায় বাগানের জমী তৈয়ারী খরচা উঠিয়া যায়। পতিত জমিতে পাঁক বা এঁটেল মাটী ছড়াইয়া কলা চাষ করিলে কলার ফলন যথেষ্ট হইয়া থাকে। ন্যূন সংখ্যায় পাঁচ বৎসরের কম একটী ফলবান

বাগান তৈয়ারী হয় না। ইতিমধ্যে যে খরচা হয়, তাহা যদি কলার আবাদ হইতে উঠিয়া যায়, তাহা হইলে কম লাভ হইল না। বাগান প্রস্তুত হইলে কলা গাছ প্রায়ই নষ্ট হইয়া যায়, তজ্জন্য বাগানের পুষ্করিণীর সন্নিহিত একটী স্থানে সবজীবাগান করিয়া তাহার চারিদিকে কলাগাছ পুতিলে কলা গাছ নষ্ট হয় না অথচ সবজী বাগানেরও কোন ক্ষতি হয় না, বরং বিশেষ উপকারে আইসে।

প্রথমতঃ বাগানে বেড়া দেওয়া আবশ্যক। কাঁটা যুক্ত বেড়ার গাছ লাগাইলে এক বৎসরের মধ্যে দুর্ভেদ্য বেড়া হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে অর্থব্যয় আছে অথচ অন্য কোন উপকারে আইসে না। আমার বিবেচনায় খানার নিকট চারিহাত অন্তর সুপারি গাছ রোপণ করিয়া তাহার মধ্যে মধ্যে কাগজী আদি লেবু গাছ রোপণ করতঃ (ঐ গাছ সহজে বর্দ্ধিত হয় ও ছাগাদিতে খায় না সুতরাং সহজে বেড়া তৈয়ারী হয়) ২।৩ বৎসরের মধ্যে দুর্ভেদ্য বেড়ায় পরিণত হয়। ইহাতে উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। বেড়ার কার্য্য সিদ্ধ হয় ও সুপারী এবং লেবুতে যথেষ্ট আয় হইতে পারে। প্রথম পগারের উপর বাঁশের বেড়া দিয়া সুপারী গাছ বসানই কর্ত্তব্য। এইরূপে সুপারী ও লেবুগাছ বর্দ্ধিত হইলে লেবু গাছগুলিকে সুপারী গাছের সহিত সমসূত্রে রাখিবার জন্য বাঁশের বাতা দিয়া আবদ্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নচেৎ দুর্ভেদ্য বেড়ার পক্ষে বাধা পড়িতে পারে।

সুপারী বৃক্ষ পুতিবার কথা বলা হইল এক্ষণে নারিকেল বৃক্ষের বিষয় বলিতেছি। নারিকেল বৃক্ষ জলের নিকট বসানই উচিত। উহাতে গাছগুলি বেশ সতেজ হয় এবং ফল হইলে পাড়িবার সুবিধা হয়, এজন্য পুষ্করিণীর চারি পাড়ে ও ঝিলের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া পুতিবে। চারাগুলি বেশ মোটা তেজী অথচ ছোট হওয়াই ভাল। যে নারিকেলের খোল বড় তাহার চারাই বসান উচিত এবং পুরাতন গাছের নারিকেলেই চারা কিছু বেশী তেজী হয়। নারিকেল গাছ পুতিবার সময় অনেকে গোড়ায় একটু লবণ দিয়া বসাইতে ব্যবস্থা দেন, কারণ লবণাক্ত প্রদেশেই নারিকেল জন্মিয়া থাকে, কিন্তু তাহা কতদূর ফলপ্রদ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

বাগানের উত্তরপশ্চিম দিকে যে ঝিলের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেই পশ্চিম-দিকের ঝিলের পশ্চিম পাড়ে যে জায়গা থাকিবে তাহাতে ৩।৪ ঝাড় বাঁশ বসাইতে হইবে। তাল খেজুর আদৌ নহে। ইহার জন্য পৃথক ক্ষেত্র করা উচিত। এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে ঝিলটী ইচ্ছামত বক্রভাবে ঘুরাইয়া লইয়া যাইতে পারা যায়। বাঁশ, বাগানের বেড়া, মাচান, ভারা, গাছের ঠেশ প্রভৃতির জন্য অত্যাবশ্যক। তদ্ব্যতীত বাঁশের আওলাতে লাভও যথেষ্ট।

এইরূপ আবার উত্তরদিকের ঝিলের উত্তরে ইচ্ছামত অন্য গাছ (অবশ্য বিলাতী কুল এখানে বসান উচিত নহে) আমলকী, বেল, কথবেল, চালতা, বিলাতী আমড়া, কামরাঙ্গা গাছ বসান যাইতে পারে।

বাঁশ ও এই সমস্ত বৃক্ষ ঝিলের পরপারে বসাইবার ব্যবস্থা করা গেল, তাহার প্রধান কারণ এই যে, ইহারা অধিক দূর শীকড় চালায় এবং জমী হইতে রস টানিয়া লইয়া জমী এত শুষ্ক করিয়া ফেলে যে তাহার সন্নিকটে অন্য গাছ হইতে পারে না। অথচ এই সকল বৃক্ষ হইতে গৃহস্থের নিত্যনৈমিত্তিক অনেক উপকার সাধিত হয়। সহর অঞ্চলে খেজুর ও তাল কম আয়কর আওলাত নহে। প্রত্যেক গাছ হইতে বৎসরে ৷৷৹ আনা আয় হইতে পারে।

বাগানে আঁটির চারা ও কলমের চারা দুই প্রকারের গাছ বসাইতে হইবে। আঁটির চারাগুলি অপেক্ষাকৃত বড় হয় ও কলম অপেক্ষা কষ্টসহিষ্ণু বলিয়া উহাদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। এখানে আরও স্মরণ রাখিবেন যে ভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের বিভিন্ন প্রকার পাট করিতে হয়, সুতরাং একজাতীয় বৃক্ষ এক একস্থানে পৃথক পৃথক রোপণ করা উচিত। ঝিলের পশ্চিম পাড়ে আঁটীর আম ও কাঁঠাল বাগান করিবে। আম গাছ ২৫।৩০ হাত অন্তর ও কাঁঠাল ২০।২৫ হাত অন্তর বসাইবে। ইহার উত্তর বা দক্ষিণাংশে আঁটির পেয়ারা, বিলাতী আমড়া প্রভৃতি গাছ বসাইবে। কতকটা যায়গায় কতকগুলি কাল জাম গাছ বসাইতে ভুলিও না। কালজাম অতি উপাদেয় অম্লমধুর ফল। আবার ইহার আঁটি ও ফলে আরক তৈয়ারী হয়। কলমের গাছ অপেক্ষা আঁটির গাছে ফল অধিক হয় সুতরাং আঁটির গাছ দেরিতে ফলিলেও ভবিষ্যতে ফল ও কাষ্ঠে অধিক লাভ দেয়। পুষ্করিণীর পূর্ব্বভাগে, কলমের গাছ বসাইবে। বাগানের দক্ষিণদিক হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমে জামরুল, গোলাপজাম, লিচু, আম, লকেট, কলমের পেয়ারা, বাতাবী লেবু ও বিলাতী কুল প্রভৃতি নানাজাতীয় ফল পৃথক পৃথক বসাইয়া লইবে। এক প্রকারের গাছ নানাস্থানে ছড়াইয়া থাকিলে তাহাদের পাট করিবার বড় অসুবিধা। লিচু পাকিলে জাল দিয়া গাছটি ঘেরিতে হয়, গোলাপজামের ফল ধরিলে চট বাঁধিতে হয়, বিভিন্ন জাতীয় গাছগুলি একত্র থাকিলে, অল্প খরচে অনায়াসে ঐ সকল কার্য্য সাধিত হইতে পারে। এইখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখি, চারা বসাইয়া মধ্যে মধ্যে পেঁপে গাছ বসাইয়া দিবে, চারাগুলি বড় হইলেই ধারে ভিতে দুই একটি পেঁপে গাছ রাখিয়া বাকী পেঁপে গাছগুলি কাটিয়া ফেলিবে। ইতিমধ্যে অনেক পেঁপে খাওয়া ও বেচা হইবে, লাভ মন্দ কি ?

বাগানের দক্ষিণ ভাগে পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাড়ে সবজীবাগ করিবে। এইখানে বিলাতী ও দেশী সবজীর চাষ ইচ্ছামত করা যাইতে পারে। বাগানের দক্ষিণাংশে সবজীবাগ করিবার ফল এই যে, দক্ষিণের হাওয়া বাগানের ভিতর অবাধে প্রবাহিত হইতে পারে, এবং পশ্চিমদিকে বাঁশ থাকিবার দরুণ পশ্চিমে পড়ন্ত রৌদ্রে বৃক্ষাদির অনিষ্ট হয় না।

পুষ্করিণীর উত্তরভাগে পাড়ের অনতিদূরে একটি ঘর তৈয়ারী করিলে মন্দ হয় না। আজকালের রুচি অনুসারে সোণার পাথরবাটির মত একটি বিলাতী বাঙ্গালা নির্ম্মাণ করিলেই ভাল হয়, এত বড় বাগানটায় বাসোপযোগী একটি ঘর থাকা চাই বৈ কি।

চতুর্দ্দিক আঙ্গুর গাছের বেড়া মন্দ হয় না। উত্তর ভাগের অবশিষ্ট স্থানে বেদানা, কিসমিস, আকরোট আপেল প্রভৃতি গাছ রোপণ করা উচিত। যেখানে এই সব গাছ সেইখানে নতুবা লেবু ইত্যাদি তাই বসাইতে হয়। বাঙ্গালা দেশের মাটীতে ঐ সকল গাছ ভালরূপ হয় না, গাছ হয় ত ফল হয় না, তবে সখের জন্য মানুষ কি না করে? ঐ স্থানটিতে বেলে ও চুনা পাথর ফেলিয়া স্থানটি পাহাড়ে স্থানের মত করিয়া লইতে হয়ত আবার কতকগুলিতে ফল হইতে পারে। হিমপ্রধান বিলাতের গ্রীন হাউসের ভিতর কলা ফলিতেও ত শুনা যায়?

চারা বসাইবার পূর্ব্বে বাগানে রীতিমত সার দেওয়া উচিত। সাধারণতঃ পচা গোবরের ও পচা মাছ আদির মাটির সার ব্যবহার হইতে পারে, কারণ ইহা সকল প্রকার উদ্ভিদের উপযোগী। বিশেষতঃ পচা মাছ আদি জান্তব সার আম জামাদি বৃক্ষের প্রধান উপকরণ তজ্জন্য উক্ত সার সকল মাটিতে মিশান উচিত। কোন গাছে কি সারের দরকার অন্য সময়ে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

চারা পুতিবার সময় বর্ষার প্রারম্ভ অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠের শেষ ও আষাঢ়ের প্রথম এবং বর্ষার শেষ অর্থাৎ আশ্বিনের শেষ ও কার্ত্তিকের প্রথম। তন্মধ্যে প্রথমটী অপেক্ষা শেষ সময়ই উপযুক্ত, বর্ষার জলে চারাগুলির গোড়া পচিয়া যাওয়া সম্ভব ও গোড়া আলগা হইয়া গোড়ার মাটীগুলি সরিয়া যাওয়ায়, হাওয়াতে গাছগুলি হেলিয়া দুলিয়া নষ্ট হইতে পারে। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বসাইলে সে বিষয়ে কোন ভয় থাকে না, তবে জলসেচন সম্বন্ধে বিশেষ বন্দোবস্ত আবশ্যক হয়। শীতকালে সকল বৃক্ষেই জলসেক আবশ্যক সুতরাং নূতন চারায় দেওয়ার ত কথাই নাই। এরূপ সময়ে গাছ পুতিলে গাছ গুলি নিশ্চয়ই লাগিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করিতে হইলে একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রীতিমত মাটী তৈয়ার করিয়া অল্প সারসংযুক্ত করিতে হয়, বেশী তেজী মাটী হইলে চারা প্রথমতঃ বেশী তেজী হয় বটে, কিন্তু চারা উঠাইয়া রোপণ করিলে তত তেজ থাকে না। ঐরূপ মাটীতে উৎকৃষ্ট পক্ক শুষ্ক বীজ বপণ করিতে হয় ও নিয়মমত জলসেক করা একান্ত আবশ্যক। চারাগুলি রোপণের উপযুক্ত হইলে চারা উঠাইবার সময় গোড়ায় মাটীসংযুক্ত করিয়া কলার ছোটা দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে এবং একদিন বা দুইদিন শুকাইয়া তবে বসান উচিত কারণ চারায় শিকড় সংলগ্ন মাটী বেশ শুকাইয়া লাগিয়া যায় ঐ শুষ্ক মাটী সমেত চারা বসাইলে জল পাইয়া গোড়া আলগা হইয়া যাইতে পারে না এবং চারা হেলিয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে না। তাপর হইতে চারা উঠাইবার সময় যত্নপূর্ব্বক চারার মূল শিকড়টী অল্প ছাঁটিয়া দেওয়া উচিত। তাহাতে গাছগুলির শিকড় বেশ চারিদিক বিস্তৃত হইয়া গাছটীকে ঝাঁকড়া করিয়া থাকে। এবং গাছের অত্যাধিক তেজ দমন করিয়া গাছের ফলউৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করে

বাগান তৈয়ারী হইয়া গেলেও প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে ২।১ পশলা বারিপাত হইয়া মাটী একটু নরম হইলেই সমুদয় ফলের গাছের গোড়া অল্প বিস্তর খুলিয়া দিয়া বর্ষার জল খাওয়াইয়া লইতে হইবে এবং এই সময় সমস্ত বাগানটী একবার কোপাইয়া দেওয়া উচিত তাহা হইলে আর বর্ষাতে বন জন্মায় না। বর্ষাশেষে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে সকল গাছের গোড়ায় সার দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে এবং এক্ষণে আর একবার বাগানটীকে রীতিমত কোপাইয়া দোরস্ত করিয়া দিতে হইবে।

যিনি এক শত বিঘার বাগান করিতেছেন, তিনি অবশ্য বাগানটীকে সুন্দর করিবার জন্য বাগানে দীর্ঘ প্রস্থে ৩।৪টী সুপ্রশস্ত রাস্তা করিতে ভুলিবেন না। মনে করিলে ঝিলটীকে পয়োনালা দ্বারা পুষ্করিণীর সহিত যোগ করিয়া দিতে পারেন এবং ঐ পয়োনালার উপর পুল তৈয়ারী করিতে পারেন। বর্ষায় যাহাতে খানার জল ঝিলে প্রবেশ করান যায় তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত। বর্ষাতে খানাগুলি জলপূর্ণ হইলে সেই জল ঝিলে আসিয়া ঝিল ও পুষ্করিণীর জল বৃদ্ধি করিতে পারিবে। পুষ্করিণীর চারিধার সুন্দর ফুল ও পাতা বাহার গাছ দ্বারা সজ্জিত করিতে পারেন। পুকুরের সান বাধাইতে পারেন এই সকল কিন্তু সখের জন্য; ইহার জন্য আয় বাড়িবে না। তবে রাস্তা শুধু সখের জন্য নহে বাগানে সার প্রভৃতি লইবার ও বাগান হইতে ফল প্রভৃতি লইয়া আসিবার জন্য বাগানের ভিতর গাড়ী যাইতে পারা চাই, নচেৎ খরচা অধিক লাগিয়া যায় এবং ঐ রাস্তা হাওয়া চলাচলের একপ্রকার প্রণালীর মত। পুষ্করিণী ও ঝিলের ঢালু পাহাড়ে ও খানার ধারে ঘাস তৈয়ারী করিয়া বলদ ও গাভীর জন্য আহার্য্য সংগ্রহ হইতে পারে অথচ পাড়গুলি দেখিতে মনোরম হয়।

ডেয়ারি ফার্ম্মিং এবং পক্ষীচাষ

আমাদের দেশে নানা জাতীয় ও বর্ণের পাখী বা মুর্গী দেখিতে পাওয়া যায়। বিলাতী শোণিতের দ্বারা তাহাদের বিশেষ উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে। চাটগেঁয়ে আসল, হাদ্রাবাদী, কটকী, পাটনাই, খাঁটুরে দেশী, বন্য প্রভৃতি মুর্গীর হাউদান. ফ্লিমর্কা, অর্পিঙ্গটন লাঙ্গ্রিচী, ক্রীডকুর, রোড, ইণ্ডিয়ান রেড জাতীয় মোরগের সংযোগে আমাদের দেশী মুর্গী বংশের বিশেষ উন্নতি হইতে পারে এবং মুর্গীদের ৫০।৬০টি করিয়া পৃথক পৃথক দূর দূর স্থানে রাখা কর্ত্তব্য, যাহাতে রোগ সংক্রামিত হইতে না পারে, খোঁপ প্রত্যহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সময়ে সময়ে ফেনাইল জলে ধৌত করা বিশেষ দরকার এবং আলকাৎরা মাখানও দরকার। ডেয়ারি ফারমের কিছু দূরে পাখী চাষের

ব্যবস্থা করা অবশ্য অবশ্য কর্ত্তব্য। উচ্চ রৌদ্র যুক্ত এবং ছায়াযুক্ত স্থানে দক্ষিন-মুখীঘর করিয়া মুর্গী পোষা দরকার।, নবযুগ পত্রিকার মল্লিখিত প্রবন্ধগুলিকে অপর সংবাদ পত্র গণে ও পুনঃ প্রকাশিত করা আমার ইচ্ছা কারণ তাহাতে দেশের এই সম্বন্ধে জ্ঞান বিস্তারের কাজ সুচারুরূপে সম্পাদিত হইবে এই বিষয়ে তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে সহায়তা করা একান্ত কর্ত্তব্য প্রথম বৎসরের পাখীর বাচ্ছা হইতে বৈজ্ঞানিক পালন ও খাদ্যদানের দ্বারা যত বেশী সংখ্যা হয় ডিম লইবে, দ্বিতীয় বৎসরে তাহাদের সংজনন কার্য্যে নিয়োগ, ডিমে তাদেওয়ায় ও ছানা পালনে সংযোগ করিবে এবং তৃতীয় বৎসরে হাটে পাঠাবে। ১০০।১৫০ মুর্গী এবং সঙ্গে সঙ্গে এক একটি ডিম ফোটান কল লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা করিলে এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহস্থ সংসারের বেশ অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। জাতীয় শিক্ষা সংঘ বা দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় বা মাননীয় প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের মত দেশ হিতৈষী বা বাবু হীরেন্দ্র নাথ দত্তের মত বঙ্গ সমাজের মনিষীগণ এদিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না কি? সেই জন্য আমার স্বদেশবাসী মহাত্মাগণের নিকট তথা হিন্দু মুসলমান ধনী দরিদ্র, রাজা মহারাজা, ব্যবসায়ী, জমীদার, গৃহস্থ, কৃষক সকলের নিকট নিবেদন যে তাঁহারা সমবেত হইয়া আমার এই জীবনের ৩০ বৎসরের যাবতীয় কৃষি, পক্ষী চাষ, গোরক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ কর একত্রে ছাপাইয়া স্বদেশ মধ্যে গৃহস্থ এবং কৃষক কেন্দ্রে বিতরণ করুন তাহাতে এই মহার্ঘ ও দুর্দ্দিনের দিনে বিশেষ কাজ হইবে; মিটিং করিলে বা চিৎকার করিলে বা নাটক নভেল পড়িলে কোন কাজ হইবে না। যদি কেহ অগ্রসর হন আমি সকল লিখিয়া দিতে পারি, এই গুলি দেশের অবস্থায় বস্তুত শিক্ষা প্রদ হইবে। কোন স্বদেশবৎসল মহাত্মা অগ্রসর হউন। আমায় পত্র দিলে সকল খবর দিতে পারি আমার নিকট ভারতবর্ষের বহু স্থান হইতে ডেয়ারি ও পুষ্টী চাষ সম্বন্ধে পত্রাদি আসিয়া থাকে; তাহাদের উত্তর দেওয়া অসম্ভব তাই বলি যে জাতীয় শিক্ষা সংঘের নেতাগণ, সার প্রফুল্ল কুমার রায় বা ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অধ্যাপকগণ যোগাযোগ করিয়া এই কাজ কাজে পরিণত করুণ, এই আমার বিনীত প্রার্থনা। ভারতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানবীর মাননীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আদীন দরিদ্র শিক্ষিত অশিক্ষিতের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন, সার ঘোষের শেষ দানের অর্থ রাশী হীরেন্দ্র বাবুর হাতেই অচিরে আসিয়া পঁহুছিবে, যাহা স্বর্গীয় ঘোষ মহাশয়কে প্রার্থনা করিয়া দেশের নিঃস্ব সহায় হীন কৃষক বৃন্দের মধ্যে কৃষি শিক্ষাদি আবশ্যকীয় বিষয়ে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ভ্রমণশীল কৃষি লেক্‌চারার ও শিল্পের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করিয়াছি, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে আজ্ঞা হয়, এই আমার প্রার্থনা।, সার মুখো মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারেন যে কৃষি শিক্ষা বিস্তারের জন্য আমি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কমিশনের সময় তাঁহাকে কত না উত্যক্ত করিয়াছি এখন সুযোগ আসিয়াছে তাহা কাজে পরিণত করুন, যাহাতে লোকপজা

দানবীর স্বর্গীয় ঘোষ মহাশয়ের শেষ বাসনা পরিপুরিত হয় এবং তাঁহার আত্মা সুখে শেষ বিশ্রাম লাভ করিতে পারে। তিনি উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য, তাহা কোন বাঙ্গালি না জানে আবশ্যক হইলেও অনেক অবান্তর কথা এই পত্রে বলিয়াছি। ডেয়ারি ফার্ম্মিং সম্বন্ধে বড় বেশী কিছু বলা হয় নাই। এ সম্বন্ধে আমার এই বক্তব্য যে জ্ঞান চিকির্ষু পাঠক মল্লিখিত গোপাল বান্ধব পাঠ করুন আর এই পত্র গুলাও যত্নে পাঠ করিলে অনেক বিষয় জানা যাইবে।

আমাদের যদি জাতিরূপে ধরা পৃষ্ঠে বাঁচিতে হয়, তবে আমাদের দেশের কৃষির একমাত্র সহায়ও দুগ্ধাদি খাদ্য সামগ্রীর উৎস ভারতীয় গোধনের নিশ্চয় নিশ্চয় রক্ষা করিতে হইবে। আমার মনে হয় যে আর্য্য ঋষি, নৃপতিগণ, বৌদ্ধ নরপতিগণ তথা মুশলমান বাদসাহগণ গোজাতির রক্ষা বিধান করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের দেশের তাঁহাদের শাসনকালে মজ্জাগত দৈন্য উপস্থিত হয় নাই, সেইজন্য সে যুগে অকাল মৃত্যু রোগাদি আমাদের অভিভূত করিতে পারে নাই, আমরা গোমাতা হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছি বলিয়া আমাদের দেশের হিন্দু ও মুশলমান উভয় ভায়ের এত দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। মুশলমান ধর্ম্ম শাস্ত্রে গোহত্যার নিষিদ্ধ না হইলেও অভিমত নহে। এখন দেখা কর্ত্তব্য যে গোরক্ষার জন্য বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে কি করিয়াছি এবং বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের কি কর্ত্তব্য! গোজাতির রক্ষা তথা উন্নতি কি প্রকারে হইতে পারে! এই সকল বিষয় পর পর পত্রে আলোচনা করিব।

ডেয়ারি ফার্ম্মিং ও পক্ষীর চাষ

বিগত কয়টি পত্রে আমার স্বদেশী পাঠকগণ এই উভয় কলা বিদ্যায় সম্বন্ধে কতকটা আভাষ পাইয়া থাকিবেন। যে দেশে বিরাট রাজার উত্তর ও দক্ষিণ গো গৃহ আজও ভগ্নাবশেষ বুকে ধারণ করিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, সে দেশের গো মাতার কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে তাহা চিন্তা করায় সময় কি বাঙ্গালির আজও আসে নাই? নিম্ন সম্বল শূন্য গৃহস্থ এবং মধ্যবিত্ত লোকের দ্বার দ্বার যে অভাব তাহাদের সাংসারিক সুখ অবসান করিয়াছে, যে দেশের লোকের মুখে "হরি ঘোসের গোল "কথাটি উপকথায় পরিণত হইয়াছে, সেই দেশের শিশু আতুর তথা যুবা রোগী দুধের সাধ পিটুলি গোলা জল দ্বারা মিটাইতেছে ও সন্তান পালনে রত হইয়াছে সে দেশের কথা আর কি বলিব! এরূপ দেশ ও তাহার অধিবাসী রসাতলেই যাইলেই মঙ্গল, নভেলী যুগের কুম্ভকর্ণী নিদ্রায় অভিভূত বাক সর্ব্বস্ব স্বার্থপর জাতি ধরায় থাকিলেই আর অন্তর্ধান হইলেই বা কি! ভারতের বহু বহু জাতির মধ্যে আমাদের মত কেবল জাতি অধঃপাতের নিম্নস্তরে অবতরণ করিয়াছে কি না তাহা জানিনা। ভাই বঙ্গবাসী! যদি জাতি রূপে ধরাপৃষ্ঠে অবস্থান করিতে চাহ তবে নিজের দেশের কৃষি ও গোধনের দিকে নজর দাও। ভাই

হিন্দু মুসলমান, তোমাদের জোৎ জমার উৎপন্ন ফশলের ফলন বৃদ্ধির দিকে, পুকুরের মাছের বৃদ্ধির দিকে, মুর্গীর ও গাভীর উন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত কর। তোমরা পাখী খাও মাছ খাও, ছাগল খাও, কিন্তু তাহাদের উৎপন্ন কর না। বৈজ্ঞানিক পাশ্চাত্য ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীগণ যেরূপ ভাবে ইহাদের দুধের জন্য বা খাদ্যের জন্য উৎপন্ন করেন তোমরাও সেইরূপ উৎপন্ন কর। সুরাটের সন্নিকট পীর মোতামিয়া সাহেবের আদেশ মত প্রত্যেক বঙ্গবাসী গৃহস্থ ঘর ঘর একটি করিয়া গাভী পালন কর, ইহাতে তোমাদের সাংসারিক ও দেশের প্রভূতহিত ও কল্যাণ সাধিত হইবে। গোপালনের আমাদের অন্তরায় কি কি এবং কেনই বা আমাদের দেশের স্বদেশী আন্দোলনের সময়ের এতগুলি ডেয়ারি ফারম ও দুগ্ধ ব্যবসায় অকালে মৃত হইল তাহার কারণ কি? গোপালনের আমাদের প্রধান প্রধান যে সকল অন্তরায় আছে তাহা পূর্ব্বে পূর্ব্বে পত্রে আলোচনা একরূপ করিয়াছি, তাহার মধ্যে দেশে গোপ্রচারের অভাব, গোজাতির অবনতি ও অবাধ গোহত্যা, গোপালনে দেশের লোকের অমনোযোগিতা শাস্ত্রমত বৃষোৎসর্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের নিস্পৃহতা গোজননীতির অনভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। সেইজন্য বলি যে ভাই বঙ্গবাসী রাজা মহারাজা জমীদার প্রজা সকলে আগ্রহ করিয়া গোপাল বান্ধব যত্নে পাঠকরুন; তাহা আমার নিকট প্রাপ্য ঐ পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ প্রচারের সহায়তা করুন; ইহাতে মতঙ্গ, ভেড়, পালকাপ্য, সাঙ্গধর, হনুমন্ত, সহদেব, কৃষ্ণ নকুল ভৃগু আদি ঋষিগণের গোসম্বন্ধীয় বিতীয় বিষয় প্রাঞ্জল ভাবে বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া লিখিত আছে, এরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় আর নাই। আর এক কথা এই যে কোন সহৃদয় মহাত্মা অগ্রসর হইয়া দেশের কৃষক কেন্দ্রে এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থ গণের মধ্যে মল্লিখিত প্রবন্ধাদিগুলি সংগ্রহ করিয়া বিতরণ করুন, ইহাতে বেশ কাজ হইবে এবং এমন প্রচার কাজ হইবে যাহার জন্য বক্তৃতা বা লেকচারে কদাচ হইবে না।

এখন আমাদের দেশে চাই অবাধ গোহত্যা নিবারণ বৃষরক্ষণী এবং গোপ্রচার রক্ষনি আইন, দেশে বহুল কৃষি-বিদ্যালয় ও ইণ্ডাস্‌ট্রিয়াল স্কুল ও কলেজ স্থাপন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডির মধ্যে ঐরূপ শিক্ষা বিধি আশু প্রবর্ত্তন, যেরূপ বঙ্গীয় মহিষ্য সমিতি ও বঙ্গীয় কৃষক সমিতি, গভর্ণমেণ্টে তথা বড় ও বঙ্গীয় লাট ও ভারত সচিব সকাশে ভিন্ন ভিন্ন আবেদন পত্রিকার দ্বারা বিগত ১৯০০ সাল হইতে ধারাবাহিক স্থাপন করিয়াছেন। নব বড়লাট লর্ড রেডিং সকাশেও এরূপ আবেদন গিয়াছে। দেখি কি হয়। যদি ভারতীয় গোধনের অবস্থা জানিতে চাহ, সে বিষয় চিন্তা করিয়া প্রতিকারে মনন করিয়া থাক, তবে হে ভাই বাঙ্গলার চাষি, অখিল ভারতীয় গো কনফারেন্সের সেক্রেটারীর নিকট হইতে তাঁহাদের গভর্ণমেণ্টে প্রেরিত ১৯২১ সালের মেমোরিয়াল আনাইয়া পাঠকর; চক্ষুর পর্দ্দা ঘুচিবে, বোজা চক্ষু খুলিবে, বুঝিবে যে

দেশের অসহায় গোধনকে অবাধে কসাইয়ের হাতে তুলিয়া দিয়া বিদেশী সৌদাগরের ধনবৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিয়া নিজের ও নিজের দেশের কি মহান অনিষ্ট ও অহিত সাধন করিতেছ তাহা বুঝিবে! এ সম্বন্ধে আর যাহা কিছু বলিবার আছে তাহা পর পত্রে শেষ করিব। এইবার পাখীচাষ সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন তাহা পরে বিবৃত করিলাম।

বৈজ্ঞানিক নির্ব্বাচন ও পৃথকী করণ দ্বারা দেশী খেঁটুরে মুর্গীরও সবিশেষ উন্নতি করা যাইতে পারে আমাদের দেশের অজ্ঞ কৃষক ও গোউৎপাদকগণ এই বৈজ্ঞানিক বিধি প্রতিপালন করেন না বলিয়া আমাদের দেশের গো মুর্গী, মেষ ছাগলাদি গৃহপালিত পশুর এত অবনতি ঘটিয়াছে। বাদশাহ আকবরের সময় ১০৲ টাকা মূল্যে আধমণ দিনে দুগ্ধ দাত্রী গাভী মিলিত; কিন্তু আজ এরূপ গাভী ভারতে দুষ্প্রাপ্য। ২০৪০ হাজার টাকা মূলধনে যৌথ কারবার ফেলিয়া আমার মনে হয় দেশী ও বিলাতী মুর্গীর কারখানা ও ডেয়ারি ফারম কল কবজা লইয়া কলিকাতার ৫০।৬০ মাইল দূরে প্রবাহমান নদীর সান্নিধ্যে ও রেলষ্টেশানের নিকট বেশ লাভে চালান যাইতে পারে। কলিকাতার মাড়োয়ারি সম্প্রদায় কিছু দিন পূর্ব্বে এইরূপ এক কোটী টাকা মূল ধনে ডেয়ারি ও গোরক্ষনি ফারম প্রারব্ধ করিতে সাধারণকে কঙ্গ্রেস মঞ্চে অঙ্গীকার প্রদান করেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা অদ্যাবধি কার্য্যে পরিণত হইল না, আমার মনে হয় যে এইরূপ এক বৃহৎ কাজ হিন্দু, মুশলমান, ধনী দরিদ্র চাষী প্রভৃতির সমবেত সংযোগ ও চেষ্টা না হইলে কদাচ সাধিত হইতে পারে না। বম্বাইর ধন কুবের শ্রীযুক্ত দ্বারকাদাস যমুনাদাস, পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, শ্রীশ্যামলদাস বি কেদীয়া, লাল্লুভাই জাভেরী, স্বামী গোকুলনাথ জী মহারাজ, রহিমভাই করীমভাই প্রভৃতি মহোদয়গণের অধিনায়কত্বে সেই নগরে এক ডেয়ারি খোলার ব্যবস্থাও হইয়াছে এবং কাজও অগ্রসর হইয়াছে কিন্তু কলিকাতায় সববাক্ সর্ব্বস্ব! মুর্গী চাষ সম্বন্ধে পাঠকগণ কেবলি যে কৃষি সম্পদ, কৃষি কথা, কৃষক প্রভৃতি পত্রিকায় মল্লিখিত প্রবন্ধগুলি যত্নে পাঠ করুন। পাখী এবং গো চাষ কৃষির অন্তর্গত। কৃষি-শিক্ষার জন্য বিলাত ৪০ হাজার পাউণ্ড প্রতি বৎসরে ব্যয় করিয়া থাকেন; মার্কিণ যুক্ত রাজ্যে প্রতি বৎসর ২৫ হইতে ৩০ লক্ষ টাকা কৃষি-শিক্ষা বিস্তার, ভ্রমনশীল লেকচার, পাখী চাষ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যয়িত হইয়া থাকে; কিন্তু দীন ভারতে কৃষি শিক্ষার জন্য কি ব্যয় হয় তাহা কোন ভারতবাসীর অপরিজ্ঞাত? সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশে কৃষকদের প্রতিনিধি সভায়, সমিতিতে পার্লিয়ামেণ্টে ও সেনেটে স্থান অধিকার করিয়া কৃষক সম্প্রদায়দের প্রতিনিধি স্বরূপ তাহাদের স্বার্থ রক্ষায় সদাই ব্যস্ত আছেন, কিন্তু যে ভারতের শত করা ৯০ জন কৃষক বা কৃষিজীবি সে দেশের রাজ সভায় ছাপাখানার ওয়ালদের, শ্রমজীবিদের, ধর্ম্মঘটকারীদের তথা ডাকঘরের ও রেল কর্ম্মচারীদের প্রতিনিধিত্বের স্থান আছে কিন্তু কৃষকদের সেস্থান নাই! হায় আমাদের দেশের মূক

ও অন্ধ চাষা সম্প্রদায়! এই জন্য যখন সংস্কার আইন চেল্‌মস্‌ফোর্ড ও মন্টেগুর জাঁতায় গঠিত হয়, তখন বঙ্গের কৃষক সম্প্রদায়ের কেন্দ্র স্বরূপ বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি এই নবসভায় প্রতিনিধিত্ব পাইবার জন্য সবিশেষ আবেদন ও আন্দোলন করেন, কিন্তু তাঁহাদের আন্দোলনে কোন ফল লাভ হয় নাই। শাসকগণ এই দীন দেশের কৃষকদের কথা শুনিলেন না, জমীদারগণের সভায় প্রতিনিধিত্ব মিলিল, কাজেই দেশের শতকরা ৯০ জন কৃষকের স্বার্থ রক্ষিত হইল না, রাজ সভায় কৃষকদের খাঁটী একটিও প্রতিনিধি বা কথা বলিবার লোক নাই, অথচ আমরা স্বায়ত্ব শাসনে অধিকারী হইয়াছি। রাজ প্রসাদে কৃষকের অধিকার নাই। তাই বলি হে ভাই বাঙ্গালার দীন পদদলিত, উপেক্ষিত ও নির্য্যাতিত কৃষক সম্প্রদায় তোমরা সমবেত হও, তোমরা বঙ্গীয় কৃষক সমিতির সহিত মিলিত হও, দেশের যে সকল কৃষক বা জন সমিতি সকল আছে তাহারা সমবেত হইয়া কলিকাতায় কেন্দ্রীয় কৃষিসমিতির সহিত যোগদান কর, এফিলিয়েটেড্ হও, তাহার জীবন পুষ্টিকর, তবেই তোমাদের পাখীচাষ ও ডেয়ারি ফার্ম্মিং, ডেয়ারি স্কুল, দুগ্ধ ব্যবসা, কৃষিশিক্ষাদি বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হইবে, তবেই তোমাদের পক্ষের লোক রাজার বড় বা ছোট দপ্তরে স্থান পাইবে, তবেই তোমরা তোমাদের অভাব অভিযোগ শুনাইবার অবকাশ পাইবে, তবেই তোমরা ধন্য ধন্য হইবে, নচেৎ কদাচ নহে! তাই বলি ভাই হিন্দু ও মুশলমান চাষী ভাইগণ, তোমরা একত্র হও, organised bodyতে পরিণত হও, সমবেত হও কারণ

সংগচ্ছধ্বং সবদধ্বং সংবোমনাংসি জানতাম।

ডেয়ারি ফার্ম্মিং সম্বন্ধে একরূপ সব কথাই পূর্ব্বেই ২ পত্রে পাঠকগণকে বলিয়াছি। অতঃপর পত্রগুলিতে পাখিচাষ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিব। পাঠকগণ আমার এসম্বন্ধে লেখাগুলি সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিলে পাখিচাষ সম্বন্ধে একরূপ theoretical জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। আশা করি কোন সহৃদয় ব্যক্তি এই গুলিকে সংগ্রহ করিয়া ছাপাইয়া কৃষক কেন্দ্র বিতরণ করিয়া দেশের ধন্য বাদার্হ হইবেন।

ডিম ফোটা কল পরিচালন সম্বন্ধে অনেক পুস্তক আছে, তন্মধ্যে সাট্‌ক্লিফের পুস্তক খানি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ছানা ফোটার পর তাহাদিগকে ২৪ হইতে ৩৬ ঘণ্টা কিছু খাইতে দিবে না কারণ তাহা তাহাদের ঐ সময়ের মধ্যে আবশ্যক হয় না। ডিমের হরিদ্রাভ"লালীস্থ" প্রোটীনের দ্বারাই তাহাদের শরীর পরিপুষ্ট হয়। যাহাদের কারবার ছোট এবং ১০।২০ বা ৫০টা মুর্গী লইয়া ব্যবসা তাহাদের পক্ষে মুর্গীর নিচে ডিমদিয়া ছানা তোলা শ্রেয়। মুর্গীকে বসাইবার পূর্ব্বে তাহার গায়ে ভাল "কীটনাশক পাউডার" দিয়া বসান কর্ত্তব্য। এইরূপ পাউডার ঘরে স্বল্প ব্যয়ে গন্ধক, দোক্তা কার্ব্বলিক বা ফেন্যাইল সাহায্যে প্রস্তুত করা যায় তাহা ক্রমশঃ পরে বিবৃত হইবে। কিন্তু বসিয়ে মুর্গী বা ডিমদাত্রী মুর্গীকে আবশ্যক মত পুষ্টিকর খাদ্য, পরিষ্কার পানীয় জল, হাড় চূর্ণ,

প্রোটিন ধূলা, উদভিদ্ ও মাংস যুক্ত খাদ্য দিবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে ক্রমশঃ পর পর প্রকাশ করিতেছি।

ক্রুডারের (Brooder) দ্বারায় সদ্য জাত ছানাগুলিকে উত্তাপ দানে শুষ্ক ও শক্ত সামর্থ্য-যুক্ত করা হয়। ছানাগুলি ছেলেবেলায় বড় ঠাণ্ডায় শর্দ্দী ধরিয়া নষ্ট হয় বলিয়া পাশ্চাত্য ঠাণ্ডাদেশে ব্রুডারের ব্যবহার প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে শীতকালে এইরূপ ব্রুডারের ব্যবহার প্রচলন করা মন্দ হয় না। ব্রুডার পরিষ্কার, চাষ দেওয়া বিষহীন জমিতে বসান উচিত এবং উহা বসাইবার ২১ দিন পুর্ব্বে তাহার বাতি ও পরিচালন বিধিটি ঠিক করিয়া লওয়া উচিত। ফলে ছানা ফুটিলে যত দূর সম্ভব মুর্গীর নিচে ফোটা ছানার সহিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। কলে ফোটা ছানাগুলিকে যদি মুর্গীর সহিত এক করিয়া না দেওয়া হয় তবে তাহাদের স্বতন্ত্র পালন করা একটু যত্ন সাধ্য ও তাহার বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন তাহা ক্রমশঃ বিবৃত হইবে। ব্রুডার, তাহার আলো ও তদ অন্তর্গত সকল স্থান পরিষ্কার প্রত্যহ করিয়া পুতি বিমুক্ত করিবে (Disinfect)। ছানা গুলিকে গ্রীষ্মকালে ছাওয়া যুক্ত ঠাণ্ডা স্থানে রাখিবে এবং শীতকালে গরম রৌদ্র-যুক্ত স্থানে রাখিবে; রৌদ্র তীব্র হইলে সরাইয়া ছায়া যুক্ত স্থানে রাখিবে বা গরম উত্তাপ পাইবার জন্য ব্রুডারের ভিতর রাখিবে। মুর্গীদের হাড়চূর্ণ, শামুক গুগলী, চূণ কাঁকর বালী, কীটনাশক গুড়া, পরিষ্কার পানীয় জলে সামান্য গন্ধক ও মোসব্বর দিবে শিক্ষানবীষ যেন উত্তমরূপ স্মরণ থাকে যে পরিচ্ছন্নতা ও পরিশ্রমই মুর্গীচাষ ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য লাভ প্রাপ্তির একমাত্র গুহ্য ও মূলমন্ত্র। সডাক পত্র দিলে মুর্গীসম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় এবং যাঁহাদের বেশী প্রয়োজন, তাঁহারা আমার সহিত স্বয়ং ৩১নং এল্‌গীনরোড কলিকাতায় সাক্ষাৎ করিতে পারেন। আমি মুর্গীচাষ সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি। মাদ্রাজ প্রদেশে "হিন্দু পত্রিকায় আমার কতকগুলি এ সম্বন্ধে পত্র পাঠ করিয়া তদ্দেশীয় উৎসাহী যুবক ও অধিবাসীবৃন্দ শত শত পুল্ট্রীফারম খুলিয়া বেশ দু পয়সা আয় করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। আমার ঐকান্তিক বাসনা যে আমাদের দেশের মুসলমান ভ্রাতারা এবং শিক্ষা প্রাপ্ত "রিফমর্ড্ হিন্দু" ভ্রাতাগণ মিথ্যা রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে লম্ফ ঝম্ফ না করিয়া এদিকে দৃষ্টি পাত ও মনোযোগ দান করিলে দেশমাতৃকার প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিবেন। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে পক্ষীচাষের সহিত "ডেয়ারি ফারম" অবশ্য অবশ্য থাকা চাহি। দুগ্ধ সরবরাহ ও ডেয়ারি করা এবং গোরক্ষা সম্বন্ধে খুবই ভুয়া মিটিং, সভা সমিতি, জল্পনা ও কল্পনা সমগ্র দেশে দেখিলাম, রিজোলিউশান পাশ দেখিলাম, কিন্তু এ নাগাইত কাজেত কিছুই দেখিতেছি না। ডেয়ারি কোম্পানি ১৭২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে "বেঙ্গল ডেয়ারি এবং বেন্টিক ষ্ট্রীটে বাবু রাম কুমার ভগত, কেশোরাম পোদ্দার, ঘনশ্যাম দাস বিলা,

রাম কুমার ঝুণ ঝুণওয়ালা, রাম দেও চৌখানি প্রমুখ মাড়োয়ারি ধন কুবেরগণ কলিকাতা নগরে এক কোটী মূলধনে দেশপূজ্য পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের সম্পাদকত্বে যে গোরক্ষা মণ্ডলী নামক যৌথ কারবার রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, অথবা অখিল ভারতীয় গোকন্‌ফারেন্সের সেক্রেটারী শর্ম্মামিশ্রকোম্পানি যে মণ্ডেল ডেয়ারি কোম্পানি ভাসাইয়াছে, তাঁহারাই বা কি করিতেছেন? মান্দ্রাজে মিল্ক সাপ্লাই কোম্পানি, কাশ্মীর বিশ্বেশ্বরগঞ্জ ডেয়ারি কোম্পানি প্রভৃতি দেশের মধ্যে বহু দুগ্ধ সরবরাহও গোরক্ষাকল্পে কোম্পানি উদ্‌ভূত হইয়াছে কিন্তু কাজে কেহ এনাগাইত কিছু করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। ডেয়ারি বা পুল্‌ট্রী ব্যবসা আমাদের দেশের পরিবর্ত্তিত অবস্থায় সমাবেশ নবভাবে প্রবর্ত্তিত করা বড় সহজ নহে। গোরক্ষায় রাজা উদাসীন, গোখাদক প্রজাদের দেশে, পরিবর্ত্তিত অবস্থায়, শাস্ত্রানুমোদিত গো অধক্ষ্যের ও পরিচালকের অভাবে গোরক্ষা করা যে বড় সহজ ব্যাপার নহে তাহা ভারতবাসী মাত্রেরই বুঝা উচিত। গোরক্ষা ও দুগ্ধ সরবরাহ সুলভ করিতে হইলে দুগ্ধের মূল উৎস অর্থাৎ গোপ্রচার রক্ষা, গোবংশের অবাধ বলি বিধিদ্বারা বয়ন পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, নয়ন শূন্ধ সমীকরণ করিতে হইবে গো পরিচালক অধ্যক্ষ কৃষ্ণ, নন্দ, উদীয়ানদের যুগের মত আমাদের তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে; সেইজন্য বলি যে বঙ্গবাসী, ভাই মাড়োয়ারি সম্প্রদায় আপনারা এই গোরক্ষার যে সঙ্কল্প করিয়া "গোরক্ষা মণ্ডলী "স্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে কাজ দেখান, দেশের লোককে সাথ করে লন, দেশের বিশেষ জ্ঞের মত লইয়া ধীরে ধীরে প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হউন, যে বিশেষজ্ঞদের মতে কার্য্য পরিচালন করিবেন, তাঁহাদের একবার দুগ্ধ ব্যবসা জনন ফারম ইত্যাদি সকল জ্ঞাতব্য বিষয় গুলি ডেনমার্ক, সুইজরলণ্ড, ইংলণ্ড ও আমেরিকা ১১৫ মাসের জন্য পাঠাইয়া পরিদর্শন করিয়া আনয়ন করুন, যাহাতে আপনাদের কাজ সুচারুরূপে অগ্রসর হয়, আমার বিশ্বাস যে আমাদের দেশের কাজ দেশীয় লোকের সাহায্যেই চালন কর্ত্তব্য এবং কার্য্যক্ষম সুদক্ষ বিশেষজ্ঞের (Expert) এর দেশে খুবই অভাব, একথা আমি বিগত ২৬।৯।২০ তারিখের দৈনিক বসুমতী পত্রিকার স্তম্ভে ও বঙ্গবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি। কেবল মাত্র দুগ্ধ ব্যবসার উপর নির্ভর করিলে গোরক্ষাও ডেয়ারি পরিচালন লাভ বান হইবে না দুঃখের বিষয় মাড়োয়ারি ভায়ারা কোন সৎ লোকের ও সদ্‌ যুক্তি না লইয়াই কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন. ইহাতে যে তাঁহারা কতদূর লাভবান ও সফলকাম হইবেন তাহা বলা যায় না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভারতের নিস্ব কৃষক পুত্র ও পত্নীদের পক্ষে মুর্গীচাষ, ডেয়ারি ফার্ম্মিং ছাগল, হাঁস, খরগোশাদির চাষ বিশেষ লাভ জনক বলিয়া আমার মনে হয়। সামান্য ১০।১৫ হাজার মূলধনে পার্ব্বত্য উচ্চ ভূমিতে বা বিল ও ডোবা থানা নদী পুকরিণী বহুল স্থানে জলচর পাখীরচাষ যে খুব লাভের সহিত পরিচালিত হতে

পারে তাতে আর সন্দেহ কি ? একবৎসরের কম বয়স্কা মুর্গী অপেক্ষা দুই বৎসরের পুরাণ ধাড়ী মুর্গী ভাল ও পাকা পব্বিকা হইয়া থাকে। যদি ঘেরা ছোট বাঁধা পরিসরের মধ্যে পাখী রাখা হয়, তাহাহইলে একটা নির্ব্বাচিত তেজস্কর মোরগের সহিত ১০।১২টি বেশী ডিমদাত্রী শোণিত বিশিষ্ট (profuse egg laying strain) মুর্গী সংযোজিত করা যাইতে পারে, নচেৎ যদি খোলা স্থান হয়, তবে একটি নরের সহিত অবাধে ২০।২৫টি মুর্গী ছাড়িয়া উর্ব্বর ডিম পাওয়া যাইতে পারে। আমি দ্বিতীয় পত্রে বলিয়াছি যে একটা তেজস্কর মোরগের সহিত ৫।৭টা মুর্গী ছাড়া যাইতে পারে এবং উর্ব্বরা ডিম্ব পাইতে হইলে নরওমেদী ৮।১০ দিন পূর্ব্বে সংযোজিত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু নর খুব উজ্জ্বল বর্ণ বিশিষ্ট, উচ্চ চিৎকারকারী, তেজস্কর চঞ্চল ও তীক্ষ্ণ রক্তবর্ণ ফুল যুক্ত হইলে জানিবে যে তাহার সংযোগে প্রাপ্ত ডিম উর্ব্বর নিশ্চয় হইবে সংযোগ ৮।১০ দিন হইতে ২ সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত বাড়ান যাইলেও লাভ বই কোন ক্ষতি নাই। ছানাগুলিদের প্রথম খাদ্য সমভাগ কঠিন সিদ্ধ ডিম কুঁচা শুষ্করুটী বা খুব ক্ষুদ্র ২ গমচূর্ণ বা চোকর দুধে মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। রুটী হইতে দুধ কচ্লাইয়া বাহির করিয়া লইবে কারণ বেশী দুধ খাদ্যে থাকিলে ঠাণ্ডা লাগিয়া শর্দ্দী ধরিবার সম্ভাবনা থাকে। চতুর্থদিন হতে অর্দ্ধ সিদ্ধ ভাত ও গম বা মক্কা চূর্ণের সহিত হলুদ মিশাইয়া খাইতে দিবে এবং ঐরূপ হলুদ মাখান খুদ জমীতে ছড়াইয়া দিবে যাহাতে বাছিয়া বাছিয়া ছানাগুলি খাইতে পারে। এইরূপে তাঁহাদের বেশ পরিশ্রম হইলে উত্তম স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে সহায়তা করিবে।

মুর্গীখানা উচ্চ ঢালু স্থানে নির্ম্মাণ করিবে যাহাতে নর্দ্দামার ধোয়াট সম্পূর্ণ নিকাস হইয়া দূরে নীত হয় এবং পাখী ঘরের স্বাস্থ্যের সহিত কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করে। বেলে বা কাঁকুরে জমীতে মুর্গীখানা নির্ম্মাণ করিবে এবং প্রত্যেক ২।৩ বৎসর অন্তর সব স্থান পরিবর্ত্তন করিবে এবং বাসা ও খোঁপ গুলি পূতি বিমুক্ত করিবে। বাসাস্থানে যেন বেশ গাছ পালা থাকে যাহাতে পাখীগুলি ছাওয়াতে গ্রীষ্মের ও রৌদ্রের সময় আশ্রয় লইতে পারে। ঘর এমন স্থানে নির্ম্মাণ করিবে যেন বর্ষাতেও যেন জল না বাধে। বাসা গুলিও ঘর দক্ষিণ বা দক্ষিণ পূর্ব্বমুখী নির্ম্মাণ করিবে যাহাতে শীতকালে চৌচাপটে খুব বেশী ও অবিচ্ছিন্ন রৌদ্র পাইতে পারে। ট্র্যাপ-নেষ্ট ব্যবস্থিত থাকিলে বেশী ডিমদাত্রীগণ নির্দ্দেশ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। বাসা ঘরে দাঁড় রাখিবে যাহাতে ধাড়ী পাখীগুলি রাত্রে বসিয়া যাপন করিতে পারে। ঐ ঘরের নিম্নে ১ ইঞ্চি বালী ছড়াইয়া রাখিলে পুরীষ বা লিদ জমিয়া পোকা হইতে পারিবেনা, এই গুলি সময়ে খেতে দিলে খুব ভাল সারের কাজ করিবে। আমাদের দেশের চাষীগণ তাহা জানেন না বা জানিলেও আলস্য বসতঃ কাজ করেন না। পাশ্চাত্য দেশে এই সারের খুব দাম এবং উচ্চ বাজারও আছে। ভারত শিক্ষা হীনতায় সব হারাইয়াছে ও

হারাইতেছে। যে মুর্গী ডিম দিবে শীঘ্র বা ডিম দিতেছে তাহাদের উদ্ভিদ্ খাদ্য দিবে বা ঘাসযুক্ত স্থানে চরিতে দিবে এবং গৃহস্থ্য বাড়ীর কোপীপাতা, আলুর খোসা ইত্যাদি গৃহস্থ্যের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি মুর্গীদের বেশ দেওয়া যাইতে পারে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং পুনশ্চ পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি যে ডিমদাত্রী ও বসিয়ে মুর্গীদের নির্ম্মল জল, প্রচুর খাদ্য, উদ্ভিদ্ ও জান্তব খাদ্য, শুষ্করক্ত কসাই খানা হইতে, মৎস্যের পরিত্যক্ত অংশ, কাঁটা পোঁটা কয়লারগুড়া, হাড়চূর্ণ সদা খোপ বা বাসার নিকট রাখিবে যাহাতে সহজেই খাইতে পারে। যে মুর্গী ডিম দিতেছে তাহাদের সমভাগে মকাচূর্ণ, জই এবং গমচূর্ণ দিবে অথবা তিনভাগ মকাচূর্ণ দুইভাগ জই এবং একভাগ গম অথবা একভাগ জই এবং দুইভাগ মকাচূর্ণ দিবে। মুর্গী প্রথম তিন বৎসরই খুব বেশী ডিমদেয়, সেই জন্য তাহার পর তাহাকে হাটে পাঠাইবে এবং এই সময়ের মধ্যে ভাল সুনির্ব্বাচিত (well balanced) খাদ্য দিবে বড়জাতির মধ্যে প্লিমাউথ রক্গুলিকে ২ বৎসর পর্য্যন্ত রাখিয়া পরে বাজারে পাঠাবে। ডিম বাজারে পাঠাইবার সময় ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় লইয়া যাইবে, যেন রৌদ্র না লাগে; বেশী তীক্ষ্ণ রৌদ্রে ডিম খারাপ হইয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র করকার M. R. A. S. & Co., 31 Elgin Road, Calcutta.

দেশের কথা

১৯১৯-২০ অব্দে মোটের উপর ১৫৭ কোটী টাকার বিদেশী জিনিষ ভারতে আমদানী হয় তন্মধ্যে এক কাপড়ই প্রায় ষাট কোটী টাকার; অর্থাৎ আমদানী জিনিষের মধ্যে কাপড় একা এক-তৃতীয়াংশের অধিক। আমদানী চিনির স্থান তাহার বিদেশী চিনি আমদানী করা হইয়াছিল।

এই দুইটি দ্রব্য স্বদেশে উৎপন্ন হইলে কত টাকাই দেশে থাকিয়া যাইবে।

বিদেশ হইতে কাপড় আমদানী করা হয় বলিয়া ইংলণ্ডের মত জাপানও আমাদের বস্ত্র উৎপাদন ও ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা করিবেই। ইহারা সকলেই ব্যবসায়ের খাতিরে নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলিবেই। জাপান যে প্রকার পণ্য ভারতে চালাইতেছে তাহাতে ইংরেজ বণিকগণও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছেন।

ফিউডেল প্রথা

[শ্রীকুমুদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ]

ভূমিস্বত্বের উপর মধ্যযুগে যে সমাজ-বন্ধন ও শাসন গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাই ফিউডেল প্রথা বলিয়া বিদিত। মধ্যযুগে একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই প্রথা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই প্রথায় তিনটি লক্ষ্যের বিষয়: (১) যে ভূমি সাক্ষাৎভাবে ভোগ দখল করে তাহার তাহাতে মালিকের দাবী (proprietory right) নাই; (২) ভূম্যধিকারীর সঙ্গে পত্তনিদারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক (personal bond); (৩) ভূম্যধিকারীর পত্তনিদারের উপর রাজার ন্যায় ব্যবহারের ক্ষমতা।

দুই রকমেই এই সামাজিক প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল। যখন বর্ব্বর জাতিগণ বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করিতে লাগিল তখন সাধারণতঃ রাজার অংশে ভূমির ভাগ বেশী পড়িত। রাজ্য-বিজয় প্রভৃতি নানাবিধ উপায়েও রাজাও সেই ভূমির পরিমাণ বাড়াইতে সতত চেষ্টা পাইতেন। সরকারি জমির আয় রাজার পদ-গৌরব রক্ষার্থ ও রাজ-অনুগ্রহ প্রদর্শনে ব্যয় হইত। সরকারী জমির অংশ-বিশেষ রাজা তাঁহার অনুগত কর্ম্মচারীদের জায়গীর স্বরূপ প্রদান করিতেন। সাধারণতঃ এই জমির স্থিতিকাল উক্ত কর্ম্মচারীর জীবনকাল পর্য্যন্ত ছিল। শ্যার্লেমানের মৃত্যুর পর যে যুগ আসিল, অনিয়মই যেন তাহার নিয়ম। রাজ-শক্তির প্রভাব খর্ব্ব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ অনুগ্রহ-প্রদত্ত জমি জায়গীরদারদের বংশধরেরা উত্তরাধিকারসূত্রে দাবী করিয়া বসিল। এইরূপে জায়গীর বংশপরম্পরাগত হইতে লাগিল! ইহারা নামে রাজার অধীন ছিল; কিন্তু ইহাদের জমিদারিতে তাহারা রাজ কর্তৃত্ব চালাইতে লাগিল। এই সকল বড় বড় জায়গীরদার আবার তাহাদের ভূমির অংশ বিবিধ লোকের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিত রাজার সঙ্গে তাহাদের যেরূপ সম্পর্ক ছিল এই সকল লোকের সঙ্গেও তাহাদের সম্পর্ক সেইরূপ থাকিত। শ্যার্লেমানের সময়ে যে সকল লর্ড বা জমিদার সীমান্ত রাজ্যে স্থাপিত ছিল, তাহারা তাঁহার মৃত্যুর পরে বিদ্রোহী হইল। ইহারা পরস্পরের সঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় সাধারণ লোকের মহা অনিষ্ট সাধন করিত। এই অনিষ্ট হইতে ও অরাজকতার সুযোগে যে সব বিভিন্ন জাতি আসিয়া উপদ্রব করিত, তাহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমির অধিকারী আপনাদের জমি উক্ত জমিদারদের হস্তে অর্পণ করিয়া, আবার তাহাদের নিকট হইতে ফিরিয়া গ্রহণ করিত। এখন ইহারা যে ভূমিতে বাস করিত, সে ভূমির উপর তাহাদের ভোগ-দখল থাকিলেও, তাহার প্রকৃত মালিক উক্ত জমিদার ছিল। ইহার ফলে ক্ষুদ্র অধিকারীরা জমিদারের কাছে বিপদের সময় ধনপ্রাণ রক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু তাহাদিগকেও আবার জমিদারের কার্য্যে

আত্মনিয়োগ করিতে হইত। এইরূপে যাহারা স্বাধীন ভাবে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ভূমির মালিক ছিল, তাহারা অধীন প্রজায় পরিণত হইল। জমিদারের হস্তে ইহাদের জমি অর্পণের নাম ছিল কমেনডেসন এবং প্রত্যর্পণ প্রথার নাম ছিল সাবইনফিউডেসন্।

প্রধাণতঃ ফিউডেল প্রথার দুইটী ধারা নির্দ্দেশ করা যায়। একটীর প্রচলন কেবল ইংলণ্ডে এবং ইহার গড়ন-কর্ত্তা প্রথম উইলিয়ম্। অন্যটী বাকী সমস্ত ইয়োরোপে চলিয়াছিল। ইয়োরোপ ভূখণ্ডে "অধীন জন" (vessal) আসন্ন প্রভুর বাধ্য ছিল। তাহার রাজার সঙ্গে অথবা স্বীয় প্রভুর উপরিস্থ প্রভুর সমীপে কোন কর্ত্তব্য ছিল না। প্রয়োজন হইলে আসন্ন প্রভুর হইয়া উঁহাদের সঙ্গে যুঝিতেও সে বাধ্য থাকিত। কিন্তু ইংলণ্ডে 'সেলিসবারীতে যে অঙ্গীকার' আদায় করা হয়, তদনুসারে সকলেরই আগে কর্ত্তব্য ছিল দেশের রাজার কাজে,—পরে কর্ত্তব্য আসন্ন প্রভুর নিকট। এ ব্যবস্থানুসারে অধীন জন স্বতঃই রাজার বিপক্ষে নিজ প্রভুর পক্ষ লইয়া লড়িতে প্রস্তুত ছিল না। এই সময়ের ইউরোপীয় সমাজে সকল দিক হইতেই ফিউডেল-বন্ধন "আষ্টে পৃষ্ঠে জড়াইয়া গিয়াছিল। এইরূপেই গির্জ্জা, মঠ, নগর ফিউডেল প্রথার অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্ম্মযাজকেরা তাহাদের বিস্তৃত জমিদারী হইতে নানাজনের মধ্যে জমি বণ্টন করিয়া "প্রভু" আখ্যাত হইতেছিল। ইহারা আবার কোনও ক্ষমতাপন্ন শক্তিশালী লর্ডের রক্ষাধীনে আপনাদিগকে স্থাপন করিত। সময়ে সময়ে ইহারা সৈন্য সাহায্য না করিয়া লর্ড বা তাহার পরিবারবর্গের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক দিন প্রার্থনা করিত। এইরূপে ঐহিকরাজ্য ও ধর্ম্মরাজ্য, এবং ক্ষুদ্র অধীন প্রজা হইতে শক্তিমান্ প্রভু পর্য্যন্ত সকলের দেহেই ফিউডেল প্রথার ছাপ পড়িয়াছিল।

"বয়ন শেষে যাহা হইয়াছিল তাহা আকারে রোমান্ হইলেও, যে সূত্রে ইহার বয়ন কার্য্য শেষ হইয়াছিল, সেই সূত্র টিউটানিক।" ফিউডেল প্রথার তিন দিক জায়গীর, জায়গীরদারের রক্ষণাবেক্ষণ, এবং তাহার উপর রাজার চাল এই তিন বিশিষ্টতার উদ্ভবের পরিচয় হইতে জানিতে পারা যায়।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে রোমক সাম্রাজ্যের অধিকাংশ ভাগই মালিকী স্বত্বে নানাজনের দখলে ছিল; কিন্তু একাদশ শতাব্দীর শেষাংশে সম্ভবতঃ ইহাদের অধিকাংশ ভাগই জায়গীরি স্বত্বে দখলীকৃত হইয়াছিল। কিরূপে এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

লর্ড ও তাহার অধীনতার অঙ্গাঙ্গীভাবের (personaltie) মূল অনুসরণ করিতে গিয়া, কেহ-কেহ ইহাকে টিউটন অধিনায়ক ও তাহার দলের লোকের পরস্পর সম্পর্কের অনুরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার এই যে, ফ্রান্সই ফিউডেল প্রথার উৎপত্তিস্থান। তথায় সরকারী কর্ম্মচারী এবং বড় বড় লোকেরা রাজার নিকট তাহাদের বিশ্বস্ততা প্রভুভক্তির জন্য যেরূপ প্রতিশ্রুতি-পাশে আবদ্ধ হইত, তাহা

অনেকাংশে পূর্ব্বোল্লিখিত জার্ম্মাণ যুদ্ধনায়ক ও তাহার সঙ্গীদের মধ্যে যেরূপ পরস্পর সম্বন্ধ থাকিত তাহার অনুরূপ।

দুই রকমে লর্ডদের রাজ-ক্ষমতাপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। প্রথমে রাজার অবহেলায়, দ্বিতীয় অনধিকার গ্রহণে (by usurpation)। মেরুভিঞ্জিয় ও কেরুলিঞ্জিন শাসকগণ অনেক সময়ে স্বেচ্ছায় বড়-বড় লোককে স্বতন্ত্র করিয়া দিতেন। এই নিমিত্ত তাঁহার বিবিধ সনদ প্রচার করিতেন এবং ইহাতে লর্ডদের ক্ষমতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজ-ক্ষমতার অনেকখানি লাঘব হইত। অনধিকার গ্রহণের বিষয় দৃষ্টান্ত দ্বারা সরল করার প্রয়োজন নাই। এই দুইএর সমবায়ে যে সমাজ গড়িয়া উঠিল, তাহাই ফিউডেল সমাজ বলিয়া কথিত।

ফিউডেল সমাজ মোটামুটিভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) অধীন ও (২) স্বাধীন। স্বাধীন সম্প্রদায় আবার দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত (ক) সম্ভ্রান্ত ও (খ) সাধারণ। সম্ভ্রান্ত শ্রেণী আবার তিন ভাগে বিভক্ত (অ) ব্যারণ (আ) ভ্যাসল (ই) ভদ্রলোক বা squire। সাধারণের আবার দুই শ্রেণী-বিভাগ (অ) যাহারা কাহারো কোন ধার ধারে না, (আ) নিম্নপদস্থ ধর্ম্মযাজকগণ। যাহারা পরাধীন—স্বাতন্ত্রহীন, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত হইলেও, মধ্য যুগের সাধারণ সংজ্ঞা ভিলেন্ বা দাস নামেই তাহাদিগের উল্লেখ করা যাইবে। ইহারা স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় ক্ষেত্র-সংলগ্ন ছিল; এবং উহার বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও হস্তান্তরিত হইত।

জমীদারী-সম্পর্কীয় কাগজ-পত্রের আলোচনা করিয়া পল্ ভিনোগ্রেডফ্ যে ফলাফল পাইয়াছেন, তাহা তিনি এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

বিভিন্ন নাম এবং যেরূপ ভাবে ভূমি ভোগ করা হইত তাহা হইতে দেখা যায়, কোন রকমে ভূমি স্বত্ব ভোগ করা হইত, ভোক্তার সামাজিক পদ-গৌরবের চেয়ে তাহার উপরই বেশী দৃষ্টি থাকিত। একজনের হইতে আর একজনের বিভিন্নতা কোনও আইন-কানুন দ্বারা ঠিক হইত না, ভূমি দখলের উচ্চ নিম্নতায় তাহা সূচিত হইত।

এই দাস-জাতির বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগ এবং নানারূপ দাস কার্য্য ও রীতি হইতে দেখা যায় যে, এই দাস প্রথায় নানারূপ বিভিন্ন ধারা আসিয়া মিশ খাইয়াছে।

প্রভুর সঙ্গে দাসের সম্পর্ক অনেকটা আবহমানকাল প্রচলিত দস্তুরের উপর নির্ভর করিত এবং মধ্যযুগের এই বিশিষ্টতা একদিকে দাসত্ব অপরদিকে স্বাধীনতা হইতে এই ভিলেন্ প্রথার পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছিল।

ফিউডেল প্রথায় একের সঙ্গে অন্যের বাধ্যবাধকতা দুইরকম বাহ্যব্যবহার দ্বারা প্রকটিত হইত; একটা বিশ্বস্ত রহিবার প্রতিজ্ঞা, অপরটা Homage প্রথার দ্বারা পরস্পর সম্বন্ধ অনুসৃত হইত। Homage প্রথা দ্বারা প্রজা প্রভুর নিকট তাহার অধীনতা

স্বীকার করিত। ইহা সম্পাদন করিবার সময়ে প্রজা শূন্য মস্তকে, কোমর বন্ধহীন এবং অস্ত্রশূন্যাবস্থায় নতজানু হইয়া তাহার দুই হস্ত প্রভুর হস্তের মধ্যে রক্ষা করিত; এবং এখন হইতে সে প্রভুরই একজন লোক হইল এই বলিয়া প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইত। এতদনুসারে সে যে জমি পাইত, তাহার বিনিময়ে সমস্ত দেহ, মন ও সম্মান দ্বারা বিশ্বস্ততার সহিত প্রভুর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিত। ইহার পরই বিশ্বস্ত থাকিবার প্রতিজ্ঞা। কিন্তু Homage এর পর ইহার বেশী প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইত না এবং এই কার্য্য প্রতিনিধিদ্বারাই চালান যাইত। আর একটী প্রথা জমি হস্তান্তরের সময় আত্মপ্রকাশ করিত। ইহা দুই প্রকারের—সাধারণ অসাধারণ। প্রথম প্রকারানুযায়ী লর্ড বা তাহার প্রতিনিধি দ্বারা জমি সাক্ষাৎভাবে প্রদত্ত হইত; দ্বিতীয়ানুযায়ী, ভূমির চিহ্নস্বরূপ স্থান—দস্তুর মত দূর্ব্বা পাথর, বৃক্ষশাখা যষ্টি বা আর কিছু প্রদত্ত হইত।

প্রভুর কোনও পরামর্শ প্রকাশ করিয়া দিলে, কাহারও কোনও ছল চাতুরী গোপন করিলে, প্রভুর কোনও প্রকার অনিষ্ট করিলে, অথবা প্রভুর পরিবারের কোনও প্রকার অসম্মান করিলে অবিশ্বাসের কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত; যুদ্ধক্ষেত্রে প্রভু অশ্বচ্যুত হইলে প্রভুকে নিজের অশ্ব দিতে যুদ্ধের সময় তাহার পার্শ্ব রক্ষা করিতে, প্রভু বন্দী হইলে তাহার জামিনস্বরূপ তাহার বিনিময়ে বন্দী হইয়া থাকিতে সে বাধ্য থাকিত। প্রভুর বিচারালয়ে কখনও কেবল দর্শকরূপে, কখনও বিচারকার্য্যে অংশ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সে উপস্থিত থাকিত। কতদিন সে যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিবে তাহার নিয়ম বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ ছিল। লর্ড তাহার অধিনস্থদের নিকট হইতে নানা রকমে অর্থ আদায় করিত। সাবালক যখন বংশপরম্পরা অনুসারে তাহার জমি গ্রহণ করিত, তখন লর্ডকে যে টাকা দিতে হইত, তাহার নাম ছিল (relief)। অধীন যখন তাহার জমি অন্যের নিকট বিক্রয় করিত, তখন তাহাকে জরিমানা স্বরূপ লর্ডকে কিছু দিতে হইত। যখন জমির মালিকের বংশের কেহ বর্ত্তমান না থাকিত, তখন উক্ত জমি লর্ডের অধিকারে আসিত। লর্ড আপনার প্রয়োজন হইলে "সাহার্য্য" স্বরূপ কিছু আদায় করিতে পারিত। ইংলণ্ডে Magna Charta অনুসারে লর্ড তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নাইট্ করিবার সময়, জ্যেষ্ঠা তনয়ার বিবাহ দিবার সময় এবং নিজেকে বন্দী দশা হইতে মুক্ত করিবার কালে "সাহায্য" চাহিতে পারিত।

ইংলণ্ডে ও নর্ম্মণ্ডীতে লর্ড, আপনার "অধীনজন" নাবালক হইলে তাহার অভিভাবক হইতেন। এই অনুষ্ঠান দ্বারা লর্ড উক্ত নাবালকের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইতেন এবং তাহার ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিতেন। লর্ড, তাহার অধীন নাবালক নারী হইলে তাহার স্বামী; এবং পুরুষ হইলে তাহার স্ত্রী ঠিক করিয়া দিতেন। তাহারা যদি নিজেদের ইচ্ছা ও পছন্দমত বিবাহ করিতে চাহিত, তাহা হইলে এই বিবাহে অনুমতি পাইবার জন্য তাহাদের লর্ডকে টাকা দিতে হইত।

শ্যার্লেমানের পরে ফিউডেল প্রথা দ্বারাই ইয়োরোপীয় সমাজ রক্ষা পাইয়াছিল। "ফিউডেল সময়ের বর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী এবং দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাকারই দিনেমার, বেদুইন আরব, ও হাঙ্গেরীয়দের আক্রমণ প্রতিরুদ্ধ করিয়াছিল।" ইহা দ্বারা ফিউডেল সমাজের বিশেষ অধিকার ভোক্তাদের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বিকাশ লাভ করিয়াছিল। ব্যারনদের সহায়তায় কবিতা রোমান্স্ প্রভৃতির শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল। "ইংলণ্ড, ফ্রান্স্ ও জার্ম্মাণীর উৎকৃষ্ট প্রাচীন সাহিত্য এই ফিউডেল যুগেই উৎপন্ন হইয়াছিল।" রমণীর প্রতি সম্মান, দুর্ব্বল ও নিপীড়িতদের রক্ষা প্রভৃতি বীরভাব ফিউডেল প্রথার সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিষ এই বীরভাব লইয়া যাহারা কার্যক্ষেত্রে নামিয়াছিল, তাহারাই পরে নাইট্ বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিত।

কিন্তু ফিউডেল প্রথা জাতীয় জীবন গঠনের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল। ইহা বর্ত্তমান থাকায় কোনও জাতির মধ্যেই আশানুরূপ ক্ষমতাযুক্ত গবর্ণমেণ্ট গঠন সম্ভব হইতে পারিতেছিল না। সমাজ বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত হইয়াছিল এবং সম্পূর্ণরূপে আমাদের বর্ণসমস্যার ন্যায় না হইলেও, ঐ ধরণের একটী সমস্যা ইয়োরোপীয় সমাজে দেখা দিয়াছিল। লর্ডদের সঙ্গে সাধারণ লোকের অতি দূর সম্পর্ক ছিল। উচ্চবংশের লোকের সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর লোকের আকাশ পাতাল পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। এমন কি, যেখানে ফিউডেল প্রথা বর্ত্তমান ছিল না, সেখানেও সম্ভ্রান্ত লোকেরা নানারূপ বিশেষ সুবিধা ভোগ করিত।

ফিউডেল প্রথার প্রধান শত্রু ছিল রাজা ও সাধারণ লোক। রাজা সুবিধা পাইলেই লর্ডদের প্রভাব খর্ব্ব করিতে অগ্রসর হইতেন। প্রয়োজন হইলে তিনি এই বিষয়ে সাধারণ লোকদের সহায়তা গ্রহণ করিতেন। তাহারাও ক্ষমতাপন্ন ও দুর্দ্দান্ত নবাবদের উচ্ছেদ সাধন করিতে পশ্চাৎপদ ছিল না। মধ্যযুগে যে নগর-সংঘ গঠিত হইয়াছিল তাহারাও এই প্রথার বিনাশ সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। যখন ইহারা ধন ও ক্ষমতা-গৌরবে উচ্চস্থান অধিকার করিত, তখনই ইহারা, যে লর্ডদের ভূমিতে তাহারা বাস করিত, তাহাদের সকল রকম আদায় ও অত্যাচারে বাধা প্রদান করিত এবং তাহাদের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিত।

যুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে বর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী নাইট্দের প্রভাব চলিয়া গেল। ইহার ফলে সাধারণ পদাতিক সৈন্যের সঙ্গে উক্ত নাইট্দের কোনই বিভিন্নতা রহিল না। ফিউডেল লর্ডদের দুর্গও এই সকল আগ্নেয়াস্ত্রের নিকট "অতিষ্ঠ" হইল। এইরূপে সকলকে সমান করিয়া (of the same height) বারুদ-আয়ুধ ফিউডেল প্রথার যুদ্ধনীতি সম্পূর্ণরূপে মূল্যহীন ও অনুপযোগী করিল।

ক্রুজেড্ বা ধর্ম্মযুদ্ধেও ফিউডেল প্রথার অনেক ক্ষতি করিয়াছিল। লর্ডরা অনেক সময়ে টাকা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আপনাদের জমি বন্ধক দিয়া বা বিক্রয় করিয়া যাইত। উত্তরাধিকারীর অভাবে অনেক সময়ে তাহাদের জমিজমা রাজার হস্তে গিয়া পড়িয়াছিল।

ফিউডেল প্রথার শাসনরীতি অন্তর্হিত হইলেও, সমাজবন্ধনে ইহা সমস্ত মধ্যযুগেই বর্ত্তমান ছিল। সম্ভ্রান্ত লোকেরা রাজ-ক্ষমতা, হারাইলেও সমাজে নানারূপ শ্রেষ্ঠ অধিকার ভোগ করিত।

ইংলণ্ডে রোজস্এর যুদ্ধে বহু সম্ভ্রান্ত লোকদের বা nobilityর ধ্বংস সাধন হইলে এই প্রথার পতন সংঘটিত হয় (১৪৫৫—১৪৮৫)। ফ্রান্সে সপ্তম চার্লস্ রীতিমত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে সকল সময়ে কার্য্যোপযোগী করিয়া রাখার পর হইতেই (১৪৪৮)। এই প্রথার পতন ঘটে। কিন্তু ১৭৯৮খৃঃ অব্দের বিপ্লবের পূর্ব্বে এই প্রথার সকল রকম জঞ্জাল সেই দেশ হইতে বিদূরিত হয় নাই। স্পেনে ফার্ডিনেণ্ড ও ইজাবেলার হস্তে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফিউডেল কুলীন সম্প্রদায় তাহাদের মৃত্যু পরোয়ানা পাইয়াছিল। আজকাল ভারতের জমিদার ও প্রজার আইনের সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে। প্রজা এখন খাজানা দিয়াই খালাস—জমিদারকে খাজানা ফাঁকি দিবার জন্য কেবলই আইনের ফাঁক খুঁজিতে থাকে। জমিদারও প্রজাকে আইনের নাগপাশে বাঁধিতে চাহেন এবং কলে কৌশলে প্রজাকে পেষণ করিতে পারিলে ছাড়েন না। আজকালকার কালে খাজানা আদায় করিয়া সরকারী রাজস্ব দিয়া যাহা থাকে তাহাতে জমিদারগণের কুলায় না ; তাই তাঁহারা দুপয়সা বাজে আদায়ের চেষ্টা করেন। জমিদারগণের অবস্থা হইয়াছে সরকারী রাজস্ব আদায়কারী এজেণ্টের মত। অনেক সময় বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে প্রজাপীড়ন করিতে হয়।

প্রজা জমিদারে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাহা এখন প্রায়ই দেখা যায় না। জমিদার ছিলেন আগে মণ্ডলেশ্বর একজন জমিদারকে অবলম্বন করিয়া এক একটি মণ্ডল গড়িয়া উঠিত। প্রজাগণ আপদেবিপদে পূজা পার্ব্বণে জমিদারে সহায়। তাঁহারা প্রজার মা-বাপ ছিলেন। তখনকার জমিদারের লোক বল ছিল। তাঁহারা প্রজাগণের নায়ক-ছিলেন। অনেকটা ফিউডেল প্রথার মত। আইনের বলে সবই স্বাধীন—কেহ কাহাকেও মানিতে চায় না।

জমিদারগণ যদি পূর্ব্বপ্রথা অনুসরণ করিয়া নিজ নিজ জমিদারীর উন্নতি করেন এবং প্রজাগণের অন্নবস্ত্রের পানীয় জলের সংস্থান করিয়া দেন এবং প্রজাগণ আইন সঙ্গত ধার্য্য কর অপেক্ষা জমিদারের আবশ্যকতানুযায়ী অধিককর যোগান তবে পরস্পরের মধ্যে আবার সখ্যতা স্থাপিত হইতে পারে। প্রজা যদি একগুণের স্থানে দশগুণ ফসল উৎপন্ন করিতে এবং তাহা যদি জমিদারের সাহায্য দ্বারা সম্ভব হয় তবে প্রজারা জমিদারকে তাহার ন্যায্য দাবী হইতে বঞ্চিত করিবেক ? প্রজা জমিদার একযোগে কাজ করিলে সর্ব্বশক্তি বাড়িবে এবং তাহাতে উভয়ের কল্যাণ হইবে।

(ভারতবর্ষ)।

আষাঢ়, ১৩২৮ সাল।

ভারতে লেবুর চাষ

ভারতে নানা জাতীয় লেবুর (citrus) জন্মিয়া থাকে। এই লেবুর আবাদের কতদূর পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে এবং তাহাতে কতটা উপকার হইবে তাহা আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে চাই। লেবু হইতে উৎপন্ন এসিড (acid) এবং অন্য দ্রব্য আমরা বিদেশ হইতে আমদানী করি। এই আমদানী কম করিয়া দেশে লেবুজাত ভাল দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিলে নিশ্চয়ই অনেক লাভ হয়।

ভারতের বিভিন্ন জল হাওয়ায় ও মাটিতে নানাজাতীয় লেবুর আবাদ হইয়া থাকে এবং তাহাদের প্রসার বৃদ্ধি করা যাইতে পারে এবং যে সমস্ত লেবু অযত্নে নষ্ট হয় সে গুলি সংরক্ষণ এবং তজ্জাত দ্রব্য অধিকমাত্রায় উৎপন্ন করিতে পারিলে আমরা কার্য্যকারিতার দিক দিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারি।

লেবুর আচার, লেবুর মোরব্বা ইহা কত অধিক মাত্রায় বিক্রয় হইতে পারে তাহার পরিমাণ করা যায় না এবং বর্ত্তমান সময়ে ঐ সকল দ্রব্য সমাধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইলেও তাহা বিকাইবে।

এ'ত হইল কেবল সংরক্ষিত ফলের কথা, লেবু হইতে এসিডাদি যাহা উৎপন্ন হয় তাহার কাট্‌তি অতি বিস্তর। মিষ্টি ও অমিষ্ট লেবুর রস, সাইট্রিক এসিড (citric acid), জমান এসিড (Crystals) এবং লাইম সাইট্রেটের (Cytrate of Lime) অতি মাত্রায় প্রয়োজন। অনেকেই হয়ত জানেন না যে সাইট্রেট লাইম ধোলাই কার্য্যে বিশেষ আবশ্যক। সামান্য খরচে এই সমস্ত প্রস্তুত হইতে পারে এবং যাঁহারা কুটীর শিল্প প্রচলন জন্য মাথা ঘামাইতেছেন তাঁহাদের এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য করা উচিত। কৃষি-

বিভাগের দ্বারা, কৃষি-কার্য্যে লিপ্ত কর্ম্মচারিগণের দ্বারা কৃষি জাত দ্রব্য হইতে কি উৎপন্ন হইতে পারে, না পারে তদ্বিষয়ে বহুতর পরামর্শ পাইতে পারেন। আমরা এই সকল বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতেছি কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে দেশের সাড়া এদিক দিয়া পাওয়া যাইতেছে না। ভারতীয় কৃষি সমিতির ধলভূমগড় কৃষি-আবাস স্থাপনের চেষ্টা এই প্রকার কার্য্যের অনুকূল হইবে, কিন্তু দেশের লোকের বিশেষতঃ দেশের নায়কগণের তাদৃশ আগ্রহত আমরা অনুভব করিতে পারিতেছি না। ভারতীয় কৃষি-সমিতি ২৫ বৎসর যাবত কৃষি ও উদ্যানতত্ত্ব আলোচনায় নিযুক্ত আছেন, দেশ নায়ক গণ দেশটাকে নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিতে বাসনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা দেশের কোথায় কি আছে তাহা সামান্য পত্র ব্যবহার দ্বারও খোঁজ লইতে উৎসুক নহেন—ইহা বড় পরিতাপের বিষয়।

উদ্যান পালকগণ, সামান্য চাষীগণ ফল সংরক্ষণ, রস ও এসিড প্রস্তুত করণ শিখিতে পারে, সামান্য খরচে ঐ সকল প্রস্তুত হইতে পারে। দেশের নায়কগণের সহায়তা পাইলে তাহাদিগকে ঐ সকল শিল্প শিখাইবার ব্যবস্থা করা দুরুহ হইবে না। পাতী, কাগজী, চিনের কাগজী, টক সরবতী, গোঁড়া প্রভৃতি লেবুর প্রচুর রস হয়। ইহাদের রসরক্ষা করা যাইতে পারে এবং ইহাদের রস হইতে এসিড ভাল হয়। এসিড তৈয়ার পক্ষে পাতি ও টক সরবতী লেবুই প্রশস্ত। মিঠা সরবতী, কলম্বা, এলাচি, কমলা, সাত্রা মোরব্বা প্রস্তুতের বিশেষ উপযোগী। আচার, মোরব্বা বা জারক প্রস্তুত করিতেও পাতি লেবু অদ্বিতীয়। সাধারণতঃ ইহা বলিলে যথেষ্ট হইবে আচার, এসিড, জারক তৈয়ার করিতে টক রসাত্মক লেবুর ব্যবহার হওয়া অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

ভারতের সর্ব্বত্রই লেবু গাছ জন্মিয়া থাকে কিন্তু বিভিন্ন জাতীয় লেবুর এক একটা নিজস্ব স্থান আছে। বাঙলায় কাগজী, সরবতী, গোঁড়া প্রভৃতি লেবু যেমন জন্মায় এমন আর কোথাও হয় না। কাগজী লেবুর রস উৎকট টক নহে এবং এমন একটু গন্ধ আছে যে সকলেই সরবতের সহিত এবং ভাতের তরকারিতে ইহা ব্যবহার করে। কচি অবস্থা হইতে ইহার ব্যবহার আরম্ভ হয়, কচি কালে ইহার গন্ধ আরও সুমধুর। পুষ্ট ফলের কাটতিও অজস্র।

পার্ব্বত্য প্রদেশে কমলা ভাল জন্মিয়া থাকে—বাঙলার চট্টগ্রামের পর্ব্বতে, আসামে ও দার্জ্জিলিঙে, সিলঙে, মান্দ্রাজের নিলগিরি পর্ব্বতে ও মালাবার উপকূলে মধ্য প্রদেশ কমলা খুব সহজে ও সচ্ছন্দে জন্মিয়া থাকে। আসাম দার্জ্জিলিঙ প্রভৃতির জায়গার কমলা তত ভাল নহে কিন্তু সিলেটের কমলা, নাগপুরের সাত্রা, মান্দ্রাজ নিলগিরি কমলার খ্যাতি অতিশয়।

সিংহভূমের পার্ব্বত্য অঞ্চলে ইহা সুন্দর জন্মিতে পারে। কাশী, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানের পাতি বিখ্যাত। এই পাতি লেবুর চাষ সিংহভূমে (ধলভূমে) হইতে পারে।

বাঙলার কিন্তু পাতি ভাল হয় না—বাঙলায় উহার খোসা পুরু হয় এবং রস অল্প হয় কিন্তু কাগজী সরবতীর রস প্রচুর হয়।

যেখানে ভাল মাটী আছে, যেখানে প্রচুর বারিপাত হয় সেখানে লেবু গাছ ভাল হয়। ৬০ হইতে ১০০ ইঞ্চি বারিবর্ষণ যেখানে হয় সেখানে লেবু জন্মে ভাল। বৃষ্টি জল না পাইলে সেচের জলেও ইহাদের আবাদ করা যাইতে পারে।

ইহার আবাদের জন্য ভাল কাদা দোঁয়াস মাটি আবশ্যক যে জমিতে জান্তব ও উদ্ভিজ্জসার প্রচুর আছে এমন জমি হইলে আরও ভাল। চুণে মেটেল জমিতেও ইহারা সচ্ছন্দে জন্মিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের জ্ঞানে আমরা বুঝিয়াছি যে উপযুক্ত সার ব্যবহার দ্বারা যে কোন জমিতে লেবু উৎপাদন করা কঠিন নহে।

সিংভূমে কুলী কামিন সস্তা। উপযুক্ত লাঙ্গলাদি কৃষি যন্ত্রদ্বারা জমি তৈয়ারি করিয়া লইয়া ইহার আবাদে প্রবৃত্তি হইলে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী।

জল বসা জায়গায় লেবুর আবাদ হয় না—জমি চাষের সময় জমির জল নিকাশি পয়োনালাদি ঠিক করিয়া লইতে হইবে। একটু যত্ন করিয়া আবাদ করিলে এবং আবাদ রক্ষার জন্য আন্তরিক চেষ্টা থাকিলে ইহার আবাদে পয়সা আসিবেই আসিবে। গাছ-গুলি যতদিন ছোট থাকে ততদিন লেবুর বাগানে শণ বঞ্চের আবাদ করিয়া জমির সারবত্তা বৃদ্ধিকরা যায়। পরে এবং সর্ব্ব কালেই আবশ্যক বুঝিয়া অন্য সারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। গাছ গুলি শীঘ্র ফলবান করিতে হইলে বিশেষ তদ্বিরের প্রয়োজন।

আমরা অনেকবার বলিয়াছি যে সামান্য ভুলের জন্য ফলের আবাদের বিষম ক্ষতি হয়। ফলের কেন শস্যের আবাদেরও সমান ভাবে ক্ষতি হয় তবে তফাৎ—শস্যের সময় সদ্য বৎসরেই ভুল ধরা পড়ে কিন্তু ফলের আবাদে কালে ৩।৪।৫ বৎসর কালে তবে দোষ গুণ জানিতে পারা যায়। তাই আমরা বলি হয় নিজে বীজ বা গাছ সংগ্রহ করিবে না হয় বিশ্বাসী স্থান হইতে উহা কিনিবে। নিজে ভাল গাছ হইতে কলম করিয়া লওয়া অপেক্ষা ভাল আর নাই কিন্তু ইহা সকল সময় সম্ভব হইবে না সেই জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির উপর এই ভারার্পণ ভিন্ন গতি নাই। সস্তায় মজিয়া যাওয়া আমাদের দেশের লোকের ব্যায়ারাম; যাহা আপাততঃ সস্তা তাহা খারাপ হইলে মহা দুর্ম্মূল্য এ কথা সর্ব্বদাই মনে রাখা কর্ত্তব্য। সস্তায় ভাল জিনিষ পাওয়া একবারে অসম্ভব না হইলেও কঠিন, এই দুর্ম্মূল্যের যুগে তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তাই আমরা পুনঃ পুনঃ সাবধান করিতে চাই যে পোকা ধরা গাছ কিম্বা নিকৃষ্ট জাতীয় ফলের গাছ লইয়া বৃথা অর্থ ও সামর্থ নষ্ট করিবেন না।

যদি কমলার আবাদ করিতে চান তবে সিলেটের কমলার ও নাগপুরের সান্ত্রার ভাল কলম লইয়া আবাদ করা নিতান্ত প্রয়োজন। কাশীর পাতি, বাঙলার কাগজী লেবু খুঁজিয়া লইবেন। অন্য লেবুগাছ যেখানে যেমন অবশ্যক বুঝিবেন লইবেন। চাষ আবাদ

সম্বন্ধে লোককে ঠিক পথে লইয়া যাইবার জন্য ভারতীয় কৃষি-সমিতি (Indian Gardening Association) স্থাপিত হইয়াছে। চাষ আবাদ সম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট হইতে পরামর্শ লওয়া আমরা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি। গভর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগ আছে সেখান হইতেও সদুপদেশ পাইতে পারেন।

এই সামান্য প্রবন্ধে অধিক খবর দেওয়া সম্ভব নহে—ইঙ্গিতে দুই চারিটি কথা বলা মাত্র। এক প্রকার লেবু আছে যাহার খোসা এক প্রকার মোরব্বা প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার হইতে পারে। কমলার খোসাও মিষ্টান্ন সুগন্ধ করিতে আবশ্যক। মোরব্বা প্রস্তুতেও ইহা ব্যবহার করা যায়। ঐ বিশেষ লেবুটির নাম সাইট্রস মেডিকা Citrus madica sp.। ইহার রস পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে—ইহার ১ গ্যালন (৫ সের) রসে ৭॥ আউন্স এসিড প্রস্তুত হইতে পারে। সাইট্রস্ মেডিকা লেবুর বহু প্রচলন নাই—কিন্তু পাতি লেবু ইহার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়া আমরা সমান ফলই পাইতে পারি। টকরস লেবু যাহাকে সচরাচর লইম (Lime) বলে তাহা সাইট্রিক এসিড (Citric Acid) প্রস্তুতে বিশেষ উপযোগী—ইহাতে এসিডের মাত্রা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

এখন একটা বিশেষ খবর বলি—যেখানে বারিপাত অধিক হয় সেখানে লেবুর রসে এসিডের মাত্রা কম হয়; যেখানে বারিপাত কম—সেখানে রসে এসিডের অনুপাত বেশী দেখা যায়। শীত কিম্বা গ্রীষ্মকালে রসে এসিডের মাত্রা বাড়িয়া থাকে। বর্ষায় যদি এক গ্যালন রসে ১০ আউন্স এসিড জন্মায় তাহা হইলে শীত কালে নিশ্চয়ই সম পরিমাণ রস হইতে ১৪ আউন্স এসিড পাওয়া যাইবে। ফলে রসের মাত্রা কম বেশী জমির উর্ব্বরতা, আবাদের পারিপাট্যের উপর নির্ভর করে।

সাধারণতঃ লেবুর গুল কলম হয় কিন্তু চোক কলম করাই প্রশস্থ। যে সকল লেবু গাছের বাড় বৃদ্ধি অধিক সেই সকল গাছেই চোক বসাইতে হয়। মূল গাছটি বলবান হইলে কলমটি বলবান হইবে, ফলে, ফল বড় রসাল ও প্রচুর হইবে, এমনকি মূলের জোর সমধিক থাকিলে রসেও এসিডের মাত্রা অধিক হয় এবং লেবুর খোসা হইতে তৈল সমধিক পরিমানে পাওয়া যায়। এই জন্যই ত সাবধান আগেই হইতে হয় এবং যেখান সেখান হইতে কলম সংগ্রহ করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে।

লেবুর আবাদ করিবার পূর্ব্বে ভাবিয়া লইতে হইবে যে এক বিঘা জমি হইতে কেমন করিয়া অধিক মাত্রায় সাইট্রিক এসিড, কত রস, কি পরিমাণই বা তৈল পাওয়া যাইবে। গোড়ায় গলদ না হয় যাহা আর শোধরাণ যাইবে না। কিন্তু এত কথা ভাবিবার কি সময় আমদের আছে—আমরা হৈ-চৈ করিতে পটু কিন্তু কাজটি কাজের মত করিয়া করা অভ্যাস আমরা একেবারে হারাইয়াছি। একটা উদাহরণ দিয়া কাজের গুরুত্বটা বুঝাইব—একটা গাছে যদি ২০০০ লেবু পাই তাহা হইলে একটা

গাছ হইতেই আমার ১০ আঃ এসিড উৎপন্ন হইবে সেস্থলে যদি আমি ২০০ মাত্র লেবু পাই তবে আমার সমূহ লোকসান নহে কি ?

লেবুর প্রসঙ্গে আমরা বাতাবী লেবু নামোল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না। ইহার রস রক্ষা করা সম্ভব নহে বা তাহাতে লাভ নাই বা ইহার রসে এসিড প্রস্তুত হইবে না। কিন্তু ফল হিসাবে ইহা একটি বিশিষ্ট আহার্য্য ফল ; ইহার এক একটা দুই তিন আনা দরে বাজারে বিক্রয় হয়। সুপক্ক অবস্থায় পাড়িলেও ইহা অনেক দিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে এই কারণে দূর দেশে পাঠাইতে সুবিধাজনক। ইহার খোসায় তৈল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় বাতাবী বেশ জন্মিতে দেখা যায়, ফলও বেশ রসাল হয়। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলের লেবুর খোসায় তৈল ভাগ অপেক্ষাকৃত অধিক। বাতাবী অনেক রকমের আছে, ভাল মন্দ বাছিয়া আবাদ করিতে হয়। যাহার খোসা পাতলা, শস্য অধিক কোয়া নরম রসাল ও মিষ্ট এমন লেবু চাই ; বাছাইয়ের ইহাই তাৎপর্য্য। চেহারা ভাল এমন জাতীয় কলম পাইয়াই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নহে। যে তোমাকে অকপটে ভিতরের খবর বলিবে তার নিকট যাওয়াই তোমার লাভ।

সকলেই লাভ খতাইয়া তবে কাজে নামে—এই লেবু চাষে লাভ কি অনেকেই হয়ত জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবেন। লাভ লোকসানের সঠিক খবর দেওয়া বড় সহজ নহে। অনেক কারণের উপর ইহা নির্ভর করে ১ম উপযুক্ত জমি চাই, ২য় অনুকূল জলহাওয়া চাই, ৩য় বৃষ্টি বা সেচের জলের সুবিধা চাই, ৪র্থ তোমার সামর্থ—তুমি যে পরিমাণে উদ্যোগী হইবে এবং যে পরিমাণ প্রয়োজনমত অর্থ ব্যয়ে তোমার সামর্থ থাকিবে। এইটিই আসল কথা। সকলদিক বিচার করিয়া, উপযুক্ত পরামর্শ লইয়া তবে কাজে নামা উচিত নতুবা সফলকাম হইবে না। আর এক বিষম বিপদ এই যে তুমিত ঠকিবে, সেটা নিজের দোষে কিন্তু নিজের দোষ গোপন করিয়া লোকের মনে ধারণা জন্মিয়া দিবে যে ওসব কাজে লাভ হয় না, ইহাতে দশের অনিষ্ট হইবে।

দেশের অধিকাংশ লোককে চাষাবাদের কাজে মন দিতেই হইবে তুমি ফট্‌কা ব্যবসায় ধড়িধক্কা লাভে অর্থ রোজগারের সুযোগ পাইতে পার কিন্তু সে সুযোগ সকলের ঘটে না বা তাতে দেশের বিশেষ কি লাভ আছে ?

একটা কথা আমরা মোটের উপর খুব সাহস করিয়া বলিতে পারি যে এক বিঘা একটা লেবুর আবাদ হইতে আমরা ন্যূনকল্পে খরচবাদে ১০০৲ টাকা লাভ করিতে পারি। বহু বহু কারবারি এত পরিশ্রমের এই ফল শুনিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিবেন কিন্তু তাঁদের অবজ্ঞা কষ্টি পাথরে কসা খাঁটি জিনিষ নহে। তাঁদের মোটালাভ এবং মোটা লোকসান আমাদের আলোচ্য নহে। তাঁদের লাভ ক্ষতিতে দেশের কিছু আসিবে যাইবে না। আমাদের কথা প্রমাণের জন্য মান্দ্রাজ কৃষিসভায় অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

It is estimated that given proper cultivatien and pruntIng each tree should give an avarage of 5 dozen perfect fruits the same season, which, considering the excellent varities and the advantageous market conditions, would have sold at 8 annas per dozen or Rs. 2-8-0 per tree and this on over 700 trees, or roughly 7 acres or say, Rs. 250 an acre. Allowing Rs. 100 an acre for cultivation, manure, atc., and cost of marketing the crop it would have left Rs. 150 an acre clear. Had those trees been properly cared for and Rs. 100 an acre spent annually on cultivation, pruning manure, they would have, at 9-years old, given considerably 500 fruits per tree, and this is what I consider to be a fair avarage crop on well cared for trees under general Indian conditions for oranges, lemons citrons, etc. Limes of course bear much heavier crops, and owing to their being planted 15'×15' apart which would allow them ample room even on the best of soils and give 193 trees per acre, I have seen trees which gave an annual crop of between three and five thousand limes of good size. As to the prices obtainable for fruit in different districts, much depends on the market facilities on each plantation; it is impossible to give anything like an accurate statement as to possible profits in each district. But the figures I have given will, I think, enable any one interested in the subject to from a fair idea on this point. Unfortunately I am unable to go into details of this m nufacture and sale prices etc., of citric acid in such a short paper as this must be. There are other aspects of citrus culture, such as the preservation of fruit by the sweating process and allied subjects, which I fear, must be left out of this paper, also through lack of time.

বাগানের মাসিক কার্য্য

শ্রাবণ মাস।

সব্জীবাগান—এই সময় শাকাদি সীম, ঝিঙ্গে, লঙ্কা, শসা, লাউ, বিলাতী ও দেশী কুমড়া পুঁই, বরবটি, বেগুন, শাঁকালু, টেঁপারি প্রভৃতি, পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই শালগম, ইত্যাদি দেশী সব্জী ক্রমান্বয়ে বপন করিতে হইবে।

পালম শাক ও টমাটোর জলদি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতী সব্জী বীজ—জল্দি বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতি বপনের এখনও সময় হয় নাই।

এ বৎসর বর্ষা জলদি, তথাপি মোকাই (ছোট) এবং দে-ধান চাষের এখনও সময় যায় নাই।

ফুল বাগিচা—দোপাটি, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা;) এমারন্থাস, কক্সকোম্ব আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম, (sun-flower) মার্টিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুল বীজ লাগাইবার সময় এখনও গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাত্‌লা করিয়া তাহা হইতে দুই একটী গাছ লইয়া অন্যত্র রোপন করিয়া নূতন ঝাড় তৈয়ারি করা যায়।

গোলাপ, জবা, বেল, যুঁই প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষের কলম অর্থাৎ ডাল কটিং করিয়া পুতিয়া চারা তৈয়ারি করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলি, যুঁই, বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ক্যানা, লিলি প্রভৃতির পট বা গামলা বদ্‌লাইবার সময় বর্ষারম্ভ, কেহ কেহ সময় না পাইলে আষাঢ় শ্রাবন পর্য্যন্ত এই কার্য্য শেষ করেন। মূলজ ফুল গাছের মূল বর্ষায় বসাইয়া তাহাদের বংশবৃদ্ধি করিয়া লইতে হয়। কংকগুলির মূল বর্ষাকালে গামলায় তুলিয়া না রাখিলে জল বসিয়া পচিয়া যায়। ডালিয়া এই শ্রেণীভুক্ত।

কলিয়স, ক্রোটন, আমারান্থাস, একালিফা, প্রভৃতির ডাল কাটিয়া পুতিয়া এই সময় বসাইতে পারা যায়।

ফলের বাগান—আম, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ এখন বসাইতে পারা যায়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে, কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন ঘন ঘন বৃষ্টি হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়। কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া গাছ মারা না যায়। আম, লিচু, কুল, পীচ ও নানাপ্রকার লেবু গাছের গুল কলম করিতে আর কাল-বিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এখনও কলম করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রথার কলম করাকে লেয়ারিং (layering) করা বলে।

আনারসের গাছের ফেঁকড়িগুলি ভাঙ্গিয়া বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পীচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফল গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ারী করিতে হয়। পেঁপের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

ভরা বর্ষতেই পেঁপে বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু চারা তৈয়ারী করিয়া ভাদ্রমাসের আগেই চারা নাড়িয়া না পুতিলে ভাদ্রমাসের রৌদ্রে চারা বাঁচান দায় এবং জমিতে ঘাস পাতা পচানি হেতু জমি অম্লাক্ত হওয়ায় তখন চারার অনিষ্ট হয়। চারাগুলি তিন চারি পাতা হইলে, যখন বৃষ্টি হইতে থাকে তখন নাড়িয়া বসান উচিত।

শস্যক্ষেত্র—কৃষকের এখন বড় মরসুম। বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কতক স্থানের কৃষকেরা এখন আমন ধানের আবাদ লইয়া বড় ব্যস্ত। পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থানে পাট কাটা হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার দক্ষিনাংশে পাট নাবি হয়। ধান্য রোপণ শ্রাবনের শেষে শেষ হইয়া যাইবে। আষাড় মাসে ধান্য রোপণের

উপযুক্ত সময়। বর্ষারম্ভ হইলেই বীজতলাতে ধান বুনিয়া বীজধান (ধান্য চারা) তৈয়ারি করিয়া লইতে হয়।

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বৃষ্টির জল খাওয়াইবার এই সময়। কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ায় মাটি বিচালিত করা কর্ত্তব্য। সুপারি গাছের গোড়ায় এই সময়ে গোবর মাটি দিতে হয়। এই সময়ে ঐ সকল গাছের গোড়ায় সামান্য পরিমাণ কাঁচা গোবর দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা! ফলের গাছে হাঁড়ের গুঁড়া এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ যথা, শিশু, সেগুণ, মেহগ্নি, খদির, রাধাচুড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় আবশ্যক।

বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন আবশ্যক।

সব্জী ক্ষেতে জল না জমে সে বিষয় দৃষ্টি রাখা ও ক্ষেতের পয়নালা ঠিক করিয়া রাখা এই সময় বপন আবশ্যক।

যদি দেখিতে পাও, কোন লতা গুল্মের গোড়ায় অনবরত অত্যধিক জল বসিয়া ক্ষতি হইতেছে, তাহা হইলে তাহার আইল ভাঙ্গিয়া দিয়া এরূপে নালা কাটাইয়া দিবে যেন শীঘ্র গাছের গোড়া হইতে জল সরিয়া যায়। কলার তেউড় এমাসে পুতিলেও চলিতে পারে। বেগুণ, আদা ও হলুদের জমি পরিষ্কার করিয়া গোড়ায় মাটি ধরাইয়া দিবে। আখের গাছের কতকগুলি পাতা ভাঙ্গিয়া আর কতকগুলি তাহার গায়ে জড়াইয়া দিবে। গাছগুলি যখন বেশ বড় হইয়া উঠিবে তখন নিকটস্থ চারি গাছা আখ একত্রে বাঁধিয়া দিবে, নহিলে বাতাসে গাছ হেলিয়া পড়িবে কিম্বা ভাঙ্গিয়া যাইবে। যে স্থানে সর্ব্বদা রৌদ্র পায়, সেই স্থানের উত্তমরূপে চাব দেওয়া জমিতে সারি করিয়া লঙ্কার চারা পুতিবে। এই মাসের প্রথম পনর দিনের মধ্যে লঙ্কা পুতিতে হইবে, নচেৎ গাছ ও ফল ভাল হয় না। রৌদ্র না পাইলে লঙ্কার ঝাল হয় না। যে দোয়াঁস মাটিতে বালির অংশ কিছু বেশী আছে সেইরূপ জমিতে এক কি দেড় হাত অন্তর দাঁড়া বাঁধিয়া ঐ দাঁড়ার উপর আধ হাত অন্তর দুইটী করিয়া শাঁক আলুর বীজ পুতিবে। শাঁক আলুর ক্ষেত সর্ব্বদা আগা ও পরিষ্কার রাখিবে। এই মাসের শেষ কিম্বা ভাদ্রের প্রথমে আউস ধান কাটে।

বাগানের বেড়া—যাঁহারা বেড়ার বীজের দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন। এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাঁছগুলি দস্তুরমত গজাইতে পারে। চিরস্থায়ী বেড়ার জন্য অনেকে ডুরোণ্টা বা মেহদী, ত্রিপত্রা বা চিতার বেড়া দেন। ড়াল পুতিয়া হউক বা বীজ ছড়াইয়া হউক বেড়া প্রস্তুত করিতে হইলে বর্ষাকালই উপযুক্ত সময়। জ্যৈষ্ঠ হইতে এই বিষয়ে যত্নবান হইতে হয়, শ্রাবণ পর্য্যন্ত চেষ্টায় বিরত হইতে নাই। পচা ভাদ্রে বা নিতান্ত শীত কিম্বা গ্রীষ্মে বেড়া প্রস্তুত করা চলে না।

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

২২শ খণ্ড। { শ্রাবণ, ১৩২৮ সাল। } ৪র্থ সংখ্যা।

বীজ-নির্ব্বাচন

(Seed Selection)

জমির গুণাগুণ অনুযায়ী ফসল যেরূপ ভাল ও মন্দ হয়, সেইরূপ বীজের উৎকর্ষ ও অপকর্ষের জন্যও শস্য বেশী কম হইয়া থাকে। শস্যের ভালমন্দ অনেকটা বীজের উপর নির্ভর করে, কারণ বীজ ভাল না হইলে শস্য কোন ক্রমেই ভাল হইতে পারে না। অতএব উত্তম ফসল জন্মাইতে হইলে উৎকৃষ্ট নির্ব্বাচিত বীজদ্বারা আবাদ করা উচিত। ভাল বীজ নির্ব্বাচন করা যদিও কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ তথাপি লাভজনক। ভাল বীজে বেশী ফসল জন্মাইতে পারে; সুতরাং ভাল বীজের মূল্যও অধিক হয়। আমরা এবিষয়ে বহুপরীক্ষা (Demonstration) করিয়া দেখিয়াছি। 'নির্ব্বাচিত' ও 'অনির্ব্বাচিত' একজাতীয় বীজ একই জমি সমান দুই ভাগ করিয়া, একভাগে নির্ব্বাচিত ও অপরভাগে অনির্ব্বাচিত বীজ একই সময়ে এক প্রণালীতে বপন করিয়া ও যথাসময়ে উভয়দিকের ফসল কর্ত্তন করিয়া দেখা গিয়াছে যে, নির্ব্বাচিত বীজের ফসল অনির্ব্বাচিত বীজের ফসল অপেক্ষা পরিমাণে বেশী সুতরাং মূল্যও অধিক। দ্বিতীয়তঃ নির্ব্বাচিত বীজ অনির্ব্বাচিত বীজ অপেক্ষা পরিমাণে কম লাগে।

বীজ নির্ব্বাচনের প্রণালী

অতএব বীজ নির্ব্বাচন করা সকল কৃষিজীবিরই কর্ত্তব্য। এবিষয়ে নিম্নে কিছু ব্যক্ত করা গেল। অনেকের ধারণা আছে বীজগুলি দেখিতে ভাল হইলেই উৎকৃষ্ট, ইহা কেবল ভুল ধারণামাত্র। বীজ নির্ব্বাচন অর্থ:—বীজগুলি যে কেবল দেখিতেই ভাল হইবে তাহা নহে; অন্যান্য যে সকল গুণদ্বারা ফসল ভালজন্মে তাহাও থাকা দরকার। (অর্থাৎ যে বীজদ্বারা আবাদ করিলে উত্তম ফসল লাভ করা যায় সেইরূপ বীজ নির্দ্দেশ করতঃ বাছিয়া লওয়াকেই বীজনির্ব্বাচন কহে)। কোন বীজে ভাল ফসল জন্মিবে, তাহা বীজ দেখিয়া ঠিককরা দুরূহ। অতএব প্রথমতঃ বীজনির্ব্বাচন না করিয়া বীজের জন্য উত্তম ফসলের গাছ নির্ব্বাচন করতঃ ঐ গাছ হইতে বীজ সংগ্রহ করিবে। তাহা হইলেই প্রকৃত বীজনির্ব্বাচন হইবে। বীজনির্ব্বাচনের কোন সহজ ধারাবাহিক প্রণালী

নাই। বিভিন্ন জাতীয় ফসলের বিভিন্ন প্রকারের উৎকর্ষ দেখিয়া বীজ নির্ব্বাচন করিতে হয়, তবে মোটের উপর যে সকল গাছ হইতে বীজ সংগ্রহ করিতে হয়, সেই গাছগুলি সুস্থ, সবল, কীটশূন্য ও বীজগুলি পরিপক্ক হওয়া দরকার। উক্ত নিয়মটি সকল ফসলের বীজনির্ব্বাচনের সময়ে মনে রাখা কর্ত্তব্য। একএক জাতীয় ফসলের বীজ নির্ব্বাচনের সময়ে একএকদিকে বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিতে হয়। যেমন :—ধানের বীজনির্ব্বাচনে, ফলন (ধান), পাটেরবীজ নির্ব্বাচনে, গাছ ; (আঁশ), তামাকের বীজনির্ব্বাচনে, পাতারদিকে বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিতে হইবে—অবশ্য অন্যান্য বিষয়েও লক্ষ্য রাখিতে হয়। কীটদষ্ট, দুর্ব্বল, অপুষ্ট বা রোগাক্রান্ত গাছের বীজ সংগ্রহ করা উচিত নহে। কারণ, পিতামাতার দোষগুণ যেমন সন্তানে বর্ত্তে সেইরূপ বীজের দোষগুণ ও ফসলে লক্ষিত হয়। যথা—কীটদষ্ট বা টক আমের বীজোৎপন্ন গাছের ফলও তদ্রূপ হয়। আমরা যে ফসলের যে গুণসমূহের জন্য উৎকৃষ্ট মনে করি, সেই ফসলের সেইরূপ উৎকর্ষের দিকে বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিয়া বীজনির্ব্বাচন করিতে হয়। যেমন—ধান।

ধান

আমরা ইহার কি গুণ চাই ? আমরা চাই ইহার ফলন বেশী ; চিটাকম ; ঝড়া না হয় ও গাছগুলি দণ্ডায়মান থাকে। অতএব ধানের বীজনির্ব্বাচনের সময়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, যে ধান গাছে অন্য গাছ অপেক্ষা ধান বেশী জন্মিয়াছে, চিটাকম বা হয় নাই, ধানগুলি ঝড়িয়া পড়ে নাই ও গাছটী দাঁড়ান আছে (এবং পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুযায়ী) উহা সুস্থ, সবল, কীট শূন্য ও বীজগুলি পরিপক্ক। এরূপ গাছ নির্ব্বাচন (Selection) করিয়া তাহা হইতে বীজ সংগ্রহ করিবে। আমরা যদি ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া উক্ত বীজনির্ব্বাচন করি তবে কি দোষ হইবে তাহা নিম্নে বিবৃত করা গেল। কম ফসলযুক্ত গাছের বীজসংগ্রহ করিলে ঐ বীজ হইতে উৎপন্ন শস্যের ফলন কম হইবে। চিটাযুক্ত গাছের বীজ হইলে ফসলে চিটা পরিপূর্ণ হইবে অর্থাৎ ফলন কম হইবে। ঝড়াগাছের বীজ হইলে, ফসল পাকিলেই ধানগুলি ঝড়িয়া পড়িবে ও শায়িত গাছের বীজ হইলে, সকল গাছগুলি মাটিতে পড়িয়া যাইবে সুতরাং ফসল ভালরূপে জন্মিবে না ; যাহা জন্মিবে তাহাও মাটিতে নষ্ট হইবে। বীজ সুস্থ, সবল, পরিপক্ক ও কীটশূন্য না হইলে সমুদয় বীজ গাছ জন্মিতে পারে না ; যে গুলি জন্মিবে তাহা হইতেও আশানুরূপ ফসল পাওয়া যাইবে না। এই জন্যই অনির্ব্বাচিত বীজ, নির্ব্বাচিত বীজ অপেক্ষা পরিমাণে অধিক প্রয়োজন হয়। পাটের বীজ নির্ব্বাচন করিতে হইলে, কিরূপ গাছের বীজের দরকার ? আমরা ইহার কি চাই ?

পাট

আমরা চাই গাছটী মোটা, সোজা, লম্বা ও ডালপালাবিহীন, সুস্থ সবল, পরিপক্ক ও কীটশূন্য। কারণ, সুস্থ, সবল, পরিপক্ক ও কীটশূন্য গাছের বীজ না হইলে গাছ ভালরূপে জন্মিবে না বা একেবারেই জন্মিবে না। মোটাগাছ না হইলে, পাটের আঁশ (fibre) কম হইবে অর্থাৎ ফলন কম হইবে। গাছটী সোজা, লম্বা ও ডালপালাবিহীন না হইলে পাট ছাড়াইতে অর্থাৎ পাটের গাছ হইতে আঁশ পৃথক করিতে সময় বেশী লাগিবে কাজেই খরচও বেশী পড়িবে। অতএব নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া বীজ সংগ্রহ করা উচিত নহে।

পাট ও ধান আমাদের দেশের প্রধান ফসল এই জন্য এই দুইটী শস্যের বিষয়ে কিছু আলোচনা করিলাম। অন্যান্য ফসলের বীজ নির্ব্বাচন করিতে হইলে, এইরূপে যে ফসলের সে গুণসমূহের উৎকর্ষের দরকার সেইদিকে মনোযোগ পূর্ব্বক বীজনির্ব্বাচন করিবে। উক্তনিয়মে ক্রমান্বয়ে বীজসংগ্রহ করিলে কালে ফসলের উৎপাদিকাশক্তি বর্দ্ধিত হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। (অন্যান্য ফসলের বীজসম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব এরূপ বাসনা আছে।)

শ্রীমহেন্দ্র কুমার দাস।
সরকারী কৃষি-প্রদর্শক।
গাইবান্ধা (রংপুর)

ধানের চাষ

শোন ভাই চাষি ধানের চাষ
যদি করিস লাভের আশ,
ঝাড়াল গোছের মোটা শিষ
যত্ন করে বেছে তুলিস,
বাছা বীজে সেরা ধান
তাতে বাড়ে চাষির মান,
বৈশাখ মাসে ধৈঞ্চা রুয়ে
সার করবি আমন ভুঁয়ে।
সেরা আউস কটক তারা
চাল হবে ঠিক নাগরার পারা,

ফলন বেশী সুবাশ তায়
এমন আউস মেলা দায়
বিঘা প্রতি তের মণ
যত্ন কল্লে হবে ফলন।
ধানের রাজা ইন্দ্রশাল
ফসল দেখে পড়বে নাল
"ডহর" জমীতে এই আমন চাষ
দেখিস চাষা ভুলে না ঘাস
বিঘা প্রতি ষোল মণ
যত্ন কল্লে হবে ফলন
চাম আপিষে পাবি বীজ
পয়সা দিয়ে কিনে নিস্

এগ্রিকলচুরাল এবং ডেয়ারি ষ্টুডেন্ট লিখিত।

বাঙ্গালার বাণিজ্য

গত বর্ষে জলপথে বাঙ্গালার বাণিজ্যের বহর কেমন হইয়াছিল, তাহার হিসাব নিকাশ হইয়াছে—সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, কলিকাতাই বাঙ্গালার প্রধান বন্দর—আমদানী মালের শতকরা ৯৮ ভাগ এই বন্দরে আসিয়াছে, অবশিষ্ট ২ ভাগ চট্টগ্রাম দিয়া আসিয়াছে। গোটা ভারতের হিসাব ধরিলেও কলিকাতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর; এ বন্দরে আমদানীর পরিমাণ—শতকরা ৩৯, বোম্বাইয়ে—৩৫। আমদানীর মধ্যে কার্পাস পণ্যাই সর্ব্বপ্রধান; মূল্য ৩৭ কোটি ১১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৭ শত ৬১ টাকা। ইহা হইতেই আমাদের পরমুখাপেক্ষিতার পরিচয় পাওয়া যায়—পরিমাণ কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে এ দেশেই লোকের বস্ত্রের প্রয়োজন মিটিত, এখন মিটে না কেন? আবার বাণিজ্যবাদীরা বলিবেন—ভারতে যে ব্যয়ে যেরূপ কাপড় প্রস্তুত হয়, বিদেশে তদপেক্ষা অল্পব্যয়ে তদপেক্ষা ভাল কাপড় প্রস্তুত করা সম্ভব—কাজেই বিদেশ হইতে এ দেশে কাপড় আমদানী স্বাভাবিক। কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে অবস্থা ঠিক বিপরীত ছিল; ভারতবর্ষ হইতেই য়ুরোপে বস্ত্র রপ্তানী হইত—সেই রপ্তানীতে ভারতবর্ষে অর্থাগম হইত। কেমন করিয়া সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। যাহাতে এদেশের কাপড় বিলাতে ব্যবহৃত না হয়, সে জন্য বিলাতে আইন করা হইয়াছিল। তাহার পর যখন বিলাতে বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠিত হইল তখন এদেশে বিলাতী মাল আবাধে চালান দেওয়া চলিতে লাগিল। ঐতিহাসিক উইলসন স্বীকার

করিয়াছেন, গলা টিপিয়া ভারতের বস্ত্র-শিল্প নষ্ট না করিলে বিলাতে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইতেই পারিত না। আজ আমরা পরণের জন্য পরমুখাপেক্ষী—এদেশের লোক বিদেশী কাপড়ে লজ্জানিবারণের উপায় করে। তাহার পর কার্পাস শুল্কের যে ব্যবস্থা হইয়া আসিয়াছে তাহা কতদূর অন্যায় তাহা ভারত-সচিব মিষ্টার চেম্বার্লেন ও মিষ্টার মণ্টেগু স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন; স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। এ অবস্থায় ভারতবাসী যদি ত্যাগ স্বীকার না করে অর্থাৎ বিদেশী পণ্যবর্জ্জন না করে, তবে তাহার উপায় কি?

লবণের কথা আর নাই বলিলাম। যে দেশে লবণাম্বুরাশি-পরিবেষ্টিত, সে দেশে বিদেশ হইতে—বিলাত, স্পেন, জার্ম্মাণী প্রভৃতি স্থান হইতে লবণ আমদানী হয়।

তামাক বিলাসের সামগ্রী—এ দেশে তামাক উৎপন্নও হয়। এতকালও এ দেশের লোক তামাক ব্যবহার করিত—তবে সে দেশী রকমে। দেশী তামাকে দেশী গুড় মাখিয়া ও দেশী মসলা মিশাইয়া লোক ধূমপান করিত। ফরশীর বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র করিয়া গিয়াছেন; এখন রকমফের হইয়াছে। এখন চুরুট চলে। আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গালায় ১ কোটী টাকারও অধিক মূল্যের তামাক আমদানী হইয়াছিল। চুরুটের বা সিগারেটের আমদানী ওজন হিসাবে কিছু কমিয়াছিল বটে, কিন্তু দাম চড়ায় লোকসান হয় নাই। সিগারেটের আমদানী মার্কিণ হইতেই অধিক হইয়াছে। ইহার মোট মূল্য ৮৭ লক্ষ টাকার অধিক।

কাচের ও মাটীর বাসন প্রভৃতির দাম পূর্ব্বাপেক্ষা ৪৬ লক্ষ টাকা অধিক হইয়াছে।

আমরা এই কয়টি মালের কথা বলিলাম—যেমন হাঁড়ির একটা ভাত টিপিলেই সব ভাতের অবস্থা বুঝা যায়, তেমনই এই কয়টি পণ্যের আমদানী হইতেই আমাদের আর্থিক অবস্থা বুঝা যাইবে।

এখন কথা—আর কোন দেশ এমন ভাবে পরমুখাপেক্ষী হইয়াছে কি না এবং হইয়া থাকিলে তাহাদের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে?

ফ্লাণ্ডার্শ হইতে তন্তুবায় আনিয়া বিলাতে পশমী কাপড় উৎপন্ন করা হইত। এ দেশে পশমী কাপড় হয়—ভালই হয়। কিন্তু দুই কারণে বিদেশী পশমী কাপড়ের আমদানী বাড়িতেছে। প্রথম কথা—বিদেশী পণ্যের উপর কোনরূপ রক্ষা শুল্ক নাই; দ্বিতীয় কথা—আমাদের রুচিবিকার। এই রুচিবিকার হেতু আমরা স্বদেশী জিনিষ ত্যাগ করিয়া বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করি—পট্টু ফেলিয়া হোমস্পান ব্যবহার করি।

যে জাতি স্বদেশের জিনিষ ত্যাগ করিয়া বিদেশী পণ্যের আদর করে সে জাতি জাতীয়তা হারাইতে বসিয়াছে। ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি স্বদেশীর স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন—

"দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।" সে ভাব যত দিন জাতির মধ্যে জাগ্রত না হয়, তত দিন দেশের আশা কোথায়? মহাত্মা গান্ধী সেই কথাই বলিয়াছেন—যদি আমরা দেশী ভাষায় কথোপকথন বা পত্রব্যবহার না করি, যদি দেশীয় বেশ পরিধান করিতে ঘৃণা বোধ করি, তবে আমরা স্বদেশী নহি—স্বরাজলাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারি নাই। স্বদেশীর সময় যে ভাব জাগিয়াছিল, তাহা আমাদের শিক্ষার দোষে নিবিয়া আসিতেছিল; সেই সময় এই নবীন আন্দোলন। ত্যাগে ইহার প্রতিষ্ঠা—কাজেই সাফল্যে আমরা আর সন্দেহ করি না।—বসুমতী।

পাটের আবাদ

বর্ত্তমান বর্ষে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যা ও আসাম যে পরিমাণ ভূমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে তাহার সরকারী বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বাঙ্গালা

	ভূমির পরিমাণ গত বৎসর	ভূমির পরিমাণ বর্ত্তমান বৎসর
২৪ পরগণা	৬৭,৭১২ একর	২৩১৫৮ একর
নদীয়া	৫৮১৬৩ "	৩১০২৫ "
মুর্শিদাবাদ	১৫১১১ "	৪৭৬৮ "
যশোহর	৫৯৩৫০ "	৩৮,৫৪৮ "
খুলনা	৯৮৮০ একর	৫৮৭৬ একর
মেদিনীপুর	৭৯৮৩ "	৫,৪১৩ "
হুগলী	২৬২৫৯ "	১৯৪২২ "
হাবড়া	৯৬৭৪ "	৪৫৯৫ "
ঢাকা	২৪০,২১১ "	১৮০,০৬০ "
ময়মনসিংহ	৫৩৮৩৫১ "	৩৩২,২৯৩ "
ফরিদপুর	২১৯১০০ "	১৪৩০০০ "
বাথরগঞ্জ	৩৭৬২৩ "	১৯৪১২ "

	গত বৎসর	বর্ত্তমান বৎসর
ত্রিপুরা	২১৮২৮০ একর	১৭৫০০০ একর
কোঁচবিহার	৩৬১২১ "	১৩১৪৭ "
রাজসাহী	৮০৪০৭ "	৪৭৪৯০ "
দিনাজপুর	৬৫৬১৯ "	৪৩৫৪৭ "
দার্জ্জিলিং	২৮০১ "	১৯৫১ "
রংপুর	২৪১৪৫৪ "	১০৪৩২৬ "
পাবনা	৯৬১৩৮ "	৬১৪৭৬ "
মালদহ	১৯০০০ "	১৪২০০ "

বিহার ও উড়িষ্যা।

চম্পারণ	১৪০০ "	১৩০০ "
মজঃফরপুর	২২০০ "	২৯২৫ "
ভাগলপুর	১১৫০ "	১১৭৩ "
পূর্ণিয়া	১৫৩০০০ "	৮৬০০০ "
সাঁওতাল পঃ	৯০০ "	৫০০ "
কটক	১৮০০০ "	১৩৫০০ "
বালেশ্বর	২১০০ "	১০০০ "

আসাম।

কাছাড়	৩০০ "	২০০ "
শ্রীহট্ট	১৪২০০ "	১২১০০ "
গোয়ালপাড়া	৫৬৯০০ "	২৯২০০ "
কামরূপ	১৫৮০০ "	১২৩০০ "
দরং	১১৪০০ "	৯৩০০ "
নওগাঁ	৩১৩০০ "	২০৩০০ "
শিবসাগর	২০০ "	৪০০ "
লক্ষ্মীপুর	২০০ "	১০০ "
গারো পাহাড় (সমতল)	৪২০০ "	৩৩০০ "

ইহাতে দেখা যাইতেছে পূর্ব্ব বৎসরাপেক্ষা ১৪,৫৬,৬১৫ একর জমীতে আবাদ কম হইয়াছে। অনেকে ইহা অপেক্ষা কম আবাদের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। ৬ই জুলাই আবাদের এই সংবাদ প্রকাশ হইবামাত্র পাটের বাজার চড়িয়াছিল—পাইটের দর ৭২৲ হইতে ৮০ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

পুষ্করিণীতে মাছের আবাদ

শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু, এম, আর, এ, এস লিখিত।

পুষ্করিণীতে মৎস্যের আবাদ যেরূপে চলিতেছে তাহা একেবারেই নিস্ফলপ্রদ। যেরূপ পোনা এই কারণে ব্যবহার হয় তাহাতে প্রায় অনেক প্রকার মৎস্যের পোনা মিশ্রিত থাকে। এই সকল পোনা এত ক্ষুদ্র যে, যে সকল মৎস্যাসী মাছ পুষ্করিণীতে থাকে তাহারা প্রায় সমস্তই খাইয়া ফেলে। পুষ্করিণীতে মাছ আবাদ করিতে হইলে কেবল রোহিত প্রভৃতি মৎস্যের পোনাই ছাড়িতে হইবে এবং এই সকল পোনা এত বড় হওয়া উচিত যেন তাহাদিগকে পুষ্করিণীস্থিত মৎস্যাসী মাছে না খাইতে পারে। এইরূপে যদি কেবলমাত্র রোহিত প্রভৃতি মৎস্য পুষ্করিণীতে রাখা হয় তাহা হইলে তত্রস্থ মৎস্যাসী মাছ কমিয়া যাইবে কেবল ঐ জাতের যে সকল ছোট মৎস্য পুকুরে ডিম পাড়ে তাহারাই থাকিতে পারে। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ এ সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিয়া যাহাতে সাধারণের জন্য প্রতি বৎসরে বিশুদ্ধ রোহিত প্রভৃতি মাছের পোনা সরবরাহ করিতে পারা যায় তাহার আয়োজন করিতেছে। গত বর্ষায় আমরা কয়েক হাজার বাজারে পোনা কিনিয়া কয়েকটী পুষ্করিণীতে রাখিয়াছিলাম। কয়েক মাস পরে যখন পরীক্ষা করা গেল তখন দেখা গেল যে, যে সকল পোনা রোহিত মাছের পোনা বলিয়া বাজারে বিক্রীত হয় অর্থাৎ যে সকল পোনা আমরা ঐ পুষ্করিণীতে ছাড়িয়াছিলাম তাহাদের মধ্যে প্রায় সমস্তই পুঁটী প্রভৃতি ছোট ছোট মাছের পোনা। তৎপরে আমরা দেখিয়াছি যে পোনার বাজারের সন্নিকটস্থ ধান্যক্ষেত্রে এবং স্বল্প জলাশয়ে অনেক ছোট জাতের স্ত্রীলোকেরা এই সকল পোনা রোহিত প্রভৃতি মাছের পোনার সহিত ভেজাল দিয়া বিক্রয় করিবার জন্য এই সকল পোনা সংগ্রহ করে।

রোহিত প্রভৃতি পোনা মাছের চাষ

এই প্রদেশের খাইবার মাছের মধ্যে রোহিত, কাৎলা প্রভৃতি মাছগুলি প্রধান! এই সকল মাছের বৃদ্ধির জন্য অনেক উপায় অবলম্বন করিয়া দেখা গিয়াছে। প্রথমে পুকুরের মাছ যাহাতে পুকুরে ডিম পাড়ে তজ্জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল। তাহার ফলে দেখা গিয়াছে যে তাহারা পুকুরে ডিম পাড়ে না। তাহার পর নদীর মাছ লইয়া পরীক্ষায় সেইরূপ কোন ফল পাওয়া যায় নাই। তাহার পর সরকারী কৃষি বিভাগ হইতে পোনা বিতরণের আয়োজন করা হয়। এই কার্য্যের প্রারম্ভে দেখা গিয়াছিল যে ইহাতে বিশেষ কোন ফল পাওয়া যাইবে না। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ যে ভাবে কার্য্য চালাইতেছেন তাহা সম্যক উপায় নহে। তথাপি এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কোন ভাল উপায় করা যাইতে পারে কি না তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। আমরা আরও দেখিয়াছি যে এই প্রদেশের নদীর এবং

পুকুরের মাছ বৃদ্ধি করিতে হইলে বিশুদ্ধ রোহিত প্রভৃতি মাছের প্রচুর পরিমাণে সুলভ মূল্যে সরবরাহ করিতে হইবে।

যদিও এ প্রদেশের নদী হইতে অনেক পরিমাণে মাছের পোনা সরবরাহ করা যায় কিন্তু ঐ সকল পোনা অন্য অন্য মৎস্যাসী মাছের সহিত মিশ্রিত থাকে এবং এই সংমিশ্রণ হইতে বিশুদ্ধ পোনা বাছিয়া লওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে এই সকল মৎস্যের পোনা কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন করা যাইতে পারে। বাকৃসার এবং কটকে এ বিষয় পরীক্ষা করিবার জন্য ঐ দুই স্থানে দুইটী কারখানা স্থাপন হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। এখনও এ বিষয়ের পরীক্ষা সফল না হইলে সাধারণের জন্য এই উপায়ে উৎপাদিত পোনা সরবরাহ করিতে পারা যাইবে কি না বলা যায় না।

আশা করা যায় যে এই সকল পরীক্ষার ফলে কৃত্রিম উপায়ে কয়েক প্রকার পোনা মাছের বাচ্ছা উৎপাদন হইতে পারিবে। এবং এই বিষয় স্থির হইলে বহুল কারখানা করিয়া সাধারণের পোনা সরবরাহ করা এবং নদীর মাছ বৃদ্ধি করা অতি অল্প অনায়াসেই হইবে।

পোনা বিতরণের কার্য্য

রোহিত প্রভৃতি পোনা মৎস্যের ডিম এবং পোনা সাধারণের অধিক পরিমাণে প্রয়োজন দেখিয়া মৎস্যবিভাগ গত কয়েকবৎসর সর্ব্বসাধারণকে হাটের দরে কলিকাতায় পোনা সরবরাহ করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। লক্ষ লক্ষেরও অধিক পোনা এইরূপে যোগান হইয়াছিল এবং মফঃস্বলের লোকেরা যাহাতে তাঁহাদের আপনাদের কামরায় রেলপথে পোনার হাঁড়িগুলি লইয়া যাইতে পারেন সে বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন রেল কোম্পানির সহিত বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। যাঁহারা পোনাগুলি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে কি প্রকার যত্ন করিলে পোনাগুলি নিরাপদে পৌঁছিতে পারে। সরকারী কৃষি-বিভাগের এই কার্য্য উপরন্তু বলিয়া মনে হয়। শত শত লোক এই প্রকার ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে এবং অল্পয়াসে সুচারুরূপে ঐ কার্য্য চলিতেছে।

বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে এখনও বিশুদ্ধ রোহিত প্রভৃতি পোনা মাছের বাচ্ছা সাধারণের জন্য সরবরাহ করিবার বন্দোবস্ত হয় নাই। ইহা হইলে পুকুরে মাছ বৃদ্ধির একটী মহৎ উন্নতি সাধন হইত। ভারতীয় কৃষিসমিতি এ বৎসর কিয়ৎপরিমাণে এইরূপ পোনা সরবরাহ করিতে পারিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে এবং বৎসর বৎসর ইহার বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করা হইবে।

লোনা জলের মাছ

সমুদ্রের মৎস্যসম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য উল্লেখযোগ্য কোন কার্য্যই হয় নাই এবং ইহা বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আমাদের বঙ্গোপসাগরের মৎস্যসম্বন্ধে এখনও হস্তক্ষেপ করা হয় নাই।

সুন্দরবন এলাকায় জলাশয়ে মৎস্যবিষয়ক রীতিমত অনুসন্ধান হওয়া উচিত। সুন্দরবনের এলাকা প্রায় ৫,৭০০ বর্গমাইল হইবে এবং তজ্জন্য অনেক সময়ের আবশ্যক। আমরা হুগলী নদীতে কলিকাতা হইতে মডপয়েণ্ট পর্য্যন্ত এবং খুলনা জেলার নদী সকলে মৎস্যবিষয়ে জরিপ করা হইয়াছে। মৎস্যতত্ত্ববিদকর্ত্তৃক জেলেদের প্রত্যেক গ্রাম পরিদর্শন করা হইয়াছিল এবং খুলনা জেলায় যে বহু পরিমাণে বিল আছে সেগুলিও পরিদর্শন করা হইয়াছিল। ফলে কিন্তু আসল কাজ একটুকুও অগ্রসর হয় নাই। বাঙলায় মাছের অভাব ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

যতদূর দেখা গিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছে যে ট্রলজাতীয় জাল সুন্দরবন এলাকার জলাশয়ের পক্ষে এখন একান্ত অনুপযুক্ত এবং ভবিষ্যতে কখনও উপযুক্ত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। স্রোতের সহিত ভাসমান জালও ঐরূপ অনুপযুক্ত। দেশীয় মৎস্য ধরিবার উপায় সমুদায় সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকরী বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু জেলেদের অতিশয় হীনাবস্থা নিবন্ধন তাহারা আপনাপন জাল প্রস্তুত করিতে বা কিনিতে এমন কি মেরামত করিতে পারে না। তাহাদের নদীতে মৎস্য ধরিবার বিষয়ে আর একটী প্রতিবন্ধক এই যে ঐ সকল নদীতে সর্ব্বদা জাহাজ যাতায়াতের জন্য তাহারা বড় মাছ ধরিবার জাল পাতিতে পারে না অথবা পাতিলে তাহাদের জাল অনেক স্থলে জাহাজের দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়। এই সকল কারণের জন্য অনেক জেলেরা মৎস্য ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া চাবার কার্য্য করিতে আরম্ভ করিতেছে। ইহার প্রতিকার না হইলে মৎস্যব্যবসায়ের উন্নতি হইবে না।

মৎস্যবিষয়ে উন্নতি করিতে হইলে অবশ্যই কয়েক প্রকার মৎস্য কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন করিতে হইবে কিন্তু জেলেদের মধ্যে সমবায়সমিতি সংস্থাপন করিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতিসাধন করাও একান্ত আবশ্যক। এইরূপ সমিতি সংস্থাপন হইলে জেলেদের অবস্থার উন্নতি হওয়া ছাড়া মৎস্যের সমগ্র ব্যবসায় নিয়মিতরূপে চলিয়া সাধারণের মৎস্যের অনাটন দূর হইবে।

সুন্দরবন এলাকার সমস্ত নদীতেই জোঁয়ার ভাঁটা হয় এবং সেইজন্য সমস্ত জোয়ার ভাঁটার জলের মত এই সকল জায়গায় সাধারণকে বিনা খাজানায় মৎস্য ধরিতে দেওয়া উচিত। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে অনেক স্থলেই স্থানীয় জমীদারগণ বহুদিন অবধি স্বেচ্ছানুসারে নদীতে মৎস্য ধরিবার স্বত্ব দখল করিয়া লইয়াছে এবং সেই স্বত্বানুযায়ী জেলেদের নিকট মৎস্য ধরার জন্য খাজানা আদায় করিয়া থাকেন। ফলতঃ জেলেরা মৎস্য ধরিবার জন্য ইজারাদারকে খাজানা দিয়া থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের ধৃত মৎস্যগুলি একটা সামান্য দরে ঐ ইজারাদারকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া আমরা দেখিয়াছি যে খুলনা জেলার অধিকাংশ বিল সকল কেবল ছোট মাছের পক্ষে একরকম ফাঁদের মত। যে সকল ছোট মাছ বর্ষায় উহাদের ভিতর প্রবেশ করে

সেগুলি সমস্ত ধরা পড়ে কিন্তু এই সকল বিলে প্রায় সকল প্রকার আমাছা জন্মায় এবং তাহারা অনেকেই ব্যাধিকীটে পরিপূর্ণ।

বাঙ্গলার মিঠা ও লোণা জলের মাছ

ইহাদের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

সাধারণতঃ স্থলচর ও জলচর প্রাণীতে যেরূপ প্রভেদ দেখা যায়, সেইরূপ মিঠা জল ও লোণা জল ভেদে জলচর প্রাণীদের মধ্যেও সাধারণতঃ কতকটা প্রভেদ লক্ষ্য হয়। কতকগুলি প্রাণী, যেমন উভচর, জলে ও স্থলে বাস করিতে পারে, সেইরূপ জলচরদের ভিতরে কতকগুলি লোণা ও মিঠা উভয় জলেই বাস করিতে পারে; কিন্তু অন্য কতকগুলির পক্ষে বসবাসের জলের পরিবর্ত্তন মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। অনেকগুলি লোণা জলের প্রাণীকে মিঠা জলে আনিলে তাহারা অতি অল্প সময়েই মারা যায়। আবার অনেক মিঠা জলের প্রাণীকে লোণা জলে আনিলেও মারা যায়।

আবাসের বাহিরে বিস্তৃত হওয়া প্রাণীদের সাধারণ ধর্ম্ম। মিঠা জলের প্রাণীরা নদীর যোগাযোগের সাহায্যে সহজেই বিস্তৃত হইতে পারে। কাজেই "বাঙ্গলা" বলিলে আমরা কতটুকু স্থান বুঝি তাহা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। বাঙ্গলা বলিতে আমরা বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম বুঝিব এবং সেই ভূভাগে নদীগুলির সমাবেশ মনে রাখিলে জলচর প্রাণীদের বিস্তৃতি বুঝা সহজ হইবে। আর একটা কথা—নদীর যোগাযোগ অপেক্ষা শীতাতপের ন্যূনাধিক্যে ভিন্ন ভিন্ন বংশকে (Species) ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নির্দ্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ হইয়া পড়িতে হইয়াছে। সমতলের গঙ্গার মাছের, হিমালয়ের পাদদেশের মাছের, গারো ও খাসিয়া পর্ব্বতের মাছের জাতির ভিতর অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

আপনারা সকলেই জানেন যে "চিঙ্গড়ী মাছ" "গুগলী মাছ" ইহাদের খ্যাতি মাছ হইলেও এগুলি মাছ নহে। খাঁটী মাছ শিরদাঁড়াওয়ালা জলচর প্রাণী। সাধারণতঃ ইহারা কানকোর সাহায্যে জল হইতে জলে মিশান অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া শ্বাসক্রিয়া চালায়।

হাঙ্গরও মাছ—বড়টি প্রায় তিমি মাছের মত বড়। কলিকাতার নিকট গঙ্গায় সময় সময় ইহাকে দেখা যায়—ইহারা উদ্ভিদভোজী। ছোটটি গঙ্গার প্রসিদ্ধ হাঙ্গর। আমাদের অধিকাংশ মাছ, রুই, কাতলা, টেঙ্গরা, সোল, সাল, কই, মাগুর. সব মিঠাজলের মাছ কাতলার কঙ্কালে ও হাঙ্গরের কোমল হাড়ে আপনারা ইহাদের দুই শ্রেণীর পার্থক্য দেখিতে ও বুঝিতে পারিবেন। যেমন সাল মাছ একটি বংশ (species) সোল মাছ অন্য একটি বংশ (species), চেঙ্গ মাছ আর একটা বংশ (species), কিন্তু এই সবগুলির একটা অতি নিকট সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া এই সবগুলিকে এক

জাতির অন্তর্গত ধরা হয়। তাহাতেই বলা হয় ইহাদের জাতি (Genus) এক। আবার রুই, মৃগল, সরল পুঁটি ইহারা ভিন্ন ভিন্ন (Genera) বা জাতির মাছ হইলেও ইহাদের পরস্পরের নিকট সম্বন্ধের জন্য ইহাদিগকে এক বৃহৎ পরিবারের অন্তর্গত বলিয়া ধরা যায়। আমাদের ভেটকী বা কোরাল, চান্দা, প্রভৃতি এক পরিবারের অন্তর্গত মাছ। ইহাদের অধিকাংশই সামুদ্রিক—অল্পসংখ্যক জাতিই বাঙ্গলার মিঠা জলে পাওয়া যায়। ভেটকীর বংশ (species) অষ্ট্রেলিয়াতে পাওয়া যায়। ভেটকীর জাতি (Genus) আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া এই দুই স্থানেও পাওয়া যায়। বাঙ্গলার ভেটকী কি করিয়া অষ্ট্রেলিয়াতে গেল বুঝা কঠিন। এই পরিবারের সব মাছই মনে হয় সমুদ্র হইতে আসিয়া মিঠা জলের হইয়া গিয়াছে। কাজেই ইহাদের সকলেরই আদি স্থান লোণা জল।

বাঙ্গলার মিঠাজলের আর একটি পরিবার কই মাছের। এই পরিবারে মাত্র একটি জাতি। ইহা এখন ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র বিস্তৃত, আফ্রিকায়ও ইহার জাতি পাওয়া যায়। খল্‌সের পরিবার সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যাইতে পারে। ইহারা ভারতের সর্ব্বত্র বিস্তৃত। টেঙ্গরা, আইড়, বোয়াল, মাগুর সিঙ্গী এসব মাছের আদৌ খোলস নাই। এই মাছগুলি সব এক পরিবার ভুক্ত, বাঙ্গলাদেশে ইহাদের বংশের (Species) সংখ্যা খুব বেশী। ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই ইহাদিগকে দেখা যায়। সমুদ্রেও অনেকগুলি আছে। ইহাদের কোনও কোনও জাতির মাছ আফ্রিকায় পাওয়া যায়। ইহাদের অনেক গুলিতেই সাক্ষাৎ ভাবে বায়ু হইতে শ্বাস গ্রহণের বন্দোবস্ত রহিয়াছে। মাগুরের কানকোর উপর একটি ঝালর কাটা যন্ত্র রহিয়াছে। সিঙ্গী মাছের শিরদাঁড়ার উপর দিয়া কানকোর উপর পর্য্যন্ত ফুস ফুসের ন্যায় একটা লম্বা চুঙ্গী রহিয়াছে, ইহার সাহায্যে বায়ু হইতে শ্বাস গ্রহণ করা বেশ চলিয়া থাকে। এই অতিরিক্ত শ্বাস যন্ত্রের সাহায্যে সিঙ্গী-মাগুর ডাঙ্গায় অমর। ইহারা সকলেই খাটি বাঙ্গলার মাছ। এই পরিবারের আইড়, টেঙ্গরা, বোয়াল চারিদিকে বিস্তৃত। বোয়াল, খাড়ী হইয়া প্রায় উপকূলে নামিয়াছে। হিংস্রতায় ইহারা হাঙ্গরের অনুরূপ। রুই, কাত্‌লা, মৃগল, সরলপুটি, মাশির এই সবই এক পরিবারের অন্তর্গত। এই পরিবারের বৈজ্ঞানিক নাম সিপ্রিনিডি। এই পরিবারের মাছের বংশ (Species) ভারতবর্ষে প্রায় দুই শতেরও অধিক। ইলিশ মাছের পরিবারের বৈজ্ঞানিক নাম ক্লুপিডি। এই পরিবারের অন্তর্গত অধিকাংশ মাছই সামুদ্রিক। বাঙ্গলার ইলিসও সমুদ্রের মাছ। ডিম পাড়িবার জন্য বর্ষার প্রারম্ভে ইহারা খাড়ী দিয়া নদীতে প্রবেশ করে, তারপর উজান বহিয়া ডিম ছাড়িয়া আবার সমুদ্রে চলিয়া যায়। যাঁহারা ডিমওয়ালা মাছ ধরা, আইন করিয়া বন্ধ করিতে চান, তাহাদের মনে রাখিলে ভাল হয় যে ডিম রহিত ইলিস বাঙ্গলার নদীতে উজাইতে আসে না। তবে ইলিসের জাতির খুব ছোট রকমের দুইটি মাছ কেবল বাঙ্গলার জলেই পাওয়া যায়। ক্লুপিডির (clupeidea) পরিবারের সাদৃশ্য-বিশিষ্ট আর একটি পরিবার বাঙ্গলা খাটি

মিঠা জলে খুব দেখা যায়। ইহারা চিতল মাছের পরিবারভুক্ত। ইহারা বাঙ্গালার মিঠাজলে আবদ্ধ নহে, গোটা ভারতবর্ষ জুড়িয়া রহিয়াছে।

পুরাকালে মৎস্যতত্ত্বের কোনও আলোচনাই আমাদের দেশে ছিল না একথা যাঁহারা বলিতে চান আমরা তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারি না। সুশ্রুতে মাছের যেরূপ বিভাগ প্রণালী আছে তাহাতে মনে হয় মৎস্যশাস্ত্রের আলোচনা পূর্ব্বকালে ছিল। মাছের যে নামগুলি রহিয়াছে তাহার দশমাংশেরও এখন কিনারা হয় নাই। আর মাছের চাষের যে সব বন্দোবস্ত ছিল তমলুকের অতি প্রাচীন দেবালয় বর্গভীমার মন্দিরে প্রতিদিন মাছের বন্দোবস্তের উপাখ্যানটি তাহার একটি উত্তম দৃষ্টান্ত। প্রত্যেক হিন্দু স্ত্রীর জন্ম-দিনে পুকুরে মাছ ছাড়িতে আদিষ্ট। এসব যতই আলোচনা করা যায় ততই পুরাকালের উন্নতির প্রসার দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

সেকালের বাজার-দর

একালে সোণার ভারত দুর্ভিক্ষ ও তৎসহচর দুঃখ দৈন্যের স্থায়ী আবাসভূমি হইয়া পড়িয়াছে। বিগত পাঁচ বৎসরের যুদ্ধ ব্যাপারের স্কন্ধে সমগ্র অপরাধ স্থাপন করিবার এখন একটা সুবিধা দাঁড়াইয়াছে, ইতঃপূর্ব্বে সাময়িক অনাবৃষ্টির উপরেই ঐ ভার ন্যস্ত হইত। পুরাণ কাহিনী যতদূর জানিতে পারা যায় তাহাতে দেখা যায় ইতি উৎপাত-জনিত দুর্ভিক্ষ দেশে সময়ে সময়ে দেখা গিয়াছে। রামায়ণেও দুর্ভিক্ষের কথা আছে; মহাভারতে এক দ্বাদশবর্ষব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষের ব্যাপার শান্তিপর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। অবশ্য এই-সকল ক্ষেত্রে কবি-কল্পিত অতিরঞ্জন বাদ দিতে হইবে। আকবর বাদশাহ রাজত্ব ইতিহাসে রামরাজত্বের মত বলিয়া কীর্ত্তিত; সে সময়েও অন্ততঃ তিনবার দুর্ভিক্ষের দর্শন পাই। একবার অন্নকষ্টে লোকে পুত্র কন্যা বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এমন কি, এক সময়ে মানুষে মানুষ খাইবার বীভৎস চিত্রও ঐতিহাসিক দেখাইয়াছেন। আকবরের রাজত্বের ৪২শ বৎসরে ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া এক দুর্ভিক্ষ উত্তর-পশ্চিম ভারতে তিন চারি বৎসর চলিয়াছিল, এবং ইহার প্রকোপে ও পরিমাণফলে শেষে মারীভয় উপস্থিত হইয়া গ্রাম নগর শ্মশানে পরিণত করিয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে শাজেহান বাদশার আমলেও দুইবারের ভীষণ দুর্ভিক্ষের বিবরণ পাওয়া যায়। সেকেলের ব্যবস্থায় এরূপ অবস্থায় দেশের খাদ্য বাহিরে যাইতে দেওয়া হইত না। মোগল রাজগণ

দুর্ভিক্ষের সময় প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে প্রভৃত অর্থব্যয় করিয়া খাদ্য বিতরণের বন্দোবস্ত করিতেন বটে, কিন্তু উপযুক্ত রাজপথ ও যান-বহনাদির অভাবে প্রদেশ-বিশেষে শস্যহানি ও অন্নকষ্টের আবির্ভাব হইলে খাদ্য যোগান এক প্রকার দুঃসাধ্য হইয়া পড়িত। সেকেলের অবস্থার সহিত এ-যুগের পার্থক্য এই যে, যে-অন্নকষ্ট সে যুগে আকস্মিক ছিল, এখন তাহা স্থায়ী উৎপাতে পরিণত হইয়াছে।

বাজার-দর ও বর্ত্তমান সমস্যা লইয়া অধুনা নানা জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভায় অনুমোদিত হইয়াছে যে বর্ত্তমান অবস্থায় শস্যাদি দেশ হইতে রপ্তানি হওয়া অনুচিত; গবর্ণমেণ্টও সেই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। টাকার মূল্য হ্রাস এবং শ্রমজীবীর আয়বৃদ্ধির অনুপাতে দ্রব্যের মূল্যের অত্যধিক বৃদ্ধির কথা এখন সাধারণে আলোচনা করিতেছেন। অল্পদিন পূর্ব্বে গবমেণ্টের নিয়োগে দ্রব্যাদির দরবৃদ্ধি ও তৎসংস্থষ্ট নানা কথার তথ্য নিরূপণের জন্য যে কমিশন বসিয়াছিল তাহার ফলাফলও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিষম সমস্যার আলোচনা প্রস্তাবিত প্রবন্ধের বিষয় নহে। এ রোগের ঔষধ অনুসন্ধানে মনস্বী রাজবৈদ্যগণ ব্যাপৃত। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমরা সেকেলের বাজার-দরের দুই-একটি নমুনা দিতে চাই। শ্রমজীবীর বর্ত্তমান আয় গত শতাব্দীর চারিগুণ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যাহাই হউক, মোগলঅ ধিকারে বঙ্গভূমি চিরদিনই শস্যসম্ভারপূর্ণ ছিল বলিয়া মুসলমান লেখকেরা আমাদের দেশকে জিন্নেৎ-উল্‌-বেলাৎ—মর্ত্তে স্বর্গতুল্য বিশেষণে অভিহিত করিতেন। এই উপাধি অবশ্য কাশ্মীর প্রভৃতি প্রদেশের ন্যায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের নিমিত্ত প্রদত্ত হয় নাই। সোণার বাঙ্গালার রাজকর হইতে বাদ্‌শাহের বিলাস-বাসনা চরিতার্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজকীয় যুদ্ধ-ব্যাপারের যথেষ্ট সহায়তা হইয়াছে—একথা নানা পারসী ইতিহাসে লিখিতেছে। বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষের কাহিনী মুসলমান ইতিহাসে বিরল। বিদেশী পর্য্যটকগণ শতমুখে বঙ্গের ধনধান্যের গৌরব প্রচার করিয়াছেন। ফরাসী বার্ণিয়ে বলেন মিশর দেশ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শস্যশালী বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু বাঙ্গালার তুলনায় তাহার শস্যসমৃদ্ধি নগণ্য। তিনি লিখিয়াছেন 'সর্ব্বপ্রকার আহার্য্যদ্রব্য এদেশে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।' এরূপ ক্ষেত্রে উৎপাদকের সুবিধা না হইলেও সাধারণ লোকের উদরপূর্ত্তির চিন্তা থাকে না। সয়েস্তা খাঁর সময়ে একবার টাকায় টাকায় আটমণ চাউল বিক্রিত হওয়ায় তিনি নগরের অন্যতম তোরণ-দ্বারে ঐ কথা ক্ষোদিত করাইয়া পুনরায় ঐ অবস্থা না হইলে দিব্য দিয়া সেই দ্বার বন্ধ করেন এবং মুর্শীদকুলী খাঁর শাসনসময়ে হিন্দু মন্ত্রী রাজা যশোবন্তের কর্ত্তৃত্বে ডেপুটী নবাব সরফরাজ আবার টাকায় আটমণ চাউল দেখিয়া সোল্লাসে ঐ তোরণ উন্মুক্ত করেন; এই বিবরণ সকলেই জানেন। রিয়াজ-উস্‌-সালাতীন্ গ্রন্থকার মুর্শীদকুলীর সময়ে দ্রব্যাদি বড়ই সুলভ

ছিল বলিয়া আনন্দের লিখিয়াছেন—'এমন কি মাসে একটাকা আয় হইলে একজন লোক দুবেলা পোলাও কালিয়া খাইতে পারিত।' এই গ্রন্থকার ছেয়াত্তুরে মন্বন্তরের ভীষণ দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

বাং ১১৭৬ সালের মন্বন্তরের ভীষণ লোকক্ষয়ের শোচনীয় ব্যাপার অনেকেই জানেন। ঐ বৎসরের প্রথম দিকের সরকারী রিপোর্ট হইতে দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া জেলায় তৎপূর্ব্বে আট বৎসরের চাউলের দর নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। আট টাকা মণ মোটা চাউলের বাজারে আমরা যদি সেকালের দরের একটা ফর্দ্দ দাখিল করি, তাহাতে পেট না ভরিলেও 'হায়রে সেকাল' বলিয়া হা হুতাশ করিবার লোক অনেক পাইব। মুর্শিদাবাদ সদর হইতে কোম্পানীর রেসিডেন্ট বীচার সাহেব ১৭৬৯—২৫ শে মার্চ্চ তারিখে রিপোর্ট দিতেছেন :—

দিনাজপুরের চাউলের দর (নগরে)—একটাকায়

	আউস	নওয়ালী সরু চাল	হৈমন্তিক উৎকৃষ্ট	মাঝারি	মোটা নিকৃষ্ট
বাং ১১৬৮ সাল—মণ	১॥৩ সের	১।৮	৸৬	৸৯	১।১
(ইং ১৭৬১-৬২)					
১১৬৯ সাল	২।৬	২।৩	॥৫	॥৯	১৴৭
১১৭০ "	২৴০	১॥০	॥৫	৸১	১॥৪
১১৭১ "	২।৪	২।০	॥৫	৸০	১॥০
১১৭২ "	১॥৭	১॥১	৸১	১৴০	১।০
১১৭৩ "	১॥৯	১॥২	॥৩	৸১	১৴৫
১১৭৪ "	১॥৪	১॥২	॥৩	৸১	১৴০
১১৭৫ "	১।৪	১৴৭	॥৩	॥৫	৸০

পূর্ণিয়ার চাউলের দর—একটাকায়

	আউস	নওয়ালী সরু	হৈমন্তিক উৎকৃষ্ট	মাঝারি	মোটা নিকৃষ্ট
বাং ১১৬৮ সাল মণ	২।৭	২৴৭	৸৭	১৴০	১৸৫
(১৭৬১—৬২ খৃঃ)					
১১৬৯ "	১৸৫	১৸০	৸৫	৸৭	১॥২
১১৭০ "	২।০	২৴৫	৸৫	৸৭	১৸০
১১৭১ "	১৸০	১॥৭	৸২	৸৫	১।৫
১১৭২ "	২৴০	১৸৫	৸৫	১৴০	১৸৫
১১৭৩ "	২।০	২৴৫	৸০	৸৫	১॥৫
১১৭৪ "	১।৭	১৴৯	৸০	৸৫	১৴৭
১১৭৫ "	১।০	১৴০	।৮	।৯	৸৬

এই ফর্দ্দের উপর টীকা-টীপ্পনীর আবশ্যক নাই।

স্বয়ং গবর্ণর হেষ্টিংস ফ্রান্সিসের সহিত জমিদারী বন্দোবস্তের বাদানুবাদে সেকালের বাজার-দরের যে ফর্দ্দ দিয়াছেন তাহাও এই সঙ্গে দ্রষ্টব্য (এই ফর্দ্দ প্রাচীন রেকর্ডে এবং ১৭৮২ সালের পার্লামেণ্টের কমিটীর ষষ্ঠ রিপোর্টে দেওয়া আছে। ইহাতে সুজাখাঁর সময়ের সহিত হেষ্টিংসের সময়ের তুলনা দেখুন।

	(মুর্শিদাবাদ) ১১৩৬ বাং সাল		হেষ্টিংসের সময় (কলিকাতা)	
	মণ	সের	মণ	সের
প্রথম শ্রেণী বাঁশফুল (টাকায়)	১	১০	—	১৬
২য় শ্রেণী	১	২৩	—	১৮
৩য় "	১	৩৫	—	২১
মোটা (দেশী)	৪	১৫	—	৩২
পূরবী	৪	২৫	—	৩৭
মনসুরা	৫	২৫	১	—
কুকশালী	৭	২০	১	১০
গম প্রথম শ্রেণী	৩	—	—	৩২
দ্বিতীয়	৩	৩০	—	৩৫
যব	৮	—	১	১৩
গহমা বাজরা (ঘাড়ার খাদ্য)	৪	৩৫	২০	২২
তৈল প্রথম শ্রেণী	—	২১	—	৬½
ঐ দ্বিতীয়	—	২৪	—	৬¾
ঘৃত প্রথম শ্রেণী	—	১০½	—	৩
ঐ দ্বিতীয়	—	১১½	—	৪

ইহাতে দেখা যায়, কলিকাতার দর সেকালেও কিছু চড়া ছিল। উৎকৃষ্ট চাউল প্রভৃতির কথায় তখনকার মুর্শিদাবাদের বাজার-দর দেওয়াই উচিত ছিল। যাহা হউক সাধারণ ভাবে তুলনায় সমালোচনা এই ফর্দ্দ হইতেও করা যায়। মন্বন্তরের ধাক্কা সামলাইতে বহুদিন লাগিয়াছে দেখা যাইতেছে, কারণ কোলব্রুক প্রভৃতির উল্লিখিত বাজার-দর হেষ্টিংসের সময় অপেক্ষা সুলভ।

পরিশেষে একালের বাজার-দরের ফর্দ্দ দিয়া 'মধুরেণ' সমাপন করা যাইতেছে :—

উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের বাজার দর (একমণের মূল্য) দপ্তরের রিপোর্ট।

Anuual Averagc Retail Prices in Bengal—Northern and Eastern Circles—

Statistical Committees Report :—

	১৯০৫	১৯০৬	১৯০৭	১৯০৮	১৯০৯	১৯১০	১৯১১	১৯১২
ধান্য	২৷৮	২॥৶০	৩/৬	৩৲	২৸৶০	২৸৶০	২৵৮	২৷/১০
চাউল (সাধারণ)	৩॥৵৭	৫৷৵২	৫৸৵১০	৫৸/৯	৫/৯	৩৸৶২	৩৸৶৫	৪॥০
ঐ (উত্তম)	৪৲৬	৫॥৶১৭	৬৷৵০	৬॥/০	৫॥৩	৪৸০	৫/৪	৫॥৵০
গম	৩৵৮	৪৵৮	৪৶৪	৪৸৶৫	৪৷৶৮	৩৸৶৫	৪৶৬	৪॥০
ময়দা	৫৸৩	৬৷৵৮	৬৸০	৭৷৵০	৬৸৵৮	৬॥৫	৬॥৵০	৬॥০
যব	১৷৶৩	২৷৶১১	২৸৶৫	৩/০	২৸৪	২৷৩	৩/০	৩৵০
কলাই	২৸৵১০	৩৸০	৩৸/৬	৪৸৵৭	৩॥৶৭	৩৵২	৩৵২	৩৸০
মসুর	২৶৯	৩৲	৩৷/৪	৩॥৵০	৩/২	২৷৶৬.	২৷৵০	২॥৵৮

গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে নির্দ্দিষ্ট সাধারণ ও উত্তম চাউল কাহাকে বলে তাহা পাঠকের অবিদিত নাই। তুলনায় সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন—"বুঝ লোক যে জান সন্ধান"। ১৯১৩ হইতে দ্রব্যাদির মূল্য আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে ইহাও এক সুপরিজ্ঞাত সত্য।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়,—প্রবাসী।

পূর্ব্বকালের সস্তা গণ্ডার কি প্রকার প্রসার ছিল তাহার অনেক প্রমাণ ছিল। প্রায় প্রায় ১৫০ শত বৎসর আগে এক ব্যক্তি পুরীতে তীর্থ যাত্রা কালে তাঁহার সম্পত্তি ৩ বিঘা জমি, পিতল কাঁসার তৈজসাদি ও আওলাত বন্ধক রাখিয়া ১৫৲ টাকা মাত্র কর্জ্জ করেন এবং সমুদয় সম্পত্তি বন্দক গৃহিতার দখলে ছাড়িয়া দিয়া যান।

৮০ বৎসর আগে এক ব্যক্তি উইল করিয়াছেন—তাঁহার উইল পত্র অদ্যাপিও তাঁহার ওয়ারিশগণের দখলে আছে। তাহার মর্ম্ম এই, দেব সেবার্থ প্রতিদিন /১ সের হিসাবে দুধ বরাদ্দ করেন তাহার মূল্য মাসিক ॥০ আনা নির্দ্দিষ্ট হয়। ১ বিঘা জমির উৎপন্ন ধান্য হইতে দেব সেবার অন্য ব্যয়াদি সম্পন্ন হইবে এরূপ বন্দোবস্ত হয়। নূঃ সঃ।

ধৈঞ্চা সার

খনা বলে শোনরে চাষা
যদি করিস লাভের আশা
বৈশাখ মাসে ধৈঞ্চা রোও
ঝগড়া ঝাঁটি ফেলে থোও।

বিঘা প্রতি তিন সের বীজ
দু থার চোষে বুনে দিস
ধৈঞ্চা সারে ফলন বাড়ে
এঠেল মাটী আঁট ছাড়ে
সরেস হবে বেলে মাটী
ফসল তার ফলবে খাঁটী
ফাঁপবে মাটী মরবে গাজ ১
এমনি গুণ এমনি ঝাঁজ
তিন সের বীজের ৵০ আনা দাম
চাষ অপিষ থেকে কিনে আন
এত সস্তায় এত ফল
আর কিসে তুই পাবি বল।

চাষের-নিয়ম

আষাঢ় মাসে "কাড়ান' পেলে
বোল থাকে না কোন কালে
ধৈঞ্চা মারা কাদা করা
মুখের কথায় কাজ সারা
কাদায় মারা ধৈঞ্চার সার
ষোল আনা ফসল তার
আষাঢ়ে কাড়ান সবাই চায়
বছর বছর মেলা দায়
বুদ্ধি খরচ না করলে রে ভাই
কেমন করে ফল পাই
বোশেখে বোনা ধৈঞ্চার গাছ
আষাঢ়ে হবে পৌনে দু হাত
কাড়ান আশায় থাকিস যদি
ধৈঞ্চে নামাতে হবে ক্ষতি
বাড়লে ধৈঞ্চা নোয়ান ভার
লম্বা গাছ কাঠি সার
তাতে সার হবে না

ক্ষেতটা চষা যাবে না
কচি ধৈঞ্চার নরম কাঠি
আষাঢ় মাসের রসা মাটী
বিলাতী লাঙ্গলে দিয়ে চাষ
ধৈঞ্চার উপর মাটী চাপ
রসা মাটীর পেলে চাপ
পোলে সারে ধৈঞ্চার গাছ
ধুলোয় মারা ধৈঞ্চার সার
আট আনা রকম গুণ তার
কাড়ান পেলে কাদা করবি
হিসেব করে ধান রুবি
আষাঢ়ে দুই শ্রাবণে তিন
বাড়াবি যত বাড়বে দিন
রুয়ে ধান ঘুরিস ফিরিস
দেড়া ফসল ঘরে তুলিস।

১। পাঁজ—বা ঝাঁজি এক প্রকার স্যাওলা, ধানের ক্ষেতে দেখা যায়।

২। চাষ আফিষ—বাঙ্গালার প্রতি জেলায়, সরকারি চাষের আপিষ ও আছে।

৩। কাদায় মারা—কাদার সহিত গাছ চষিয়া দেওয়া

৪। বিলাতী লাঙ্গল—দেশী লাঙ্গলে মাটী চাপা দেওয়া যায় না বলিয়া বিলাতী "মেষ্টন" বা হিন্দুস্থান নামক লাঙ্গনে চাষ দিলে ধৈঞ্চার উপর মাটী চালা পড়িবে।

৫। ধুলোয় মাধা বর্ষার পূর্ব্বে স্বাভাবিক মাটীতে চাষ বেওবার নাম ধুলোয় চাষ,-ও ধুলায় মাবা অর্থে শুষ্ক মাটীতে গাছ গুলী মই দিয়া নামাইয়া পরে' বিলাতী লাঙ্গলে চাষ দিয়া-চাপা দেওয়া

এগ্রিকালচুরাল এবং ডেয়ারি ষ্টুডেণ্ট।

———

আষাঢ়, ১৩২৮ সাল।

কমলা গাছের সার

গাছের খাদ্য হইতেছে সার। উদ্ভিদাগণ জমি হইতে এই সার সংগ্রহ করে। উদ্ভিদগণ কিন্তু স্বীয় শীকড় দ্বারা রস ভিন্ন কঠিন পদার্থ দেহ পুষ্টির জন্য নিজ দেহে টানিয়া লইতে পারে না। যে সার জমিতে অদ্রবনীয় অবস্থায় থাকে তাহা দ্বারা উদ্ভিদের কোন উপকার হয় না সুতরাং সারমাত্রকেই উদ্ভিদের গ্রহণীয় অবস্থায় আনা চাই।

কমলা একটি উৎকৃষ্ট ফল, ইহার কাট্তিও বাজারে অনেক অধিক। কমলা আবাদ করিতে হইলে তাহার চাষ কারকিত উত্তমরূপে করিতে হয় এবং সার প্রয়োগ দ্বারা গাছের তেজবৃদ্ধি এবং ফলন বৃদ্ধি করিতে হয় নতুবা মামুলি লাভে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। এক প্রকার জমিতে ১০০ কমলা গাছ বসান যায়।

ইহার উপযুক্ত মৃত্তিকা মেটেল দোঁয়াস এবং প্রত্যেক ফলবান গাছে প্রতি বৎসর নিম্নলিখিত সার প্রয়োগ কৃষি-রসায়নে ব্যবস্থা দেওয়া আছে।

চূণ	...	...	২০ তোলা
পটাস	...	...	১৮
নাইট্রোজেন	...	...	৮ "
গ্রহনোপযোগী			
ফস্ফরিক এসিড	...	...	১৬ "

(কৃষি রসায়ন)

জমি চূণে মেটেল হইলে আর স্বতন্ত্র চূণ দেওয়ার আবশ্যক নাই। ইহার জন্য খনিজ পটাস না দিয়া পানা কিম্বা কলার খোলা ও পাতা পোড়া ছাই কিম্বা কাঠের ছাই ব্যবহার

করা যায়—অবশ্য মাত্রায় অধিক ব্যবহার করিতে হয়। নাইট্রোজেনের জন্য খৈল এবং ফস্ফারিক এসিডের জন্য হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ আবশ্যক। একটা ফলবান গাছে সাধারণ ঝুড়ির অর্দ্ধ ঝুড়ী ছাই, এক সের খৈল এবং দেড় সের হাড়ের গুঁড়া পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে হয়।

এমেরিকার উদ্যান পালকগণ এক একর বাগানে ৬০০ পাউণ্ড মিশ্রসার ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রত্যেক গাছে ৬ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৩ সের সার দেওয়া হয়। আমাদেরও হিসাব তাই।

সার প্রয়োগ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না জল প্রয়োগের ব্যবস্থা চাই কারণ সারটিকে গলাইয়া রসরূপে পরিণত না করিলে উদ্ভিদ তাহা গ্রহণ করিবে না।

জমির উপর সার ছড়াইয়া জমি চষিয়া তাহা মাটির ভিতর প্রবেশ করাইতে হইবে নতুবা সারের অনেক অপচয় হয়। শিকড় দ্বারাই সারের কার্য্য হইবে। সার উপরে থাকিলে বৃষ্টির জলে ও সেচের জলে ভাসিয়া যাইয়া জমি হইতে বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে। খণিজ সার দুর্গম স্থানে পাঠাইবার পক্ষে সুবিধা কিন্তু যেখানে পাওয়া যায় উদ্ভিজ সার, গোময় সার ব্যবহারে লাভ আছে। গোময় সার কঠিন জমির প্রকৃতি বদলাইয়া দেয়—মাটিকে বিশেষ ভাবে কোমল করে। বেলে মাটিতে সার প্রয়োগ বিনা ফলের আবাদ ভাল হয় না, কোন আবাদই হয় না। আগে সার প্রয়োগ দ্বারা জমি তৈয়ারি করিয়া না লইলে আবাদ বসান অসম্ভব। বেলে মাটিতে গোময় সার মিশাইলে তাহাতে রস রক্ষার সুবিধা হয়—বেলে মাটির রস রক্ষা করা বড়ই দুরুহ। রসের সমতা রক্ষা করা আবশ্যক—জমি শুষ্ক হইলে কিম্বা অতিশয় স্যাঁতা হইলে আবাদ ভাল হয় না।

ফলের বাগানে পটাস প্রয়োগ বিশেষ প্রয়োজন। পটাস প্রয়োগ দ্বারা গাছের ফল বৃদ্ধি হয় এবং ফলের আকৃতি ও গুণের উন্নতি হয়। পটাস সারের সুষ্টু প্রয়োগ দ্বারা ফল গুলির শিঘ্র বৃদ্ধি ও পক্কতা নিয়ন্ত্রিত হয়। সার প্রদানের সময়ের উপর আগু পিছু পাকা অনেক সময় নির্ভর করে। প্রথমতঃ সার গাছের গোড়ায় গোড়ায় দেওয়া ভাল। গাছের চারিদিকে গোলাকার খাদ খুলিয়া অথবা দুই সারি গাছের মধ্যে মধ্যে খাদ খুলিয়া তাহাতে সাছর ড়াইয়া মাটি ঢাকা দিতে হয়। এই প্রকারে আলবাল প্রস্তুত করিলে জল সেচনের সুবিধা হয়। কিন্তু যখন গাছ বড় হয় এবং তাহাদের শিকড় ক্ষেতময় ছাইয়া ফেলে তখন সার ক্ষেতময় ছড়ানতে সুবিধা অনেক। এমন লাঙ্গল আছে বা তৈয়ারি করা যায় যাহাতে জমি চাষের সঙ্গে সঙ্গেই সার ছড়ান কার্য্য সমাধা হইয়া যায়।

বসন্ত সমাগম গাছের নূতন পল্লব নির্গত হয়। এই সময় গাছের বৃদ্ধির সময়। ইহার পূর্ব্বকালেই সার প্রদান কার্য্য শেষ করা ভাল। এক পস্‌লা বৃষ্টি হইবার পর কিম্বা জমিটি সেচের জলে উত্তম ভিজাইয়া লইয়া ‘যো’ যুক্ত হইলে তাহাতে লাঙ্গল দিবার সময় সার ছড়াইতে হইবে। কত হিসাব করিয়া কাজ করিলে যে সিদ্ধি লাভ হয় তাহা ভুক্ত

ভোগী না হইলে কেহ বুঝিতে পারে না। পুষ্পোদ্গমের সময় গাছে সার দিতে নাই। কিন্তু পুষ্পোদ্গমের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রতি গাছে ।।০ সের বা ১ পাউণ্ড নাইট্রেট্ অব সোডা সার প্রদান করিলে মুকুল গুলি দৃঢ় হয় এবং ফলের গুটি বেশ সুগঠন হয়। কিছু বৎসর ধরিয়া জমিতে ক্রমান্বয়ে সার দিলে জমি যখন খুব সারবান হইয়া উঠে তখন সারের মাত্রা কমান উচিত। উপযুক্ত আহার যেমন জীবের পক্ষে হিতকর তেমনি বৃক্ষাদির পক্ষেও। অতিরিক্ত সার প্রদানে অতিরিক্ত ফসল হয় না। সব কাজেরই মাত্রাজ্ঞানই আসল জ্ঞান।---উদ্যান তত্ত্ববিদ শশীভূষণ সরকার লিখিত।

পত্রাদি

মৎসের চাষ—

অনেকেই মৎসের আবাদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন। বাঙ্গলার মাছ দুধ ক্রমশই কমিয়া যাইতেছে। সহরে দুর্ম্মূল্য হইলেও দুধ মাছ খরিদ করিতে পাওরা যায় কিন্তু অনেক পল্লীগ্রামে উহা দুষ্প্রাপ্য। ইহার প্রতিকার কি নাই? মাছের পোণা কোথা হইতে সংগ্রহ করা যায় কেহ কেহ ইহাও জানিতে চান।

উত্তর বাঙালার মাছের আবাদ সম্বন্ধে বিশেষ কোন তত্ত্বালোচনা হয় নাই এবং বিশেষজ্ঞগণ তথ্যানুসন্ধান করিয়া কোন সুমিমাংশায় আজিও উপনীত হইতে পারেন নাই। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানে আপাততঃ প্রবৃত্ত না হইয়া মাছ কেন এত দুষ্পপ্য হইতেছে তাহার মোটামুটি কারণ আমরা বেশ বুঝিতে পারি। গোচর ভূমি লোপ পাইয়াছে বলিয়া, গবাদি খাদ্য খড় খৈল দুর্ম্মূল্য হওয়ায় যেমন প্রত্যেক গৃহস্থ এখন গাভী পুষিতে পারে না, তেমনি খাল, বিল মজিয়াছে বলিয়া, বড় জলাশয় গুলি জলশূন্য ও আবর্জ্জনা পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া, নানা কারণে নদী সকলের বেগ মন্দীভূত হইয়াছে বলিয়া, নদীর জলস্রোত এখন আর তেমন দুকুল ছাপাইয়া গ্রামের খাল, বিল, হ্রদ, সববরে প্রবেশ করে না বলিয়া সব জলাশয়ে মাছ কমিয়া যাইতেছে। গঙ্গা, পদ্মা, দামোদর, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদনদী সকল বর্ষাকালে মাছের ডিমে পরিপূর্ণ হয়। এই মাছের ডিম জলের আলোড়নে ফুটিতে থাকে এবং নানা মুখে শত শত গ্রামে প্রবেশ করিয়া সঙ্গে গ্রামের জলাশয় গুলি মাছের পোণায় পূর্ণ করিয়া ফেলে। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অনেক ভোগের বস্তু হইতে আমরা বঞ্চিত হইতে বলিয়াছি।

আমতায়, দামোদরের ধারে, গঙ্গা ও পদ্মার ধারে অনেক স্থানে মাছের পোণা পাওয়া যায়; তাহা ভারে ভারে লইয়া গিয়া পুকুর, ঝিলে বিলে আবাদ করা হইয়া থাকে

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কালীঘাটের গঙ্গায় বলরামবসুর ঘাটে, আমতা, হুগলী, দামোদরের ধারে যেমন মাছের পোণার হাট এখানেও সেই প্রকার হাট হইয়া থাকে। সরকারী বিবরণী হইতে ও অনুসন্ধানে যাহা আমরা জানিতে পারি তাহাতে জানা যায় যে আমতা, হুগলী, আশুগঞ্জ, বলিয়া কান্দি, বানজেটিয়া বরিসাল, বাসুখালী, বহরমপুর, ভাণ্ডারদহ বিল, ছাগলদহবিল, চাঁপাডাঙ্গা, চাঁদপুর, ঢাকা, ডেমরা, দামুকদিয়া, দৌলতপুর ফালাকাটা, ঘাটভোজ, গোয়ালন্দ, গোপালগঞ্জ, খুলনা, কোলাবিল, মাদারিপুর, গিরকাদিম, নারায়ণগঞ্জ, পাঁশকুড়া, পাংশা, সারাঘাট, জাগুলা, কালিগঞ্জ, কটিয়াখাই, কিষণগঞ্জ (খাগড়া) এবং চিলকা হ্রদে এই সকল স্থানেই মাছের আড়ঙ্গ।

সকল স্থানেই পূর্ব্বাপেক্ষা মৎস্য আমদানী কমিয়া আসিতেছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া প্রতিকার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে বাঙালার, বিহার উড়িষ্যায় (যাহা পূর্ব্বে বাঙলা প্রদেশ বলিয়া খ্যাত ছিল) মাছের অসচ্ছলতা ক্রমশঃ বাড়িবে। ইহাতে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন এবং প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ। কিন্তু আমরা সমবেত চেষ্টা খালি বিল জলাশয় গুলির সংস্কার সাধন করিতে পারি। এবং নদ নদী হইতে শতমুখে যাহাতে জলস্রোত গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারি, স্রোতের রুদ্ধ দ্বার গুলি মুক্ত করিয়া দিতে পারি।

কিন্তু আমাদের সমবেত চেষ্টারঅভাব এবং সরকারি সাহার্য্যেরও অভাব।

আমরা জ্ঞাত আছি রোহিতাদি মৎসের ও ইলিস মৎস্যের বৈজ্ঞানিক উপায় ডিম ফুটাইবার জন্য কটকে ও বকসারে দুই স্থানে দুইটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে সেখানে কিরূপ ভাবে কার্য্য চলিতেছে আমরা আজ পর্য্যন্ত জ্ঞাত নহি।
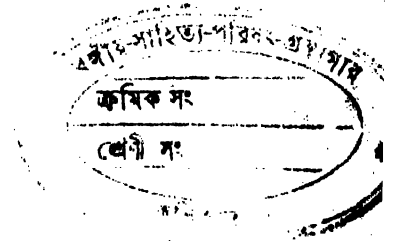
বাগানের মাসিক কার্য্য

শ্রাবণ মাস।

কৃষিক্ষেত্র—যে সকল জমিতে শীতকালের ফসল করিতে হইবে, তাহাতে এই মাসে গোময়াদি সার প্রয়োগ করিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

সার মিশ্রিত গামলা বা কাঠের বাক্সে কপিবীজ বপন করিয়া এই সময় চারা তৈয়ার করিতে হয়। মৃত্তিকার সমপরিমাণ পাতাসার মিশ্রিত করিতে পারিলে ভাল হয়। জল্দি ফসলের জন্য ইতিপূর্ব্বেই চারা প্রস্তুত হওয়া উচিত। আর একটি কথা এস্থলে বলা আবশ্যক যে, অধিক জমিতে চাষ করিতে গেলে বাক্সে বা গামলায়

বীজ বপন করিয়া পোষায় না। উচ্চ জমিতে চারিদিকে আইল দিয়া বীজ বপন করিতে হয়। বীজতলা আবশ্যক মত হোগলা দিয়া ঢাকিয়া রাকিতে হয়। কোন কোন সুনিপুণ চাষী পেতো বাঁশের মাচান করিয়া তাহার উপর ৬।৮ ইঞ্চি পুরু মাটি ছড়াইয়া বীজ বপন করে।

অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট বোমা বা বিচালী গুচ্ছের অগ্রভাগ দ্বারা বীজক্ষেত্রে জল ছিটাইতে হয়।

আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক মাসে আলু বসাইবে, সে সকল জমিতেও এই সময় উত্তমরূপ চাষ দিতে হইবে ও সার ছিটাইতে হইবে।

শীতকালে জন্য লাউ, কুমড়া বীজ এই সময় বসাইবে। লাউ, কুমড়া বীজ ৩.৩ দিন হুকার জলে ভিজাইয়া বপন করিলে বীজগুলি পোকায় নষ্ট করিতে পারে না।

ওল ও মানকচু তুলিবার এই সময়। এই সময় তাহারা খাইবার উপযুক্ত হয়।

এই মাসের প্রথমেই, উত্তর-পশ্চিম, বেহার প্রভৃতি স্থানে কপির চারা ক্ষেত্রে বসান শেষ হইয়া যাইবে। বাঙ্গালা প্রদেশে এই মাসের শেষে কার্য্য আরম্ভ হইবে। পাটনাই ফুলকপির চারা ক্ষেত্রে বসান এতদিন হইয়া যাওয়া উচিত।

সেলেরী (Celery), এসপারেগস (Asparagus) ও দুই এক জাতীয় টমাটোর Tomoto) চাষ এই সময় হওয়া উচিত।

লাউ, কুমড়া, শাঁকালু, বীট, পাটনাই শালগম ও গাজর, পালম, নটে প্রভৃতি নানাপ্রকার শাক সব্জী, শসা প্রভৃতি দেশী সব্জী তৈয়ার করিতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

মুলা, মটর প্রভৃতির জন্য জমিতে গোবর সার দিয়া ভাল করিয়া চযিয়া তৈয়ারি করিয়া রাখিতে হইবে।

ফলের বাগান—লিচু, লেবু প্রভৃতি ফলগাছের যাহাদের গুল কলম করিতে হইবে তাহাদের গুল কমল করা শেষ হইয়াছে, কিন্তু আম প্রভৃতির জোড়কলম বাঁধা এখন চলিতেছে।

বীজ নারিকেল, হইতে চারা করিবার জন্য এই সময় মাটিতে বসাইতে হইবে।

যে সকল নারিয়কল গাছ হইতে পাকিয়া ও শুকইয়া আপনি পড়ে, তাহাদিগকে গলন নারিকেল কহে। একটী শীতল স্থানে কাদা করিয়া তাহাতে গলন নারিকেল এক পাশে হেলাইয়া বোঁটার দিক উপরে রাখিয়া বসাইতে হয় ও আবশ্যক মত জল সিঞ্চন করিতে হয়।
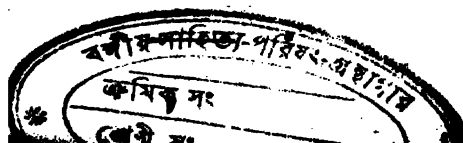
কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

২২শ খণ্ড। { ভাদ্র, ১৩২৮ সাল। { ৫ম সংখ্যা

পল্লীর দুর্দ্দশা।

ইদানীং দেশের চতুর্দ্দিক মহা হৈ চৈ রব উঠিয়াছে, পল্লীগ্রাম সকল উৎসন্ন হইল। উৎসন্ন না হইবে কেন? এক দিকে দেশের প্রাকৃতিক জলধার সমূহ মজিয়া যাইতেছে। জলস্রোত সব অবরুদ্ধ। তারপর রেলওয়ে সাধারণ জল নির্গমের পথ বন্ধ করিয়া পল্লী সমূহ অসাস্থ্য কর করিয়া তুলিতেছে। যে সকল পল্লী পুকুর পুষ্করিণীর জলের উপর নির্ভর করিত তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এক কালে দেশের অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ই যেমন পল্লী সমূহের প্রধান কারক ছিলেন, আজ তাহারাই তাহাদের ধ্বংসের প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। "সহর বাস রোগে" আক্রান্ত প্রত্যেক অবস্থাপন্ন ব্যক্তিই পল্লীর বাস্তুভিটা ত্যাগ করিতেছেন। অবস্থাপন্ন শিক্ষিত সম্প্রদায় এইরূপে পল্লীর সহিত সমুদয় সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলে কে আর তাহাকে রক্ষা করিবে? অবশ্যই প্রতিগ্রামে ২।১টী—অবস্থাপন্ন ব্যক্তির বসতি আছে। পূর্ব্বে ইঁহারাই পুষ্করিণী খনন, রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া পল্লীর শোভা সম্পাদন করিতেন। পূর্ব্বে ইঁহারাই পল্লীর মা বাপ ছিলেন, আজ তাহারা সহরে আশ্রয় লওয়ায় পরিত্যক্ত পল্লী সমূহ বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় নীত হইতেছে। আমরা যখনই যে কোন পল্লীর অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি পাত করি, তখনই দেখিতেই পাই, শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন ভদ্র সম্প্রদায় কার্য্যোপলক্ষে দূর দেশে থাকিলেও গ্রামবাসীর সহিত তাহাদের একটা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল। আত্মীয় স্বজন বাটীতেই থাকিত, বারমাসে তের পার্ব্বণ বাটীতে নিয়মিতই সম্পন্ন হইত, পূজা বা বৃহৎ ব্যাপার উপলক্ষে তাহারা কর্ম্মস্থল হইতে বৎসর বৎসরই বাটী আসিতেন, বিদেশ হইতে অর্থোপার্জ্জন করিয়া তাহা আসিয়া দেশে ব্যয় করিতেন, কত নিরন্নকে অন্ন দিতেন, কত গরিব দুঃখীকে বস্ত্র দিতেন, কত প্রকারে কত লোকের উপকার করিতেন, গ্রামের

রাস্তা ঘাট প্রস্তুত করাইতেন, আবশ্যক মত সেই সমস্ত সংস্কার করাইতেন, পুকুর পুষ্করিণী খনন করাইতেন, গ্রামের দশ জনে মিলিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন, মহা সমারোহে পৈতৃক ক্রিয়া কাণ্ড সম্পন্ন হইত। কিন্তু ইদানীং তাহার ঠিক বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে। যিনি অদৃষ্ট ক্রমে উপার্জ্জনের মুখ দেখিলেন অমনি পল্লী ত্যাগ করিলেন, যাহাদের বিষয় সম্পত্তি আছে, তাহারা ইষ্টক স্তূপের উপর আমলাদের জন্য একখানি কুঁড়ে ঘর রাখিয়া সহরে বসিয়া পেন্সন ভোগীর ন্যায় মাসে ২ মাসহারা পাইতেছেন, আর হাওয়া খাইতেছেন, মফঃস্বলে আমলা বর্গের যথেচ্ছ ব্যবহারে প্রজা উৎসন্ন হইতেছে, কি উন্নতির পক্ষে অগ্রসর হইতেছে, তাহা একবার চক্ষু তুলিয়াও দেখেন না, আমাদের এইরূপ নাগরিক জীবন দেশের বিচ্ছিন্ন অর্থশক্তিকে সহরে কেন্দ্রীভূত করিতেছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্ট সম্প্রদায় যে বিশেষ সাহায্য করিতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু কেহ কি বলিতে পারেন পল্লীবাসী সহরের নিকট হইতে এপর্য্যন্ত কতটুকু প্রত্যুপকার পাইয়াছে? পল্লী গ্রামের প্রসঙ্গ উঠিলে সাধারণতঃ অনেকে চক্ষু কোঠর গত করে, কখনও বা বিকটভ্রূভঙ্গি করেন, আবার কখনও ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করেন। উদ্দেশ্যহীন শুষ্ক রাজনৈতিক গূঢ়তর্কে মাথা ঘামাইতে পারেন, বিসমার্ক গ্লাডষ্টোনের কথা লইয়া লড়াই করিতে পারেন, অথচ এদিকে নিজের গোশালা যে ভগ্ন সেদিকে দৃক্‌পাতও নাই, ঘরের কথা উঠিলে ইহারা "নোংরা" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকেন, ফলতঃ নোংরা যে কে করিল, তাহা আর তলাইয়া দেখেন না।

এক্ষণে যাহারা দেশের নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষিত, জন সাধারণের দৃষ্টিকে পল্লীগ্রামের দিকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন, তাহাদের আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আজ অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন, যাহা কিছু সম্পদ, যাহা কিছু নিজস্ব, আমাদের জাতীয় জীবন গঠনের যাহা কিছু উপাদান, তাহা সেই চির দিনের শান্তির নীড় ছোট ২ গ্রাম গুলিতে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। পল্লীবাসী অভাবের তাড়নায় ও কলেরা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মহা মারীতে উৎসন্ন প্রায় হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে আছে কেবল অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ, কলেরা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধির জীবাণু পূর্ণ কতকগুলি মানব মূর্ত্তি। গ্রামে চিন্তাশীল, কর্ম্মবীর ও সহানুভূতি সম্পন্ন জনগণের অভাবই ইহার অন্যতম কারণ। গ্রামে সুশিক্ষিত লোকের অভাব বলিয়াই গ্রামের এত দুর্দ্দশা। সুচিকিৎসক নাই বলিয়া সুচিকিৎসা হয় না। উপযুক্ত বিদ্যালয় নাই বলিয়া সুশিক্ষা হয় না, কাজেই লোকে মূর্খ ও চরিত্রহীন হইয়া পড়ে। হিংসা, দ্বেষ, দলাদলি, ঝগড়া বিবাদ পরধন পরস্ত্রী হরণ ইত্যাদি অতি জঘন্য কার্য্যগুলিই অনুষ্ঠিত হয়। পল্লীগ্রামের অধিকাংশ সমাজের অবস্থাই এইরূপ।

মনুষ্যের মধ্যে অধিকাংশই অন্যের নির্দ্ধারিত পথে চলিয়া থাকে এবং অল্প সংখ্যকই নিজে কর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া লইতে সক্ষম। আমরা চাকরী প্রিয়, বিনা ঝঞ্ঝাটে মাসান্তে মাহিয়ানার টাকা কয়টী পাইলেই বড় খুসী, এবং সেই কার্য্য জুটাইবার জন্যই পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরে বাস করি। নচেৎ কর্ম্ম সৃষ্টি করিয়া লইতে পারিলে কত শত কার্য্য আছে, যাহাতে বেশ সম্মানের সহিত জিবীকা নির্ব্বাহ উপযোগী অর্থাগম করা সম্ভব। দেশের নেতৃগণের কর্ত্তব্য পল্লীগ্রামের কি কি কার্য্য কি প্রণালীতে করা সম্ভব তাহার একটা মোটামুটী ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া। পল্লীর কথা গুলি চিন্তা করিলে আমাদের কতকগুলি বিষয় সর্ব্বপ্রথমই মনে উদিত হয়। পল্লীর স্বাস্থ্য কার্য্যকরী শিক্ষার অবস্থা, কৃষির অবস্থা, পল্লী শিক্ষা বিষয়ের উপায়, চোর বদমায়েস ডাকাতের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা, পল্লীগ্রামের আহার্য্য দ্রব্যের ও পরিধেয় বস্ত্রের সংস্থান, গ্রাম্য পশুদের স্বাস্থ্য ও দুগ্ধ সংস্থান ইত্যাদি বিষয়গুলির আলোচনা করিয়া একএকটী কার্য্য কিরূপে সংস্কৃত হইতে পারে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ আবশ্যক। এক্ষেত্রে অনেকেই উপদেশক সাজিয়া অনেকানেক পথ দেখাইতেছেন। ফলতঃ পল্লীবাসীর পক্ষে কোন্ উপায় সহজ তাহাই বিশেষ আলোচ্য।

পল্লীগুলি বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর। এক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করিলে পানীয় জলের অভাব পূরণ হয় ও বন জঙ্গল ডোবা নালাদি পরিষ্কার করা সম্ভব ইহাই সর্ব্বপ্রথম চিন্তানীয় বিষয়।

অনেক উপদেষ্টা বলিতেছেন যে গবর্ণমেণ্টের উপর ভরসা করিয়া অথবা সর্ব্বদা সেই আসায় বসিয়া না থাকিয়া পল্লীবাসীগণের সমবেত শক্তির উপরেই নির্ভর করা উচিত। প্রত্যেক পল্লীবাসী একযোগে যদি কোমর বাঁধিয়া এই সকল উপদ্রব দূর করিতে যত্নপর হন, তবে পল্লীর এই দুর্দ্দশা কয়দিন টিকিতে পারে? যাহারা এই উপদেশ দিতেছেন তাহাদিগকে নিন্দা করিতে পারি না। কিন্তু কথা ও কার্য্য দুই সমান ও সহজ নহে। একত্র কোমর বান্ধাই যদি সহজ হইত, তবে আমদের নিকট কোন কাজই অসম্ভব বোধ হইত না ও বর্ত্তমান দুর্দ্দশার সঙ্গেও সাক্ষাৎ হইত না। কিন্তু ভাই একত্র ও একজোট হওয়ার শক্তিটুকুরই একান্ত অভাব। এরূপ যদি কোন উপায় থাকে যাহাতে সেই শক্তিটুকু আমাদের জাতীয় জীবনে প্রবেশ করান যায়, তবে কার্য্য আপনা হইতেই হইতে থাকিবে ও দেশের সর্ব্ববিধ সমস্যা সহজ হইয়া যাইবে। আমরা কথা বলিতে খুব পটু। উপদেশ দেওয়া সহজ, কিন্তু পল্লীবাসীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া সকলকে একজোট করিয়া কার্য্য করা নিতান্ত দুরুহ ব্যাপার। যাহারা পল্লীবাসীকে উপদেশ দিতেছেন, তাহাদের কোন কার্য্যই দেখা যায় না, পল্লীবাসীকে যে উপদেশ দেওয়া হয় তাহার মর্ম্ম তাঁহারা নিজেই বুঝেন না। ফলতঃ শিক্ষার অভাবে অন্নচিন্তা ও ব্যাধির তাড়নায় তাহারা বড় বিব্রত যে কোন কথা বা কোন উপদেশই তাহাদের প্রীতিকর হয়

না, অথবা কোন সৎচিন্তাও তাহাদের মনে উদয় হয় না, সুতরাং পল্লীবাসীর মঙ্গলের জন্য যাহারা সচেষ্ট. আমাদের অনুরোধ পল্লীবাসীর অবস্থার সহিত পরিচয় লাভের জন্য তাহারা প্রথম চেষ্টা করুন, তৎপরে তাহাদের মতামত ও নির্দ্দিষ্টপথে গ্রামবাসীকে চালিত করিবার জন্য লোক আবশ্যক। আমরা যতটুকু গ্রামের অবস্থা বুঝি তাহাতে এই লোকেরই অভাব দেখি এবং সেই অভাব পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন প্রস্তাবই কার্য্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব হইবে না. কেবল বাহিরের উপদেশ অথবা কেবল মুখের কথায় এ কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। সর্ব্বপ্রথমও সর্ব্বপ্রধান বাধা এই যে পল্লীগ্রামের উপর দেশের জনসাধারণের একটা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব আছে। সেই ভাবটী দূর করিতে হইবে। দেশের নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণের মধ্যে যাহারা পল্লীগ্রামের উন্নতির আবশ্যকতা অনুভব করিতেছেন, তাহাদিগকে ব্যক্তিগত ও সমবেতভাবে দেশের লোককে এবিষয়টীর গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করাইতে চেষ্টা করিতে হইবে। পল্লীবাসের আবশ্যকতা ও যেখানে বাস করা যে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সর্ব্বপ্রধান দেশসেবা, একথা দেশবাসীকে প্রাণে প্রাণে বুঝান দরকার। তদ্ব্যতীত পল্লী সেবাব্রত যাহারা গ্রহণ করিবেন, তাহাদের যে দেশবাসী তুচ্ছ করে না, একথাও দেশবাসীর দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে। এ কথায় সন্দেহ নাই নাই যে দেশ সেবক কখনও জনসাধারণের নিন্দা বা প্রশংসার জন্য কোন কার্য্যে অগ্রসর হন না। কিন্তু তাহাদের সম্মান করিলে আমাদের জাতীয় আদর্শ উন্নত হইবে এবং সে আদর্শে নূতন সেবকদলের সৃষ্টি হইবে. এইজন্যও আমরা ইহা চাহি যে প্রকৃত দেশসেবককে সাধারণে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে, দেশবাসী যে তাহাদের সেবার মর্ম্ম অনুভব করে, এ চিন্তা তাহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে অনুপ্রেরণা প্রদান করে ইহাতে সন্দেহ নাই। এজন্য বলিতেছিলাম যে দেশসেবকদিগকে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেই নেতৃবৃন্দের কর্ত্তব্যবোধ হইল না, তাহাদের সেবার প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুরূপ সম্মান প্রদর্শনও আবশ্যক। আমাদের জাতীয় মহাসমিতি, জেলা সমিতি, প্রাদেশিক সমিতি প্রভৃতি এই সেবকদের উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিবেন। আমরা যেন কেবল যাহারা গলাবাজী করিতে সক্ষম, তাহাদেরই সম্মান করিয়া জাতীয় আদর্শকে ছোট না করি। আমরা যেন এই নিভৃত সেবকদের সেবা করিয়া নিজেরা ধন্য হই ও দেশের উন্নতি করি। প্রকৃত দেশসেবার আদর ও মর্ম্ম আমরা উপলব্ধি করি না সে আমাদেরই দুর্ভাগ্য একথা যেন বিস্মৃত না হই। বর্ত্তমান সময়কে আমাদের জাতীয় জীবনের উন্মেষ সময় বলা অসঙ্গত নহে। এ সময়ে দেশসেবা কাহাকে বলে ও কি করিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইতে পারে, এ কথাটী ধ্রুবতারা সংবাদপত্র, বক্তৃতাদির সাহায্যে দেশকে জাগ্রত করিতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। পল্লীসেবার আবশ্যকতা দেশের নেতৃবৃন্দের রচনা ও বক্তৃতার বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য।

আমাদের জাতীয় মহাসমিতি, প্রাদেশিক সমিতি, সমস্তই জনকত শিক্ষিত লোকের

আন্দোলন, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, প্রকৃত জাতি এই জাতীয় মহাসমিতির সংবাদও রাখে না, আর আমরাও তাহাদের সংবাদ দেওয়া আবশ্যক মনে করি না, সেই জন্যই পল্লীগ্রামের এই শোচনীয় অবস্থা। আমাদের যাহারা নেতৃস্থানীয় তাহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই পল্লীগ্রামের ধারণা নাই, তাহারা সহরে বাস করিয়া শিক্ষিত লোকের সংস্রবেই আসিয়া থাকেন। সহরের বাহিরে লক্ষ লক্ষ দেশবাসী যে কি প্রকারে জীবন যাপন করে, এ চিন্তা তাহাদের নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এ ভাবটী দূর করা আবশ্যক। উপযুক্ত পথ প্রদর্শক হইলে সে পথে চলিবার লোকের অভাব হইবে না। দেশবাসীকে ইচ্ছাপ্রিয় না করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দেন যে, নীরবে নিভৃতে পল্লীবাসে বসিয়াও দেশের সেবা করা সম্ভব। আর অর্থ সম্বন্ধে এইমাত্র অনুভব করি যে, অর্থাভাবে এপর্য্যন্ত জগতে কোন বড় কাজ বন্ধ থাকে নাই, যাহা কিছু অভাব মনুষ্যত্বের। দেশের নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশকে মানুষ করিতে চেষ্টা করুণ। একনিষ্ঠ স্বার্থশূন্যভাবে দেশবাসী দেশের সেবা করিতে পারে, এই আদর্শে তাহাদিগকে উদ্বোধিত করিয়া তুলুন, আদর্শের পশ্চাতে কাজ আপনিই সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে। কোন প্রতিবন্ধকেই তাহা বন্ধ থাকিবে না।

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত

আমরা বলি —পল্লীতে ও দেশের মধ্যে সাবলম্বনের ভাব জাগাইতে হইলে দেশে সৎশিক্ষার আয়োজন আবশ্যক—শিক্ষা অর্থে কার্য্যকরী শিক্ষাই বুঝি। আমরা বি, এ, এ, মে প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যায় শোভন ছাত্র আপাততঃ আমরা চাই না, আমরা চাই কর্ম্মক্ষম, কর্ম্মীছাত্র। ভাব প্রচার প্রথম এবং প্রধান কার্য্য। ৮।১০টী বা ততোধিক গ্রাম লইয়া এক একটি গ্রাম্য বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারিলে ভাল হয়। সেখানে বালকগণ কেবল লিখিতে, পাড়তে, অঙ্ক কষিতে শিখিবে না, সেখানে তাহাদের সাংসারিক প্রয়োজনানুরূপ সর্ব্বপ্রকার শিক্ষায় আরম্ভ হওয়া আবশ্যক। এইরূপ বিদ্যালয়ে ছেলেরা কৃষি ও উদ্যান চর্চ্চা করিবে, গোপালন ও গোরক্ষা শিখিবে, কামারের কাজ, ছুতরের কাজ, কোমরের কাজ, সুতাকাটা বস্ত্র বয়ন শিক্ষা করিবে।

এই প্রকার বিদ্যালয় কতকগুলি গ্রাম সমষ্টির কেন্দ্র স্বরূপ হইবে। বিদ্যালয়ের সংস্রবে প্রচুর জমি থাকা চাই অন্ততঃ ৩০০।৪০০ বিঘা। সেখানে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি কার্য্য পরিচালনা, গোরক্ষা, এবং খাদ্যার্থ পশুপক্ষী পালন করা যাইতে পারিবে। গ্রাম সমূহের সব অভাব এখান হইতে মিটিবে না—ছাত্রেরা কাজ শিখিলে, কাজের কৌশল হৃদয়ঙ্গম করিলে তাহারা স্বতন্ত্র ভাবে কাজ চালাইতে পারিবে। দেশের জমিদার ও গ্রামবাসীগণ একত্র হইয়া উদ্যোগী হইলে এই প্রকারের বিদ্যালয় এবং তৎসংক্রান্ত ক্ষেত্রে স্থাপিত হওয়া বিচিত্র নহে।

বিদ্যালয় সংলগ্ন ক্ষেত্রে সুবৃহৎ জলাশয় থাকিবে এবং তাহার চারি পাশ পরিখা বেষ্টিত হইতে পারিবে। এখানে ছেলেরা মাছের চাষ করিবে এবং মৎস্য তত্ত্ব আলোচনা করিবে।

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য তত্ত্ব ও সমাজ তত্ত্বের আলোচনা নিশ্চয়ই হইবে এবং স্থানীয় অভাব, অভিযোগ নিবারণের জন্য ছাত্রদিগকে বাল্য জীবন হইতে দীক্ষাদান করা হইবে। চাই কর্ম্ম—কেবল আলোচনা ও জল্পনা নহে। আমাদের এই প্রস্তাবটি আপাততঃ কাল্পনিক বলিয়া মনে হলেও ইহাতে যে অন্তর্নিহিত সত্য আছে—সেটা স্বাবলম্বন। দেশে আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে এই মূল মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে হইবে।

প্রথম ছাত্র জীবন হইতেই ব্যবসায়ে অনুরক্তি জন্মাইতে হইবে। এক জনের নিকট হইতে ব্যবসায়ের জন্য মূলধন সংগ্রহ নাও হইতে পারে। সকলে কিছু কিছু দিয়া মূলধন যোগাড় করিয়া লওয়া সম্ভব। শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবকগণ এক যোগে কাজে প্রবৃত্ত হইলে তাহা সংগ্রহ হইতে কাল বিলম্ব হইবে না।

এই মূলধন দ্বারা ধান চাল কেনা বেচা, পরিধেয় বস্ত্র কেনা বেচা, সকল ছাত্রের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ও সংসারের আবশ্যক এমন সব পণ্যের আদান প্রদান চলিবে। প্রকৃত পক্ষে ইহা একটি যৌথ কারবার, সকলেরই ইহাতে স্বার্থ সকলেই ইহাতে উদ্যোগী, সকলেই ইহাতে লাভবান। মোটের উপর কিছু উৎপন্ন করা চাই, স্থানীয় অভাব মোচনের জন্য প্রাণপণ করা চাই, যাহা স্বস্থানে উৎপন্ন হইবে না তাহাই বাহির হইতে কিনিতে হইবে। এই প্রথায় বিদ্যালয় গঠিত হইলে বিদ্যালয়ের খরচ অচিরে উঠিয়া যাইবে, উপরন্তু লাভ হইবে। সে লাভের অংশী ছাত্রেরা, শিক্ষকেরা, অভিভাবকেরা। ইহা আকাশ কুসুম নহে বা আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত কাল্পনিক নহে, সুকার্য্যের অবশ্যম্ভাবী সুফল। সংসার ও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে শিক্ষা সে শিক্ষা কোন কালেই সুশিক্ষা হয় না। ছেলেদের সংসার ও সমাজের মধ্যে রাখিয়া, সংসার ও সমাজের অভাব, অনাটন মধ্যে লালন পালন করিয়া তাহাদের ছাত্র জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

যাহা কিছু খাই, পরি, দেখি তাহা জমি হইতেই উৎপন্ন হয়। জমির সহিত ছেলেদের আত্মীয়তা ঘটাইতে পারিলে কাজ হইবে এবং সেই কাজ কাজের মত হইবে। তাই বারম্বার বলি প্রথম হইতেই ছেলেদের মাটি ঘাঁটিতে দাও জানিও মাটিতে কাহাকেও মাটি করে না।

বহির্বাণিজ্যের কথা আপাততঃ নাই ভাবিলাম। উপস্থিত কালে দেশের জলমাটি লইয়া কতটা কাজ করিতে পারি, নিজ নিজ পল্লীবাসের কতটা উন্নতি করিতে পারি সেই চিন্তাই করি না। সহরে বাসে ধড়ি ধক্কা ব্যবসায়ে হঠাৎ ধনবান হওয়া যায় বটে কিন্তু সেই সকল ধনবান, দেশের কয়জন লোকের প্রকৃত উপকার করেন? তাঁহারা

ধনবান হইতে পারেন কিন্তু যথার্থ বড় মানুষ তাঁহারা হন না। রাজার প্রজার সম্বন্ধ পল্লীবাসে, চাষবাসে, পল্লীবাসের অভাব অভিযোগ মোচনে। এই জন্য আমাদিগকে আবার পল্লীবাসে ফিরিয়া যাওয়া উচিত। কৃঃ সঃ।

মুর্গীর চাষ বা পুল্‌ট্রীফার্ম্মিং

ভারতবর্ষ পত্রিকায় "ইঙ্গিত" শীর্ষক প্রবন্ধে ২।১টি পুল্‌ট্রীফার্ম্মিং সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া খুবই আনন্দলাভ করিলাম বটে, কিন্তু লেখকের সব কথার স্বার্থকতা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। তিনি সামান্য পুঁজির গরীব ও গৃহস্থের আয়ের দিকে লক্ষ্য না করিয়া প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয়, আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই ক্ষুদ্র গৃহস্থ (small holder)। মুর্গী চাষ তাহাদেরই অনুরূপ করিয়া লিখিতে হইবে, যাহাতে সকলেই তাহা অনুসরণ করিয়া জীবীকা অর্জ্জন করিতে পারে। "ইঙ্গিতের" লেখকের ধারণা যে বড় যৌথ কারবারে আমাদের বাঙ্গালা দেশে মুর্গীচাষ প্রবর্ত্তন করা সহজ। যে দেশের লোক আজপর্য্যন্ত একটা যৌথ কারবার বা ডোয়ারি লাভে পরিচালিত করিতে পারিল না, সে দেশের লোক ২০।৩০ হাজার টাকা একত্র করিয়া বড় ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মুর্গীচাষ প্রবর্ত্তন করিবে, তাহা বর্ত্তমান সময়ে কিছু অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। মাছের চাষ ও হাঁসের চাষ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে মুর্গীর চাষ আমি বেশ চালাইয়া দিতে পারি। পাখী, কলাদি আনাইয়া দিতে পারি। ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে যদি ২।৩ বা ৫ জন যৌথ কারবারে কাজ করিবার উপযুক্ত মহাজন পাই তাহা হইলে আরও ভাল হয়। ১০।১২ হাজার টাকা লইয়া বেশ মোটা লাভ করা যাইতে পারে। এই ব্যবসায়ে বাৎসরিক খরচা বাদে এতদ্‌সংলগ্ন ঝিলের মধ্যে যে মাছ আছে বিক্রয় করিয়া অনেক টাকা লাভ করা যাইতে পারে। যেমন risk তেমনি লাভ,ইহা কারবারের নিয়ম। সৎ লোক ও বিশ্বাস চাহি কিন্তু আমাদের দেশের লোক সকল দেশের নেতা সাজিয়া যে হানি করিয়াছেন ও করিতেছেন ও যৌথ কারবার ভাসাইবার পক্ষে বিশ্বাস হরণ করিয়া অন্তরায় উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা বঙ্গবাসী কি হিন্দু কি মুসলমান কাহারও অবিদিত নাই। যাহাহউক ভাল সৎলোকের তত্ত্বাবধারণে এইরূপ কারবার করা অযৌক্তিক হইবে না বলিয়া আমার মনে হয়। দেখুন মাড়োয়ারী সম্প্রদায় এত সভাসমিতি করিয়া অদ্যাবধি যৌথ ডেয়ারি কলিকাতায় প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলেন না। 'এটা সহজ কাজ নয়,; আমাদের দেশে শিক্ষার অভাব, লোকের অভাব, বিশেষজ্ঞের অভাব, পুঁজীর অভাব, কর্ম্মীর অভাব—সবেরই অভাব!

বিলাতি মুর্গীর দাম এদেশের দেশী খেঁটুরে মুর্গী অপেক্ষা বেশী হইলেও তাহা পোষণ করা, তাহার চাষ করা বেশী লাভজনক। আমেরিকা প্রদেশের ফিশেলের "শ্বেত প্লিমথ রক্" জাতীয় মুর্গী চূড়া, খাশী জগৎবিখ্যাত। ইহাদের ফারমে প্রতিবৎসর ৩০ কোটী কেবল এই জাতীয় মুর্গী অপর জাতীয় মুর্গী এবং জলচর পক্ষী উৎপাদিত হইয়া থাকে। বিলাতের টুভী, বেল, বার্ণি, গান, মল্লক, পোটার, ইষ্টম্যান প্রভৃতি উৎপাদকগণ ইউরোপ প্রসিদ্ধ। আমি ইহাদের নিকট হইতে ভাল ভাল জাতীয় পাখী অর্ডার পাইলে আনাইয়া দিতে পারি।

(১) আমেরিকার মুর্গীর জাতি মধ্যে প্লিমথরক্, ওয়াণ্ডোট্, জাভা ডমিনীক্, বাক্আই এবং আইল্যাণ্ডরেড ইহারা উত্তম বসিয়ে (Sitters) এবং উত্তম পালিকা (good mothers)। ইহারা সকলেই ব্রাউন বর্ণের ডিম দেয়, ইহাদের পায়ে পর হয় না এবং চর্ম্ম এবং পায়ের রং হরিদ্রাভ হয়। জাভাদের পা কাল হয়।

(২) ডিমদাত্রী জাতির মধ্যে ভূমধ্যসাগরের জাতিসকল এবং ইউরোপীয় কন্টিনেণ্টাল জাতিগুলিকে জ্ঞাপন করে। এই পরিবারের মধ্যে আমরা লেগহর্ণ, কাম্পিানী, মিনর্কা স্পেনীয় এবং আনকোনা জাতিগুলির উল্লেখ করিতে পারি। পুনশ্চ এই পরিবারের মধ্যে সিঙ্গেল কোম্ব শ্বেত লেগহর্ণগুলি কৃষককুলের খুবই প্রিয়। যদি আমাদের দেশের ৫।৭জন সমবেত হন আমি এইরূপ মুর্গী ইম্পোর্ট করিয়া দিতে পারি।

ডিম্বদাত্রী জাতিগুলির লেগহর্ণগুলি কিছু কিছু ডিমে বসে কিন্তু তাহারা ভাল "বসিয়ে (sitters) হয় না। ইহারা খুব চরণশীল ও উড়িতে পারে, সেইজন্য ২।১টা ওড়ন পালক "ছিন্ন করিয়া দিলে ইহারা বেড়া বা প্রাচীর অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিবে না। ইহার পায়ে "পর" হয় না এবং সাদা ফলযুক্ত হয় (lobes) ও সাদা ডিম দিয়া থাকে। লেগহর্ণ জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পরিবার আছে যেমন একেনে কোম্বযুক্ত ব্রাউন, রোজ কোম্বযুক্ত ব্রাউন, একেনে কোম্বযুক্ত শ্বেত, রোজ কোম্বযুক্ত শ্বেত, একেনে কোম্বযুক্ত বাফ, রোজ কোম্বযুক্ত বাফ একেনে কোম্ব ঝুঁটীযুক্ত কাল, রুপুলী এবং লাল পাইল। সেইরূপ মিনর্কা শ্রেণীর মধ্যে একেনে কোম্ব ঝুটিযুক্ত কাল, রোজ কোম্বযুক্ত কাল, একেনে কোম্বযুক্ত শ্বেত, একেনে কোম্বযুক্ত বাফ পরিবারগুলির উল্লেখ করিতে পারি। ৩। স্পেনীয় পরিবারের মধ্যে সাদামুখো কাল এবং নীল (blue) আন্দুলেশীয়গণই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৪। আনকোনা পরিবারের মধ্যে একেনে ও রোজ কোম্বযুক্ত এই দুই জাতির পক্ষী হইয়া থাকে। ৬। কন্টিনেণ্টাল জাতির মধ্যে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি কাম্পনী পরিবারের আমোল্লেখনীয়, তন্মধ্যে রুপুলী ও সোণালি পরিবারের নাম এস্থানে বলা কর্ত্তব্য।

এইবার এসিয়াটিক বিলাতী এবং ফরাসী জাতিগুলির শ্রেণী বিভাগের কথা উল্লেখ

করিব। এইগুলিকে মাংস বা মেজের পাখী চলিত ভাষায় বলিয়া থাকে। জেনারেল পায়পাস জাতি যেমন প্লিমথরকাদি, তাহাদের অপেক্ষা ইহারা বড় ও ভারী হইয়া থাকে এবং জেনারেল বা সাধারণ কাজের জাতিগণ ডিম্বদাত্রী শ্রেণীগণের অপেক্ষা আকারে বড় হয়। উহারা দেরীতে বাড়ে এবং দূরে দূরে চরে না। ইহারা শীঘ্রই চর্ব্বি ধারণ করে রেডক্যাপ, লাফ্লিচী, ক্রীভ্‌কুর এবং হুদান ভিন্ন অপর জাতীয় মেজের বা মাংস জাতিগণ ভাল "তাদিয়ে বা বসিয়ে" এবং উত্তম "পালক" বা মাতা হইয়া থাকে। ইহারা সকলেই লাল বা ব্রাউন বর্ণের ডিম দেয়; কেবল রেড্‌ক্যাপ ও ডর্কিং সারা এবং লাফ্লচী, ক্রীভ্‌কুর, হুদলা জাপিগণ সাদা ডিম পাড়িয়া থাকে।

আমাদের দেশী অপেক্ষা বিলাতী মুর্গী খুব সুন্দর এবং কোন কোন জাতীয় ডিম দিবার শক্তি খুব অধিক। আমাদের দেশে সামান্য একটি কল লইয়া ৫।৭ শাত টাকার একটি ছোট খাঁট চাষ বেশ চলিতে পারে এবং একটি গৃহস্থ পরিবারও তাহার আয়ে প্রতি পালিত হইতে পারে। বিলাতিগুলির মধ্যে "হাউদান" গুলির পায়ে পাঁচটা নখ এবং ইহাদের মাথায় টোপর আছে; ইহাদের রঙ্গ শাদা ও কাল মিশ্রিত বিন্দুযুক্ত হইয়া থাকে। এই জাতীয় নর ও মাদীকে ৪ মাস হইলে পৃথক রাখিতে হয়। সঙ্কর জননে ইহারা খুব উপযোগী যেহেতু নরগুলি খুবই তেজস্করও চঞ্চল প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে। হাম্বার্গগণ আদিম জার্ম্মেণী দেশাগত বলিয়া খ্যাত। ইহারা খুবই বেশী ডিম দেয় এবং সকল দেশের জল বায়ুর উপযোগী। ইহাদের ফুল ও পালক লাল রং যুক্ত হইয়া থাকে। সঙ্কর জননে ইহারা খুবই উপযোগী। ইহারা প্ল্যাঙ্গেল্ড, পেনসিল্‌ড্‌ এবং কাল এই তিন বর্ণের হইয়া থাকে। দোয়াঁশলাগণ আদীম চীন দেশানীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। সঙ্কর জননে ইহারাও খুব উপযোগী; ইহাদের মাংস খুব নরম এবং সুস্বাদু। ছানা গুলি খুব কষ্ট সহিষ্ণু হয় কিন্তু বিলম্বে বড় হয়।

লেগর্হণদের আদিম জন্ম দেশ আমেরিকা। আমেরিকার নিউইয়র্ক ও নিউ ব্রুন-জুইক প্রদেশের কৃষকগণ ইহাদিগকে বহু কষ্টে ও বৈজ্ঞানিক নির্ব্বাচন বিধির দ্বারায় প্রথম উৎপাদন করে। কাল, সাদা ও ব্রাউন এই তিন বর্ণের এই জাতীয় মুর্গী দৃষ্ট হয়। যদিও ইহারা সম্বৎসরে মিনর্কা জাতি হইতে বেশী ডিম দেয় না, কিন্তু আমার মনে হয় এবং বহু পাশ্চাত্য পালকাগণও বলেন যে সমান সমান ডিম দেয়। ডিম পাড়া সম্বন্ধে মিনর্কাজাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মিনর্কাগণ ইংলণ্ডের কর্ণোয়াল কাউন্টিতে চাষাদের গৃহে ও উৎপাদক গণের মধ্যে বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বৎসরে ২০০ টা ডিম দেয়, ঝাকে ২০০ শতের অল্প সংখ্যক ডিম দাত্রী মুর্গী রাখা উচিত নহে। তাহাতে পালকের লোকসান হয়। ডিম-দাত্রী-গুণ ক্রমে ক্রমে বৈজ্ঞানিক উপায়ে উন্নতি করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী পত্রে জননীতি যত্নে পাঠকরা কর্ত্তব্য। কাল এবং সাদা এই দুই বর্ণের মিনর্কা হইয়া থাকে। ইহাদের ঝুঁটী ও থলী (lobe)

দেখিতে খুব সুন্দর এবং বড়। অর্পিঙ্গটনগুলি খাঁটী বিলাতী মুর্গী। কেন্টের কুক্ কোং ইহাদের প্রথম উৎপাদক। আমেরিকাবাসীরা এই জাতির খুব উন্নতি বিধান করিতেছেন। কাল সাদা বাক প্যাঙ্কেলড্ এবং জুবিলি এই কয় পরিবারের মধ্যে এই জাতি বিভক্ত। কোন কোনটির একেনে এবং কোন কোনটির ডবল ঝুঁটি হয়।

প্লিমথ্ রক্ এবং ওয়াণ্ডোট্গণ আমেরিকার উৎপাদিত তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং ইয়োরোপেও ঐ দেশ হইতে আনীত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি শীঘ্র বাড়ে এবং সাদা, বাক ও বার্ড এই তিন পরিবারের হইয়া থাকে। রেড্ক্যাপ্ গুলি হাম্বার্গ সংযোগে উৎপাদিত হইলেও ডার্বি ও ইয়র্ক শায়ারের কৃষকগণ দ্বারা বেশী পালিত হয়। ইহাদের শিরায় গেম শোণিত প্রবাহিত আছে। প্রচুর ডিম দাত্রী বলিয়া ইহারা বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে। ভূমধ্যসাগর পরিবারগণ ভাল ডিম দাত্রী বলিয়া প্রসিদ্ধ কিন্তু তাহারা ভাল ডাবা বসিয়ে নহে। রেড্ক্যাপ্দের ডিম হাম্বার্গদের অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইলেও খুব পুষ্টিকর (rich) এবং ইহাদের মাংস খুব সুস্বাদুও সাদা বর্ণের হইয়া থাকে। ডিমদায়িকা গুণ বর্দ্ধিত করিতে হইলে এই জাতির সহিত সঙ্কর উৎপাদন করাই যুক্তি যুক্ত। এ সম্বন্ধে পরে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি। ওয়াণ্ডোট্ গণের শিরার ব্রাম, হাম্বার্গ এবং অপর শোণিত প্রবাহমান আছে। ইহারা যেমন দেখিতে সুন্দর তেমনি শীত ও গ্রীষ্মে সমভাবে খুব ডিম দেয়। সকলরূপ জল বায়ুতে ইহারা সমানভাবে থাকিতে পারে। রুপুলি সোণালি, বাক সাদা এবং পার্ট্রিজ এই পাঁচ পরিবারের ইহারা হইয়া থাকে। স্কচ্ গ্রেগুলি বিশেষ জাত বা স্কট্লণ্ড দেশীয় ডর্কিং বলিয়া প্রসিদ্ধ, ইহারা মোটাও হয় শীঘ্র এবং ডিমও মন্দ পাড়ে না। ভারতীয় মুর্গীর মধ্যে চাটগেঁয়ে আসীল এবং পশ্চিম উপকুলের বস্‌রাগণ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ও প্রসিদ্ধ বস্রাগণ ছোট হইলেও খুব ডিম দাত্রী বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ। আইসাটুইড (মিঃ জেপি,মীক্) বলেন যে ডিম ও খাদ্যের জন্য ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। মহীশূর এবং হায়দ্রাবাদে ভাল আসীল পাওয়া যায়। সখ বা প্রদর্শনীয় জন্য ব্রামা, কোচীন, ল্যাঙ্গশান, অর্পিঙ্গটন, প্লিমথরক্, ওয়াণ্ডোট্, সিল্কি, ব্যাণ্টাম পোষা যুক্তি যুক্ত।

এসিয়া পরিবারের মধ্যে ব্রাহ্মা কোচীন এবং লাঙ্গশান জাতির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য তন্মধ্যে ব্রাহ্মা লাইট এবং ডার্ক, কোচীন বাক, পাট্রিজ সাদা ও কাল এবং লাঙ্গশানগণ সাদা ও কাল পরিবারের হইয়া থাকে।

২। বিলাতী পরিবারের মধ্যে ডাকিং, রেড্ক্যাপ, অর্পিংটন, কর্ণিশ, ও সাসেক্সের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য তন্মধ্যে ডকিং সাদা, রূপালীগ্রে, এবং বহুবিধ রঙ্গিন, অর্পিঙ্গটনগণ বাক, কাল, সাদা, ব্লু, কর্ণিশগণ ডার্ক, সাদা, সাদা কলমী লাল (white-acid red) এবং সাসেক্স্গণ লাল এবং স্পেকেল্ড (Speckled) বর্ণের হইয়া থাকে।

ঘ। ফরাশী জাতীর মধ্যে হুদশ, ক্রীভ্‌কুর, লাফ্লিচী ও ফেক্রুল পরিবারের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ; তন্মধ্যে হুদাশ সাদা ফুৎকী ও সাদা, ক্রীভ্‌কুর ও লাফ্লিচী কাল এবং ফেক্রুলগণ সামন (Salmon) বর্ণের হইয়া থাকে।

অধ্যাপক প্র চ স

৩১নং এলগীন রোড কলিকাতা

ডেণ্ড্রেবিয়ম্ নোবিলি

ইহা এপিফাইট্যাল শ্রেণীর অর্কিড আর্দ্রছায়া যুক্তস্থানে জন্মিয়া থাকে। ইহারা উন্মুক্ত স্থানে সচ্ছন্দ বোধ করে না, সেইজন্ত ইহাদের পালনের জন্ত গাছঘর আবশ্তক।

তোমরা একটি ডেণ্ড্রেবিয়ম নিবিলি গাছ লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ। ইক্ষু, বেত্র বা কলাগাছ যেমন ঝাড় বাঁধিয়া ভূমি হইতে আকাশের দিকে সোজাভাবে খাড়া থাকে ঠিক সেইরূপভাবে ইহা অবস্থান করিতেছে। একটী ঝাড়ে ৫।৭টী বা ততোধিক ডঁটার স্তায় গোল কাণ্ড আছে। কাণ্ডগুলি মানুষের আঙ্গুলের মত মোটা, গোড়ারদিকে হঠাৎ সরু এবং লম্বাতে প্রায় একহাত হইবে। দেখা যায় যে কতকগুলি কাণ্ড শুষ্ক এবং কুঞ্চিত এবং ঠিক সোজাভাবে দণ্ডায়মান নহে, অল্প হেলিয়া ও ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। আবার কতকগুলি বেশ সতেজ হৃষ্টপুষ্ট এবং পত্র ও পুষ্পের দ্বারা সুশোভিত। আর কতকগুলি এখনও কচি। এই কচি কাণ্ডগুলি ক্রমবর্দ্ধিত হইতেছে। ইহা শরৎকালে পুষ্টিলাভ করিবে এবং আগামী বৎসর তাহাতে ফুল ফুটিবে। আগামী বৎসর বসন্তের প্রারম্ভে পরীক্ষা করিলে দেখিবে কাণ্ডটীর গোড়ায় একপাশে একটু স্ফীত হইয়াছে, কিছুদিনের মধ্যে ইহা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া শাখার রূপ ধারণ করিবে। প্রথম ইহা পুরাতন কাণ্ডের অঙ্গ হইতে নিজ খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আপন জীবন ধারণ করে। তাহার পর আপন পাদ দেশ হইতে সূত্রাকার মূল নির্গত করিয়া আপন জীবিকা নির্ব্বাহের পথ পরিষ্কার করিয়া লইয়া থাকে।

একটী নেবুগাছের ডাল আড়াআড়িভাবে ছেদন করিলে দেখিতে পাইবে ইহার মধ্যস্থলে একটা "মাজ" আছে তাহাকে বেষ্টন করিয়া কাষ্ঠময় চক্রাকার স্তর আছে এবং ইহার ছাল খুব সহজে বিচ্ছিন্ন করা যায়। রাস্নার কাণ্ডগুলি কাষ্ঠময় নহে—ইহা সরস ও রসাল। কতকগুলি শিরা নরম পদার্থে আবৃত রহিয়াছে বটে কিন্তু ইহার মাজ, কাষ্ঠময় চক্রাকার স্তর নাই বা সহজে বিচ্ছিন্ন করা যায় এমন কোনও ছাল নাই।

ইহার ছালের গঠন ভিতরের পদার্থ হইতে বিভিন্ন নহে কেবলমাত্র কাষ্ঠময় শিরা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয় এবং সেইগুলি ঘণ সন্নিবিষ্ট হইয়া আচ্ছাদনের আকার ধারণ করিয়াছে। কাণ্ডগুলির গায়ে গাঁট আছে তাহাকে গ্রন্থি কহে এবং দুই গ্রন্থির মধ্যস্থলেকে পর্ব্ব কহে। যে সকল দেশে রাস্না জন্মিয়া থাকে সচরাচর সে সব স্থানে বৎসরের মধ্যে প্রায় দশমাস ধরিয়া অনবরত বৃষ্টি হয়। রাস্না এই সময় তাহার অঙ্গ প্রতঙ্গে যে সকল কোটী কোটী ক্ষুদ্র কোষ ও ক্ষুদ্র শিরা আছে সেগুলিকে সরস পুষ্টীকর খাদ্যদ্বারা পরিপূর্ণ করে এবং সেই সঙ্গে আপন ক্ষুদ্র কাণ্ডগুলি বর্দ্ধিত করিয়া লয়। দেখিলে মনে হয় রাস্নার ভবিষ্যতের অনাটনের বিষয় জ্ঞাল থাকায় অসময়ের জন্য জীবনধারণের খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছে। বর্ষা শেষ হইলে শীতের প্রারম্ভে গাছগুলি খুব হৃষ্টপুষ্ট দেখায়। শীতের পর গ্রীষ্ম আসিলে কয়েকমাসের প্রখর রৌদ্রে বায়ু ও মাটি শুষ্ক হইয়া উঠে এবং গাছের প্রধান খাদ্য জল দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে। এই সময়ে পত্রকাণ্ডস্থিত রস শোষণ করিয়া লয়, কিন্তু কাণ্ডগুলি শুষ্ক মাটি হইতে জল পায় না। কিছুদিনের মধ্যে কাণ্ডস্থিত রস ফুরাইলে পাতা শুকাইয়া যায়; কাণ্ড ও মূলেরও শীঘ্রই ঐ দশা ঘটে এবং তাহার ফলে গাছগুলি মরিয়া যায়। কিন্তু রাস্নার প্রবল উত্তাপ ও অতি শুষ্কতা সহ্য করিবার ক্ষমতা আছে। আমাদের গাত্রে যেমন অনেক রন্ধ্র আছে সেইরূপ রস্নার সবুজ পাতায় এবং সবুজ কাণ্ডেও অনেক রন্ধ্র আছে। এই রন্ধ্র দিয়া জলীয় পদার্থ নির্গত হয়। এই রন্ধ্রগুলি অণুবিক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ব্যতিত দেখা যায় না। যদি সমস্ত পত্র ও কাণ্ডস্থিত অসংখ্য রন্ধ্র দ্বারা ঐ জলীয় পদার্থ নির্গত হইত তাহা হইলে রাস্নার খাদ্য শীঘ্রই ফুরাইয়া যাইত এবং গাছটি খাদ্যাভাবে মারা পড়িত। কিন্তু ভগবানের এমনই কৌশল যে মূল জল শোষণ বন্ধ করিলে রাস্না তাহার বহু পত্র ত্যাগ করিয়া ফেলে এবং এইরূপে রন্ধ্রের সংখ্যা হ্রাস করিয়া সমূহ বিপদ হইতে রক্ষা পায়। আরও দেখ কাণ্ডের পর্ব্বগুলি অতি প্রশস্ত বৃন্তদ্বারায় এমন সুচারু রূপে বেষ্টিত যে কাণ্ডের অভ্যন্তরের রস বাহির হইবার পথ একরকম বন্ধ। পেঁয়াজ, ওল, প্রভৃতির মূল বা কন্দ শীত ও গ্রীষ্মকালে অসাড়ভাবে কালযাপন করে এবং স্বীয় অঙ্গস্থিত খাদ্যে জীবন ধারণ করে এবং বর্ষার জন্য অপেক্ষা করে। রাস্নার কাণ্ডগুলির প্রকৃতি ও অনেকটা যদিও ঐরূপ উহার মাটির ভিতরে হয় না এইটাই বিশেষত্ব। এইরূপ কন্দকে আমরা উপকন্দ বলিব।

দেখ এই গাছের পাতাগুলি ঈষৎ পরু, গাঢ় সবুজ রঙ্গের, পাঁচ, সাত অঙ্গুলী লম্বা হইবে; আকৃতিতে অনেকটা বল্লমের ফলকের ন্যায়, কিন্তু অগ্রভাগ গোল ও খাঁজকাটা। তোমরা হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে আম, জাম, বেল প্রভৃতি গাছের পাতার মধ্য শিরা হইতে ছোট ২ শিরা তেরছা ভাবে বাহির হইয়া জালের রূপ ধারণ করে। রাস্না পাতার ও কয়েকটি করিয়া শিরা আছে বটে, কিন্তু শিরাগুলি আম, জাম প্রভৃতির ন্যায়

নহে। ইহার শিরাগুলি বোঁটা হইতে আগা অবধি লম্বা লম্বি ভাবে বিস্তৃত। পাতাগুলি উপকন্দের গায়ে নির্দ্দিষ্টভাবে সাজান থাকে। এই সাজান প্রণালীর ব্যতিক্রম কখনও ঘটে না। পাতাগুলি গ্রন্থির গাত্রে পর্য্যায়ক্রমে বিপরীত দিক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পাতাগুলি দুই বৎসরকাল স্থায়ী হইয়া থাকে, অর্থাৎ দুই বৎসর পরে উপকন্দের গাত্র হইতে ঝরিয়া পড়ে। কিন্তু বৃন্তগুলি ঝরিয়া পড়ে না। ইহা বাঁশের শুষ্ক খোলের মত দেখায় এবং উপকন্দের পর্ব্বগুলিকে সুচারু রূপে বেষ্টন করিয়া শীত ও গ্রীষ্ম হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। বৃন্তগুলি ভাল করিয়া দেখ, ইহা সাধারণ পত্রের বোঁটারমত সরু নহে, খুব চওড়া এবং উপকন্দের পর্ব্বগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, মনে হয় যেন সহজে ছাড়াইয়া ফলা যাইবে না। কচি উপকন্দের নিম্নদিক দেখ। পত্রগুলি এত ছোট যে নাই বলিলেও চলে, কেবল যেন পত্রের গোড়ায়দিকই বর্ত্তমান। সেই জন্য মনে হয় উপকন্দের গোড়ার দিকে পত্র নাই।

সচরাচর পত্রহীন কিন্তু কখন কখন পত্রযুক্ত পরিণত উপকন্দের গ্রন্থিগুলি হইতে একটি ছড়া ফুল উৎপন্ন হয়। ছড়িতে ২।৩ টী করিয়া ফুল থাকে। এইগাছে এত প্রচুর পরিমাণে ফুল হয়, যে পূর্ণ ফুটন্ত অবস্থায় একটী গাছে ৫০।৬০ টী বা ততোধিক ফুল একত্রে দেখা যায়। আবার ফুল গুলির যেমন চমৎকার রঙ, তেমনি বহুদিন অবিকৃত থাকে বলিয়া ইহা সকলেরই আদৃত। গৃহ ও উদ্যান সাজাইবার উপযোগী এমন চমৎকার গাছ খুব কমই আছে।

এই ফুলের গঠন আমরা একবার সাধারণ ভাবে দেখিয়াছি। এস আর একবার পরীক্ষা করি। দেখ ফুলগুলি যেন কি এক অপূর্ব্ব চকচকে মোমের মত পদার্থে প্রস্তুত করা সজ্জিত রহিয়াছে। নিম্নদলটির সোজপিঠটি কোমল রোমে আবৃত এবং মধ্যস্থল অতি রমণীয় পিঙ্গলাভ লোহিত বর্ণে রঞ্জিত। নিম্ন দলটীর আকৃতি গোলাকার, ইহার পাদদেশ গুঠাইয়া নলের আকার ধারণ করিয়াছে এবং অগ্রভাগ ফুলান ও ওল্টান। পাপড়িগুলির পার্শ্বদেশ সুচারুরূপে তরঙ্গায়িত। পাপড়ি ও বৃতিগুলির অগ্রভাগ দেখিলে মনে হইবে যেন নীলাভ লোহিত বর্ণে ঈষৎ রঞ্জিত করা হইয়াছে।

দেখ দণ্ডটির মাথায় একটি সাদা ঢাকনি রহিয়াছে। যদি তুমি ধীরে এই ঢাকনিটী তুলিয়া দেখ দুই জোড়া হলদে পরাগ পিণ্ড দৃষ্টি গোচর হইবে। দুইটি করিয়া পিণ্ড দুইটি গর্ত্তের ভিতরে পাশাপাশি স্থাপিত রহিয়াছে। সাবধানে ইহার এক জোড়া হাতে তুলিয়া লও। ইহা অতি সহজে উঠিয়া আসিবে। বেশ বুঝিতে পারিবে যে পিণ্ডগুলি আলগা, কোন জিনিষের সঙ্গে লাগান নহে। যে সকল ফুলে পরাগপিণ্ড এইরূপে গঠিত ও স্থাপিত সেগুলি সব ডেণ্ড্রোবিয়াম জাতিয় বলিয়া স্থির করিতে পারা যায়।

ফল, পাতা, উপকন্দ বা অন্য কোনও অঙ্গের দ্বারা এই গাছ সহজে চেনা যায় না বা অন্য জাতির রাস্না হইতে পৃথক করা যায় না। দণ্ডের যে দিকটা নিম্নদলের ঠিক সম্মুখ-

বর্ত্তি সেই দিকটা একটু দেখ! তোমরা দেখিবে যে ঢাকনিটার নিচে একটি কোটর রহিয়াছে। ইহাই "গর্ভমুখ"। এই কোটরের ভিতরে এক প্রকার চক্‌চকে আঠাল পদার্থ আছে; ইহার কি প্রয়োজনীয়তা তাহা তোমাদিগকে পরে বলিব।

ডেণ্ড্রবিয়াম নোবিলি, সিকিম, আসাম প্রদেশের পাহাড় ও জঙ্গলে পাওয়া যায়। ইহা নাতিশীতোষ্ণ স্থান পছন্দ করে। ডেঃ নোবিলি তরাই অঞ্চলের দারুণ গ্রীষ্ম বা কিন্তু গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে যে অল্প অল্প রৌদ্র ইহাদের গায়ে লাগে, তাহা ইহাদের জীবন ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। বর্ষাকালে ইহাদের জলের অভাব হয় না। বর্ষা শেষ হইলে আকাশের জল আর পাওয়া যায় না বটে কিন্তু ভিজা জমির জল বাষ্পাকারে ধীরে ধীরে উদ্‌গত হইতে থাকে। সেই বাষ্প রাস্না তাহার খাদ্যস্বরূপ আপন শিকড় দ্বারা চুম্বকের মত আকর্ষণ করিয়া লয়। যে বহুকাল ধরিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল যে উদ্যানে ইহার চাষ করা যায় না, কিন্তু সে ভ্রম এখন দূর হইয়াছে। নিপুন ভাবে যত্ন করিয়া রোপণ করিলে ইহা বেল, গেঁদা, দোপাটি প্রভৃতির মত সহজে চাষ করা যায়। এখন কত লোকের একচেটিয়া নহে। ইহা এখন বেশ সস্তায় পাওয়া যায় এবং অনেক সাধারণ লোকের উদ্যানে শোভা বর্দ্ধন করে।

বঙ্গদেশের জলতত্ত্ব

জল কেবল মনুষ্যের এবং জীব সমূহের জীবন নহে, ইহা উদ্ভিদের এবং অচেতন পদার্থ মাত্রেরই প্রাণ বলিয়া পরিগণিত। পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে বোধ হয় অনেকের একথা জানা নাই যে, শিলা বা শৈল অথবা ধাতুর খনি বা খরাজ * গুলিতে যদি বহুকাল পর্য্যন্ত সলিলের সংশ্রব না থাকে, তাহা হইলে প্রস্তরের গুরুত্ব, পর্ব্বতের স্থূলত্ব, খনির উৎপাদিকা শক্তি এবং খরাজের প্রশস্ততা ক্রমে ক্রমে হ্রস্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরিণামে তাহাদের প্রয়োজনীয়তা হইতে তাহারা বঞ্চিত হয়। আমি বহুস্থানে দেখিয়াছি যে, দীর্ঘকাল যাবৎ বর্ষাকালে আকাশ হইতে পর্য্যাপ্ত বৃষ্টি পতিত না হওয়ায়, বড় বড় পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য স্থূলতা, গুরুত্ব, উৎপাদিকা শক্তি, পরিধি অথবা প্রশস্ততা বহু পরিমাণে সংক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, জলের প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক পদার্থেই সুস্পষ্ট ভাবে প্রত্যক্ষীভূত হয়। যাঁহারা কৃষিকার্য্য না করিয়া কেবল ব্যবসা করেন অথবা কারখানা চালাইয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকটেও জল পদে পদে প্রয়োজনীয় পদার্থ বলিয়া পরিগণিত

* কোমল ধাতুর প্রথম প্রসারণের আকরকে পারস্য ভাষায় খরাজ বলে।

হয়। তুলার কল, সুরকীর কল, ইটের কারখানা প্রভৃতি জল না হইলে একেবারেই চলে না। কিন্তু কৃষিকার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা জলের অধিকতম প্রয়োজন। কৃষিকর্ম্মের উন্নতি বিধান জন্য যতই যত্ন ও পরিশ্রম করা যাউক, জলের অত্যন্ত অভাব অথবা সম্পূর্ণাভাব হইলে কৃষকের কার্য্য আদৌ চলিতে পারে না। কৃষকেরা সাধারণতঃ যে কয়েক প্রকার জল ব্যবহার করে তাহাকে আমরা চারিটি ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায় অভিহিত করিতে পারি, তদ্যথা—আকাশজল বা বৃষ্টি, পর্ব্বতজল অর্থাৎ ঝরণা প্রভৃতি; মর্ত্তজল অর্থাৎ সরোবর দীর্ঘিকা, নদ, নদী, খাল, বিল, ঝিল প্রভৃতি; এবং পাতাল জল অর্থাৎ মৃত্তিকার নিম্ন হইতে আপনা হইতে ফোয়ারা (উৎস) আকারে যে জল নিঃসৃত হয় তাহাই পাতাল জল। কৃষিকার্য্য করিতে হইলে এই চারি প্রকার জলের তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত কৃত্রিম উপায়ে আর এক প্রকার জলের উৎপাদন হইতে পারে, তাহা এস্থলে নানা কারণে উল্লেখ করিব না। ডিনেমাইট (Dynamite) প্রয়োগে আকাশে কৃত্রিম মেঘ সৃষ্টি করিবার সম্প্রতি এক অভিনব উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে; আজকাল বহুদূর পর্য্যন্ত গোলা নিক্ষেপ উপযোগী কামানের সৃষ্টি হইয়াছে। বিমান পোত ধ্বংশ করিবার জন্য এই প্রকার কামান ব্যবহার করা হয়। শূন্যে লক্ষ্য করিয়া ঐ প্রকার কামান ছুঁড়িলেও আকাশে মেঘের সঞ্চার হয়। ও বৃষ্টি হয় প্রাচীন ঋষিরা মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া রাশি রাশি ধূমের সাহায্যে কৃত্রিম মেঘ উৎপাদন করিতেন, ইহাও প্রাচীনকারে গ্রন্থাদিতে বিবৃত আছে; কিন্তু সে সকল কথার উপরে নির্ভর করিয়া কৃষিকার্য্য চলে না এবং চলিতে পারে না, ইহা ধ্রুব সত্য, সুতরাং বর্ত্তমান প্রস্তাবে এই কৃত্রিম জলের বিবরণ উহ্য রাখা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি। রসায়ন শাস্ত্রে জলকে "কমল" ও "কঠিন" (Hard water and Soft water) সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে. বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত এই দুই কথার সম্পর্ক না থাকায় আমি তাহার ও উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না।

বৃষ্টিজলের একটা পরিমাণ আমরা করিতে পারি এখানে তাহা করাও:হইয়াছে

বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় বৎসরে সাধারণতঃ কত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়, তাহার তালিকা এখানে দেওয়া গেল।

জেলার নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ	জেলার নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ
বর্দ্ধমান	৫৬ ইঞ্চি	জলপাইগুড়ি	১৩৯ ইঞ্চি
বীরভুম	৫৯ "	দ্বারজিলিঙ্গ	১২০ "
বাকুড়া	৫৫ "	রঙ্গপুর	৭৯ "

জেলার নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ		জেলার নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ	
মেদিনীপুর	৬০	”	বগুড়া	৬৭	”
হুগলি	৫৯	”	পাবন	৬১	”
হাবড়া	৫৭	”	ঢাকা	৭১	”
২৪ পরগণা	৬৩	”	ময়মনসিংহ	৮৭	”
নদীয়া ৫৭	৫৭	”	ফরিদপুর	৬৫	”
মুরসিদাবাদ	৫৪	”	বরিশাল	৮৫	”
যশোহর	৬১	”	ত্রিপুরা	৭৬	”
খুলনা	৬৬	”	নোয়াখালি	১১৩	”
রাজসাহী	৫৭	”	চট্টগ্রাম	১১২	”
দিনাজপুর	৬৯	”	শ্রীহট্ট	১৫৬	”
পাটনা	৪৫	ইঞ্চি	মালদহ	৫৭	ইঞ্চি
গয়া	৪৩	”	সাঁওতাল পরগণা	৫৪	”
সাহাবাদ	৪৪	”	কটক	৬০	”
সারণ	৪৫	”	বালেশ্বর	৬১	”
চাম্প্যারণ	৫৪	”	পুরী	৫৭	”
মজাঃফরপুর	৪৬	”	হাজারিবাগ	৫২	”
দ্বারভাঙ্গা	৫০	”	রাঞ্চি	৫৪	”
মুঙ্গের	৪৯	”	পালামো	৪৮	”
ভাগলপুর	৫১	”	মানভূম	৫২	”
পূর্ণিয়া	৭৩	”	সিংহভূম	৫৮	”

প্রাচীন এবং নবীন জাতিদিগের শাস্ত্র সমূহ পর্য্যালোচনা করিলে আমরা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারি যে, কৃষিকার্য্যের জন্য উপরিউক্ত জন্য চারি প্রকার জলের মধ্যে "উৎসজল" (পাতালজল) সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। কিন্তু এই মহোপকারী জল প্রচুর পরিমাণে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় না ; পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, অন্যান্য প্রকার জলের সঙ্গে তুলনা করিলে পাতাল জল কৃষির পক্ষে শ্রেষ্ঠতম পদার্থ ; অন্য জলে ৫ মাসে যে কার্য্য হয়, পাতাল জলে ৫ সপ্তাহে তদ্রূপ কার্য্য হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে ধানের চাষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সুতরাং ধান্য চাষ সম্বন্ধে প্রোক্ত চারি প্রকার জলের দ্বারা কিরূপ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা নিম্নে দেখান যাইতেছে।

(দৃষ্টান্ত।)

জল।	সময়।
আকাশ জল।	৫ মাস
পর্ব্বত জল।	৪ মাস
মর্ত্ত জল।	২ মাস
উৎস জল।	৫ সপ্তাহ

অর্থাৎ ক্ষেত্রের শস্তে বা বপনকালে ৫ মাস মধ্যে আকাশ জলের (বৃষ্টির) দ্বারা যে পরিমাণে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, পর্ব্বত জলে ৪ মাস মধ্যে, মর্ত্ত জলে ২ মাস মধ্যে সেইরূপ উপকার পাওয়া যায়। উৎসজল সকল সময়ে এবং সকল স্থানে সুলভ নহে; পর্ব্বতের ঝরণার জলও সকল দেশে মিলে না, সুতরাং মেঘের জল এবং মর্ত্তজলেরই উপর কৃষকেরা প্রধানতঃ আশা ও ভরসা স্থাপন করে। মেঘের জল (বৃষ্টি) সম্বন্ধে একথা বলা যাইতে পারে যে, কৃষকের প্রয়োজন অনুসারে, সময় বিশেষে, বৃষ্টির প্রয়োজনের অল্পতা বা আধিক্য অনুভূত হয়, অর্থাৎ কোনও কৃষক তাহার নিজের স্বার্থানুসারে ভাদ্র মাসে জল চায়, কেহ বৈশাখে জল প্রার্থনা করে, কেহ বা মাঘ বা ফাল্গুনে বৃষ্টির জন্য লালায়িত হয়। শস্তের অবস্থা দেখিয়া বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা বা অপ্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও, জলতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বৎসরান্তর্গত বারমাসের জলের উপকারিত্ব, অনুপকারিত্ব, শুদ্ধতা সম্বন্ধে আলোচন করিয়া, বিশেষতঃ উদ্ভিদ বিজ্ঞানবিদ বিদুষবৃন্দের সহিত একমত হইয়া, যে সকল প্রয়োজনীয় অভিমত অভিব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন. তাহা সুক্ষ্মানুসুক্ষ্মরূপে বুঝিতে পারিলে, জানিতে পারি, সম্বৎসর মধ্যে মাঘ মাসের জল অথবা মাঘের তৃতীয় সপ্তাহ হইতে ফাল্গুনের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত যে বৃষ্টি পতিত হয় তাহার জল বঙ্গের কৃষিকার্য্য পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও উপকারী। মাঘের জলের পরে বৈশাখের এবং বৈশাখের পরে শ্রাবণের জল প্রশস্ত। অন্যান্য মাসের জল তুলনায় বা সমালোচনায় প্রায় সমতুল্য। কৃষিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বলেন উপরিউক্ত তিন মাসের জল, কৃষিকার্য্যোপযোগী সমুদায় পদার্থ বর্ত্তমান থাকে। তাঁহারা মাঘের জলকে অত্যন্ত উপকারী বলিয়া স্থির করতঃ লিখিয়া গিয়াছেন—

ধন্য রাজা আর পুন্য দেশ।
যদি বর্ষে মাঘের শেষ ॥

সমুদয় ভারতের সহিত তুলনা করিলে বঙ্গদেশকে অত্যন্ত উর্ব্বরা বলিয়া বোধ হয়; বাঙ্গালার সমুদয় স্থান অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গে অধিকতর বৃষ্টি পতিত হয়। বখরগঞ্জ নোয়াখালি সন্দ্বীপ চট্টগ্রাম প্রভৃতি কতিপয় স্থানে "আঁশ মাটি" নামে একপ্রকার পাৎলা মৃত্তিকা দেখা যায়, উহার উপরে বৃষ্টি পতিত হইবা মাত্র উহা জমিকে সরস করিয়া দেয়; এই পাৎলা মাটির এরূপ শক্তি যে, একবার ইহাতে বৃষ্টি বা অপর জল পতিত হইলে, অনেকদিন পর্য্যন্ত জল না পাইলেও ইহা তরলত্ব সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হয়। "কালো তুলা মাটি" নামে আর এক প্রকার মৃত্তিকা আছে, তাহাতে জল সেঁচিয়া দিলে অথবা তদুপরি মেঘের জল পতিত হইলে, বহুকাল পর্য্যন্ত তাহার তরলত্ব থাকিয়া যায়, সুতরাং অনাবৃষ্টি বা জলাভাব বশতঃ সেই জমির বিশেষ ক্ষতি হয় না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের কৃষি বিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যক্ষ মহাশয় লিখিয়াছেন "The Black cotton

soil is noted for its power of retaining moisture. এই মাটিতে অন্য জলাপেক্ষা মেঘের জল বিশেষ প্রশস্ত।

উপরে মর্ত্তজলের উল্লেখ করা গিয়াছে। আমরা কূপ, পুকুর, দিঘী, নদ, নদী, খাল বিল, ঝিল প্রভৃতি হইতে মর্ত্তজল সংগ্রহ করিয়া থাকি। এস্থলে বলা আবশ্যক, উপরিউক্ত সর্ব্বপ্রকার জলাপেক্ষা, নদ বা নদীর জল বঙ্গদেশীয় কৃষিকার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। নদ নদীর জল হইতে পুকুর বা খালের জলের এরূপ ভিন্নতা কেন এবং কি জন্যই বা কৃষিকার্য্যে ইহাদের তারতম্য লক্ষিত হয় তাহার উল্লেখ করিতে গেলে প্রবন্ধ সুদীর্ঘ হইবার সম্ভাবনা, এজন্য সে বিষয়ের তর্ক বা বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম না। মোটামুটী এই টুকু জানা যায় যে নদ নদী জল পর্ব্বত গাত্র ধৌত করিয়া ও বিভিন্ন সমতল স্থানের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় নানা প্রকার খনিজ জীবজ ও উদ্ভিদ নিজ অঙ্গে মিশাইয়া লয়। এই কারণে নদ নদী জলের সেচ পাইলে ক্ষেতে যে পলি সঞ্চিত হয় তাহাতে ক্ষেত্রটিকে সারবান করিয়া তুলে। ইহাও জানা আবশ্যক যে, অযোদ্ধা, এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষিকর্ম্মে, নদ বা নদীর সলিল অপেক্ষা কূপের জল অধিকতর প্রশস্ত। পাঞ্জাবে খালের জল, মান্দ্রাজে পার্ব্বত্য জল, বোম্বাইয়ে কূপের জল এবং রাজপুতনায় ঝরণার জল, কৃষিকার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সহায়ক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত ও মুর্শিদাবাদ বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা, ও ছোটনাগপুর বিভাগে মেঘের জল পতিত না হইলে শস্যাদি প্রায়ই রক্ষিত হয় না। কৃষিবিদ পণ্ডিতেরা পূর্ব্বে বিবেচনা করিতেন, বোধ হয় ক্ষেত্রের গুণের অনুসারে এবম্প্রকার ঘটনা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু বহু বর্ষের পরীক্ষা, চিন্তা ও আলোচনায় প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ পুরুষেরা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ক্ষেত্রের গুণ দেশের অসমতা ইহার অন্যতম সামান্য কারণ হইতে পারে কিন্তু প্রধানতঃ জলের গুণ ও দোষই ইহার প্রবল ও প্রধান কারণ। ইন্দ্রিরা (Reservoirs and tanks) কাটিয়া নানাপ্রকারের জল রক্ষা করিয়া বিশেষত বৃষ্টির জলের ইঞ্চি হিসাবে পরিমাণ করিয়া পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন যে, জলতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা না থাকিলে "পাকা চাষা" হওয়া যায় না। মহীসুরের সুবিখ্যাত সুলেকাড়ে (Sulakare) নামক কৃত্রিম হ্রদে পণ্ডিতেরা জলের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ হ্রদ প্রায় ২০ ক্রোশ পরিধি সম্বলিত।

খালের (canal) মধ্যে গঙ্গানদীর সংযুক্ত খাল সমূহ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। কথিত আছে, ১৩৫১ অব্দে ফেরোজ সাহ কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথমে খাল কাটার সৃষ্টি হয়। ১৬২৮ অব্দে আলি মর্দ্দানের যত্নে যমুনা খালের উদ্ভাবন হইয়াছিল। ১৮১৭ অব্দে ইংরাজ সরকার সর্ব্বপ্রথম খাল কাটা বিষয়ে মনোযোগ প্রদর্শন করেন। এক্ষণে ভারতবর্ষে প্রায় ৬১,০০০ মাইল ব্যাপিয়া খালের সংযোগ আছে, ইহাতে ৩৩,০০০ মাইল পর্য্যন্ত চাষ হইতে পারে।

বঙ্গদেশে ইডেন খাল, উলুবেড়ে খাল, পাশকুড়া খাল, স্লোননদের খাল, মহানদী খাল প্রভৃতি প্রধান। এই সকল খাল কৃষিকার্য্য পক্ষে খুব সহায়ক বটে কিন্তু প্রজারা নানা কারণে করভারে প্রপীড়িত থাকে। অনেক সময় টাকা প্রদান করিয়াও জল পায় না। প্রজাদিগকে, রাজার সহিত প্রজার সম্বন্ধ, জলের সহিত কৃষিকার্য্যের বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধ, মেঘের সহিত বায়ুর এবং বায়ুর সহিত জলের সম্বন্ধ, বিশেষতঃ জলতত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করা, বর্ত্তমান কালের শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। জল সিঞ্চনের সহজ ও সুলভ উপায় এবং জল প্রবেশ ও জল নির্গমের সরল প্রথা প্রভৃতি বিষয়ে কৃষকদিগকে অভিজ্ঞ করিয়া রাখিলে কৃষিকার্য্যের আশাতীত উন্নতি হইতে পারে।—শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী লিখিত প্রবন্ধ হইতে।

পোকা নিবারণে কার্ব্বন-ডাই-সাল্ফাইড

(অঙ্গার ১, গন্ধক ২)। অঙ্গারের সহিত গন্ধকের সংমিশ্রণে কার্ব্বন-ডাই-সালফাইড নামক যৌগিক পদার্থের উৎপত্তি হয়। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে, জ্বলন্ত লৌহবৎ কয়লার মধ্য দিয়া, গন্ধকের বাষ্প (সালফার-ডাই-অক্সাইড) প্রবেশ করাইয়া, গন্ধক ও কয়লার সম্মিলিত বাষ্পকে জল বেষ্টিত পাত্রে আবদ্ধ করিতে হয়। এই জল বেষ্টিত পাত্রে গাঢ় হইয়া, এই বাষ্প, তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহার বর্ণ নাই ; কিন্তু ইহার গন্ধ অতিশয় তীব্র। কোন খোলা পাত্রে রাখিলে ইহা উড়িয়া যায়। ইহার বাষ্প বায়ু অপেক্ষা আড়াইগুণ ভারী। অগ্নি-শিখার সংস্পর্শে ইহা নীলবর্ণ ধারণ করিয়া জ্বলিতে থাকে।

অনেকক্ষণ, এই গ্যাসের শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিলে শরীর অসুস্থ হয়। কিন্তু, নিম্নশ্রেণীর জন্তু, যথা—ইন্দুর, মশা, ছার এবং অন্যান্য পোকা, ইহার বাষ্পে ৩ ঘণ্টার মধ্যে মরিয়া যায়। বীজ * রক্ষা করিবার জন্য, ইহার মত উপকারী কোন দ্রব্য, এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই।

৬ হাত দীর্ঘ, ৬ হাত প্রস্থ এবং ৬ হাত উচ্চ (১০০০ ঘন ফিট) কোন ঘরে, অথবা ৩০ মণ বীজপূর্ণ কোন পাত্রে, অর্দ্ধ সের কার্ব্বন-ডাই-সালফাইড ব্যবহার করিতে হইবে। গোলাঘর সময়ে সময়ে খুলিলে, তথায়, ইহার বাষ্প অধিক দিন স্থায়ী থাকে না ; সুতরাং প্রায় তিন সপ্তাহ অন্তর পুনঃ পুনঃ এইরূপ কার্ব্বন-ডাই-সালফাইড প্রয়োগ করা আবশ্যক।

কোন গাছের মূলাংশে পোকা লাগিলে, ইহার ৪।৫ ইঞ্চি অন্তর, একটী গর্ত্ত করিয়া, একার্দ্ধ (কোন কোন স্থলে এক) তোলা কার্ব্বন-ডাই-সালফাইড ঢালিয়া, ঐ গর্ত্তের মুখ বন্ধ করিয়া দিলে, গন্ধে, মূলস্থ পোকা মরিয়া যায়।

কোন বৃক্ষের গুঁড়ি কিম্বা ডালের মধ্যে কীট গর্ত্ত করিলে, ঐ গর্ত্তের ভিতর, কিঞ্চিৎ কার্ব্বন-ডাই-সালফাইড ঢালিয়া, মোম দ্বারা গর্ত্তের মুখ আবদ্ধ করিয়া রাখিলে, ঐ কীট অচিরাৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

এইরূপ, উঁই, পিপীলিকা, ইন্দুর, প্রভৃতির বাসায়, কার্ব্ব ডাই-সালফাইড ঢালিয়া দিয়া, মুখ বন্ধ করিয়া দিলে, ইহারা মরিয়া যাইতে পারে।

কার্ব্বণ-ডাই-সালফাইড সতর্কতার সহিত প্রয়োগ করিতে হইবে। যে গোলাঘরে ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে, তথায় অগ্নি জ্বলিলে, সমস্ত ঘর অগ্নিময় হইবে। কবাট জানালা উন্মুক্ত করিয়া দিলে, কার্ব্বন-ডাই-সালফাইড গ্যাস উড়িয়া যায়; তৎপরে ঐ ঘরে অগ্নি জ্বলিলে, কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

আমেরিকা ও ইউরোপে এক টাকায় সাধারণতঃ এক সের কার্ব্বন-ডাই-সাল্‌ফাইড বিক্রীত হয়। অধিক পরিমাণে ইহা বিক্রীত হয় না বলিয়া এদেশে ইহার মূল্য অতিশয় অধিক। সাধারণের নিকটে ইহার গুণ প্রচারিত হইলে এদেশে ইহা উৎপন্ন করা হইবে এবং সম্ভবত আমরা ইহা এ দেশেও সুলভ মূল্যে প্রাপ্ত হইব। শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী, Agricultural expert Dep. of Land Recorps and Agriculture, Bengal.

গুদামে বা গোলাঘরে বীজ রক্ষা করিবার জন্য কি উপায় করা কর্ত্তব্য অনেকে জানিতে চান। কার্ব্বণ-ডাই-সাল্‌ফাইড এই কাজের বিশেষ উপযোগী। সকলের জ্ঞাতার্থ কৃষকে পুর্ব্ব প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র চৌধুরী লিখিত ঐ সম্বন্ধে প্রবন্ধটী এ স্থলে সন্নিবেশিত হইল।

কাগজী লেবু

উদ্যান তত্ত্ববিদ্ শ্রীশশিভূষণ সরকার লিখিত।

আয়ুর্ব্বেদ মতে কাগজী লেবু অম্লরসযুক্ত বাতঘ্ন, দীপক, পাচক ও লঘু। কোন কোন মতে কাগজী লেবু কৃমি সমূহের নাশকারী, অরুচিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে অতিশয় রুচিকর, উদর রোগের শান্তিকারক এবং বায়ুপিত্ত কফ শূল রোগের পক্ষে হিতকারী। অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য রোগে ইহা যে বিলক্ষণ ফলপ্রদ তাহা প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে। কোষ্ঠ বদ্ধতা ও বিসূচিকা রোগেও উপকারী।

গলার বেদনায় লেবুর রস কবল করিলে বেদনার লাঘব হয়। চুলকানী রোগে ইহার রস বাহ্যিক প্রয়োগে সুফল দেয়। প্রসব হইবার পর জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে ইহার রস খাওয়াইলে ও পিচকারী দ্বারা স্থানীয় প্রয়োগে রক্তস্রাব নিবারণ হয়। যাহাদিগকে নিয়ত প্রখর রৌদ্রে কাজ করিতে হয় তাহাদের মুখের ও অন্যান্য স্থানে চর্ম্মে একপ্রকার কালশিঠে দাগ পড়িয়া থাকে। এরূপ স্থলে লেবুর রস ও গ্লিশিরিন সমান ভাগে মিশাইয়া লাগাইলে কালচে দাগ মিলাইয়া যায়। এই দাগকে সাধারণতঃ মেছেতা বলে। গ্লিশিরিনের পরিবর্ত্তে মধু দিলেও চলিতে পারে। ধনী লোকেরা মিল্ক অব রোজ প্রভৃতি নানাবিধ ঔষধে ঐ সকল দাগ দূর করিয়া থাকেন। সামান্য কৃষকদের চৈত্র বৈশাখ মাসের প্রখর রৌদ্রে কার্য্য জন্য ঐ সকল দাগ পড়া দোষ দূর করিয়া তাহার এই ঔষধ ব্যবহারে সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতে পারে।

লেবুর রস মিছরির সরবতের সহিত খাইতে অতি উাদেয় ও স্নিগ্ধকারী পানীয়। এজন্য সব লেবুই ব্যবহার করা যায় কিন্তু কাগজী লেবু সুতার ও সুঘ্রাণ বলিয়া রসবতে ইহার রস অধিক বাঞ্ছনীয়। ইহা জ্বরের সময় পিপাসা শান্তি করিবার জন্য ব্যবহার করা হয়। ইহাতে কেবল পিপাসা নিবারণ হয় এরূপ নহে, তৎসঙ্গে অনেক সময় জ্বরের উত্তাপেরও অনেক হ্রাস হইয়া থাকে। লেবুর রসের বাতঘ্ন গুণ যদিও সকলে স্বীকার করেন না কিন্তু কেবলমাত্র লেবুর রস ব্যবহার করিয়া অনেক বাত রোগ হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। বাত রোগগ্রস্ত ব্যক্তি প্রত্যহ লেবুর রস ভাতের সহিত দীর্ঘকাল সেবনে উপকার পাইবার সম্ভাবনা। অনেক দিন যাবৎ সরস ফল মুল খাইতে না পাইলে রক্ত দূষিত হইয়া স্কর্ভী নামক রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে দাঁতের গোড়া ফুলে এবং দাঁতের গোড়া ও নাক দিয়া রক্ত পড়ে, স্থানে স্থানে চর্ম্মের নীচে রক্ত জমায় এক প্রকার কাল দাগ হয় এবং উদরাময় ও আমাশায় হইতে পারে। এই রোগে লেবুর রস একটী প্রধান ঔষধ।

লেবুর জ্বরনাশক গুণও বিলক্ষণ আছে। একটী তাজা কাগজী লেবু খোসা সমেত খণ্ড খণ্ড করিয়া একটী পরিষ্কার মাটীর পাত্রে আধ সের পরিমাণ জল দিয়া সন্ধ্যার সময় সিদ্ধ করিবে এবং আধ পোয়া থাকিতে নানাইয়া সমস্ত রাত্রি হিমে রাখিয়া দিবে। পরদিন প্রাতঃকালে লেবু সমেত জল উত্তমরূপে চাপিয়া পরিষ্কার কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া পান করিবে। এরূপ প্রকারে লেবুর রস ৭।৮ দিন পান করিলে দীর্ঘকালের পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর আরোগ্য হয়। লেবুটী প্রতিদিন গাছ হইতে টাটকা তুলিয়া লইলে ভাল হয়। সময় সময় প্রবল তরুণ জ্বরেও ইহাতে বিলক্ষণ উপকার পাওয়া যায়।

যখন এই একটী সামান্য লেবু দ্বারা এতগুলি উপকার পাওয়া যায় তখন গৃহস্থ মাত্রেই দুই একটী লেবু গাছ রোপণ করিলে মন্দ কি। ইহার আবাদ করিয়া লেবুর রস প্রস্তুত করিতে পারিলে বিলক্ষণ লাভও হইতে পারে। লেবুর রস প্রস্তুত করিয়া রাখিতে

হইলে প্রথমতঃ লেবু গুলিকে দুই খণ্ড করিয়া কাটিয়া উত্তমরূপে চাপিয়া সমস্ত রস বাহির করিতে হইবে। লেবুর দুই মুখ কাটিয়া তাহার মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ মোটা কাটি প্রবেশ করিয়া দিয়া ঘুরাইলে রস বাহির করা যায়। এই প্রকার প্রথাই ভাল। রস পরে সরু পরিষ্কার ন্যাকড়ায় ছাঁকিয়া বোতলে পুরিবে এবং দৃঢ়রূপে ছিপি বন্ধ করিবার মত ঠিক করিয়া রাখিবে এবং এক থানি বড় কড়াতে জল গরম করিয়া লেবুর রস পূর্ণ বোতল গুলি তাহার মধ্যে রাখিয়া আধ ঘণ্টা জ্বাল দিতে থাকিবে পরে কিছু শীতল হইলে বোতল গুলি ছিপি আঁটিয়া তুলিয়া রাখিবে এইরূপ করিয়া রাখিলে রস শীঘ্র পচিয়া নষ্ট হয় না। বোতল গুলিতে রস কাণায় কাণায় পূর্ণ থাকিবে। রস অন্য রকমে সংরক্ষণ করা যায়—যথা সাইলিসাইলিক প্রভৃতি এসিড সংযোগে ; কিছু তাহাতে খরচ আছে সেই জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রথাই ভাল।

লেবুর খোসা হইতে এক প্রকার ঈষৎ পীতবর্ণ অতি সুগন্ধযুক্ত তৈল পাওয়া যায়, ইহাকে লেবুর তৈল বলে। ইহা আস্বাদনে তিক্ত কিন্তু ইহার বায়ুনাশক ও উত্তেজক গুণ আছে। পেট ফাপিলে ইহার দুই এক ফোঁটা জলের সহিত সেবন করিলে পেট ফাপা নিবারণ হয়। শরীরের বেদনাযুক্ত স্থানে মালিস করিলে ঐ স্থানের উগ্রতা সাধন করিয়া বেদনা নিবারণ করে। ইহা প্রায়ই অন্য ঔষধ সুগন্ধযুক্ত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই তৈল প্রস্তুত করিতে হইলে লেবুর খোসাকে উত্তমরূপে পিশিয়া বক যন্ত্র দ্বারা তৈল চুয়াইয়া বাহির করা যায়। এই তৈল কিছুদিন রাখিলে ঘণ ও টারপিন তৈলের ন্যায় দুর্গন্ধ যুক্ত হইয়া যায়। তৈল পচিয়া বিকৃত হইয়া ঐরূপ হয়। উহার পচন নিবারণ জন্য কুড়ি ভাগের এক ভাগ এলকোহল নামক সুরাবীর্য্য মিশ্রিত করিবে ও পরে বোতলের ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিবে।

লেবুর রসের সহিত সোডা মিশ্রিত করিয়া অতি অল্প ব্যয়ে সোডাওয়াটার প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা বাজারে সোডাওয়াটার অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট।

ভারতীয় জল সেচন কমিশন

ভারতীয় জল সেচন কমিশন তিন বৎসর, অনুসন্ধান, সাক্ষ্য গ্রহণ এবং নানা স্থান পরিভ্রমণের পর তাঁহাদের মন্তব্য প্রকাশ করেন। জলসেচন কমিশনের (Irrigation commission) সভ্যগণ তাঁহাদের রিপোর্ট চারি ভাগে বিভক্ত ১ম ভাগে—সভ্যগণের সাধারণ মন্তব্য এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের জলাভাব সম্বন্ধে সাধারণ সমালোচনা—২য় ভাগে বিভিন্ন প্রদেশেরসেচনেব জলের আবশ্যক অনাবশ্যকতা সম্বন্ধে বিশেষ মন্তব্য—৩য় ভাগে প্রস্তাবিত "এবং উপস্থিত খাল কূপাদি সম্বন্ধীয়

মানচিত্র এবং ৪র্থ ভাগে জল সেচন সম্বন্ধে সাক্ষ্য সমূহ। কৃষকে ইতিপূর্ব্বে সমস্ত রিপোর্টের বিস্তারিত সমালোচনা হইয়াছে। কমিশনের আলোচ্য ছিল সমস্ত ভারতের জলতত্ত্বানুসন্ধান। আমরা এক্ষণে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে সভ্যগণ যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন এবং সেচন সম্বন্ধে তাঁহাদের সাধারণ মন্তব্য সমূহ, আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

কমিশনের সভ্যগণ বঙ্গদেশ সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত কম আলোচনা করিয়াছেন। ধান্য বঙ্গদেশের প্রধান শস্য। যে সমস্ত স্থানে ধান্য উৎপাদিত হইয়া থাকে, সে সমস্ত স্থানে প্রায় কোন না কোন প্রকার সিঞ্চনের বন্দোবস্ত রহিয়াছে। কমিশনের মতে কলিকাতার সমরেখাবর্ত্তি স্থান সমূহে বিশেষতঃ পূর্ব্বাংশে কোনরূপ কৃত্রিম সিঞ্চন প্রণালীর আবশ্যকতা নাই। তাহা কিয়ৎপরিমাণে সত্য হইতে পারে। কিন্তু কলিকাতার পশ্চিমাংশের সমস্ত ধান্য ক্ষেত্রই যে স্বাভাবিক উপায়ে সঞ্চিত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রহিয়াছে। সিঞ্চনের ক্ষেত্র হিসাবে বঙ্গদেশ নিম্নলিখিত পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

(১) উড়িষ্যা এবং মেদিনীপুর (২) দামোদর নদ প্রণালী (৩) গঙ্গার দক্ষিণ তীরস্থ বিহার প্রদেশ (৪) গঙ্গার উত্তর তীরস্থ বিহার প্রদেশ (৫) ছোটনাগপুর।

(১) উড়িষ্যা এবং মেদিনীপুর—

১৮৬৫ সালে উড়িষ্যা ক্যানাল খোলা হয়। মহানদী হইতে এই ক্যানাল বহির্গত হইয়াছে। এই ক্যানাল হইতে সর্ব্বসমেত ৫৭৬, ৩৬৪ একার জমি সিঞ্চিত হইতে পারে। ১৯০১ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর গড়ে ১৯৫৯৭৩ একার জমি এতদ্বারা সিঞ্চিত হইয়াছে। ক্যানাল কাটাইবার ব্যয় সুদ বাদ ২,৬৩,৪৬,৬১৭ টাকা এবং ইহার উপর বাৎসরিক ব্যয় আছে। বাৎসরিক আয় গড়ে ৪,৬৭০১৩ টাকা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে উড়িষ্যা ক্যানাল সমুহের বাৎসরিক আয় হইতে সম্পূর্ণ ব্যয় সঙ্কুলান হয় না। মেদিনীপুর ক্যানাল—এই ক্যানাল কংসাবতী নদী হইতে বহির্গত হইতেছে। এতদ্বারা বৎসরে গড়ে ৭৩,২৮০ একবার জমি সিঞ্চিত হয় ক্যানাল কাটাইবার ব্যয় সুদ বাদ ৮৪,৭৩,৪২৭ টাকা। বৎসরিক ব্যয় ২,৪০,২৯৯ টাকা। বাৎসরিক আয় ২৫০,৫৩০ টাকা।

উক্ত ক্যানাল সমূহ দ্বারা যত পরিমাণ জমি সিঞ্চিত হইতে পারে বস্তবিক তত পরিমাণ জমি সিঞ্চিত হয় না। ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানের জলকর যথেষ্ট কম হইলেও কৃষকেরা ক্যানাল জল আশানুরূপ ব্যবহার করে না। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট ক্যানাল খুলিবার সময় নৌ-শুল্ক হইতে যেরূপ লাভের আশা করিয়া ছিলেন তদ্রূপ লাভ প্রায় হয় নাই। উড়িষ্যা ক্যানাল নৌকা প্রভৃতির বেশী চলন নাই এবং উড়িয়ারা নৌকা অপেক্ষা বলদের দ্বারাই মাল প্রভৃতি চালান দেয়। এই সমস্ত কারণে গবর্ণমেণ্ট ক্যানাল খুলিয়া লাভবান্ হইতে পারেন নাই এবং তজ্জন্যই কমিশনের মত এই যে উড়িষ্যা প্রদেশে ক্যানাল প্রভৃতি না কাটিয়া অপর যে সকল স্থানে এইরূপ কার্য্য লাভজনক হইতে পারে এবং যে খানে অধিক

আবশ্যক সেইরূপ স্থলেই খাল কাটান যুক্তি সঙ্গত। আমরা বলি গভর্ণমেণ্টে কেবল লাভের দিকে তাকাইলে চলিবে না যাহাতে চাষের ও চাষীর উন্নতি হয় তাহাও করা কর্ত্তব্য। কৃঃ সঃ

কৃষিকার্য্যে অনাদর কেন ?

যদিও ভারতে অল্পে অল্পে কৃষির আদর বাড়িতেছে তথাপি এখনও কৃষিকর্ম্মে সাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। সহরবাসী একদল ধনী সম্প্রদায়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও এখনও অনেক শিক্ষিত লোকে ও কৃষিকর্ম্মকে সহানুভূতির চক্ষে দেখেন না ঐ সকল লোকের স্বভাবতই কৃষককুলের উপর ঘৃণা— তাঁহারা তাহাদের সাহচর্য্য যেন কিছুতেই পছন্দ করেন না। তাঁহাদের ভয় যেন তাঁহারা চাষার সঙ্গে মিশিলে তাঁহারা ও চাষা হইয়া যাইবে। আর একদল অর্থ ললুপ ও বিলাস প্রিয়। তাঁহারা চান ফটকা ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ লাভ করিতে এবং সেই পয়সা কৃত্রিম ভোগ বিলাসে ব্যয় করিতে। তাঁহারা আত্ম সর্ব্বস্ব—দেশের প্রকৃত কল্যাণ তাহারা খোঁজেন না। দেশে কোন নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে বা নষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার করিতে হইলে তাহাদিগকে চাষীর সঙ্গে মিশিতেই হইবে এবং সর্ব্বাগ্রে চাষের সুব্যবস্থা করিতে হইবে নতুবা শিল্প সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টিলাভ করিবে না। আর একটা বিশেষ লাভ এই যে কৃষি কর্ম্মের জন্য কৃষকের সহিত মিশিলে ক্ষিতি অপ, তেজ, মরুত, ব্যোম, এই পঞ্চমূল উপাদানের সহিত সাক্ষাত সম্বন্ধ ঘটে। ইহাদ্বারা শরীরের ও মনের যথেষ্ট উন্নতি হইয়া থাকে। ভাবের আদান প্রদান হইয়া সকলেরই মন প্রকৃতির ক্রোড়ে সহজে সরল ভাবে গড়িয়া উঠে—ইহা স্বাভাবিক। এই প্রকার গঠিত মনের শক্তি অসাধারণ এবং ইহারই শক্তি সমাজের হিতকল্পে নিযুক্ত হয়। এই দলের লোক ভ্রান্ত মান মর্য্যাদা রক্ষার জন্য চাষীদের নিকট হইতে পৃথক থাকিতে চান। ইহা অস্বাভাবিক এবং সেই জন্যই বলা কৃষি প্রধান দেশে কৃষিকর্ম্মে ঘৃণা বা অনাদর থাকিলে চলিবে কেন ? ক্রমশঃ আমরা অনন্য উপায় হইয়া পড়িতেছি. কৃষি এখন আমাদের প্রধান অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইবে।

অনেকেই বলিবেন অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিয়া শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িবে এবং মন ক্লিষ্ট হইবে। কিন্তু কোন স্থানই স্বাভাবিক অবস্থায় অস্বাস্থ্যকর ছিল না। আমরাই অবহেলা করিয়া তাহাকে অস্বাস্থ্যকর করিয়াছি এবং আমরা আমাদের দোষের প্রতিকার করিলে পল্লীগুলির লুপ্ত স্বাস্থ্য আবার ফিরিয়া আসিবে। আমরা যদি নির্ম্মল জলের ব্যবস্থা করি, দেশের আবর্জ্জনা নষ্ট করিয়া রৌদ্র বাতাসের প্রবেশপথ সুগম করিয়া দিই, সুপক্ক সুস্বাদু ফল, টাট্‌কা সব্জী, নির্ম্মল দুধ, বিশুদ্ধ মাখন ঘৃত, তাজা

মাছ এবং চাষের ধানের ভাত খাইতে পাই তাহা হইলে রোগ আমাদের ধারে ঘেঁসিতে পারিবে না এবং এমতাবস্থায় আমরা সুস্থ দেহ মন লইয়া সংসার করিতে পারিব। এইরূপে আমরা সাবলম্বী হইব এবং মন প্রকৃত স্বাধীন ভাব অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। ধনীগণ বলিবেন যে টাকায় কিনা হয়, টাকায় বাঘের দুধ মিলে। মিলে বটে কিন্তু সে পরের হাত তোলা। সদ্য জাত দ্রব্যের স্বাভাবিক আস্বাদন হইতে অনেক ধনী নগরবাসীকে বঞ্চিত থাকিতে হয়। যাহারা পল্লীর সহিত সম্বন্ধ হারাইয়াছেন তাহারা সহজে বুঝিতে পারিবেন না পল্লীর জল মাটি হাওয়াতে কি সুখ আছে বা সদ্যজাত খাদ্যের মূল্য কি ? খোলা গায়ে, নগ্ন পায়ে মাঠে বেড়ানতে যে কি লাভ তাঁহারা কি প্রকারে বুঝিবেন !

রত্নগর্ভা বসুন্ধরা নানা স্থানে নানারূপ রত্ন ধারণ করিয়া থাকেন, কোথাও স্বর্ণ, রৌপ্য কোন স্থানে বা হীরক মণি মুক্তা প্রবালাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তৎসমীপস্থ দেশবাসী উক্ত দ্রব্যাদি আহরণ দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহের উপায় করিয়া থাকে কিন্তু আমাদের বঙ্গদেশে উক্ত দ্রব্যাদির মধ্যে বিশেষ কিছুই উৎপন্ন হয় না তথাপি আমাদের দেশে যাহা আছে তাহাই উক্ত দ্রব্যাদির সহিত তুলনা করিলে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। কেননা কেবল মণি মুক্তার দ্বারা উদর পূরণ হয় না, কিম্বা জীবন ধারণ করা চলে না। মণি মুক্তার বিনময়ে শস্যের আবশ্যক। এই জন্যই মহামুনি পরাশর বলিয়া গিয়াছেন---

"কণ্ঠে হস্তে চ কর্ণে চ সুবর্ণং যদি বিদ্যতে।
উপবাসস্তথাপিস্যাৎ অন্নাভাবো দেহিনাম ॥

* * *

তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য কৃষিং যত্নেন কারয়েৎ ॥

—ভারতবর্ষই যে কৃষির সর্ব্বোচ্চ স্থানে তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে ও করিয়া থাকেন ; তন্মধ্যে বঙ্গদেশই সর্ব্বপ্রধান, কারণ বঙ্গদেশের অবস্থা, আবহাওয়া পর্য্যালোচনা করিলেই স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ইহা কেবল উদ্ভিদ্ রত্নই প্রসব করিতে সমর্থ, বঙ্গদেশে পর্ব্বতাদি কোন রূপ প্রতিবন্ধক অধিক মাত্রায় না থাকায়, সমুদ্রের আর্দ্র বায়ু সঞ্চালিত হইয়া বাঙলার মাটীকে সর্ব্বদা সরস রাখিয়া থাকে বলিয়া ও উত্তাপ-বৃষ্টিপাত এবং নদীরজল সম্যকরূপে পাওয়া যায় বলিয়া বঙ্গভূমির তুল্য উর্ব্বরতা ও শস্য-দান-সামর্থ এরূপ স্থান আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। শস্য রত্ন যে মহারত্ন, তাহা বলা বাহুল্য। এইজন্যই ধানকে ধান্যধন, গবাদিকে গোধন বলে। এই জন্যই দিল্লীর সম্রাট্গণ বাঙ্গালা লইবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়া ছিলেন। এহেন মহারত্নপ্রসূ বঙ্গদেশে থাকিয়াও যে আমাদের দুর্ভিক্ষ্যের আর্ত্তনাদ শুনিতে হয় ইহাই দুঃখের বিষয় ! আরও দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা যাহার দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া থাকি, যাহা না হইলে, মুহূর্ত্তও আমাদের চলে না, সেই মহারত্ন

শস্য উৎপাদনে আমরা অবহেলা করিয়া থাকি। অধিকন্তু যাহারা ঐ সকল কার্য্য করে তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া সামান্য "চাষা" নামে অভিহিত করিয়া ভদ্রসমাজ হইতে বিচ্যুত করিয়া এক অতি নীচ সম্প্রদায় মধ্যে গণ্য করিয়া থাকি; বর্ত্তমান অবস্থায় "চাষা শব্দ এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, কোনও ভদ্রলোককে "চাষা" বলিলে, তাঁহাকে গালাগালি দেওয়া হইল, এইরূপ মনে করিয়া থাকেন, এমন কি কৃষিকার্য্যকে নীচ ব্যবসা জ্ঞানে অবহেলা করিয়া জমি বিলি করিয়া খাজনা আদায় করতঃ জমির স্বত্ব উপভোগ করিয়া থাকেন; ইহাতে কৃষি অপেক্ষা কম আয় হইলেও তত্রাচ কৃষিকার্য্যকে উপেক্ষা করেন।* আবার ইহার উপর যদি কৃষকদের কোন রূপ ত্রুটি হয় অর্থাৎ যদ্যপি তাহারা শস্য ভালরূপ না হওয়ায় খাজনা দিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে তাহাদের পীড়নের আর পরিসীমা থাকে না। এই তো বর্ত্তমান বঙ্গের অবস্থা! যে দেশে কৃষকেদের আদর নাই, সে দেশের মঙ্গল সুদূরপরাহত। আমাদের দেশে পূর্ব্বে কৃষকদের আদর ও মান্য ছিল বলিয়াই, এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে ও সেই উন্নতির স্রোত এতদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু এক্ষণে আর চলে না, দিন দিন ভারতের উন্নতি সূর্য্য অস্তমিত হইয়া আসিতেছে; তাহার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল মাত্র কৃষকদিগের উপর পীড়নই একমাত্র কারণ। কৃষকদিগের উপর একটু সস্নেহ দৃষ্টি একান্ত প্রার্থনীয় তাহা হইলে বঙ্গের নিরীহ পরোপকারী কৃষকদিগের যথেষ্ট উপকার সাধন করা হয় ও তৎসঙ্গে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয় সন্দেহ নাই, ইহা বলাই বাহুল্য।

কৃষিকার্য্যে বাঙ্গালী চরিত্র বড়ই চমৎকার! আজীবন পরের দাসত্ব স্বীকার করিয়া প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতঃ অন্নকষ্টে থাকিব সেও ভাল; তবু সারাজীবন স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া অন্নের সচ্ছলতা করা বাঙ্গালীর সাধ্যাতীত, এই জন্যই বলিতেছিলাম, কৃষিকার্য্যে বাঙ্গালী চরিত্র বড়ই চমৎকার! শুধু কৃষিকার্য্যে কেন? অন্যান্য কার্য্যেও বাঙ্গালীচরিত্র চমৎকার। বাঙ্গালী পরের উচ্ছিষ্ট পাইলে আর কিছুই চায় না।

* এই কথার মীমাংসা এক কথায় হয় না—ভূস্বামীগণ যদি স্ব স্ব অধিকারে সমস্ত জমি নিজ দখলের রাখিয়া চাষ আবাদ করিবার প্রয়াস পান তাহা হইলে দেশে কুলী মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। তাহা না করিয়া বরং অতি অল্প পরিমাণ জমিতে নিজে আবাদ করা কর্ত্তব্য—সেই গুলিই তত্রস্থ আদর্শ ক্ষেত্র হইবে। তাহার অধীনস্থ প্রজাবৃন্দকে নূতন নূতন সহজসাধ্য চাষাবাদ প্রণালী শিক্ষা দিতে হইবে। প্রজাদের জমির কিসে উন্নতি হয় বিধিমত প্রকারে চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাতে জমিদারগণের কিছু অধিক ব্যয় হইতে পারে। কিন্তু তিনি যদি ঐ সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য প্রজাদের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাজনার হার বাড়ান, তাহা হইলে তিনি ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ দোষী হইবেন না।—কৃঃ সঃ।
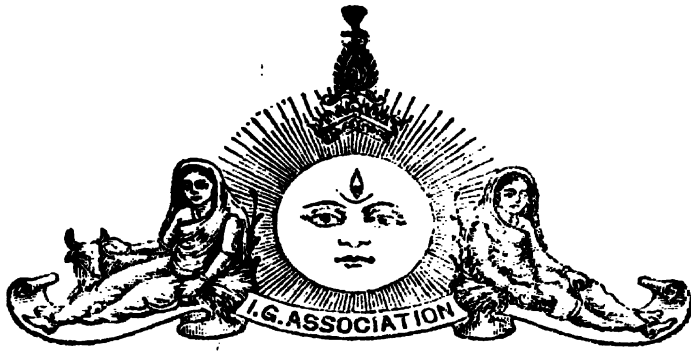
ভারতীয় কৃষির প্রসার

ভারতের চাষাবাদ উন্নতিরদিকে কতদূর অগ্রসর হইতেছে বৎসর বৎসর তাহার একটা খতিয়ান বাহির হয়। ১৯১৯-২০ সালের খতিয়ান লইয়া আমরা বর্ত্তমান সময় আলোচনা করিব।

বীজ, ক্ষেত্র, আবহাওয়া, চাষের প্রণালী এবং উপযুক্ত তদ্বির ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ের উপর চাষাবাদ সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে। আলোচ্য বর্ষে ইহার মধ্যে কোন্‌টির জন্য ব্যাঘাত ঘটিয়াছে তাহাই আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়।

চাষের অবস্থা—মোটের উপর আবহাওয়া ও চাষের অবস্থা ভালই ছিল। স্থানে স্থানে অতিবৃষ্টি জনিত কিছু অসুবিধা হইলেও মোটের উপর ভারতে সর্ব্বত্র চাষবাসের অবস্থা ভালই ছিল। চা ও নীল ব্যতীত যাবতীয় উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ অন্য বৎসর অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। সারা বৎসর যাবত কৃষিজাত দ্রব্য মাত্রেরই দর উচ্চ থাকায় চাষীরা অর্থের স্বচ্ছলতা অনুভব করিয়াছিল। চাষী মজুরদিগের কাজের অভাব হয় নাই এবং তাহাদের মজুরির হারও উপযুক্ত মাত্রায় পাইয়াছিল।

গবাদি জন্তুর পক্ষে বৎসের ফল তাদৃশ ভাল ছিল না। পশুগণ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে অনেক জায়গায় মড়ক দেখা দিয়াছিল।

বিভিন্ন শস্যের পরীক্ষা · ধান—সরকারী কৃষি ক্ষেত্রে কটকতারা আউস এবং ইন্দ্রশালী আউস ধানের পরীক্ষা করিয়া এতদুভয়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং সরকারী কৃষি বিবরণী প্রভৃতিতে ইহারই বহু আলোচনা দেখিতে পাই। কটকারা আউসের মত বা তাহা অপেক্ষা ভাল অনেক আউস আছে

তখন একটি মাত্র কটকতারা আউসের গুণ ব্যাখ্যানে বিশেষ কিছু লাভ দেখা যায় না। আমরা বলিতে পারি যে লক্ষ্মী পারিজাত আউস যাহা আমরা বহুবার চাষ করিয়াছি তাহা ফলনে ও গুণে কটকতারা অপেক্ষা নিশ্চয়ই ভাল। বাঙলার জেলায় জেলায় কত রকমেরই আমন আছে,—যেখানে যেটি উপযোগী তাহারই চাষ হয়, তখন বাঙলার চাষীরা কেবল ইন্দ্রশালী আমনের আদর করিবে কেন ? কিন্তু বাঙলার সাধারণ চাষীর একটা মহৎ দোষ এই দেখা যায় যে, তাহারা বিশুদ্ধ বীজ ধানের জন্য ততটা আগ্রহ প্রকাশ করে না, তাহাদের বীজে এক ধানের সহিত অন্য ধান মিশান থাকে যেটার প্রধান্য থাকে তদনুসারেই ধান্যের নাম দেয়। বিশুদ্ধতার আর একটি অন্তরায় যে পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকার ধানের আবাদ হয় এবং ঐ সকল ক্ষেত্তের বীজ ধান সাঙ্কর্য্য দোষে দুষ্ট হয় এবং তাহাতে ফল কখন ভাল কখন মন্দ হয়। ধানের উন্নতি কল্পে বিভিন্ন জেলার ধান অদল বদল করিয়া চাষ করা ভাল বলিয়া মনে করি কিন্তু চাষাদের সকল সময় সে সুযোগ ঘটে না। সরকারী কৃষিতত্ত্ববিদগণের এই সকল বিষয়েই মনোযোগী হওয়া অধিকতর কর্ত্তব্য বলিয়া আমাদের মনে হয়।

মান্দ্রাজে শাদাই সাম্বা ধানের পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে উহার ফলন একর প্রতি ৩,৭৭১ পউণ্ড এবং ইহার চাষে একর প্রতি ২২৯৲ টাকা মুনফা হইতে পারে। প্রত্যেক জেলায় জেলায় প্রদেশ প্রদেশে এক একটা ধান বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে হয়। বিশেষজ্ঞগণের কর্ত্তব্য তাহাই নির্ণয় করিয়া দেওয়া এবং সেই সকল ধানেরই অধিক প্রবর্ত্তন করা।

গম—শস্যের মধ্যে ধানের পরই গমের স্থান পাওয়া উচিত। গম সম্বন্ধে পরীক্ষা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আলোচ্য বর্ষে অধিক জমিতে ধানের চাষ হইয়াছিল এবং ফলনও অধিক হইয়াছে। পুষা গম বিদেশও আদৃত হইতেছে।

ইক্ষু—গুড়চিনির দর যে প্রকার চড়া তাহাতে ইক্ষুব আবাদ সমধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হওয়া এবং এদেশে এদেশের মত পর্য্যাপ্ত গুড় চিনি উৎপন্ন হওয়া উচিত ছিল। তদনুরূপ কিছুই হয় নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে বিদেশ হইতে বৎসরে প্রায় ৯০০,০০০ টন চিনি ভারতে আমদানী হইত। আলোচ্য বর্ষে ৪০৮, ৭৮০ টন চিনি (গুড় ও চিনি জাতদ্রব্য সমেত) আমাদানী হইয়াছে। কিছু মাল কম আসিলেও আমদানী দ্রব্যের মূল বাড়িয়াছে। গত বর্ষের আমদানীর মূল্য ২১৮৪ লক্ষ টাকা এবং পূর্ব্বের আমদানীর মূল্য—১৫,৩৪ লক্ষ টাকা। ভারতে ইক্ষু চাষের মত স্থানের অভাব নাই। কৃষি-বিভাগের কর্ত্তব্য ভারতীয় চাষীগণকে ইক্ষু আবাদ স্থাপনের জন্য সাহায্য করা এবং জায়গায় জায়গায় স্থানীয় ইক্ষু আবাদের এক একটা কেন্দ্রে গুড়চিনির কারখানা স্থাপন করা। কৃষি বিভাগের উৎসাহে যদি সরকার হইতে যৌথ কারবার খুলিয়া ইক্ষুর আবাদ ও চিনির কারখানা খোলা হয় তবে প্রভূত মঙ্গল হয়। সরকারকে প্রথমে অর্থ সাহায্য করিতে

হইবে কিন্তু কারবার চল্‌তি হইলে সরকার তাহার অংশ সমস্ত বেচিয়া টাকা উঠাইয়া লইতে পারেন। তখন সাধারণের টাকায় কারবার চলিবে। পুষাতে সম্প্রতি শর্করা তত্ত্বানুশীলন সভা স্থাপিত হইয়াছে তদ্বারা দেশের অনেক উপকার হইবে। ইক্ষুর আবাদ ও শর্করা প্রস্তুত সম্বন্ধে চাষীরা সেখান হইতে আবশ্যকমত অনেক উপদেশ পাইতে পারিবে।

তুলা—তন্তুউৎপাদক শস্যের মধ্যে তুলাই সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করে এবং ইহার আবাদ ঐ জাতীয় উদ্ভিদের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ১৯১৮ শালে যে পরিমাণ জমিতে তুলার আবাদ হইয়াছিল আলোচ্য বর্ষে তদপেক্ষা ২০ লক্ষ একর অধিক জমিতে তুলার আবাদ হইয়াছে। ঐ বৎসরে ২,৩৯৮,৬০০ গাঁইট (ওজন ৪২৮,৩০০ টন, টন ২৭॥ মণ) তুলা রপ্তানি হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসর উহার অর্দ্ধেক পরিমাণও রপ্তানি হয় নাই। রপ্তাণি তুলার মূল্য ৫৮,৬৫ লক্ষ টাকা এবং রপ্তানি তুলাজাত দ্রব্যের মূল্য ৩৭৩ লক্ষ টাকা। বিলাতে, বয়ন জন্য ভারতের তুলার উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হয়। ভারতীয় তুলা চাষীর ও বণিক সম্প্রদায়ের প্ররোচনায় গভর্ণমেণ্টকে ভারতে তুলা চাষের প্রতি একটু লক্ষ রাখিতে হয় এবং এই কারণে ভারতীয় কৃষিবিভাগ সমূহ তুলা চাষের জন্য সচেষ্ট। আহার ও পরিধেয় এতদুভয়ের জন্যই সর্ব্বাগ্রে বিধান করা চাই, এই কারণে ভারতীয় কৃষি বিভাগের এই দিকে দৃষ্টি থাকা বিশেষ আবশ্যক।

পাট—পাট চাষের প্রসার ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে, আলোচ্য বিবরণীতে দেখিতে পাওয়া যায়। আলোচ্য বর্ষে ২৮ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্ব বর্ষের পাটের আবাদের জমির পরিমাণ ছিল ২৫ লক্ষ একর। বর্ত্তমান সময়ে পাটের দাম কমিয়া যাওয়ায় পাট চাষ কিছু কম হইয়া থাকিবে কিন্তু পাটের দর বাড়িলে আবার চাষ বাড়িবে। পাট বহির্বাণিজ্যের একটি প্রধান দ্রব্য এবং ইহা বাঙলায় এক চেটিয়া সুতরাং ইহার চাষের উন্নতি অবনতিতে বাঙলার লাভ লোকসান অনেকটা নির্ভর করে সন্দেহ নাই। আলোচ্য বর্ষে ৪০০ পাউণ্ডের ৮৪ লক্ষ বেল পাট রপ্তানি হইয়াছিল। এক বেল বা গাঁইটের ওজন বাঙলা ৫ মণ। পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি হেতু আলোচ্য বর্ষে বাঙলায় ৭৪৭২ লক্ষ টাকা পরিমাণ অর্থাগম হইয়াছে। তৎপূর্ব্ব বর্ষে আসিয়াছিল ৬৫৩৭ লক্ষ টাকা। কিন্তু ইহা আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে এই লাভের অতি অল্পমাত্রাই চাষীর ঘরে যায়। ইহার লাভ অধিক মাত্রায় পাটের দালাল, মহাজন, ও চট কল ওয়ালাদের হস্তগত হয়। ইহাদেরই হাতে পাটের বাজার এবং ইহারা এক যোট হইয়া পাটের দর উঠায় ও নামায়। চাষীদের ভাল মন্দর দিকে ইহাদের দৃষ্টি নাই বলিলেই হয় এবং সময় সময় চাষীর সর্ব্বনাশ সাধন হইলেও ইহারা লাভ করিতে ছাড়ে না। গভর্ণমেণ্টের চাষীগণকে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। চাষীরা

উৎপাদক হিসাবে ব্যবসায়ের ও গভর্ণমেণ্টের প্রাণ স্বরূপ। প্রজা রক্ষা হইলে তবে, গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টিলাভ করিবে। ভারতে নানাস্থানে কো-অপারেটিভ সমিতি স্থাপিত হইয়াছে কিন্তু তাহাদের চাষীগণকে রক্ষা করিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা দেখা যায় না।

আমরা এই বিবরণী পাঠে জানিতে পারি যে নীল ব্যবসা রক্ষার জন্য কো-অপারেটিভ সমিতি আছে এবং রঙ্গপুর তামাক বিক্রয় জন্য সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং নাওগাঁয়ে গাঁজাবিক্রয়কারিদের কার্য্য সৌকর্য্যার্থে গাঁজা সমিতি আছে কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, পাটচাষীদের রক্ষা কল্পে কোন সমিতি নাই। তাহারা ধনীগনের কবলে পড়িয়া বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছে। পাটের ব্যবসায় অনেকে ধনী হইতেছে কিন্তু পাট চাষীরা তাহাদের উদরান্ন ও জমির খাজনা যোগাড় করিতে পারিতেছে না। গভর্ণমেণ্ট কো-অপারেটিভ সমিতির সাহায্যে তাহাদিগকে রক্ষা না করিলে আর উপায়ান্তর নাই। এইরূপ সাহায্য পাইলে বাঙলার বহু চাষীর কল্যাণ হইবে।

দেশের কথা

বাঙলায় কয়লা—বাঙ্গালায় কয়লার অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় অবস্থায় পরিণত হইতেছে। পূর্ব্বে বোম্বের কল ও মিলে বাঙ্গালার কয়লা ব্যবহৃত হইত, কিন্তু রেলওয়ে কোম্পানী গুলি মালের ভাড়া বৃদ্ধি করায় এবং প্রয়োজন মত গাড়ী সরবরাহ না করায় বোম্বে মিল ও কলের সত্বাধিকারীগণ দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে কয়লা আমদানী করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফলে বাঙ্গালার কয়লা ব্যবসায়ীগণ মহাবিপদে পতিত হইয়াছে, প্রত্যেক বৎসর রেলওয়ে কোম্পানীগুলিকে পোষণের জন্য রাজকোষ হইতে ১৮।১৯ কোটী টাকা ব্যয় হইয়া থাকে, আমরা জিজ্ঞসা করি ইহার বিনিময়ে প্রজাসাধারণ কি উপকার লাভ করিয়া থাকে? গবর্ণমেণ্টের উচিত হয় রেলওয়ে কোম্পানীকে টাকা দেওয়া বন্ধ করা নতুবা যাহাতে প্রয়োজন মত গাড়ী সরবরাহ করে তজ্জন্য কোম্পানীগুলিকে বাধ্য করা।

সিংহলে ইক্ষুর চাষ ইহার প্রতি অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে, তথায় এখন একর প্রতি ইক্ষুর জমিতে গড়ে ৭০০ মণ ইক্ষু এবং তাহা হইতে ৬০ মণ চিনি উৎপন্ন হয়। সিংহলে ইক্ষুর চাষ যেরূপভাবে চলিতেছে তাহাতে মনে হয় ৪।৫ বৎসর পরে তথায় আর বিদেশী চিনি আমদানী করিতে হইবে না। ভারতবর্ষে বৎসরে ২২ কোটী টাকার চিনি আমদানী হইয়া থাকে, এদেশে খেজুর গাছ যথেষ্ট আছে এবং চেষ্টা করিয়া দেখা গিয়াছে ইক্ষুর চাষও বেশ লাভজনক। আর একটু চেষ্টা করিলে ভারতবাসীও অচিরে বিদেশী চিনি বর্জ্জন করিতে পারিবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বাগানের মাসিক কার্য্য

আশ্বিন মাস।

ভাদ্র মাস গত হইল, বিলাতী সব্জী বীজ বপন করিতে আর বাকি রাখা উচিত নহে। কপি, সালগম, বীট প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বেই বপন করা হইয়াছে। সেই সকল চারা এক্ষণে নাড়িয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। মটর, মুলা, এবং নাবী জাতীয় সীম সালগম, বীট, গাজর, পিয়াজ ও শসা প্রভৃতি বীজের বপনকার্য্য আশ্বিন মাসের শেষেই, আরম্ভ করা উচিত। নাবী ফসলের এখনও সময় আছে, এখনও তাহাদের চাষ চলে। কার্ত্তিকের প্রথমে ঐ সমস্ত বিলাতী বীজ বপন যেন আর বাকী না থাকে। বীজ আলুও এই সময় বসাইতে হইবে। পিয়াজ ও পটল চাষের এই সময়। আশ্বিনের প্রথমার্দ্ধ গত হইলে রবিশস্যের জন্য জমি তৈয়ারি করিতে হইবে এবং আশ্বিন মাস গত হইতে না হইতেই মসুর, মুগ, তিল, খেঁসারী প্রভৃতি রবি শস্যের বীজ বপন করিলে ফল মন্দ হয় না। কিন্তু আকাশের অবস্থার উপর সব নির্ভর করে। যদি বর্ষা শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবেই রবি ফসলের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত, নচেৎ বৃষ্টিতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সচারাচর দেখা যায় যে, আশ্বিন মাসের শেষেই বর্ষা শেষ হইয়া যায়, সুতরাং বঙ্গদেশে কার্ত্তিক মাসেই উক্ত ফসলের কার্য্য আরম্ভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ধনে—যেমন তেমন জমি একটু নামাল হইলে যথেষ্ট পরিমাণে ধনে হইতে পারে। ধনে এই সময় বুনিতে হয়।

মুল্লাদি—মুল্ল, মেথি, কালজিরা, মৌরী, রাঁধুনি ইত্যাদি এতৎ প্রদেশে ভাল ফলে না; কিন্তু উহাদিগের শাক খাইবার জন্য কিছু কিছু বুনিতে পারা যায়। এই সকল বপনের এই সময়।

কার্পাস গাছ—গাছ কার্পাসের দুই চারিটি গাছ, বাগানের এক পাশে রাখিতে পারিলে গৃহস্থের অনেক কাজে লাগে। উহার বীজ এখন বপন করা যায়। বাঙলায় ক্ষেতে তুলা চাষেরও এখন একটা ভাল সময়। একবার বৈশাখ মাসেও তুলাচাষ হইয়াছে।

তরমুজাদি—তরমুজাদি, বালুকামিশ্রিত পলিমাটিযুক্ত চর জমিতেই ভাল হয়। যে জমিতে ঐ সকল ফসল করিতে হয়, তাহাতে অন্যান্য সারের সঙ্গে আবশ্যক হইলে কিছু বালি মিশাইয়া দিবে। মাটি চাপা দিয়া রাখিলে তরমুজ বড় হয়। বীজ বসাইবার এই সময়।

উচ্ছে—৪হাত অন্তর উচ্ছের মাদা করিতে হয়, নচেৎ পাইট করিতে ও উচ্ছে তুলিতে কষ্ট হইবে। উচ্ছের বীজ একটী মাদায় ৩।৪টার অধিক পুতিবে না। উচ্ছে বীজ এই মাসের মধ্যে বসাও।

পটল—পটলের মূলগুলি প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্পজলে ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া নূতন অঙ্কুর বা কল বাহির হইলেই পুতিবে। পুনঃ পুনঃ খুড়িয়া ও নিড়াইয়া দেওয়াই পটলক্ষেত্রের প্রধান পাইট। পটল চাষ এইমাসে আরম্ভ হয়।

পলাণ্ডু—কল সমেত এমটী পিয়াজ আধ হাত অন্তর পুতিয়া দিবে এবং জমি নিতান্ত শুকাইয়া গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া আবার মাটীর "যো" হইলে খুসিয়া দিবে। এই মাসে পিয়াজ বসাইবে। পেয়াজের বীজ বপন করিয়াও পেঁয়াজ চাষ করা যায়। প্রথম বর্ষ খুব ক্ষুদ্র পেয়াজ হয়, দ্বিতীয় বর্ষে সেই পেঁয়াজ পুতিলে বড় পেঁয়াজ হয়।

মটরাদি—শুঁটি খাইবার জন্য আশ্বিনের শেষে মটর, বরবটি, ও ছোলা বুনিতে হয়। ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে হয় না।

ক্ষেতের পাইট—যে সকল ক্ষেতে আলু, কপি বসান হইয়াছে, তাহাতে আবশ্যকমত জল দিয়া আইল বাঁধিয়া দেওয়া ভিন্ন এ মাসে উহাদের আর কোন পাইট নাই।

ফলের বাগান—এই সময় কোপাইয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

মরসুমী ফুল বীজ—সর্ব্বপ্রকার মরসুমী ফুল বীজ সেই সময় বপন করা কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে এষ্টার, প্যান্সি, দোপাটি, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ কিছু কিছু বপন করা হইয়াছে। এতদিন বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু কার্ত্তিক মাসে প্রচুর শিশিরপাত হইতে আরম্ভ হইলে আর বৃষ্টির আশঙ্কা থাকেনা, সুতরাং এখন আর যাবতীয় মরসুমী ফুল বীজ বপনে কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

গোলাপের পাইট—গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া এই সময় রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইয়া লইতে হইবে। ৪।৫ দিন এইরূপ করিয়া পরে ডাল ছাটিয়া গোড়ায় নূতন মাটি, গোবরসার প্রভৃতি দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিলে শীতকালে প্রচুর ফুল ফুটে। গাছের গোড়া খোলা থাকাকালে কলিচুণের ছিটা দিলে বিশেষ উপকার হয়। বাঙলাদেশের মাটি বড় রসা এইকারণে এখানে এই প্রথা অবলম্বনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

২২শ খণ্ড। } আশ্বিন, ১৩২৮ সাল। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

মুর্গীচাষ বা পুল্ট্রী ফার্ম্মিং

মুর্গীচাষের কথা পুর্ব্বে ২ পত্রে অনেক বলিয়াছি। শীতের সময় ডিম উৎপাদনই একটা বেশ লাভের আইটেম্ (item বা বাব) বলিয়া আমার মনে হয়। ইহাতে কি ২ দরকার তাহা জানা বিশেষ দরকার। ইহাতে চাই খুব বেশী ডিমদাত্রী মুর্গীর পরিবার রাখা, তাহাদের যত্ন করা, ভাল স্বাস্থ্যকর গৃহে রাখা, ছানা গুলি যাহাতে খুব শীঘ্র বাড়ে, উত্তম ও পুষ্টিকর খাদ্য দান, এবং সময়ে ২ ঝাঁকে নূতন শোনিত আনিয়া ঝাঁককে নবরূপে পুনর্গঠিত করা। ইহাতে চাই শিক্ষা ; তাহা দিবার ও পথ দেখাইবার লোক আমাদের নাই। আমাদের দেশে এইরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গরিব বালকদের জন্য করিতে হইলে ৪।৫ হাজার টাকায় যদি সামান্য স্থান ও ঘর পাওয়া যায় তাহা হইলে বেশ চলিতে পারে। দেশে এত রাজা মহারাজা, নবাব, জমিদার, বড় নবাব, ছোট নবাব, মির্জা, উলমা ইত্যাদি আছেন, এ গরিবদের উন্নতির দিকে কাহার করুণ দৃষ্টি পড়ে না। ২।১টা সাইফার, ২।১টা বাফ্ আর্ট, ২।১টা কান্দি, ২।১টা প্রেরী ইন্ কুবেটার আনাইয়া ৪।৫ হাজার মুর্গী লইয়া বেশ একটা স্কুল চলে বা ডিম কিনিয়া কাজ চলে, ২।৩ মাস খরচ চালাইলে আর দেখিতে হয় না। তাহার লাভেতেই স্কুলটা পরিচালিত হইতে পারে।

এইরূপ স্কুল বা মুর্গীচাষের কারবার চালাইলে হইতে আমাদের সর্ব্বাগ্রে দেখা কর্ত্তব্য যে আনুসঙ্গিক ব্যয়ের বিলটা যত হ্রাস করা যাইতে পারে তাহা করিবার চেষ্টা করা। আমি প্রথমেই বলেছি যে এই কারবার সামান্য ২।১টা কল লইয়া আবশ্যক মত ক্রমশঃ বাড়াইবে যেমন যেমন মালের কাটতি হইবে ও খোর্দ্দের বাড়িবে। এই কারবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, যত্ন ও রীতিমত নির্দ্ধারিত সময়ে আবশ্যকমত পুষ্টিকর খাদ্যদানই লাভের মুলমন্ত্র তাহা যেন পাঠকের সবিশেষ স্মরণ থাকে।

খুব ডিমদাত্রী বংশের পাখী ঝাঁকে রাখিবে। যদি এরূপ না পাও, অপর স্থান হইতে এই লেখকের সাহায্যে আনাইয়া লও বা তাহা তোমার নিজের ফারমে উৎপাদন করিয়া লও। যেমন পাল হইতে লোকসানদায়ী গুরুর বা ব্যাবকক্ পরীক্ষা যন্ত্রের দ্বারা টের পাওয়া যায়, সেইরূপ "ট্র্যাপ বাসা"র দ্বারা পাঠক তোমার ক্ষতি জনক পাখী নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহাদের ঝাঁক হইতে অপসারিত করিবে ও বাজারে পাঠাবে। এরূপ পাখী রাখার কোন লাভ নাই। অক্টোবর হইতে জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত এইরূপ

ট্র্যাপ বাসার সাহায্যে পালকের ঝাঁকের সকল মুর্গীর খবর পাওয়া যায়। যেমন নূতন শোনিত দ্বারা অলাভজনক গাভীর বংশকে উন্নতি করা যায়, সেইরূপ মুর্গী, হাঁস পেরু গিনিফাউল আদি পাখীরও ডিমদাত্রীগুণের সবিশেষ উন্নতি সাধিত করা যাইতে পারে। যে মুর্গী বৎসরে ১৯০টা ডিম দেয় সে তত ভাল না হইলেও মন্দ বলা যায় না। যাহারা ২৮০টা ডিম দেয় সেই মুর্গী খুবই ভাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। তারপর দেখা চাই যে ছানাগুলি খুব শীঘ্রই বর্দ্ধিত হয়, তবেই বেশী দাম পাওয়া যাইবে। বাসা নির্ম্মাণ উৎপাদকের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে যে সে কিরূপ বাসা প্রস্তুত করিবে। এই স্থান খুব ভাল নির্ম্মল বাতাস চলাচলযুক্ত ও স্বাস্থ্যকরও স্যাঁতা বিমুক্ত হওয়া চাই। ডিমদাত্রী পাখীদের খাদ্য দানের উপর ডিমের সংখ্যা নির্ভর করে, সেইজন্য ডিমদাত্রীকে শুকরক্ত, জৈবিক খাদ্য, উদ্ভিদ খাদ্য, হাড়, শামুক চূর্ণ আদি যথেষ্ট পরিমাণে দিবে তাহা পূর্ব্ব পত্রে বলিয়াছি। জই, মক্কা, গম, যব, চূর্ণ করিয়া দিলে মন্দ খাদ্য হয় না। এইরূপ খাদ্যদানে ডিম বেশী দেয়।

মুর্গীর পাল বড় বেশী বড় করিবে না, নূনকল্পে ১০০টি হইতে ২০০টি পর্য্যন্ত ডিম-দাত্রী মুর্গী রাখিবে এক এক পৃথক স্বতন্ত্র স্থানে; তাহাদের সঙ্গে সংখ্যানুযায়ী তেজস্কর মোরগও রাখিবে তাহা হইলে উর্ব্বর বসাইবার মত ডিম পাওয়া যাইবে। এক ২ ঝাঁক দূরে ২ রাখিবে তাহাহইলে সংক্রামক রোগ আক্রমণের ভয় থাকিবে না। জই চূর্ণ, মকাচূর্ণ, কোপী বীট গাজর আদি শীতের সময় জাত উদ্ভিদের পাতা, মাছের পোঁটা, ভাত, মাংসের ত্যক্ত টুকরা, শুকরক্ত, হাড় চূর্ণ আদি মিশাইয়া খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দিলে বেশী পরিমাণে ডিম পাওয়া যায়। খাদ্য ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন রূপে মিশাইয়া দিতে হয়। তাহা সডাক পত্র লিখিলে জানা যাইতে পারে।

পোকা নষ্ট করিবার জন্য নিম্নলিখিত রূপে দ্রাবণ প্রস্তুত করিয়া মেঝে ও দেওয়ালের গায়ে স্প্রেকল দ্বারা ছড়ান কর্ত্তব্য। কেরোসিন ১ কোয়ার্ট, ক্রীয়োলীন একপিণ্ট ও ৫কোয়ার্ট ক্রীম অব লাইম। আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে দুই বৎসর অন্তর পালগুলি পালটাইয়া ফেলিবে।

ইনকুবেটার বা ডিম ফোটা কলের মধ্যে, স্প্রাট, ডেয়ারিসান্নাইকোং, সাইফার বক্ আই, প্রেরীষ্টেট, ক্যাণ্ডি, ইলম্যামথ, প্রভৃতি বহু এবং নান নামধেয় উৎপাদকের কল বাজারে বিক্রয় হয়। এই কল চালন শিক্ষা সহজ তাহা আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রে বলিয়াছি। ডিম গুলি এক সঙ্গে বসাইবে। ডিমগুলি উর্ব্বর, পরিষ্কার, বড়, এবং দেখিতে সুন্দর ও তেজস্কর হওয়া কর্ত্তব্য মুর্গীর ও হাঁসের ডিম এক সঙ্গে কদাচ বসাইবে না। ডিমের কামরায় বাষ্প (moisture) দেওয়া কর্ত্তব্য; তাহাতে বেশী ও তেজস্কর ছানা হয়। অনেক সময়ের দেখা যায় যে ডিম ফোটনের সময় ছানাগুলি ডিমের গায়ে লাগিয়া মরিয়া থাকে। ইহার কারণ অসাবধানে কল চালন, বাষ্প দানে কার্পণ্য, বাতাস চলাচলে বাধা, অত্যন্ত টেম্পারেচারে ডিম রাখা, ডিমগুলাতে বাতাস না খাওয়ান, ডিমগুলা না পালটান ইত্যাদি। ডিমগুলা

কামরায় রাখিয়া ১০১½° তাপ দিতে হয় ; এইরূপ তাপ কয় দিন দিলে ক্রমশঃ যত ভ্রূণ বাড়িতে থাকে ততই কার্বণ ডায়কসাইড্ গ্যাস ডিম হইতে নির্গত হইয়া ডিমের কামরায় জমা হয় ; এই গ্যাস বিষাক্ত ; তাহা উত্তম বায়ু (ventilation) চলাচলের দ্বারায় নিষ্কাষিত করিতে হয়। আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ব্রুডার বা ব্রুডার হাউসের প্রয়োজন হয় না, তবে যেখানে বড় শীত সেই খানে ইহার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। মুর্গীর স্বাস্থ্যকর বাসা, ও স্বাস্থ্যের উপর ডিম দেওয়া গুণ নির্ভর করে, সেইজন্য আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে স্বাস্থ্যকর ঘর তাহাদের জন্য ব্যবস্থা করিবে। প্রত্যেক মুর্গীর ২½-৬বর্গফীট্ পরিসর স্থান প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা করিয়া ঘর নির্ম্মান করিবে। ডিমে বসাইবার সময় মুর্গীটিকে এবং কলে ডিম বসাইবার সময় কলটিকে প্রত্যেক বার পুতি-বিমুক্ত (disinfect) করিয়া লইবে, তাহার পর ডিম বসাইবে। ছানা ফুটিলে ২৪ ঘণ্টা বা ৩৬ঘণ্টা পর ঐ গুলিকে ব্রুডারে নীত করিবে যেন ঠাণ্ডা না লাগে। ব্রুডার ৮৫° হইতে ১০৫° পর্য্যন্ত তাপে আবশ্যক মত গরম রাখা কর্ত্তব্য। ছানা যত বড় হইবে প্রত্যেক সপ্তাহে ৫° করিয়া তাপ কমান যাইতে পারে। ছানাগুলি ডিম হইতে ফুটিলেই মুর্গীর তলা হইতে বা কলে ডিমের বাক্স হইতে স্থানান্তরিত করিবে না, তাহা আমি পূর্ব্বে ২ বার বলিয়াছি। ইহা করিলে ঠাণ্ডা লাগিয়া আমশায় হয় বা বাত ধরে বা শর্দ্দী হইয়া ছানাগুলি ৭।১ দিন মধ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। যতদূর স্বাভাবিক ভাব সম্ভব হয় সেইরূপ তাহাদের রাখিবে। মুর্গী ফোটান ছানা অপেক্ষা কলে ফোটান ছানাগুলির এই সময় পালন করা বড়ই সমস্যাপূর্ণ সময়। অর্থাৎ ডিম হইতে বাহির হওয়া অবধি ১ মাস পর্য্যন্ত বড়ই বিপদ্ সঙ্কুল কাল ; এই সময় খুব যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক। তাহার বিষয় পর ২ পত্রে বিবৃত করিব। Prof. P: C. Sarkar

31 Elgin Road Calcutta.

কৃষিকার্য্যে অনাদর কেন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পরের অনুকরণ করিতে বাঙালী সদাই পটু—পরের দেশ বাঙ্গালীর চক্ষে বড়ই সুন্দর, কিন্তু তত্রাপি বাঙ্গালীর একটা মহৎ গুণ এই যে, বাঙ্গালীকে যে কার্য্যে দাও, সেই কার্য্যেই দক্ষতা লাভ করিবে, বাস্তবিক ইহা একটা বড় সহজ গুণ নহে, এরূপ গুণ আর কোন জাতিতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা সত্বেও বাঙ্গালীর এরূপ হীনাবস্থা কেন, তাহা বাঙ্গালীই জানে।

এক অনুকরণ দোষেই বাঙ্গালীকে নষ্ট করিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা বাঙ্গালীকে এতদূর মোহিত করিয়াছে যে, পাশ্চাত্য প্রমাণ ব্যতিরেকে বাঙ্গালী কোন কার্য্যেই আস্থা স্থাপন করে না, সেই জন্য নিম্নে কৃষি সম্বন্ধে কতকগুলি পাশ্চাত্য ও দেশী অভিমত সংগ্রহ করিয়া উদ্ধৃত করিলাম; আশা করি পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক অভিভূত বাঙ্গালী পাঠকগণ পাশ্চাত্য প্রমাণ পাইয়া কৃষিকার্য্যে আস্থা স্থাপন পূর্ব্বক কৃষকদিগকে উৎসাহদানে দেশের ও দশ জনের মঙ্গল সাধন করিবেন; দীন হীন অধম লেখকের ইহাই বিনীত ও আন্তরিক প্রার্থনা।

১। "বিদ্যাবিহীন মনুষ্য আর কৃষক বিহীন দেশ উভয়ই তুল্য। যে দেশের লোকেরা কৃষককদিগের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ না করে, সে দেশের লোককে উন্নতি-গিরীতে উঠিতে দেখিলে আমি আশ্চর্য্য বোধ করিব। * * *
যাহাদের সহিত আমাদের ও রক্তের সম্বন্ধ আছে, সে সকল লোক ব্যতীত যদি আর কাহারও সহিত বন্ধুতা স্থাপন করিতে হয়, তবে কৃষক প্রজা-কেই আমার পরম মিত্র বলিয়া জ্ঞান করিব।" Bacon's Essays.

২। "সভ্যতার ইতিহাস, কৃষকের ইতিহাস ভিন্ন আর কিছুই নহে"। Aristotle,

৩। "কৃষিজীবির সংশ্রব পরিত্যাগ করিলে পার্লামেণ্টের গঠন অসম্পূর্ণ থাকিত, ইংলণ্ডের শ্রীবৃদ্ধি কৃষিকার্য্যের শ্রীবৃদ্ধির সহিত ঘনীভূত"। Speeches of Parliament.

৪। "আমি ছদ্মবেশে আমার যে সকল রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়াছি, তন্মধ্যে কোথাও কাহাকেও কৃষক পীড়ন করিতে দেখি নাই, এই জন্য বোধ হয় আমার রাজ্য এত সুশৃঙ্খলারূপে চলিতেছে"।— Peter the Great, Diary.

৫। "হলচালনা, কোদালি দ্বারা ভূমি কর্ষণ এবং কৃষকের সহিত একত্র বাসই আমার মনে এত স্ফূর্ত্তি ও শারীরিক বলের কারণ"।—Life of William Roscoe.

৬। "মনের স্ফূর্ত্তিতে কৃষকার্য্য কর"।—New Testament (Christ, instructions to his disciples)

৭। "ইন্দ্র! এই মহাযজ্ঞে তুমি আনন্দে সোমরস পান কর, এবং আমাদিগকে শতবর্ষ পরমায়ু, সবল পুত্র ও উত্তম গো প্রদান কর"।— * * *
মিত্র! তুমি ভূমিকর্ষণে শক্তি বিতরণ কর"।—ঋগ্বেদ (পণ্ডিত রমানাথ শাস্ত্রীর অনুবাদ)

৮। "হে কাফেরগণ! প্রভু কি তোমাদের ভূমি কর্ষণ করিতে আদেশ করেণ নাই"?— কোরান—Mr. Sale,s Translation

৯। "ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—ইহারা আমার অনুগ্রহে ভূমিকর্ষণ করে" শ্রীমদ্ভাগবৎ।

"ভ্রাতঃ ! অযোধ্যাপুরীতে ত দুর্ভিক্ষ হয় নাই ? ভূমি সকল ত শস্যপূর্ণ আছে ? কৃষকেরা ত স্বকার্য্য পরিত্যাগ করে নাই ? কৃষকেরা কেন দস্যু দ্বারা ত প্রপীড়িত হয় নাই" ? — রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড (ভরতের প্রতি রামের প্রশ্ন)

১১। "আমি এদেশ লইয়া কি করিব, যথায় ভূমি আছে কিন্তু কৃষক নাই" ?— মহাভারত—অনুশাসনপর্ব্ব।

১২। "কৃষক সকল উন্নতির মূল"।—Whitley's money matters.

১৩। "ভারতকে ধনী করিবার প্রধান উপায় একমাত্র কৃষিকার্য্য"।—Indian Agriculturist (William Riaeh)

১৪। "এই মহাবিদ্যার (কৃষিকার্য্য) আলোচনায় ভারতবাসী সকল সুস্থকায় এবং ধনবান হইতে পারে" Eugene G. Schrottkey.

১৫। "*　　*　　জন্তুনাং জীবনং কৃষি　　*　　*

পরাশর।

১৬। "কৃষকদিগের পরিশ্রম জাতীয় ধনের মূল।—Adam Smith,s Wealth of Nations

১৭। কৃষকার্য্য ব্যতিরেকে কোন দেশকে আমি উন্নতি হইতে দেখি না"। -Buckle's History of Civilisation

১৮। "কৃষকেরা বহুদিন বাঁচিয়া থাকে"।—Dr. Palmer on mortality.

১৯। "তাহাদিগকে (কৃষকদিগকে) ভাল না বাসিলে সভ্যতা অসম্পূর্ণ থাকিবে"। —Quizzo.

২০। "কৃষিকার্য্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহয়তা করে।—Malthus on Population.

২১। বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্দ্ধেক চাষ"।—ভারতচন্দ্র।

২২। "চাকরে আর কুকুরে সমান; যহারা মাঠে খটীয়াখায় তাহারা বড়ই সুখী"।—

২৩। "আহা সেই রমণী ভাগ্যবতী, যাঁহার রাজ্যেতে এতগুলি কৃষিজীবি বাস করে" —সেকেন্দর সা।

২৪। "তখন কৃষকেরা পর্য্যন্ত ষোল আনা বিলাসী হইয়া পড়িল　*　*　* অবশেষে সভ্যত-জৎত 'রোমের' পতন দর্শন করিলেন"।—Lord Gibon's Decline and fall of the Roman Empire

২৫। "বঙ্গের কারাগারে কৃষকের মৃত্যু সংখ্যা খুব কম"।—Dr. A. G. Lethbridge (Vide Ins Gen—Jails annual report.)

২৬।

"মিছে কেন ক্ষেপ কাল,
মাঠে গিয়ে বাঁধ আল,
কিম্বা নিজে ধর হাল,
দেশের উন্নতি সাধন তবে।　　৺ প্যারীচরণ মিত্র।

২৭। "আমি ভূমিকর্ষন করিতে ভালবাসি" ।—৺রাধাকান্ত দেব বাহাদুর।

২৮। "কৃষকগণ সমাজের জীবন।—John Stuart Mill.

আরও শত সহস্র প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাগণের উক্তরূপ অভিমত আছে বাহুল্য ভয়ে আর উদ্ধৃত করা গেল না।—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু

দেশী গাছ গাছড়া রঙ

বাল্যকালে শুনিতাম, ফেরিওয়ালা হাঁকিয়া যাইতেছে, "কুসুম ফুলের রঙ, চাঁপা ফুলের রঙ, বাসন্তিরঙ, গোলাপ ফুলের রঙ, বেগুনীরঙ, সীমপাতার রঙ, তেলের মসলা, চীনের সিঁদু উ-উ-উ-র।" আজকাল আর সে হাঁক বেশী শুনিতে পাই না। সে সকল ফেরীওয়ালাদের নিকট হইতে দোলের সময় আমরা নানা প্রকার রঙ কিনিতাম, কখন-কখনও মাজুফল, হরীতকী, বহেড়া, বাবলা গাছের ফল প্রভৃতি ভিজাইয়া, হীরাকষ মিশাইয়া কালো কালী তৈয়ার করিয়া, ব্ল্যাক কালি তৈয়ার করিবার জন্য ফেরিওয়ালার নিকট হইতে ব্লু রঙ কিনিয়া তাহাতে মিশাইতাম। পুর মহিলারা তাহাদিগের নিকট হইতে তেলের মসলা ও লালা পাতা কিনিয়া নারিকেল তৈলে মিশাইয়া, দিব্য লাল বর্ণ সুগন্ধী কেশ তৈল প্রস্তুত করিতেন। আজকাল আর সে হাঁক খুব অধিক শুনিতে পাই না। দোয়াতে ও বোতলে তৈয়ারী কালী কিনিতে পাওয়া যায়, কেহই ঘরে কালি তৈয়ারীর মেহনত করা অনর্থক বলিয়া তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। আজকাল আবার কালির বড়ী ও ট্যাবলেট হওয়ায় বোতল ও দোয়াতের কালীও উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে। দোলে রঙ-খেলা আজকাল আর সভ্যতানুমোদিত নহে। তবু ছেলেরা যেটুকু দোল খেলে, সে জন্য অনেক প্রকারের ম্যাজেণ্টার রঙ বাজারে পাওয়া যায়।

কেশ তৈলের ছড়াছড়ি হওয়ায়, মহিলারা ও ঘরে কেশ তৈলটুকু তৈয়ার করিবার শ্রম স্বীকারে নারাজ। এইরূপে আমাদের শিল্প ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। বিলাতী জিনিসের আমদানিই আমাদের শিল্প নষ্ট হওয়ার একমাত্র কারণ নয়। আমাদের নিজেদের আলস্য শ্রমবিমুখতাও এজন্য কম দায়ী নয়।(পত্রান্তর হইতে)

দেশীরঙ প্রস্তুত হইতে পারে এখন নানা প্রকার গাছ গাছড়া বিষয় কৃষকে আলোচনা হইয়াছে ভারতীয় কৃষিসমিতি মশালা নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে রঙের মশালার গাছ গাছড়ার বিষয় বিস্তারিত আলোচনা আছে। কৃঃ সঃ

দেশের কথা

বিলাতে ডাক্তারি শিক্ষা—বিলাতের মেডিক্যাল কাউন্সিলের সদস্যগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, যে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা ইংলণ্ডের আদর্শ তুল্য না হইবে ততদিন যাবৎ উক্ত বিদ্যালয়গুলির ছাত্রগণ কোন ব্রিটিশ মেডিক্যাল কলেজে স্থান পাইবে না। ফলে আজ কাল যাহারা ভারতবর্ষ হইতে এম, বি, উপাধী গ্রহণ করিয়া বিলাত যাইয়া অল্পদিনের মধ্যেই আই, এম, এস হইয়া আসিতে পারিতেন তাহাদিগের যে পথ বন্ধ হইল। এখন হইতে কয়েক বৎসর সমানে তথায় অধ্যায়ন না করিলে কেহ ভারতে চিকিৎসা বিভাগের উচ্চপদের দাবী করিতে পারিবেন না।

কাপড় হইতে আয়—প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজী মহাশয় প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবাসীর গড়ে বাৎসরিক আয় ১৮৲—২০৲ টাকা মাত্র। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন যে তাহা নয় আমাদের আয় ৩০৲ টাকা। তথাস্তু, মানিয়া লইলাম আমাদের প্রত্যেকের "গড়ে" মাসিক আয় ২৷৷০ টাকা। গড়ে কথাটীর উপর লক্ষ্য রাখিবেন। কাহারও বাৎসরিক ১কোটী কাহারও ৫০ লক্ষ ইত্যাদি, মনে করিয়া দেখুন কতগুলি লোকের মাসিক "২৷৷০" টাকা সংগৃহীত হইলে ১ কোটী টাকা হয়, তাহা হইলে বুঝুন দেশে এমন লোক আছে যাহার আয় মাসিক ১৲ টাকাও নয়। অন্যপক্ষে চাউলের মণ ৮৲। ৯৲ টাকা। একবার ভাবুন কিরূপভাবে তাহাদের দিন চলে, ভারতে বিদেশ হইতে ৬০ কোটী টাকার কাপড় আমদানী হয়, যদি এই আমদানী এক দম বন্ধ করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে ৬০ কোটী টাকা বাঁচিয়া যাইবে, ফলে ভারতবাসীর প্রত্যেকের আয় গড়ে ৩০৲ টাকার স্থলে ৩২৲ টাকা হইবে। কিন্তু মনে রাখিবেন সকলেই জোলা, তাঁতী বা কলওয়ালা হইবে না। কাপাস তুলা প্রস্তুতকারক হইতে আরম্ভ করিয়া বাজারে কাপড় বিক্রেতা পর্য্যন্ত যদি ৪ কোটী লোক ধরা যায় তাহা হইলে প্রত্যেকের বৎসরে ১৫৲ টাকা ইহাতে আয় বৃদ্ধি পাইতে পারে। ফলে ৪ কোটী লোকের আয় ৩০৲ টাকা হইতে ৪৫৲ টাকায় উঠিবে।

চিনি হইতে আয়—তারপর চিনির ব্যবসা বিদেশ হইতে ভারতে বাৎসরিক ২২ কোটী টাকার চিনি আমদানি হয়। ভারতেও কম চিনি জন্মে না। আর এক কোটী লোক যদি খেজুর ও ইক্ষুর চাষে আত্ম নিয়োগ করে তাহা হইলে আর এক কোটী লোকের আয় গড়ে ৩০৲ টাকা হইতে ৫২৲ টাকায় উঠিতে পারে, এইরূপ ভাবে আরও কত ব্যবসা আছে, সকলে যদি শুধু নিজ দেশের অভাব পূরণ করিতে পারে তাহা হইলে অচিরে ভারতের লক্ষ্মী ভারতে ফিরিয়া আসিবে।—যশোহর পত্রিকা।

তারপর আজ স্বল্প জমির অভাবে অনেকে ইচ্ছা থাকিলেও কৃষির উন্নতি করিতে পারিতেছে না। মনে করুন কোন পিতার পাঁচ পুত্র তাহাদের মধ্যে যদি কেহ তাঁতের ব্যবসা, কেহ চিনির ব্যবসা, কেহ সুতরের কাজ এবং কেহ বা চাকরী করে তাহা হইলে অবশিষ্ট ভাইটী পিতৃ প্রদত্ত জমিতে চাষ বাদ করিয়া কোন মতে দিন গুজরাণ করিতে পারে। কিন্তু সকলেই যদি পিতার ১০ বিঘা জমির প্রতি লোলুপ দৃষ্টি প্রদান করে তাহা হইলে কাহারও পেট পুরিবে না, ফল হইবে অনাহার এবং কোন্দল। তাই বলিতেছিলাম আর বসিয়া থাকিবার সময় নাই। এক খানি দেশী কাপড় বা একটা স্বদেশী পেন্সিল ক্রয় করিয়া মনে করিবেন না যে, কাপড়ের মালিককে উপকৃত করিয়াছেন, কিন্তু প্রকারান্তরে যে আপনিও উপকৃত হইতেছেন সে কথা ভুলিলে চলিবে না। এমনকি আজ যাহারা চাকুরীর জন্য দ্বারে দ্বারে ধন্নাদিতেছেন তাহারাও দেখিবেন, অধিকাংশ লোক শিল্প বাণিজ্যে মনোনিবেশ করায় চাকুরীর বাজার অনেকটা সস্তা হইয়াছে। মোটের উপর দেশের লোকের অবস্থা স্বচ্ছল হইলে উকিল মোক্তার প্রভৃতি সকলের আয়ই বাড়িয়া যাইবে, কেননা তখন ১৲ টাকার স্থলে ২৲ টাকা ফী দিতে কাহারও কষ্ট হইবেনা।—যশহর পত্রিকা।

কাগজ তৈয়ারির ব্যবস্থা—ইদানী এদেশের কাগজের দুর্ম্মূল্যতা এবং দুষ্প্রাপ্যতার দরুণ এদেশে কাগজ তৈয়ারির বিস্তৃত কারখানা করা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট যুক্তপ্রদেশে ডেরাডুনের ফরেষ্ট রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটে কাগজের পিণ্ড তৈয়ারির উপদেশ প্রদানের জন্য মিঃ ডব্লিউ রেট নামক এক অভিজ্ঞ শ্বেতাঙ্গকে নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে যাঁহারা তথ্যানুসন্ধায়ী, তাহারা ইহাঁর নিকট হইতে বিনা ব্যয়ে এ সম্বন্ধীয় উপদেশ পাইতে পারিবেন। ইংলণ্ডে ইনি কাগজ তৈয়ারির পরীক্ষাস্বরূপ পিণ্ড এবং যন্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া এদেশে আসিয়াছেন। এই যন্ত্র, ডেরাডুনের এই ইনষ্টিটিউটের নূতন লেবরটেরিতে স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে। মিঃ রেট এক্ষণে ব্রহ্মদেশে যাইতেছেন। তবে কাগজের পিণ্ড প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে ফরেষ্ট ইকনমিষ্ট, ডেরাডুন, ইউ পি,—এই ঠিকানায় পত্র লিখিলেই চলিবে। ৩০ ৪০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের বহু পল্লীগ্রামেই কাগজিগণের দ্বারা কাগজ তৈয়ারির যে বিস্তৃত কারবার চলিত, সে কারবার পুনঃ প্রচলনের কোন ব্যবস্থাই কি হইতে পারে না?—বঙ্গবাসী

পাট চাষ বন্ধে অনুরোধ।—কলিকাতার সান্ধ্য ইংরেজী সংবাদপত্র "নিউ এম্পায়ারে" প্রকাশ, মফস্বলে—বিশেষতঃ যে সকল স্থানে প্রচুর পাট চাষ হইয়া থাকে, সেই সকল স্থানে এক বাঙ্গালা পুস্তিকা বিতরিত হইতেছে। ইহাতে পাটচাষিগণকে এ বৎসর পাট চাষ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। যে সকল ছাত্র সহযোগিতা-বর্জ্জনসূত্রে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতেছে; এই কার্য্যের জন্য এই সকল স্থানে সেই সকল ছাত্রেরও অনেককে পাঠান হইবে বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। আমরাও বরাবরই বলিয়া আসিয়াছি, পাটের পরিবর্ত্তে আউশ ধান, আলু, আখ প্রভৃতির চাষ খুব বেশী করা অত্যাবশ্যক।—বঙ্গবাসী

কিন্তু পাট বাঙ্গলার একটা প্রধান বাণিজ্য সামগ্রী। ইহা পূর্ব্ববঙ্গের অনেক চাষীর ঘরে সমৃদ্ধি আনয়ন করিয়াছে। ইহার চাষ বন্ধ হওয়া কতদূর যুক্তিযুক্ত তাহা বলা যায় না। তবে সব দিক সামঞ্জস্য রাখিয়া কায করাই ভাল।—কৃঃ সঃ

কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেনের পরলোক গমন

বারাণসীধামে বঙ্গের অন্যতম কৃতী সন্তান কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন।

উপেন্দ্রনাথ সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেন মহাশয়ের পুত্র। তিনি কবিরাজী তিনি কবিরাজের পুত্র, সুতরাং অনন্যচিত্ত হইয়া কবিরাজী করিবেন অনেকেরই মনে এইরূপ ধারণা ছিল। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন উপেন্দ্রনাথের এমন অসাধারণ ব্যবসায় বোধ ছিল যাহার প্রেরণায় তিনি ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশের ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সমূহের শিরোভাগে কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেনের নাম লিখিত থাকিবে। ১৯০১ অব্দে সাপ্তাহিক বেঙ্গলী পত্রিকা দৈনিক পত্রিকায় পরিণত হয়। এই কার্য্যে উপেন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপায় মহাশয়ের প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। দৈনিক সংবাদপত্র চালাইবার আর্থিক এবং অপর যাবতীয় বোঝা উপেন্দ্রনাকে বহন করিতে হইত।

প্রসিদ্ধ "হিতবাদী" পত্রিকারও তিনি স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক ছিলেন। ৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তখন হিতবাদীর সম্পাদক ছিলেন। উপেন্দ্রনাথ তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া বাঙ্গালা পত্রিকার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ উৎসাহী ছিলেন।

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল—অনেকে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের সংশ্রবে কবিরাজ উপেন্দ্রনাথের নাম শুনিয়া থাকিবেন। কিছুকাল তিনি বঙ্গলক্ষ্মী মিলের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন। তাহার সুপরিচালনায় বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল এক মহাসঙ্কট মধ্যে রক্ষা পাইয়াছিল।

আগ্রার চর্ম্মের কারখানা—আগ্রার চামড়ার কারখানা তাহার বাণিজ্য প্রীতির অন্যতম নিদর্শন। তাহার মত চিকিৎসকের পক্ষে চামড়ার কারবারে সংযুক্ত হওয়া সৎসাহসের পরিচায়ক।

জন্মভূমির প্রতি অনুরাগ—কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ ব্যবসায় ও অপর সকল কর্ত্তব্যসম্পাদন জন্য কলিকাতায় বাস করিতেন। কিন্তু তাহার মনে তাহার জন্মভূমি কালনার প্রতি এমন অসামান্য আকর্ষণ ছিল যে তিনি সময় পাইলেই এই নগরের কোলাহল ছাড়িয়া সেই জন্মভূমি শান্ত-স্তব্ধ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে গমন করিতেন।

কবিরাজ উপেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে আমরা ব্যথিত হইয়াছি। তাঁহার পুত্র নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার পরিজনদিগকে আন্তরিক বেদনা জানাইতেছি।—চুচুড়া বার্ত্তাবহ।

চরকার কথা—সাফল্যে সন্দেহ করিও না—"ত্রিপুরা জেলার কস্‌বা গ্রামের অধিবাসী ভূতপূর্ব্ব পুলিশ ইনস্পেক্টর ৺রামচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যা শ্রীযুক্তা চন্দ্রমুখী সেন গুপ্তা মহাশয়া দৈনিক ৩ ঘণ্টারও অল্প সময় সূতা কাটিয়া বিশ দিনে দুইখানা কাপড়ের সূতা প্রস্তুত করিয়াছেন এবং স্থানীয় তাঁতির সাহায্যে, প্রতি কাপড়ে দশ আনা করিয়া দিয়া দুইখানা কাপড় তৈয়ার করিয়া আনিয়াছেন। প্রতি কাপড়ে তাঁহার মোট চৌদ্দ আনা খরচ পড়িয়াছে।

তিনি বলেন যে একজন কর্ম্মঠ পুরুষ অক্লেশে মাসে ৩ খানা কাপড়ের সূতা কাটিতে পারে। পত্রিকা পড়িয়া অনেকেই বিশ্বাস করেন না যে, চরকায় সূতা কাটিয়া পরিবার চালান যায়। কিন্তু তাঁহারা যদি কার্য্যতঃ ইহা করিয়া দেখেন তাহা হইলেই দেখিতে পাইবেন যে ইহাতে অসম্ভব কিছুই নাই নিবেদন—শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার সেন গুপ্ত। কুমিল্লা।

দামোদরের খাল—ভারতের ষ্টেট-সেক্রেটারী দামোদর খাল খননের প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহাতে ব্যয় পড়িবে ৭০,০০০,০০ সত্তর লক্ষ টাকা। এখন যে ইডেন কেনাল আছে, তাহাতে যথেষ্ট জল সরবরাহ করা এবং বর্দ্ধমান জেলার বহু আবাদী জমিতে চাষের উপযুক্ত পরিমাণ জল সেচন করা এই খাল খননের উদ্দেশ্য। বর্দ্ধমানের উত্তরে ২৮ আটাইশ মাইল অর্থাৎ চৌদ্দ ক্রোশ দূরে ফকিরবেড়া নামক স্থানে দামোদর নদীর উপর একটা বাঁধ বাঁধিয়া দেওয়া হইবে; আটাইশ মাইল দীর্ঘ একটি প্রধান খাল কাটিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার একটি প্রধান শাখা খনন করা হইবে। আটাইশ মাইল দীর্ঘ যে প্রধান খাল হইবে, তাহা হইতে জল লইয়া খড়ে নদী এবং দামোদর নদীর মধ্যে অবস্থিত প্রায় দুই লক্ষ বিঘা ধানের জমিতে সেচ দেওয়া চলিবে; উপরন্তু ইডেন কেনালেও এই নূতন খাল হইতে জল সরবরাহ হইতে পারিবে। ইডেন কেনালের এখন বড় জোর নব্বই হাজার বিঘা জমিতে জল সেচন চলিতে পারে; কিন্তু এই নূতন খাল হইলে, ইডেন ক্যানেল হইতেই প্রায় পৌণে দুই লক্ষ বিঘা জমির সেচ চলিতে পারিবে। বলা বাহুল্য, চাষের জন্য এই খালের জল লইতে হইলে, পয়সা দিতে হইবে। ফলে, সরকারের ইহাতে লোকসান নাই, পরন্তু জলের মাশুলে সরকারের রাজস্ব হইবে যথেষ্ট।

চিলকা হ্রদের মাছ

চিল্‌কা হ্রদ একটি সুবৃহৎ জলাশয়। এই জলাশয়ের মৎস্য সম্বন্ধে কিছু দিন পূর্ব্বে আলোচনা হইয়াছিল।

জাহাজ দ্বারা মাছ ধরায় ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। জাহাজ খানি দুই প্রকার 'ট্রল' নামক তলদেশের জালদ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছিল। অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে কয়েক দিনের ঐ ট্রল নামক জাল দিয়া তলদেশের মাছ ধরিয়া ছোট ছোট শঙ্কর মাছ, নালাযুক্ত মাছ, কাঁটা মাছ প্রভৃতি অতি নিকৃষ্ট জাতির মাছই পাওয়া গিয়াছিল। সর্ব্বসমেত দশটী খাইবার যোগ্য মাছ পাওয়া গিয়াছিল এবং তাহার মধ্যে দুইটীমাত্র কলিকাতার বাজারে বিক্রয়ের যোগ্য। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়তছে যে, ঐ জাতীয় জাল চিলকা হ্রদে মৎস্য ধরিবার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারিবে না। ইহার কারণ এই যে এ হ্রদের মৎস্যসকল জলের তলদেশে থাকে না বা আহার অন্বেষণে ফিরে না।

ঐ হ্রদের মধ্যে পারাকুদ এবং নলবনের নিকটস্থ জায়গায় যেরূপ মাছ ধরা হয় তাহাতে অনেক সন্তোষজনক বিষয় জানা গিয়াছে। এই সকল দ্বীপের সন্নিকটস্থ স্থানে কতকগুলি লোক নিযুক্ত আছে তাহারা কেবল কখন মাছের দল একটা অপেক্ষাকৃত ছোট চর ভূমিতে বন্যার সময় জল বাড়িলে ঝাঁকে ঝাঁকে প্রবেশ করে তাহাই দেখিয়া থাকে। ঐ চর ভূমিতে অন্য সময়ে অতি অল্প জলই থাকে এবং জমির দিকে ইহার একটী গলির মত একটী অপ্রশস্ত জলের রাস্তা আছে। যখন মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে ঐ চরভূমিতে বন্যার সময় প্রবেশ করিতে দেখা যায় তাহার পর ঐ চরভূমির সহিত হ্রদের সংযোগ স্থান বাঁশের বেড়ার দ্বারা আবদ্ধ করা হয়। এইরূপে মৎস্যগুলি আবদ্ধ হইয়া পূর্ব্বোক্ত নালাপথের ভিতর দিয়া বাহিরে যাইতে চেষ্টা করিলে তাহাদের ধরা যায়। এইরূপ উপায়ে মাছ ধরাকে "ঝান" বলে। ইহা এক প্রকার দেশীয় "কোমাদিক্" মাছ ধরার মত, যাহাতে জোয়ারের সময় যে সকল মাছ একটা আটকের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া ভাঁটার সময় তাহাদিগকে ধরা যায়।

এই ঝানগুলি কখন কখন চারি মাইল পর্য্যন্ত লম্বা হয় কিন্তু সচরাচর ইহারা এক মাইলের কমই হইয়া থাকে। অনেকগুলি ঝান নলবন দ্বীপ, পারাকুদ এবং নোয়াপাড়ার সন্নিকটে ব্যবহার হইতে দেখা যায়। "ঝান" সকল অক্টোবরের শেষে কিম্বা নবেম্বরের প্রারম্ভে লাগান হয় এবং তাহারা প্রায় এক মাস কাল লাগান থাকে। তাহারা পর সমস্ত মাছ ধরা হইলে তাহাদিগকে উঠাইয়া লওয়া হয়। তাহার পর আর পর বৎসর পর্য্যন্ত ঐরূপ মৎস্যের ঝাঁক প্রবেশ করিতে দেখা যায় না। এই সকল

চরভূমির কথা বলা গেল ঐ সকল জায়গায় অনেক প্রকার এবং যে সময়ে ঝানসকল লাগান হয়, বিশেষতঃ ছোট ছোট ঝিনুকজাতীয় প্রাণীর উৎপত্তি সেই সময়ে প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। মাছসকল ঐ সকল ঝিনুকজাতীয় প্রাণী খাইবার জন্ত ঐ সকল চর জায়গায় বন্তার সময় প্রবেশ করে। "ঝানে" যে সকল মাছ পাওয়া যায় তাহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ভেটকী, ভাঙ্গন মৎস্য। ইহা ছাড়া সেখানকার জেলেরা ভাসাজাল ও টানাজাল ব্যবহার করিয়া থাকে। ঐ সকল জালে ভেটকী, ভাঙ্গন এবং ইলিশ মৎস্য পাওয়া যায়। অনুসন্ধান সময়ে মৎস্যবিভাগের ডিপুটী ডিরেক্টর মহাশয় সেখানে ছিলেন সেই সময়ে ইলিস মাছ অত্যন্ত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতেছিল। চিল্কা হইতে যে সকল মাছ পাওয়া যায় তাহারা প্রায় সমস্তই "ঝান" টানাজাল এবং ভাসাজালে ধরা হয়। বর্ষার শেষে যখন জল কমিয়া যায় তখন ঐ সকল জাল ব্যবহার করা হয়।

দেখা গিয়াছে যে চিল্কা হইতে যে সকল মাছ প্রত্যহ "ঝান" এবং জালের দ্বারা ধরা হয় তাহা দশ মণ হইবে। কিন্তু এই পরিমাণে যে মৎস্য বৎসরের সব দিনে পাওয়া যায় তদ্বিষয়ে কিছু ঠিক জানা নাই। আমাদের বিবেচনায় না পাইবার সম্ভাবনা।

জেলেদের কাছ হইতে অবগত হওয়া যায় যে চিল্কার মাছ মাসের মধ্যেই নিয়মিতরূপে কম বেশী হইয়া থাকে। আমরা অনেক সময়ে দেখিয়াছি যে পূর্ণিমার পর মাছ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং অমাবস্যার পর হইতে ক্রমশঃ কমিয়া থাকে।

চিল্কায় এক প্রকার জোয়ার ভাঁটা দৃষ্ট হয়। ইহার বিশেষ তত্ত্ব অবগত হইবার জন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন কিছু স্থির হয় নাই। তবে স্কটলণ্ড দেশের হ্রদে এক প্রকার জোয়ার ভাঁটা হয় ইহা তাহারই অনুরূপ। ইহার কারণও যথার্থরূপে নিরূপিত হয় নাই। বায়ু জলের উপর দিয়া কয়েক ঘণ্টায় একদিকে বহিয়া যাইবার পর যখন একেবারে বন্ধ হয় অথবা অপর দিক হইতে বহিতে থাকে এই কারণই এরূপ জোয়ার ভাঁটা হইয়া থাকে।

আমরা আরও শুনিলাম যে যে বাঁধ চিল্কাকে সমুদ্র হইতে পৃথক করিতেছে সেই বাঁধ কয়েক মাইল উত্তরে চলিয়া গিয়াছে। এজন্ত কস্তুরি ক্ষণকালের জন্ত পাওয়া যাইতেছে না।

যাহা হউক এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে চিল্কায় যে সমস্ত প্রাণী চিরকালের জন্ত বাস করে তাহাদের জীবন অতি কঠোর হইবে কারণ এই জলাশয়ে বৎসরের মধ্যে অনেক প্রকারের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। বর্ষার সময় ইহাতে বিশেষতঃ ইহার উত্তরাংশ মিঠা জলের সমস্ত চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে এবং বোয়াল প্রভৃতি মিঠা জলের মাছসকল দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর আবার ইহার জল একবারে লোণা হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ ইলিশ এবং ভাঙ্গনজাতীয় মাছ ইহাতে অবস্থানুযায়ী বাস করে

এবং সম্ভবতঃ ভেট্‌কী মাছও ঐরূপে থাকে। যদ্যপি ইহাই ঠিক হয় তাহা হইলে এই জলাশয়ের মাছের পরিমাণ এবং রকম অত্যন্ত অনিশ্চিত হইতেই হইবে। এখন দেখিতে হইবে যে ইলিশ ভেট্‌কী এবং ভাঙ্গনজাতীয় মাছ এবং বাগদা চিংড়ি বৎসরের অন্য অন্য সময়ে কি পরিমাণে পাওয়া যায়।—কৃষি সমাচার হইতে।

নদীসকলে মাছ ধরিবার স্বত্বসম্বন্ধে অনুসন্ধান

নদী সকলে মৎস্য ধরিবার স্বত্ব কতদূর সরকারের হাতে আছে এবং ঐ স্বত্ব কি পরিমাণে, কত দিনের জন্য কত টাকায় ইজারা দেওয়া হইয়াছে জানিবার জন্য একবার অনুসন্ধান করা হয়। দেখা গিয়াছে যে প্রধান প্রধান নদীর অনেক বিস্তীর্ণ অংশগুলি চিরকালের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এ বিষয়ে সমস্ত তত্ত্ব পাওয়া গিয়াছে এবং ঐ সকল নিয়মিতরূপে সন্নিবেশিত করিয়া একখানি সরকারি বিবরণী প্রস্তুত করা গিয়াছে। ইহার সহিত বঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যার একখানি মানচিত্র রঙের দ্বারা দেখান হইয়াছে যে কোন্ কোন্ অংশ সরকারি এবং কোন্ কোন্ অংশ নহে। বিবরণী পুস্তিকা রাইটার্স বিল্ডিং বুক ডিপোতে পাওয়া যায়। এক্ষণে ঐ সরকারি অংশের তত্ত্বাবধান স্থানীয় কলেক্টারই করিয়া থাকেন এবং মৎস্যবিভাগের ঐ সকল সরকারি জলাশয়ের উপর কোনও হাত নাই। এই কার্য্যের ফলাফল বিষয়ে নিম্নলিখিত কয়েকটী সাধারণের জানিয়া রাখা ভাল—

(১) বাহির সমুদ্রে অর্থাৎ কিনারা হইতে তিন মাইলের বাহিরে যাহার ইচ্ছা মাছ ধরিতে পারে।

(২) বর্ত্তমান সময়ে সরকার হইতে এই তিন মাইলের ভিতরও মৎস্য ধরিবার স্বত্বসম্বন্ধে কোনরূপ কার্য্য করা হয় না এবং কোনও রূপে অধীনস্থ রাখিতে চেষ্টা করা হয় না। বালেশ্বরের সমুদ্রতীরের ১৫ মাইল সরকারি অর্ডনানস্ বিভাগের অধীনে আছে এবং ইহার সংলগ্ন আরও এক অংশ অপর লোকের স্বত্বাধীন। ধামড়া নদীর সম্মুখস্থ সমুদ্রতীরের মৎস্যস্বত্বও জমিদারীর অন্তর্গত এবং যতদূর জানা গিয়াছে অন্য অন্য জায়গার সমুদ্রতীরস্থ মৎস্য স্বত্বসম্বন্ধে সরকার হইতে ব্যবস্থা করিবার কোনও চেষ্টা করা হয় নাই।

(৩) জোয়ার ভাঁটাযুক্ত নদীসকল মৎস্য ধরিবার স্বত্ব সাধারণের এবং গবর্ণমেণ্ট সেই স্বত্বের অভিভাবকরূপে কার্য্য করা উচিত। কিন্তু যশোহর জেলায় অন্য লোকে এই স্বত্ব অধিকার করিয়াছে এবং সুন্দরবনের এলাকায় অনেক স্থানে বড় বড় জায়গা তাহাদেরই স্বত্বাধীন রহিয়াছে। বোধ হয় ইহার কারণ এই যে নদীসকল পূর্ব্বের

পথ ছাড়িয়া অন্য লোকের জমির উপর দিয়া বাহিয়া যাওয়ায় সেই সকল লোকেরই ঐ মৎস্যস্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে এবং কোন কোন স্থানে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোনরূপ তদারক অভাবে অন্য লোকে মৎস্যস্বত্ব অধিকার করিয়া লইয়াছে। ইহার ফলে এই হইয়াছে যে গবর্ণমেণ্ট অনেক জায়গার মূল্যবান স্বত্ব হারাইয়াছেন এবং তাহার সহিত জেলেরাও তাহাদের মাছ ধরিবার স্বত্বও হারাইয়াছে। যেখানে এইরূপ হইয়াছে সেখানে তাহাদের মাছ ধরিতে হইলে খাজানা দিতে হয় এবং তাহার সঙ্গে তাহাদের ধৃত মাছগুলিকে ঐ স্বত্বাধিকারী কিম্বা তাহার ইজারাদারের নিকট অতি সামান্য দামে বিক্রয় করিতে হয়। জেলেরা যে এত হীনাবস্থাপন্ন ইহাই তাহার একটা কারণ এবং সেই জন্য তাহারা আপন ব্যবসা ত্যাগ করিতেছে। এরূপ অবস্থায় মৎস্যের এবং জেলেদের উন্নতি করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য।

(৪) কতক অংশে বড় বড় নদীতে মাছ ধরিবার স্বত্ব গবর্ণমেণ্টের অধীনে কিন্তু অনেক স্থলেই ঐ সকল স্বত্ব চিরকালের জন্য অন্য লোককে বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন জেলায় গবর্ণমেণ্টের মৎস্যস্বত্ব কোন কারণ বশতঃ পতিত অবস্থায় রহিয়াছে এবং কোন কোন স্থানে ঠিক জানা নাই যে মৎস্যস্বত্ব গবর্ণমেণ্ট কিম্বা অন্য লোকের অধীনস্থ। গবর্ণমেণ্টেরই হউক আর অন্য লোকেরই হউক প্রায় সকল নদীর মৎস্যস্বত্ব অপর লোককে ইজারা দেওয়া হয় এবং ঐ ইজারাদার ছোট ছোট অংশে ঠিকা দিয়া থাকে এবং কোন কোন স্থলে ঐ ঠিকাদার জেলেদের নিকট খাজানা লইয়া তাহাদিগকে মাছ ধরিতে দেয়। এই সকল মধ্যস্থ লোকের লাভ সমস্তই জেলেদের বহন করিতে হয় এবং সেই জন্যই মৎস্য এত মহার্ঘ হইয়া থাকে। জেলেরা ঐ ইজারাদার বা ঠিকাদারকে খাজানা দিয়া থাকে অধিকন্তু তাহারা যে মাছ ধরে সেই সকল মাছ অত্যন্ত সুলভ মূল্যে ইজারাদারকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতে হয়। আমাদের বিবেচনায় যদ্যপি জেলেদের দলকে এই মৎস্যস্বত্ব অন্য মধ্যস্থ লোক না রাখিয়া ইজারা লওয়ান যায় তাহা হইলে অনেকটা উন্নতির সম্ভাবনা।—কৃষি সমাচার হইতে।

আমাদের বিশ্বাস যে ঐ জেলেদের মধ্যে কয়েকটী সমবায়সমিতি স্থাপন করিলে এই প্রস্তাবনা কার্য্যকারি হইতে পারে। এই কারণেই আমরা এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। গবর্ণমেণ্টের মৎস্যস্বত্ব যে যে নদীতে আছে তাহাদের একখানি তালিকা প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। যতদূর সম্ভব সরকারি বেসরকারি নদী ও জলাশয়ে মৎস্য ধরার জন্য এইরূপ সমবায়সমিতি স্থাপন করিয়া দেখা এবং ইহাতে উত্তম ফল দেখা যাইলে আরও বিস্তৃতভাবে ধীবরদিগের দ্বারা মৎস্য ব্যবসা চালাইবার চেষ্টা করা এবং আশা করা যায় যে, এতদ্বারা আবার বাঙলায় মাছের স্বচ্ছল হইবে।—কৃঃ সঃ।

মিঠা জলের মুক্তার ঝিনুকের বিষয় অনুসন্ধান

বাঙলার মিঠাজলে সকল প্রকার ঝিনুকের বিষয় বিশেষরূপে অনুসন্ধান করা হইয়াছিল। এই অনুসন্ধানের ফল ৭ নং সরকারি বুলেটিনে, প্রকাশিত হইয়াছে। ঝিনুকের ভিতর যে মুক্তা পাওয়া যায় সেই জন্য লোকে ঝিনুকের সন্ধান করিয়া থাকে। এক্ষণে ছোট ছোট ঝিনুকের খোলাগুলি কেবল পুড়াইয়া চুণ প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহার করা যায় এবং বড় বড় ঝিনুকগুলি কেবল বোতাম এবং গহনা করিতে কাজে আইসে।

ঝিনুকের কারবার এরূপভাবে চলিতেছে যে তাহার পরিমাণ এবং মুল্য নির্দ্দিষ্ট করা এক প্রকার অসম্ভব। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে বিশেষতঃ ঢাকা জেলায় বোতাম তৈয়ারী করা অনেক গৃহস্থের একটা সাধারণ কাজের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে এবং ঐ সকল বোতাম বাজারে বিক্রয় করিয়া অনেকেই দৈনিক খরচার কিয়ৎ অংশ উঠাইয়া লয়। ইয়ারিং, মাকড়ি, নলক, ঘড়ির চেন এবং অনেক প্রকার জামার বোতাম প্রভৃতি অল্প ও বিস্তর পরিমাণে অনেক স্থানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিহারে একটা কারখানা আছে তাহাতে আধুনিক বোতামের যন্ত্র এবং কল ব্যবহার হয়। বোতাম তৈয়ারির জন্য দুই প্রকার ঝিনুক ব্যবহার হয় যথা:—Parraysia লম্বা রকমের ঝিনুক এবং Lamellioms অর্থাৎ ছোট কিন্তু মোটা খোলাযুক্ত ঝিনুক।

বঙ্গদেশে অনেক দিন হইতে ঝিনুকের কাজ কেবল মুক্তার জন্য চলিতেছে। ঝিনুক পুড়াইয়া চূণ করা তাহার পর প্রচলিত হয়। ঐ ঝিনুক হইতে বোতাম করা কেবলমাত্র গত ৩৫ বৎসর হইতে চলিতেছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় এই কার্য্য খুব বেশী পরিমাণে চলিয়াছিল। তাহার পর এই ব্যবসা ক্রমশঃ কমিয়া গিয়াছিল। আবার ক্রমশঃ বাড়িতেছে ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ জেলার ভাণ্ডারদহে বিলে ঝিনুকের কারবার খুব বিস্তৃতরূপে ছিল এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের লোক এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। জানাযায় যে ঐ সময়ে এক বৎসরে প্রায় ৫০,০০০ মণ ঝিনুক ঐ বিল হইতে উঠান হইত। এক্ষণে ঐ ঝিনুকের কারবার প্রায় বিলুপ্ত এবং উহা হইতে ঐ বিলের তীরবর্ত্তী একখানি গ্রামে ১৫ ঘর বাগ্‌দি যাহারা এই কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত তাহার অনন্য উপায় হইয়াছে। এখন ঐ শিল্পের পুনরুদ্ধার হইতেছে কিনা আমরা জানিনা। এ বিষয় বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক।

বঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যার সমস্তই ছোট ছোট নদী এবং খাল বিলে ঝিনুক পাওয়া যায় কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে ইহার পরিমাণ অনেক কমিয়া যাইতেছে। ঝিনুকের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনায় জানা যায় যে কোন্ কোন্ কারণ বশতঃ ঝিনুকের বৃদ্ধি হইতে পারে নাই এবং কিরূপ ভাবেই বা ইহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

ঝিনুকের মধ্যে স্ত্রীজাতি এক সময়ে অনেকগুলি অণ্ড ধারণ করে, এবং তাহার

পর ঐ সকল ডিম প্রসব করিলে ঐ ঝিনুকের ফুস্‌ফুসে লাগিয়া থাকে, ঐ সময়ে ইহাদের মধ্যে পুরুষজাতি ঐ সকল ডিমকে শুক্রসংযোগে সঞ্জীবিত করে। এই সংযোগ জলের একটু স্পন্দনেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিছুদিন ডিমগুলি এই অবস্থায় বৃদ্ধি পায় এবং তাহার পর একপ্রকার কীটে পরিণত হয়। কত দিনে এই বর্দ্ধন শেষ হয় তাহা প্রত্যেক প্রকার ঝিনুকের পক্ষে বিভিন্ন এবং এখনও জানা যায় নাই। এই কীটের দুইটী খোলা এবং একটী আংটা আছে। ইহাদের গ্লকিডিয়ম (Glochidium) বলে। ইহারা মাতৃদেহ হইতে পরিত্যক্ত হইয়াই কোন এক বিশেষ প্রকার মৎস্য ডানায় সংলগ্ন হয় এবং যতদিন না ঝিনুকের অবয়ব প্রাপ্ত হয় ততদিন ঐ অবস্থায়ই সংলগ্ন থাকে। তাহার পর ইহারা মাছের ডানা হইতে খসিয়া পড়ে এবং আপনার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। পূর্ব্ববঙ্গে ধৃত কয়েকটী বোল এবং গজাল মাছের ডানায় বহুসংখ্যক উক্ত প্রকার গ্লকিডিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্যই অন্য অন্য মাছে এ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারে কিন্তু সে বিষয়ে এখনও কোনও কিছু জানিতে পারা যায় নাই। বাক্‌সারে এক প্রকার তলদেশের জালের দ্বারা বহুসংখ্যক অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝিনুক পাওয়া গিয়াছে। ঝিনুকসম্বন্ধে আলোচনায় এখন দেখা যাইতেছে যে ঝিনুকের বৃদ্ধির জন্য কয়েক প্রকার মাছ বেশী পরিমাণে আবশ্যক এবং এই জাতীয় মাছ কমিয়া যাইলে ঝিনুকেরা তাহাদের জীবনের একভাগ পরিপূর্ণ করিতে পারে না এবং সেইজন্য তাহারা নষ্ট হইয়া যায়।

বৎসর বৎসর জার্ম্মানি এবং অষ্ট্রীয়াহাঙ্গেরি হইতে এই দেশে ৪।৪॥ লক্ষ টাকা মূল্যের ঝিনুকের বোতাম আমদানি হয়। ইহা হইতে জানা যায় যে এই ঝিনুকের কারবার এদেশে সম্পূর্ণভাবে চলিলে অনেক উপকার হইতে পারে। কিন্তু ঝিনুকের উন্নতি না হইলে বোতাম, গহনা প্রভৃতির কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। এই সকল কার্য্যে উন্নতি করিতে হইলে ভাল রকমের ঝিনুক প্রচুর পরিমাণে আবশ্যক। কিন্তু যতদিন না আমরা ঝিনুকের বিষয় সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারি ততদিন পর্য্যন্ত ইহাদের বর্দ্ধনের উপায় করা সম্ভব হইবে না। ঝিনুকের ভিতর যে সকল ব্যাধিকীটের চারিদিকে মুক্তা জন্মায় তাহাদেরও আলোচনা এখন করা হয় নাই। (কৃষি সমাচার হইতে)।
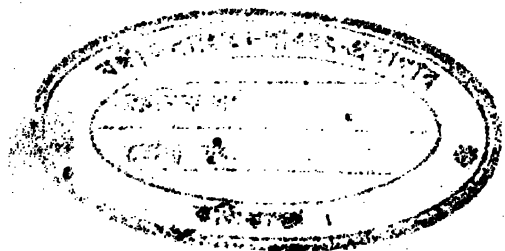
কৃষক—আশ্বিন, ১৩২৮ সাল।

ভারতীয় কৃষির প্রসার

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তৈল শস্য—তৈলশস্যের চাষও বাড়িতেছে। তিল, সরিষা, রাই, মসিনা মাট বাদাম এই গুলি তৈল শস্য। আলোচ্য বর্ষে ১৪, ৮৪৬, ০০০ একর জমিতে, তৈল শস্যের আবাদ হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে বৎসর হইয়াছিল ১১, ৮৭৩, ০০০ একর জমিতে। এই বৎসর ৮২৫, ০০০ টন তৈল শস্য রপ্তাণি হইয়াছিল এবং ইহার মূল্য বাবত ২৬,২৭ লক্ষ টাকা ভারতে আসিয়াছে। পৃথিবীর সমস্ত স্থানের সহিত তুলনায় ভারতবর্ষেই অধিক তৈল বীজ উৎপন্ন হয়। বর্ত্তমান সময় সমগ্র পৃথিবীতে যে পরিমাণ তৈল বীজ আবশ্যক তদপেক্ষা কম উৎপন্ন হইতেছে সুতরাং সর্ব্বত্র বাজারে ইহার দাম খুব চড়া। এই হেতু তৈল চাষ সকলেরই আগ্রহ দেখা যায়।

কিন্তু তৈল বীজ রপ্তানিতে আপাততঃ কিছু লাভ হইলেও এই প্রসঙ্গে একটা বিশেষ ভাবিবার কথা আছে। তৈল বীজ রপ্তানিতে আমাদের লোকসানও সমূহ।

১ম। বীজ না পাঠাইয়া যদি তৈল নিষ্কাষণ করিয়া পাঠান হইত তাহা হইলে ভারতে আরও অধিক অর্থাগম হইত।

২য়। তৈল নিষ্কাষণের পর যে খৈল অবশিষ্ট থাকে তাহা উত্তম পশুখাদ্য। যত টন বীজ রপ্তানি হয় তাহার শতকরা ৭০ ভাগ খৈল। হিসাবে করিলে বুঝা যায় যে তৈল পাঠাইলে প্রায় ১৬৭ লক্ষ মণ খৈল ভারতে থাকিয়া যাইতে পারে।

এই পরিমাণ খৈল অন্ততঃ ২০ লক্ষ গবাদি পশুর খোরাক যোগাইতে পর্য্যাপ্ত হইত। খৈল জমির সারবত্তা বাড়াইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। দেশে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণ খৈল রহিয়া গেলে চাষের কত সুবিধা হইত তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

স্বাধীন দেশ সহজেই তাহাদের স্বার্থ রক্ষা করিতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা সহজে বুঝা' যাইবে। য়ুরোপে তৈল পাঠাইলে সেখানে তৈল রপ্তানির সময় উচ্চহারে শুল্ক দিতে হয় কিন্তু বীজ পাঠাইতে হইলে সে উৎপাত নাই। তাঁহারা ইচ্ছা করেন যে, বীজই আমদানী হউক, তৈল আমদানী' হইয়া আবশ্যক নাই। আমাদের স্বার্থ তৈল অবাধে রপ্তানি হওয়ায় কিন্তু এ দেশের স্বার্থ গভর্ণমেণ্ট রক্ষা না করিলে উপায় নাই।

চা—চায়ের চাষ বিশেষ কিছু বৃদ্ধি হয় নাই—চায়ের আবাদী জমির পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা শতকরা ২ ভাগ মাত্র বাড়িয়াছে। তাহার কারণ বাজারে চায়ের কেনা বেচা কয়েক বৎসর যাবৎ বড় মন্দা যাইতেছে। রুষিয়াতে সমধিক পরিমাণে চা রপ্তানি হয়। ইউরোপীয় যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রুষিয়গণ চায়ের সর্ব্বাপেক্ষা বড় খরিদ্দার ছিল—তাহারা প্রতি বৎসর ভারত ১৯।০ সওয়া ১৯ কোটী পাউণ্ড চা ভারত হইতে কিনিত। এখন রুষিয়ার খরিদ্দার ভারতেব চায়ের হাটে নাই বলিলেই হয়। চা ব্যবসায় সমিতি চায়ের বাজার ঠিক রাখিবার জন্য ১৯১৫-১৯১৯ শালের পড় উৎপন্নের পরিমাণ ধরিয়া তাহার শতকরা ১৫ ভাগ চা উৎপন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন এবং আগামী বর্ষে শতকরা ২০ ভাগ মাত্র 'চা' উৎপন্ন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। আগে বাজারে ভাল মন্দ, মাঝারি সব রকম চা বিক্রয় হইত। বর্ত্তমানকালে ভাল চাই কেবল বিক্রয় হইবে স্থির হইয়াছে। আমরা যতদূর খবর পাইয়াছি তাহাতে অনেক বাগানওয়ালাই বলেন যে এ প্রথায় কাজ চলিলে তাঁহাদের লাভ হইবে না। কারণ বাগান রক্ষার জন্য লোকজন সাজ সরঞ্জম প্রায় ঠিক রাখিতে হইবে সুতরাং ভাল চা বেচিয়া যাহা কিছু অধিক লাভ হইবে তাহা বাগানের খরচায় খাইয়া যাইবে।

কফি—চা যেমন ভারতের লোকের ও অন্য দেশের পানীয়ের মধ্যে গণ্য হইয়াছে সেই প্রকার কফি পানের চলনও বাড়িয়াছে। ১৯২০ সালের চা চাষের তুলনায় কফি চাষের অবস্থা ভাল এবং কফির মূল্য আশাতীত অধিক। শতকরা ৭৪ ভাগে কফি মহিশুর ও কুর্গে উৎপন্ন হয় এবং এইটাই বড় সুখের বিষয় যে কফি চাষটা সম্পূর্ণ ভারতীয় চাষীদের হাতেই আছে।

ফলে—ভারতে নানা প্রকার জল মাটি বিদ্যমান এবং নানা প্রদেশে নানা প্রকার আবহাওয়ায় নানা রকমের ফল জন্মান সম্ভব ও জন্মে। সমতল ভূমে ও পর্ব্বতগাত্রে বিভিন্ন প্রকার ফল উৎপন্ন করা সহজসাধ্য এবং সম্ভব। এমন অনুকূল অবস্থায় ভারতবর্ষ ফল উৎপাদনে অদ্বিতীয় হইতে পারিত যদি অন্য দেশের ন্যায় এখানে উন্নত প্রণালীতে ফলের আবাদ করা হইত। দুঃখের বিষয় গভর্ণমেণ্ট কিম্বা ভারতীয় প্রজা বৃন্দ ফল চাষের উন্নতির জন্য এ পর্য্যন্ত কেহ কিছুই করে নাই

এবং স্থানে স্থানে যৎকিঞ্চিৎ যাহা হইয়াছে তাহা আদৌ পর্য্যাপ্ত নহে। বাঙলায় বিশেষত, ফল চাষের উদ্যোগ আয়োজন কিছুই দেখা যায় না। ভারতের জল মাটিতে কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ দেশের সবরকম ফলের গাছ অবাধে জন্মিতে পারে। এই ফলের আবাদের কি প্রকারে উন্নতি বিধান করা সম্ভব তাহা আলোচনা করিলে একটা সহজ উপায় সকলেই খুঁজিয়া পাইতে পারেন। মূল কথা এই যে, যেখানে যে ফল উত্তমরূপে জন্মিতে পারে সেখানে সেই ফলের চাষ করা, যে জাতের মধ্যে যেটা উৎকৃষ্ট সেইটার চাষ বাড়ান। হরজাই ফলের চাষে কোন লাভ হয়না। এই হইল প্রথম কথা; দ্বিতীয় কথা হইতেছে যে ফলের বাগানের ভালমত চাষ কারফিত করা এবং যে গাছের যে সার সেই গাছে সেই সার দেওয়া এবং আবশ্যকমত জল সেচনের সুব্যবস্থা করা। বাঙলার কৃষি বিভাগও ফলের আবাদের উন্নতি কল্পে এতাবত কিছুই করেন নাই। সাহারণপুর, গণেশখন্দ কিম্বা বাঙ্গালোরের সরকারী ফলের বাগানের মত এখানে কোন সরকারী ফলের বাগান নাই। বাঙলা দেশ ব্যবসা হিসাবে সর্ব্বত্র পিছাইয়া রহিয়াছে। বাঙলায় প্রকৃতপক্ষে কোন উদ্যান পালক বা ফল ব্যবসায়ী নাই।

উপকারী কীট পতঙ্গের চাষ—(ক) মৌমাছি—উপকারী পতঙ্গের মধ্যে মৌমাছির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। মৌমাছি জঙ্গলে সর্ব্বদাই বাসা বাঁধে। ভারতের মধু প্রায়ই জঙ্গল হইতে আহরণ করা হয়। মৌমাছি পালন ব্যবসা ভারতে অতি অল্পমাত্রই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আগে লোকের ধারণা ছিল যে পাহাড় ভিন্ন মৌমাছি পালন করা চলে না কিন্তু পুষা পরীক্ষাক্ষেত্রে সে ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে—মৌমাছি ভারতের সকল স্থানেই পালন করা যাইতে পারে এবং তাহাতে খরচও অধিক নাই বা ইহা বহু কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে! পুষা ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলে আরও দেখা যায় যে বিদেশ হইতে আনীত মৌমাছি পালন করিলে প্রত্যেক চাক হইতে ৮০ পাউণ্ড বা ৪০ সের মধু পাওয়া যায় কিন্তু দেশীয় মাছির চাক হইতে ৬ পাউণ্ড বা ৩ সেরের অধিক মধু পাওয়া যায় নাই। বাজারে মধুর যে প্রকার কাট্‌তি তাহাতে বোধ হয় মাছি পালন করিয়া এই ব্যবসা চালাইলে বিশেষ লাভ হওয়া সম্ভব এবং ইহাতে অধিক মূলধনের আবশ্যক নাই।

(খ) **লাক্ষা কীট**—চাঁচ গালার দর উত্তরোত্তর এত বাড়িয়াছে যে যুদ্ধের পূর্ব্বের দর অপেক্ষা উহা দশগুণ চড়িয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। কুলে, কুসুমে, পাকুড়ে, টোঙ্গায় নামক অরহরে ও অন্য অনেক গাছে লাক্ষা কীট পালন করিয়া লাক্ষা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এই সকল গাছ ভারতের অনেক স্থানে সহজে জন্মিয়া থাকে। বাঙলায় লাক্ষার যথেষ্ট পরিমাণ অভাব দৃষ্টি হয় কিন্তু তথাপি ইহার চাষের প্রসার আশানুরূপ হইতেছে বলিয়া মনে হয় না।

(গ) রেশম পোকা—বাঙলায় এক সময় রেশম চাষের প্রধান্য ছিল এবং বাঙলার রেশম শিল্প এক সময়ে খুব খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এখন আর সে প্রাধান্য নাই। মহীশুরে রেশম শিল্পের উন্নতি দেখা যায়, এতদ্ভিন্ন ভারতের অন্যত্র কাহারও এই শিল্প তাদৃশ উৎসাহ নাই। মহীশুরে রেশম উৎপাদনের পরিমাণ ৬ বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণ দাঁড়াইয়াছে এবং এই শিল্প হইতে মহীশুর রাজ্যের আয় কোটি টাকার অনেক বেশী হইয়াছে।

রেশম পোকা পালনের জন্য সমগ্রভারতে নানা জাতীয় অপরিযাপ্ত গাছ আছে। আসাম অঞ্চলে এড়ির (এরণ্ড) পাতা খাওয়াইয়া রেশম পোকা পালন করা হয়। তুঁতের গুটি দেশ বিখ্যাত। তুঁতগাছ বাঙলা বিহার উড়িষ্যা অযোধ্যা পঞ্জাব সেখানে জন্মান যাইতে পারে। পালন বন সিংভূম মালভূম জঙ্গলে অতি বিস্তার। পলাস গাছ রেশম কীট পালন করা চলে। কুলের গুটিও সুন্দর হয়। কুলগাছ সহজে জন্মান যায়। অরহর কলাইগাছ রেশম পোকা পালনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। টোঙ্গর নামীয় দীর্ঘকাল স্থায়ী অরহর ইহার জন্য নির্ব্বাচন করিলে সুবিধা হয়। পড়ো জমিতে অরহর চাষ সহজে হয় এবং ঐ প্রকার জমিতে গাছ ভালরূপ জন্মিয়া থাকে।

পশুপালন—পশুর বংশবৃদ্ধি ও পালনের দিকে মন দেওয়া ভারতের প্রধান অবশ্য কর্ত্তব্য—রোগে অনাহারে ভারতে পশুর সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। বিগত পশু গণণায় একথা সকলে বুঝিতে পারিয়া এবং অনেক মহান হৃদয় এ জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছে। ইহার প্রতিকার কি? অষ্ট্রেলিয়া দেশে পশুর সংখ্যা অত অধিক যে গড় হিসাবে প্রত্যেক মানুষের ভাগে ১৭টী পশু পড়ে ভারতে কিন্তু প্রতি ১৫ জন মানুষের ভাগে একটিমাত্র পশু নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, তাহার অধিক হয় না। সুতরাং এক এক জনের ভাগে ১ ছটাকের অধিক দুধ পাইবার আশা নাই। দুধের অভাব, হল-বাহী কাজা বলদের দুষ্প্রাপ্য ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে! ভারতের রোগাক্রমে মরিতেছে, তাহাদের খাদ্য তৃণের নিতান্ত অপ্রতুর, পশুচারণের মাঠের অভাব পশুগণকে ক্রমশঃ ধ্বংশ পথে লইয়া যাইতেছে। ইহার প্রতিকার করিতে না পারিলে পশুকুল নির্ম্মূল হইয়া যাইবে এবং নিরন্ন ভারত আরও নিরন্ন হইবে। সরকারী বিবরণী পাঠে জানা যায় যে ভারতের স্থানে পজনন ক্ষেত্রে স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙলায় এই প্রকার পশুজনন ক্ষেত্র একটিও নাই। য়ুরোপ, এমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে পশুগণকে তিন ভাগে ভাল করিয়া পালন করা হয়। এতদ্দেশ সমূহে মাসের জন্য. ভারবহনের জন্য, দুগ্ধ দানির জন্য পৃথক পৃথক ভাবে পশু পালন, করা হয়। এ সকল দেশে মাংসের জন্য দুগ্ধদায়ী বা ভার বাহী পশু কখন হনন করা হয় না বা মাংশ দায়ী পশু দুগ্ধদানে বা ভার বহনে নিয়োগ করা হয় না। আর একটা সুবিধা এই যে ভার বহনের জন্য এই সকল দেশে ঘোড়ার নিয়োগই অধিক দেখা যায়।

পশু পালনে বাঙলায় সাতিশয় নিরুৎসাহ—সমগ্র বাঙলা প্রদেশের মধ্যে রঙ্গপুরে এবং কালিমপঙে সবেমাত্র দুইটি পশুপালন ক্ষেত্র আছে, তাহাও খুব বড় রকমের নহে। কিন্তু মধ্যেপ্রদেশে ১০টি পশুপালন ক্ষেত্র আছে।

কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং—কৃষি কর্ম্মে ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্য সব প্রদেশেই কিছু কিছু দৃষ্ট হয় কিন্তু বাঙলায় তাহার একান্ত অভাব। বাঙলার চাষের জন্য কূপ খোঁড়া নাই, জল তোলা পম্প বসান নাই বা আখমাড়া কল নাই। যুক্ত প্রদেশ কৃষি-ইঞ্জিনিয়ারিঙের কিছু আধিক্য দেখা যায়—অন্ততঃ রিপোর্ট পাঠে আমরা তাহাই জানিতে পারি।

কৃষিশিক্ষা—ভারতের সব প্রদেশে কৃষিকলেজ ব্যবস্থা আছে কিন্তু বাঙলায় চাষাবাদের প্রধান্য সত্ত্বেও বাঙ্গালার কোন কৃষিকলেজ নাই। ভারতে কোথায় কোথায় কৃষিকলেজ আছে তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

বোম্বাই প্রদেশ পুনা কৃষিকলেজ—বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট
উপাধি বিঃ এজিঃ

পঞ্জাব—লায়লপুর কৃষি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সংশিষ্ট
উপাধি কৃষি বিঃ, এস্ সিঃ

যুক্তপ্রদেশ—কানপুর কৃষি কলেজ।

মধ্য প্রদেশ—নাগপুর কৃষি কলেজ।

বিহার ও উড়িষ্যা—সাবর কৃষি কলেজ।

মান্দ্রাজ—কৈম্বাটুর কৃষি কলেজ।

কলেজ ব্যতীত বোম্বে প্রদেশে ৬টী কৃষিবিদ্যালয় আছে এবং আরও ৬টী বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্কল্প হইয়াছে। এই সকল বিদ্যালয়ে স্থানীয় ভাষায় কৃষি শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু বাঙলায় সবেমাত্র ২টী কৃষি বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে, একটি ঢাকায় এবং ১টী চুঁচুড়ায়।

সমস্ত বিবরণী পাঠে এইটিই বিশেষ অনুভব হয় বাঙলা সর্ব্ব রকমে পিছাইয়া আছে। বাঙলায় কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা অতি অল্প, বাঙলায় ফলের আবাদের বন্দোবস্ত নাই, উপযুক্ত পশু পক্ষী পালন ক্ষেত্র নাই, গোপালন জন্য গোশালা নাই, বাঙলায় সেচের জলের সুব্যবস্থা নাই, বড় রকমের ইক্ষুক্ষেত্রও চিনির কারখানা নাই। বাঙলার কৃষি বিভাগ সর্ব্বতোভাবে কাজে আত্ম নিয়োগ করুণ ইহাই আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি।

কৃষি-মন্ত্রী—শিক্ষিত ভদ্র সমাজে সকলেই জানেন যে অনারেবল খাঁ বাহাদুর নবাব নবাবালি চৌধুরী বঙ্গের কৃষি-মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। ভদ্রসমাজ এ কথা জানিলেও চাষী মহলে এ খবর অবগত নহে। বঙ্গের শাসন পরিষদে এতদিন চাষ বা চাষীর কথা আলোচনা করিবার কেহই ছিল না। এখন তাহার জন্য মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়া কম আশার কথা নহে এবং আশা করি খাঁ বাহাদুরের মন্ত্রীত্বকালে

বাঙলার চাষাবাদের ও বাঙলার কৃষক কুলের প্রভূত উন্নতি হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অদ্যাপিও চাষাবাদের উন্নতি কল্পে কোন হিতকর কার্য্যে তিনি হাত দেন নাই। ইহার বড় সন্তোষের বিষয় হইবে যদি তিনি চাষী ও জমিদার গণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া কৃষির উন্নতির কাজে লাগাইতে পারেন। জমিদারগণ তাঁহাদের জমিদারীর উন্নতি করুণ এবং প্রজা জমিদার উভয়ে তাহার ফলভাগী হউক। চাষীরা অক্লান্ত পরিশ্রমে ধান পাট ও অন্যান্য শস্য উৎপাদন করে। চাষীরা অভাবী তাহারা মাল ধরিয়া রাখিতে পারে না, সেই দ্রব্য বেচা কেনা করিয়া লাভবান হয় অন্য লোক এবং তাহার অধিকাংশ যায় বিদেশীর হাতে। কো অপারেটীভ সমিতি স্থাপন দ্বারা ইহার প্রতিকার করা প্রয়োজন নহে কি? তিনি বঙ্গের ঘরে ঘরে গোপালনের সুবিধা করিয়া দিবেন ইহা আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা। ইহা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য নহে, কারণ দেশের লোকে এখন তাঁহার কথা শুনিবে এবং রাজার নিকট তাঁহার প্রতিপত্তি থাকা সম্ভব। বঙ্গের গোচারণ গুলি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হউক, নূতন গোচরের সৃষ্টি হউক, জেলায় জেলায় উৎকৃষ্ট জাতীয় ষণ্ড রক্ষিত হউক। রেল লাইনের ধারে রেলের পরিত্যক্ত হাজার হাজার বিঘা জমি পড়িয়া রহিয়াছে সে গুলি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে গোপালনের ব্যবস্থা করা চলিতে পারে এবং রেলের দরকার নাই এমন অনেক খাদ আছে যাহার সংস্কার করিলে মৎস্য পালনেরও সুবিধা হইবে। সাস্থ্য সচীব বঙ্গের স্বাৎস্থ্যোন্নতির জন্য কোটী কোটী টাকার ফরমাস্ করিয়াছেন—ঐ টাকা রাজা প্রজা কেহই দিতে পারিতেছে না সুতরাং স্বাস্থ্যোন্নতির আশা ফলবতী হইবে বলিয়া মনে হয় না। কৃষি সচীব ঐ প্রকার টাকার ফরমাস করিয়া বসিলে বর্ত্তমানে কৃষির উন্নতির কোন আশাই থাকিবে না।

রাজা প্রজা জমিদারকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া কাজ করিবার সুচনা করা হউক এবং গভর্ণমেণ্ট ঐ সকল সঙ্ঘ সমিতিকে যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করেন কৃষি-সচিব তাহারই ব্যবস্থা করুণ।

কৃষির উন্নতিকল্পে খাল বিল পুষ্করিণী জলাশয়াদির সংস্কার করিতেই হইবে, তাহাতে স্বাস্থ্য সচীবেরও স্বার্থ আছে। তাঁহারা এক যোগে কাজ করিলে বোধহয় কাজটা সহজ হইতে পারে। চাষীর অন্নের সংস্থান লইলে, তাহারা স্বচ্ছল হইলে স্বাস্থ্য সংস্কারের কার্য্য অল্পব্যয়ে ও অনায়াসে চাষীগণ দ্বারাই চলিবে।

তাঁহারা কতকগুলি পল্লী লইয়া এক একটি কেন্দ্র স্থাপন করুণ জমিদার এবং গভর্ণমেণ্টকে তাঁহাদের সহায় করুণ, এই প্রণালীতে কাজে নামিলে উভয় সংস্কার কার্য্য অল্পে অল্পে অগ্রসর হইবে এবং তাহাতে কতকটা ফল হইবার সম্ভাবনা।

মন্ত্রীদ্বয় পল্লী সমিতির সহিত সংগত হউন তাহা হইলে দেশের কাজ দেশের লোকের অভিপ্রায় মতই হইবে। সভা সমিতিতে কেবল Resolution পাশ করিলে বিশেষ লাভ কিছুই হইবে না।

পল্লী সংস্কার না হইলে চাষী সুস্থ থাকিবে না, অসুস্থ কৃষক লইয়া চাষ চলে না। পল্লী সংস্কারে মন দিতে হইলে পল্লীর পুরাতন রাস্তাগুলির সংস্কার, নূতন রাস্তার প্রতিষ্ঠা চাই। পল্লী কেন্দ্রগুলির মধ্য দিয়া অন্ততঃ দুইটি সুপ্রসস্থ রাস্তা নির্ম্মিত হউক—একটি উত্তর দক্ষিণে লম্বা অপরটি পূর্ব্ব পশ্চিম লম্বা। রাস্তা দুইটির পরিসর যদি সম্ভব হয় ৫০।৬০ কিম্বা ১০০ ফিট হওয়া উচিত। উহাদের উভয় পাশে সুপ্রশস্থ পয়োনালা থাকিবে-সেই হইল গ্রামগুলির জল নিকাশের পথ, রাস্তার উন্মুক্তস্থান হইবে বায়ু চলাচলের পথ। মানুষ চলাচলের পথ থাকিবে মাঝখানে, দুই পাশের জমি গোচারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইবে। পয়োনালার ধারে খেঁজুর ও নারিকেলের গাছ লাগান হইবে এবং অন্তরে নিম, ইউক্যালিপটস্ ও দেবদারু বসান হইবে।

এই প্রকার রাস্তার সৃষ্টি করিতে পারিলে তিনটা কাজ হইল (১) বায়ু চলাচলের ও জলনিকাষের পথ হইল, (২) গোচর ভূমি তৈয়ারি হইল। (৩) নারিকেল খেঁজুর হইতে আয় হইল।

পত্রাদি

নিমের খৈল—শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল চন্দ্র ঘোষ, পাবনা।

প্রশ্ন ১। নিমের খৈল কোথায় পাওয়া যায়?

২। যে পোকাতে মাটি চষিয়া চারার গোড়া কাটিয়া দেয়, তাহা নষ্ট করিবার উপায় কি?

উত্তর—নিমের খৈল আবশ্যক মত পাওয়া যায় না, উহা অল্পমাত্রায় উৎপন্ন হয়। সারের জন্য ব্যবহার করিবার মত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তথা তথা পাওয়া যায় না। নিমের খৈল ব্যবহারে গাছের গোড়ায় উই লাগা ও সব্জীতে বা কোন খন্দে পোকালাগার উপদ্রব কতকটা দমিত হইতে পারে। কিন্তু যাহা পাওয়া যাইবে না তাহার জন্য ব্যস্ত না হইয়া তার বদলে রেড়ীর খৈল ব্যবস্থার করা চলিতে পারে।

২। মাটির ভিতরের পোকা চষিয়া, খুঁড়িয়া বাহির করিয়া মারিতে হইবে। ক্ষেত জল মগ্ন করিলেও পোকা বাহির হয় তখন তাহাদের মারিবার সুবিধা হয়। ভারতীয় কৃষি-সমিতির কীট নিবারক আরক ব্যবহার করিলেও উপকার পাইতে পারেন। ইহাতে পটাস্‌পারমাঙ্গানেট ও সেঁকো প্রভৃতি বিষাক্ত ঔষধ আছে, যাহা পোকার গায়ে লাগিলে পোকা মরে।

কাটাল গাছের পোকা। প্রশ্ন—অন্য কয়েক জন জানিতে চান যে আম কাঁটাল গাছে ছিদ্রকারী পোকা কি প্রকারে মারা যাইবে।

উত্তর—ধারাল ছুরীদ্বারা ক্ষত স্থান কাটিয়া পোকা বাহির করিয়া মারিতে পারিলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।

অন্য প্রতিকার গঙাল ফ্লুইড ব্যবহার করা। ইহাতে হিং, ডেরকামারি গম, ঝুল ও গুড় থাকে। গুড়ের ভাগই অধিক থাকে। একসের পাতলা চিটা গুড়ে ১ তোলা হিং, ৫ তোলা গঁদ, এক আনা পেকেটের ২ প্যাকেটে ভুসা মিশাইয়া একটি প্রলেপ তৈয়ারী হইবে। গঁদের ক্ষতস্থানে প্রলেপ লাগাইয়া দিলে এবং গর্ত্তে এই মিশ্রন ঢালিয়া দিলে পোকা মরিয়া যায় এবং নূতন পোকা লাগে না। মিশ্রনটি জলে গুলিয়া তরল করিয়া মাটিতে পোকার গর্ত্তে ঢালিয়া দিলে উপকার পাওয়া যায়।

চরজমিতে আবাদ—শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ঘোষ, শান্তিপুর।

নূতন নদীর চর কি প্রকারে হাসিল করা যায় ? এই চরের মাটিতে বালুকার ভাগই অধিক।

উত্তর—বালুকাময় জমিতে জৈবিক পদার্থ না মিশিলে চাষাবাদের সুবিধা হয় না। চরে বন ঝাউ, ঘাষ অন্য লতাগুল্ম জন্মিয়া এবং তাহাদের লতা পাতা, শিকড় পচিয়া জৈবিক পদার্থ সঞ্চিত হয়। তখন ইহাতে ধান, গম যব কলাই সরিষা প্রভৃতি জন্মিতে থাকে। কিন্তু চর জমি এই প্রকারে সারবান হইতে ৪।৫ বৎসর সময় লাগে। একটা কৌশল করিলে বোধ হয় ২।১ দুই এক বৎসরে জমি সারবান করিয়া লইতে পারেন। জমিতে ঘন করিয়া ধঞ্চে বুনিয়া দেওয়া, এবং গাছ এক দেড় ফুট বড় হইলেই তাহা চষিয়া মাটিতে ঢাকা দেওয়া—এতদ্বারা আশু উপকার পাইবেন ইহা আমাদের বিশ্বাস। কেবল ধঞ্চে কেন পাট শণ প্রভৃতি ঐ জাতীয় উদ্ভিদের সবুজ সার দ্বারা ঐ মত উপকারই পাইবেন।

কাঁচা ঘাষ বা অন্য উদ্ভিজ্জ সংরক্ষণ—শ্রীযুক্ত নেপাল চন্দ্র বেড়া, মেদিনীপুর।

প্রশ্ন—কাঁচা উদ্ভিজ্জ অসময়ের জন্য সংরক্ষণ করিবার কথা কৃষকে অলোচনা করা যাছে। কোন্ কোন্ উদ্ভিজ্জ সংরক্ষণের উপযুক্ত জানিতে ইচ্ছা করি। 'কৃষকে' ইহ যে উপায়ে সংরক্ষণ করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই প্রকার সাইলেজ প্রকোষ্ঠ নির্ম্মান করা নিতান্ত ব্যয় সঙ্কুল, কোন সহজ উপায় আছে কি না ?

বর্ষার সময় গবাদির খাদ্য প্রচুর; ঐ সময় কিছু ঘাষাদি অসময়ের জন্য রাখিলে আবশ্যক মত কাজে লাগাইতে পারা যায়। আমরা খুব সঙ্গতিপন্ন চাষী নহি। ধানের গোলা বা মরাই বাঁধা আমাদের পক্ষে ব্যয় সাধ্য। আমাদের খোরাকীধান রক্ষার যদি কোন সহজ উপায় থাকে তাহা হইলে আমাদের অনেক ধান পোকা লাগিয়া নষ্ট হয় না।

উত্তর—নানা জাতীয় ঘাষ, অরহর গাছ, জুয়ার গাছ, ভুট্টাগাছ, সীমের গাছ সাইলেজ করিবার উপযোগী। ঘাষ বা ঐ সকল গাছ বেশ সবল থাকিতে থাকিতে সাইলেজ করা প্রয়োজন—বিলম্বে গাছ বা ঘাষ পাকিয়া যায় এবং তাহাদের মিষ্টত্বের হানী হয়।

উচ্চ স্থানে যেখানে জল বসার হাঙ্গামা নাই আবশ্যক মত গর্ত্ত খুঁড়িয়া গর্ত্তের ভিতরটা খড় কুটা দ্বারা উত্তমরূপ পোড়াইয়া লইতে হইবে এবং তাহাতে ঘাস বা গাছ—খণ্ড খণ্ড, করিয়া কাটিয়া তদ্বারা গর্ত্তটী সম্পূর্ণ ভাবে পূর্ণ করিতে হইবে এবং উদ্ভিজ্জ পূর্ণ গর্ত্তটি ১॥ ফুট উচ্চ মাটি দ্বারা বিশেষ ভাবে ঢাকিতে হইবে। উপরের এবং গর্ত্তের ভিতর বাহিরের চারিদিকে মাটি এমন ভাবে চাপা আবশ্যক যাহাতে গর্ত্তের মধ্যে জল প্রবেশ করিতে না পারে। গর্ত্তের উপরে গোময় ও মাটির লেপ দিলে আরও নিশ্চিত হওয়া যায়। ধানও ঐ প্রকারে সংরক্ষিত হইতে পারে। ধান আগড়া চিটা সমেত রক্ষা করাই ভাল, ব্যবহারের সময় বাহির করিয়া ঝাড়িয়া লইতে হয়। বায়ুবদ্ধ করিয়া রাখিলে এবং তাহাতে জল প্রবেশ করিতে না পারিলে ধান্য ও উদ্ভিজ্জাদি বহুকাল অবিকৃত অবস্থায় থাকে।
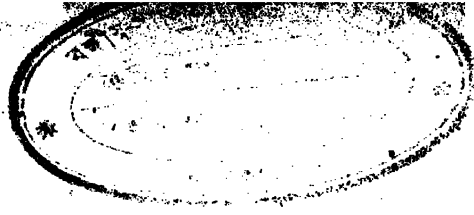
কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

২২শ খণ্ড | কার্ত্তিক, ১৩২৮ সাল। | ৭ম সংখ্যা।

আর্য্য কৃষিরীতি—হল কথন

শ্রীঅক্ষয়কুমার জ্যোতীরত্ন লিখিত।

ঈশা যুগো হলস্থাণু নির্যোলস্তস্য পাশিকা।
অড্ডচল্লশ্চ শৌলশ্চ পচ্চনী চ হলাষ্টকম্॥
পঞ্চহস্তা ভবেদীশো স্থাণ্ পঞ্চবিতাস্তিকঃ।
সার্দ্ধ হস্তস্ত নির্যোলা যুগঃ কর্ণ সমানকঃ॥
লাঙ্গ পাশিকা চৈব অড্ডচল্লস্তথৈবচ।
দ্বাদশাঙ্গুলমানো হি শৌলোঽরত্নি প্রমাণকঃ॥
পঞ্চ মুষ্টি পচ্চনিকা অগ্রস্থিবংশসম্ভবা।
দৃঢ় শ্লক্ষ্মা পরিজ্ঞেয়া পরাশরেণ ভাষিতা॥ *
যোক্ত্র হস্ত চতুষ্পঞ্চ রজ্জুঃ পঞ্চকরাত্মকা।
পঞ্চাঙ্গুলোধিকোহস্তো হস্তো বা ফালকঃ স্মৃতঃ॥
অর্কপত্রসদৃশী পাশিকা চ নবাঙ্গুলা।
একবিংশক শল্যস্ত বিদ্ধকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
নবহস্তাতু মদিকা প্রশস্তা কৃষি কর্ম্মসু।
ইয়ং হি হলসামগ্রী পরাশর মুনের্ম্মতা॥
সুদৃঢ়া কর্ষকৈঃ কার্য্যা সুভদা কৃষিকর্ম্মাণি?
অদৃঢ়া যুজ্যমানা সা সামগ্রী বাহনস্য চ।
বিঘ্নং পদে পদে কুর্য্যাৎ কর্ষকালে ন সংশয়ঃ॥

(কৃষি পরাশরে)

ঈশা, যুগ, স্থাণু নির্যোল, পাশিকা, অড্ডচল্ল, শৌল ও পচ্চনী এই আটটী হলের অঙ্গ।

---

* সার্দ্ধদ্বাদশ মুষ্টি বা কার্য্যা বা নব মুষ্টিকা ইত্যাদি পাঠান্তর।

ঈশা (ঈশ) পরিমাণ পাঁচ হস্ত, স্থাণু (মুড়ো ও বোঁটা সমেত লাঙ্গল) পাঁচ বিতস্তি অর্থাৎ সওয়া দুই হস্তের উপর, নির্যোল (আঁকড়া) দেড় হস্ত, যুগ (যোয়াল) কর্ণ সমান অর্থাৎ সওয়া তিন হস্ত, পশিকা (ফাল) ও অড্ডচল্ল (আড় চাল) দ্বাদশাঙ্গুল, শৌল (শোঁয়ালি) প্রায় এক হস্ত পরিমাণে গাঁইট শূন্য দৃঢ় এবং সুডৌল ও বংশ খণ্ড হইতে নির্ম্মিত। পাঠান্তরে দুই ও দেড় হস্ত পরিমাণেরও উল্লেখ আছে। (বিদা দেওয়া কার্য্যের সময় ঐ পরিমাণের ব্যবহার দেখা যায়।)

যোক্ত (যোঁত) চারি হস্ত প্রমাণ, (আঁয়তের পরিমাণ ঐরূপ) রজ্জু (লাঙ্গল দড়ি) পাঁচ হস্ত, ফাল এক হস্ত বা এক হস্ত পঞ্চাঙ্গুল প্রমাণেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফালের আকার অর্কপত্র সদৃশ এবং বিস্তার নয় আঙ্গুল ও বিন্ধক (বিদা) একবিংশতি শল্য (লৌহ নির্ম্মিত বিদা কাটি) দ্বারা নির্ম্মিত এবং মদিকা (মই) নয় হস্ত পরিমিত হইবে।

এই সকল পরাশর কথিত হল সামগ্রী সুদৃঢ় হইলে কৃষি কার্য্যে শুভদা হয়। অদৃঢ় সামগ্রী দ্বারা কার্য্যে নিযুক্ত হইলে বাহনের কার্য্য কালে পদে পদে বিঘ্ন হয়।

দ্বাপরে পরাশর কৃষি শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য তখনও যে ভাবের কৃষি যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইত এখনও প্রায় সেইরূপ যন্ত্রাদিই আছে। আমাদের যেমন দেশ তদুপযুক্ত যন্ত্রই সৃষ্ট হইয়াছে। উহাদের অনাদরে দ্বারা সুবিধাও নাই শ্রেয়ঃ নাই।

শুভেহর্কে চন্দ্রসংযুক্তে শুক্লযুগ্মেন বাসবা।
শুক্লপুষ্পৈশ্চ গন্ধৈশ্চ পূজয়িত্বা যথাবিধি॥
পৃথিবীং হলসংযুক্তাং পৃথুঞ্চৈব প্রজাপতিম্।
অগ্নেঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা ভূরি দত্ত্বা চ দক্ষিণাম্॥
ফালাগ্রং স্বর্ণ সংযুক্তং কৃত্বা চ মধুলেপনম্।
অহেঃ ক্রোড়ে বামপার্শ্বে কুর্য্যাদ্ধলপ্রসারণম্॥
স্মর্ত্তব্যো বাসবো ব্যাসঃ পৃথূ রাম পরাশরঃ।
সম্পূজ্যাগ্নিং দ্বিজং দেব কূর্য্যাদ্ধলি প্রসারণম্॥

রবি ও চন্দ্রশুদ্ধ দিবসে, শুক্ল যুগ্ম বস্ত্র, শুক্ল পুষ্প ও গন্ধাদি দ্বারা যথাবিধি (গণেশাদি ও ক্ষেত্র পালাদি) হল সংযুক্তা পৃথিবী, পৃথু ও প্রজাপতির পূজা করতঃ অগ্নি প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক যথেষ্ট দক্ষিণা দান করিবেন এবং ফালাগ্রে স্বর্ণ স্পর্শ করতঃ ঘৃত-দধি ও আজ্য প্রদান ও মধু লেপন করিয়া সরস ক্ষেত্রে (কৃষকের) বাম পার্শ্বে (উত্তর মুখে) হল চালন করিবেন। হল চালনের পূর্ব্বে বাসব, ব্যাস, পৃথু, রাম ও পরাশরকে স্মরণ করিয়া অগ্নি, দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা করিতে হইবে। বাসবকে অর্ঘ দান করিবার বিশেষ মন্ত্র আছে উত্তরাভিমুখ হইয়া মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মন্ত্র যথা ;—

শুক্ল পুষ্পসংযুক্তং দধিক্ষীরসমন্বিতম্ ॥
সুবৃষ্টিং কুরু দেবেশ ! গৃহাণার্ঘ্যং শচীপতে !

রাঢ় দেশে বাড়ীতে পূজা কার্য্য সমাধানন্তর ক্ষেত্রে *হল চালন করিতে যাওয়া রীতি আছে। হল চালনার্থে যাত্রা কালীন পথে যাত্রা বিরুদ্ধ ব্যাপার দর্শন হইলে হল চালনে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। এই সময় শুভযাত্রার অঙ্গ সকল সন্দর্শনে প্রভূত ইষ্ট হয়। যাত্রাকালীন যে গুলি ইষ্ট এবং যাহা স্মরণাদিতেও শুভ হয় এ স্থলে তাহা বলিতেছি :—

শুভ যাত্রার সদুপায়

ধেনুর্বৎসপ্রযুক্তা বৃষগজতুরগা দাক্ষিণাবর্ত্তো বহ্নিঃ।
দিব্যা স্ত্রী পূর্ণকুম্ভা দ্বিজনৃপগণিকা পুষ্পমালা পতাকা ॥
সদ্যোমাংসংঘৃতংবা দধিমধুরজতং কাঞ্চনং শুক্লধান্যম্।
দৃষ্টা শ্রুত্বা পঠিত্বা ফলমিহলভতে মানবো গন্তুকামঃ ॥

বৎসযুক্তা ধেনু, বৃষ, তুরগ, দক্ষিণ শিখাবাহী অগ্নি, দিব্যা (সুশ্রী) স্ত্রী, পূর্ণকুম্ভ, দ্বিজ, নৃপ, গণিকা (বেশ্যা), পুষ্পমালা, পতাকা, সদ্যোমাংস, ঘৃত, দধি, মধু, রজত, কাঞ্চন, ও শুক্লধান্য এই সকল দর্শনে এবং এই শ্লোক শ্রবণে ও পঠনে যাত্রাকারী মানব শুভফল প্রাপ্ত হয়েন। যাত্রাকালীন শুভপ্রাপ্তেচ্ছুকদিগের এই শ্লোকটি অভ্যাস্থ রাখা আবশ্যক।

হলারম্ভের বিষয়

নিবিষ্টো বিষ্টরে ভক্তং সংস্থাপ্য জাহ্নবীক্ষিতৌ।
প্রণমেদ্বাসবং দেবং মন্ত্রেণানেন কর্ষকঃ ॥
বৃষো মহাকটির্বজ্যাশ্ছিন্নলাঙ্গুল কর্ণকঃ।
সর্ব্ব শুক্লস্তথা বর্জ্যাঃ কৃষকৈর্হল কর্ম্মণি ॥
হলপ্রসারণং কার্য্যং নীরুগ্ভির্বৃষ কর্ষকৈঃ।
ছিন্নরেখা ন কর্ত্তব্যা যথা প্রাহ পরাশরঃ ॥
একা ত্রিস্রস্তথা পঞ্চ হলরেখাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
একা জয়করী রেখা তৃতীয়া চার্থ সিদ্ধিদা।
পঞ্চমাখ্যাতু যা রেখা বহু শস্য প্রদায়িনী ॥

কুশাসনে উপবিষ্ট মানব জানুদ্বয় ভূমিতে সংস্থাপন করিয়া মন্ত্রাদি দ্বারা বাসবকে প্রণাম করিবে। বিশাল কটিবিশিষ্ট ছিন্ন লাঙ্গুল ছিন্ন কর্ণ ও সর্ব্ব শুক্ল বর্ণ বৃষ হল-প্রবাহে (হাল পূর্ণায়) নিষিদ্ধ। কর্ষক ব্যক্তি হাল পূর্ণে নীরোগী বৃষ দ্বারা করিবেক। হলারম্ভ কালে যেন ছিন্ন রেখা না হয়। এক তিন ও পাঁচ রেখাই উক্ত সময়ে প্রশস্ত। এক রেখা জয়করী তিনরেখা অর্থ সিদ্ধিদা, ও পঞ্চম রেখা বহু শস্যপ্রদায়িনী বলিয়া কথিত হয়।

এদেশেও আড়াই পাক লাঙ্গল চষার রীতি আছে। আড়াই পাক চষিলেই পঞ্চরেখা হইয়া থাকে।

লক্ষণালক্ষণ নির্ণয়

হলপ্রবাহ কালেতু কূর্ম্মমুৎপাটয়েদ্‌যদি।
গৃহিণী ম্রিয়তে তস্য তথা চাগ্নিভয়ং ভবেৎ॥
ফালোৎপাটে চ ভঙ্গে চ দেশত্যাগো ভবেদ্ধ্রুবম্।
লাঙ্গলো ভিদ্যতে বাপি প্রভুস্তস্য বিনশ্যতি॥
ঈশাভঙ্গোভবেন্নাপি কৃষকো জীবনাক্ষমঃ।
ভ্রাতৃনাশো যুগো ভগ্নে শৌলে চ ম্রিয়তে বৃষঃ॥
যোক্ত্রচ্ছেদে চ রোগঃ স্যাৎ শস্যহানিশ্চ জায়তে।
নিপাতে কর্ষকস্যাপি কষ্টং স্যাৎ রাজমন্দিরে॥
হলপ্রবাহকালে তু গৌরেক প্রপতেদ্‌যদি।
জ্বরাতিসার রোগেণ মানুষো ম্রিয়তে তদা॥
হলপ্রবাহমানে তু বৃষো ধাবন যদি ব্রজেৎ।
কৃষিভঙ্গো ভবেত্তস্য পীড়া চাপি শরীরজা॥
হলপ্রবাহমাত্রস্তু গৌরেক নর্দ্দতে যদি।
নাসানীঢ় প্রকুর্ব্বিত তদা শস্যং চতুর্গুণম্॥
প্রবাহামুক্তমাত্রস্তু গৌরেক স্বনতে যদি।
অঙ্গস্য লেহনং কুর্য্যাৎ তদা শস্য চতুর্গুণম্॥
হলে প্রবহমানে তু শকৃন্মূত্রং যদা স্রবেৎ।
শস্যবৃদ্ধিঃ শকৃৎপাতে মূত্রে বন্যা প্রজায়তে॥

হলপ্রবাহকালে যদি জমির আইল ভাঙ্গিয়া যায় অথবা চাষোদ্ভূতশীল মাটি ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলে গৃহিণী নাশ বা অগ্নিভয় হয়। ফাল উৎপাটিত হইলে বা ভাঙ্গিয়া গেলে দেশত্যাগ, লাঙ্গল (মুড়ো বা বোঁটা) ভঙ্গে প্রভুবিনাশ, ঈশভঙ্গে গৃহীবিনষ্ট,

যোয়ালভঙ্গে বৃষনাশ, যোত ছিঁড়িলে রোগভয়, শস্যহানি, কর্ত্তা বিনষ্ট এবং রাজদ্বারে কষ্টপ্রাপ্তি, একটী গো পতিত হইলে জ্বরাতিসার রোগে কর্ত্তা বিনষ্ট, বৃষ দৌড়িয়া পলায়ন করিলে কৃষিনষ্ট এবং শারীরিক পীড়া হয়। আর হলারম্ভমাত্রে একটী গো নাদিলে (গোবর ত্যাগ করিলে) এবং নাসা লেহন করিলে চতুর্গুণ শস্য, মুক্ত মাত্রে একটী গো শব্দ করিলে এবং অন্যকে লেহন করিলে চতুর্গুণ শস্য ও হলারম্ভমাত্রে গোবর ও মূত্র ত্যাগ করিলে গোবরত্যাগে শস্যবৃদ্ধি ও মূত্রত্যাগে বন্যা হয় জানিতে হইবেক।

হলপ্রবাহকালে এ সকল ঘটনা প্রায়ই ঘটে না। ঘটিলে ঐরূপ ফল হওয়াই সম্ভব। আমি ইহার অনেক ফল পাইয়াছি সাধারণে এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন এবং শুভাশুভ পরীক্ষা করেন এইমাত্র প্রার্থনা।

বিশেষ আদেশ

হেমন্তে কৃষ্যতে হেম বসন্তে তাম্ররৌপ্যকম্।
ধান্যং নিদাঘকালে তু দারিদ্রন্তু ধনাগমে ॥

শীতকালে হলারম্ভে সুবর্ণ, বসন্তে রৌপ্য ও তাম্র, গ্রীষ্মকালে ধান্য এবং বর্ষাকালে দরিদ্রতা লাভ হয়।

মৃৎ সুবর্ণা সমা মাঘে কুম্ভে রজতসন্নিভা।
চৈত্রে তাম্র সমাখ্যাতা ধান্যতুল্যা চ মাধবে ॥
জ্যৈষ্ঠে মৃদেব বিজ্ঞেয়া আষাঢ়ে কর্দ্দমাহ্বয়া।
নিস্ফলা কর্কটে চৈব হলেরুৎপাটীতা তু যা ॥

মাঘমাসে হলারম্ভে কর্ষিত মৃত্তিকা সুবর্ণসম, ফাল্গুনে রজতসন্নিভ, চৈত্রে তাম্র সমাখ্যাত বৈশাখে ধান্যতুল্য, জ্যৈষ্ঠে মৃত্তিকাসম, আষাঢ়ে কর্দ্দমসম এবং শ্রাবণে নিস্ফলমাত্রক হয়।

মাঘ মাসের মৃত্তিকার মধ্যে শীতের প্রবেশন দ্বারা মৃত্তিকা অধিক উর্ব্বরা হয়। অন্যান্যগুলি এইরূপ হৈম রৌদ্র ও গ্রীষ্ম এবং বৃষ্টির জলের কারণ বিভিন্ন ফলদায়ক হইয়াছে।

হলপ্রসারণং নৈব কৃত্বা যঃ কর্ষণং ব্রজেৎ।
কেবলং বলদর্পেণ স করোতি কৃষিং যথা ॥

যে ব্যক্তি হলপুণ্যাহ না করিয়া বল ও দর্পের সহিত কৃষিকার্য্য করে, তাহার সমস্তই নিস্ফলদায়ক হয়।

মুর্গীচাষ বা পুল্ট্রীফার্ম্মিং

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র সরকার প্রফেসার অব এগ্রিকালচার লিখিত।

(১)

এ সম্বন্ধে অনেক কথাই পূর্ব্বে পূর্ব্বের পত্রে বলিয়াছি। আমাদের গরীব দেশের মুশলমান ভ্রাতারা যদি একটু বিশেষ চেষ্টা করেন এবং তাহার সহিত হিন্দু ভায়েরা যোগদান করেন, তাহা হইলে কৃষি বিভাগটিকে পুনগঠিত করিয়া পুল্ট্রী স্কুল, ডেয়ারি স্কুল ইত্যাদি কৃষির প্রকৃত উন্নতির পথ উন্মুক্ত করা যাইতে পারে। আমাদের দেশের রাজা বাহাদুর, নবাব বাহাদুরগণ কি এ দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন। ৫ টাকার শেয়ারে ২ বা ১ লক্ষ টাকা উঠাইয়া একটা যৌথ মুর্গী চাষের কারবার ও তদ্ সঙ্গে ছাগল ভেড়া, গাভী মহীষাদি পশুর ব্রিডিং ফারম বেশ খোলা যাইতে পারে। বাবু চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পলাশীফারমের পরিবর্ত্তে একটা রীতিমত কাজের ফারম খোলা যাইতে পারে। এইরূপ ফারম খোলায় কলিকাতায় মাড়োয়াড়ি বা অপর হিন্দু বা মুসলমান সম্প্রদায় অগ্রসর হইলে আমি এ বিষয়ে কতকটা সাহায্য দান করিতে পারি বলিয়া আমার মনে হয়। তবে প্রকৃত কার্য্যকরী ও টাকা ওয়ালা ব্যক্তিরই অভাব আমাদের দেশে খুব বেশী তাহা আর বলিয়া দিতে হইবেনা। আমার নিজের জানা একটা বিল আছে, তাহাতে যদি ৫।৭ হাজার টাকা কেহ খরচ করেন, তাহা হইলে প্রতিবৎসর তাহা হইতে অন্যান্য খরচ খরচা বাদে হাজার টাকা তিনি লাভ করিতে পারেন কিন্তু এরূপ উদ্যোগী মহাজন ও লোক সহজে মিলে না—এই দেশ।

বিশুদ্ধ পানীয় জল বায়ুর চলাচল যুক্ত স্বাস্থ্যকর বাসা যেমন মুর্গীর একান্ত প্রয়োজন সেইরূপ তাহা দক্ষিণদ্বারী এবং অর্দ্ধ ইঞ্চি ফাঁক লোহার জালের কপাট প্রস্তুত করিয়া দ্বার রক্ষা করিবে। ডিম পাড়া গৃহ "ট্রাপ-ডোরযুক্ত হওয়া চাহি তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রে বলিয়াছি। পক্ষীর গৃহের ছাদ কদাচ করোগেটে করিবে না, তাহা পল, উলু, খাকড়া খোলা দ্বারা করিবে। উকুন বা পোকা পাখীর বড় শত্রু। মধ্যে ঘরগুলি চুণের পোচ্ দিবে, পুরীষ স্বতই প্রত্যহ পরিষ্কার করিবে, সপ্তাহে ঘরগুলি একবার ধুইবে ও তদন্তে ফেনাইল, কার্ব্বলিক পাউডার বা অপর কোনরূপ পুতিনাশক দ্রাবণ বা গুঁড়া ব্যবহারে ঘর গুলি পরিষ্কার করিবে যাহাতে কোন ক্রমে পোকা না জন্মায় এবং পাখীর গায়ে ধরিয়া তাহারা রক্ত চুষিতে না থাকে। জাতীয় মুর্গীর মধ্যে অর্পিঙ্গটন, ল্যাঙ্গশান, প্লিমাথ্ রক্, ব্রাহ্মা, চট্টগ্রামীয়, কোচীন ও গেম এবং ছোট জাতির মধ্যে লেগহর্ণ মিণর্কা, আন্দুলেসীয়গণসর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমাদের দেশী মুর্গী যদি নির্ব্বাচিত করিয়া লওয়া হয়, বাটারকাপ

খুব বেশী ডিমদাত্রী বলিয়া প্রসিদ্ধ। উপরোক্ত অষ্ট প্রকার বড়জাতীয় মুর্গীর পরিবার ওজনে ভারি, অধিক ডিমদাত্রী আকারে বড় এবং উত্তম মেজের পাখী হইয়া থাকে। চট্টগ্রামীয়গণ বেশী ভারী ও পায়ে মোজাযুক্ত হওয়ায় সহজেই ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি আদি রোগে আক্রান্ত হয়, ডিম চাপে নষ্ট করে, এবং রাগী বলিয়া নিজেদের ছানাগণকেও সময়েই ঠুকরাইয়া বিনাশ করে বলিয়া তাহাদের ডিমে "বসান" যুক্তি যুক্ত নহে। সময়েই খাদ্যের পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য এবং পালক নিজ পাখীদের নিজ সামনে খাওয়াইবেন, কদাচ সম্পূর্ণভাবে চাকরদের উপর নির্ভর করিবেন না, তাহা হইলে খাদ্যচুরী, পাখীচুরী ও ডিমচুরী হইবে এবং খরচা দ্বিগুণ বসিবে। কি হাড়ী, কাওরা, ডোম বা মুসলমান, কার্য্যোপযোগী বিশ্বাসী এই কাজের চাকর পাওয়া আমাদের দেশে বড়ই দুষ্কর ও কঠিন। ছানাদের খুব যত্ন করিবে। সদ্য ফোটা ছানা যদি বেশী হয় তাহাদের ব্রুডার (ধাইমা) এবং হোভারে (hover) পালন করিবে। যেখানে ২।১০ হাজার ছানা হয় সেখানে মুর্গীর দ্বারায় পালন কাজ করাইলে পালকের ক্ষতি হয় যেহেতু পালক—মুর্গী অন্তত তিন মাস আর ডিম দিতে অক্ষম হয়। পালকের যেন বেশ স্মরণ থাকে এবং একথা আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে, যে সকল মোরগের জানন কার্য্যে আবশ্যক নাই বা হয় না, তাহাদের বাজারে বা হাটে পাঠাইবে। আড়াই বৎসর বয়স্ক মুর্গীদের অর্থাৎ দ্বিতীয়বার পালক ঝাড়ার পূর্ব্বে পুরাতন মুর্গীদের হাটে পাঠাইবে।

মুর্গীর খাদ্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কিছু ২ পূর্ব্ব পত্রে বলিয়াছি। একটী মুরগীকে বা পুষ্ট রাখিতে হইলে খাদ্য নির্ব্বাচন বিশিষ্ট ভাবে করিতে হইবে ১'৫ ইহাই খাদ্যের রেসিও ইহাকে নিউট্রিটিভ রেসিও "বলে, তাহা পরবর্ত্তী তালিকা দেখিলেই সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইবে। পক্ষীচাষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শাখা আছে তাহা পূর্ব্ব ২ পত্রে বলিয়াছি ; কোন পাখীকে বেশী ডিমদাত্রী করিতে হইলে এক প্রকারের খাদ্য দিতে হয়, যদি মেজের পাখীর আবশ্যক হয় তবে অন্য এক প্রকার মোটা করনোপযোগী ও চর্ব্বি উৎপাদক খাদ্য দিতে হয়। এইরূপ ফ্যাটনিং (fattening) ব্যবসা সাসেক্স (ইংলণ্ড) ও আমেরিকার স্থানে ২ আছে। এবিষয়ে পরে একপত্রে আলোচনা করিব। ডিমে বসিয়ে বা "তাদিয়ে" মুর্গীকে তাপ উৎপাদক খাদ্য দিতে হয়। পরবর্ত্তী তালিকা দেখিলে কোন্ কোন্ শস্যে কি রূপ পুষ্টি সাধন করে এবং তাহার "নিউট্রিটিভ রেষিও" কি তাহা জানা যায়। ইহার দ্বারায় পাখি চাষকারীর ও শিক্ষা নবীনদের বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া আমার মনে হয় উৎপাদক বা তাদিয়ে মুর্গীকে নাইট্রোজেন ঘটিত খাদ্য ১'৪ রেষিও যুক্ত অনুপাতে দিতে হইবে, তায়ে বসিয়ে মুর্গীকে এমন খাদ্য দিতে হইবে যাহাতে তাহার দৈহিক উত্তাপ সংরক্ষিত হয়, নষ্টপেশী সকল মেরামত হয় ; এই জন্য ইহাদের কঠিন খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন। এই জন্য ইহাদিগকে মকাচূর্ণ দিলে সব কাজ হয়। সপ্তাহে দুইবার উদ্ভিদ্ খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন, ছানাদের খাদ্য নির্ব্বাচনে ১'৩ অনুপাতে প্রথম সপ্তাহে,

এবং পর পর সপ্তাহে ১'৩২ হইতে ১'৪ রেসিও যুক্ত খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন। ডিমদাত্রী মুর্গীদের ১'৪২ রেষিও যুক্ত খাদ্য গ্রীষ্মের সময় এবং শীতের সময় ১'৫ রেষিও যুক্ত খাদ্য দিবে। ডিমদাত্রী মুর্গীদের ভিন্ন ২ স্কুল কলেজে বা পাখী উৎপাদক ফারমে খাদ্য দিবার ব্যবস্থা আছে তাহা যথা স্থানে পরে বিবৃত করিব।

নবজাত ছানা গুলি ডিম হইতে বাহির হইলে তাহাদের পালন করা বড় কঠিন না হইলেও খুব যত্ন ও পরিশ্রম পর, তাহা আমাদের দেশের, অশিক্ষিত কৃষকগণ কতদূর সমর্থ হইবে তাহা জানিনা। আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে ছানা গুলি মুর্গীর তলে বা কলে ফুটিলে পর তাহাদের ত্যক্ত ডিমের খোলা অপসারিত করিয়া ছানা গুলিকে মুর্গীর নীচে বা কলে ২৪ বা ৩৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাখিবে। সেই সময় খাদ্য দিবার প্রয়োজন হয় না, কারণ ডিমের অভ্যন্তরস্থ এলবুমেনেই তাহাদের পুষ্টি ঐ কাল পর্য্যন্ত সাধিত হইয়া থাকে। কালের ছানা গুলিকে তাপ ঠিক করিয়া রুডারে স্থানান্তরিত করিবে। এসম্বন্ধে কল পরিচালনের পর্য্যায়ে পরবর্ত্তী পত্র পাঠে পাঠক সম্যক অবগত হইবেন। ২৪ বা ৩৬ ঘণ্টার পর ছানা গুলি বেশ শুষ্ক হইয়া যাইলে শুষ্ক ঘাস, খড় কুটা বা অপর নরম দ্রব্যে বাসা নির্ম্মাণ করিয়া ধাড়ী মুর্গীসহ ছানাদের তথায় স্থানান্তরিত করিবে।

ডিম উৎপাদন

প্রফেসার শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার লিখিত।

(১)

ডিম উৎপাদন মুর্গীচাসের একটা প্রধান লাভজনক অঙ্গ সেই জন্য যাহাতে শীতকালে ফেল, সমগ্র বৎসর ধরিয়া যাহাতে বেশী সংখ্যায় ডিম পাওয়া যায় সেইরূপ মুর্গীকে পালন করিতে হইবে এবং সেই অনুযায়ী খাদ্য ও দিতে হইবে। খাদ্যের দাম, তাহা প্রস্তুত ও মিশানর পারিপাট্য, তীক্ষ্মবুদ্ধি, অনুসঙ্গিক বহির ও অন্তরাবস্থার উপর সকলই নির্ভর করে। এই সকলের কোন লেখাযোখা রীতিনীতি বা নিয়ম নাই। সবই উৎপাদন করা পালকের বুদ্ধিমত্তা ও সাধারণ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। মুর্গীর খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ধাতব, নাইট্রোজেন ও কার্ব্বণ ঘটিত সামগ্রী থাকা চাহি, তাহা কমবেশ সবই যব বই, গম, মকাদি অন্নে আছে। ইহাদের এমন পরিমাণে মিশাইয়া পাখীদের খাদ্য রূপে দিতে হইবে, যাহাতে দৈহিক ক্ষয় নিবারিত হইয়া তাপ

সংরক্ষণ করে ও খুব বেশী পরিমাণে ডিম ও উৎপাদিত হয়। হাড়, জৈবিক খাদ্য এই গুলির সহিত দেওয়া কর্ত্তব্য যাহাতে ডিম বেশী হয়। শুষ্ক খাদ্য এবং মাংশ খাদ্য এই উভয়রূপ পদ্ধতিতে মুর্গীকে খাওয়াইবে। সময়ে সময়ে কাঁচা ক্লোভার ঘাস, কপির পাতাও অপর উদ্ভিদ খাদ্য ইহাদের স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ছাড়া মুর্গীদের সকাল ও বৈকালে খাদ্য দিবে, বাঁধা পক্ষীদের দিনে ৩ বার খাদ্য বণ্টন করিবে। প্রচুর পরিস্কার পানীয় জল দিবে এবং মুর্গীদের ঘর প্রত্যহ সকাল বৈকালে পরিদর্শন করিবে এবং নিজে ডিম সংগ্রহ করিয়া সেইগুলিকে সদা সদাই বাছাই করিয়া পৃথক পৃথক রাখিবে। বসাইবার ডিম যেন কদাচ ৮।১০ দিনের পুরাতন না হয়। যত ডিম টাট্‌কা হইবে ততই ছানা তেজস্কর ও নিরোগ এবং শীঘ্র বর্দ্ধনশীল ইহবে। ছানা তোলা ব্যবসা করিতে হইলে অর্থাৎ চুজায় ব্যবসা লাভজনক করিতে হইলে, খুব তেজস্বী দোষহীন ও পরিপক্ক দুই বৎসর বা ততোধিক বয়স্ক মুর্গীকে ১ বৎসর বয়স্ক ঐরূপ তেজস্বী মোরগের সহিত সংযোগ করিবে। উর্ব্বর ডিম বসাইবার জন্য দরকার হইলে ১টী পূর্ব্বোক্তরূপ মোরগের সহিত (ছোট চঞ্চল জাতি যেমন লেগহরণ এবং মিনর্কা জাতীয় হইলে) ১০ হইতে ১৫ টি মেদীকে ছাড়া পালিত (free range) হইলে সংযোজিত করিবে; মাঝারি জাতি হইলে (অর্থাৎ প্লিমথরক্, ও ওয়াণ্ডোট হইলে) ১টী মোরগের সহিত ১০বা ১২টী মুর্গীকে এবং বড় ভারি জাতি হইলে ১টী মোরগের সহিত (যেমন ব্রামা বা কোচীণ) ১০টী মুর্গী সংযোজিত করিবে। ডিমদাত্রীগণ এমন হওয়া প্রয়োজন যেন ৫ মাস হইলেই ডিম দিতে আরম্ভ করে, জেনারেল পারপাদ জাতিগুলির ৬ মাসে এবং মাংস বা মেজের জাতিগুলির ৭ বা ৮ মাসে ডিম পাড়া আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। একটি কুড়ুক্ মুর্গীর নীচে গর্ম্মীর দিনে ১৩টি ডিম বসাইবে; এবং শীতকালে ১০ বা ১১ টি ডিম্বের বেশী বসাইবে না। কত ডিম একটা মুর্গীর নীচে বসান হইবে তাহা সময়, ডিমের পরিমাণ ও মুর্গীর আকারের উপর নির্ভর করে। এক কালীন যদি বেশী ছানার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে ডিম কলে ফুটান কর্ত্তব্য। সামান্য ১০।১৫।২০টাকা হইতে ২।৫ দশ হাজার দামের পর্যান্ত কল পাওয়া যায়। সাইফার, পেটালুমা, বাকআই, টুলী, প্রাট, হল, গ্রশ্‌টার, হিয়ার্শন, ক্যাণ্ডি, প্রেরীষ্টেট্, বার্গেস, কুপার প্রভৃতি উৎপাদকগণ খুবই প্রসিদ্ধ। কলে বসান ডিম ঠাণ্ডা স্থানে ৫০বা ৬০ডিগ্রী ফার্ণহীট টেম্পারেচারে সদাই বসান পর্য্যন্ত রাখিবে। ৮।১০ দিনের বাসী বা পুরাণ ডিম কদাচ বসাইবে না তাহা পূর্ব্বেই বলেছি। পালক সকল, কথা স্মরণ করিয়া কাজ করেন। বসাইবার আগে ডিমগুলিকে পরীক্ষা করিতে অর্থাৎ একটি তীব্র আলোর সামনে একটা ছিদ্র যুক্ত পিস্‌বোর্ড অন্ধকার স্থানে ধরিয়া পরীক্ষা করিবে এবং পরীক্ষিত ডিম বসাইবে। অনুর্ব্বর ডিম দেখিলে সাফ বোধ হইবে এবং উর্ব্বর ডিমের মধ্যে মাকড়সার মত একটি

পদার্থ ভাসমান দৃষ্ট হয়। অনুর্ব্বর ডিম বাজারে বা রন্ধন শালায় পাঠাইবে। ডিমপাড়া ঘরের অন্যত্র বসিয়ে বা "তা দিয়ে" ঘর ঠিক করিবে। তা দাত্রী মুর্গীগুলির খুব বেশী যত্ন, তাজা জল, উত্তম খাদ্য দিবে। ডিম ফোটার ২৪ ঘণ্টা পরে তবে ছানাগুলিকে মুর্গীর নীচে হইতে স্থানান্তরিত করিবে। ডিম ফোটার সময় কেবল সময়ে সময়ে ডিমের খোলা গুলি সরাইয়া দিবে। কলে ডিম ফোটান সহজ হইলেও একটু শিক্ষা প্রয়োজন। প্রত্যেক কলের সহিত উপদেশ পত্র থাকে তাহা দেখিয়া কাজ করিবে। ইন্‌কুবেটার কিরূপে চালাইতে হয় তাহার সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে অন্যপত্রে যৎসামান্য আলোচনা করিয়াছি;—যাহা বাকী থাকিয়া গিয়াছে তাহা অত্রস্থানে বিবৃত করিলাম। ডিম হইতে বহির্গমনের পর ১টা ধাড়ী মুর্গীর সহিত ১০বা ১২টি ছানা বা চুজা পালনের জন্য ছাড়িয়া দাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই সময়ে চিল বাজ ইন্দুর ছুঁচা ইত্যাদি শত্রুর হাত হইতে ছানাগুলিদের রক্ষার জন্য ছাড়া স্থানে চরিতে না দিয়া পাঞ্জা বা ভি আকৃতির ঝাঁপা বা টাপা বা দাবার নীচে মুর্গী ও ছানা গুলিকে ঢাকা দিয়া শীতের দিনে রৌদ্রে এবং গরমের দিনে ছায়ায় রাখিবে। মুর্গী ২১ ফেজাণ্ট ২২ হইতে ২৪, পাতিহাঁস ২৮, মস্কভি হাঁস ৩৩ হইতে ৩৫, পেরু ২৮, ময়ূর ২৮, গিনিফাউল ২৬ হইতে ২৮ দিনে, অষ্ট্রিচ ৪২ এবং রাজহংস বা সোয়ান ৩০ হইতে ৩৪ দিনে বসানর তারিখ হইতে, ছানা ফোটায়। আমাদের দেশে শীতের ডিম বেশী উত্তমরূপ ফোটে। গর্ম্মী—কালের ডিম গাজিয়া যায়। ইনকুবেটার বা মুর্গীর নীচে একজাতীয় মুর্গীর ডিম বসাইবে। প্রত্যেক মুর্গীর পৃথক্ পৃথক্ তা বাক্স সংগ্রহ করিয়া দিবে। মুর্গীকে ডিমে বসাইবার আগে তা বাক্সে ও মুর্গীকে ধুলা দিবে; এই কটি গুঁড়াঘরে প্রস্তুত করা সহজ তাহা স্থানান্তরে আলোচনা করিব। নিস্তব্ধ, ঠাণ্ডা, গোলমাল শূন্য স্থানে তা বাক্স গুলি বসাইবে এবং 'বসিয়ে' মুর্গীকে কদাচ বিরক্ত করিবে না।

ইনকুবেটার বা ডিম ফোটান কল বহু প্রকারের বাজারে পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বেই বলেছি। আমাকে আদেশ করিলেও পূর্ব্বে চুক্তি করিলে আমি এই সকল আনাইয়া দিতে পারি ইনকুবেটার গরম বাতাস ও গরম জলের দ্বারায় পরিচালিত হয় কল কেনাই যুক্তি; কমদামের কল কেনা অপেক্ষা বেশী দামের বিশ্বাসী কল কেনাই কর্ত্তব্য কারণ ছোট অবিশ্বাসী কল শীঘ্রই খারাপ হইবার সম্ভাবনা। ৬০ এবং ৩৬০ ডিমের কলে একই পরিশ্রম ও ব্যয়; সেই জন্য ১৫০ বা ২০০ ডিমের কল কেনা কর্ত্তব্য। সাত দিনে এবং পুনশ্চ ১৪ দিনে ডিমগুলিকে পরীক্ষা করিবে। ১৮ দিনের পর ছানা ফোটা পর্য্যন্ত আর কলের বাক্স খুলিবে না। গড়পড়তায় বড় কল গুলির ছোট কল অপেক্ষা পরিচালনে খরচা কম। ইনকুবেটার পরিচালনে সাফল্য লাভ করিতে হইলে প্রথম দেখিতে হইবে যে, যে স্থানে তাহা রক্ষিত৹ তাহার টেম্পারেচার শীঘ্র পরিবর্ত্তন শীল না হয় এবং পবিস্কৃত বাতাস সেই ঘরে সদাই প্রবাহিত হয়।

কামরাটি এখন বড় ও পরিসর যুক্ত হওয়া চাহি যাহাতে পরিচালক ঘুরিয়া ফিরিয়া কল গুলি পরিদর্শন করিতে ও চালাইতে পারে। কল ঘরের মেঝে সিমেণ্টের করিবে ও কলটি স্পট লেবেল সাহায্যে সোজা ভাবে বসাইবে। কল বসাইয়া দেখিবে পরীক্ষা করিয়া যেন (regulator) স্বাধীন ভাবে কাজ করিতেছি এবং কোনরূপ বাধা বা আটক হয় না। ডিম বাক্সে দিবার আগে একদিন কলটিকে ১০২ ডিগ্রী ফাঃ টেম্পারেচারে পরিচালন করিবে, কারণ ডিম বাক্সে দিয়া কল চালাইলে ঠিক টেম্পারেচারে কলটিকে বসিতে কয় ঘণ্টা দেরী হয় এবং এই অসম তাপে ডিম গুলিরও হানি হইবার সম্ভাবনা। বাক্সের তাপ সমভাবে দেওয়া চাই। দিনের মধ্যকালে বা দ্বিপ্রহরের সময় ডিমের বাক্সের তাপ কমাইবার জন্য আগুনের বাতিটি একটি কমাইয়া দিয়া আঁচ হ্রাস করিয়া দিবে। ভ্রূণ যতই বড় হইতে থাকে তাপ ততই কম লাগে সেই জন্য পরিচালন যন্ত্রটি প্রত্যহ পরীক্ষা করিবে এবং একান্ত আবশ্যক বিবেচিত হইলে সামান্য ইতর বিশেষ করিয়া তাপ হ্রাস বা বৃদ্ধি করিয়া দিবে। তাপমান যন্ত্রের (bulb) টি ডিমের উপর যদি রক্ষিত থাকে তবে প্রথম সপ্তাহে ১০১½ হইতে ১০২, দ্বিতীয় সপ্তাহে ১০২ হইতে ১০৩ এবং তৃতীয় সপ্তাহে ১০৩ ডিগ্রী তাপে পরিচালন করিবে এবং কলের উপদেশ পত্র মত কল পরিচালিত করিবে। কলে ভাল তৈল ব্যবহার করিবে বাতি রোজ কাটিয়া ঠিক করিয়া দিবে যেন ধোঁয়া না উঠে এবং তাপ যেন সমভাবে বিকীর্ণ হয়। প্রথম ডিম ফোটা হইতে সকল ডিম ফোটা পর্য্যন্ত কলের দরজা আর খুলিয়া; তাহাতে কামরায় জলীয় ভাগ (moisture) নষ্ট হইয়া যায়। ছানা ফোটার সময় কলের উপর চাপা দিয়া অন্ধকার করিয়া রাখিবে নচেৎ ভিতরের ছানা গুলি আলো দেখিয়া বাহিরে আসিবার জন্য ব্যস্ত হইবে। সকল ছানা গুলি ফুটিলে পর ২৪ হইতে ৩৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ছানাগুলিদের কলের কামরায় বন্ধ রাখিবে। তার পর খুলিয়া পরিষ্কার করিবে এবং তাহাদের খাইবার জন্য ব্যবস্থা করিবে। সে বিষয় পরে আলোচনা করিব। ছানা ফোটা শেষ হইলে কলকে পুতি বিমুক্ত (disinfect) ফরমাল্‌ডিহাইড (formal-dihyde) বা কোলটার সাহায্যে করিবে এবং ডিম বসাইবার পূর্ব্বেও ঐরূপ করিবে। কলে ডিম একবার বসাইবার পর আর নূতন ডিম সংযোগ করিবে না। ডিম গুলিকে দ্বিতীয় দিন হইতে ১৯ দিন ঘুরাইয়া পালটাইয়া দিবে যেন সকল দিকে সমভাবে তাপ লাগে এবং ঐ সময়ের মধ্যে প্রত্যেক দিনে দুই বার করিয়া ঠাণ্ডা করিবে অথবা আরও উত্তম হইবে যদি সপ্তম হইতে ১৯দিন পর্য্যন্ত দিনে একবার করিয়া কুল করিবে। এক সময় প্রত্যহ কলগুলি পরিদর্শন করিবে এবং তেল ও বাতি পরিষ্কার করিয়া দিবে। ডিম পালটাইয়া বাতি সাফ করিবে, বাতি এবং আলো (lamp) সদাই পরিষ্কার রাখিবে। সপ্তম এবং চতুর্দ্দশ দিনে ডিম গুলি পরীক্ষা করিবে। অষ্টাদশ দিনের পর ডিমের প্রকোষ্ঠ

আর খুলিবে না। প্রত্যহ ডিম বাক্সে ঠাণ্ডা বাতাস দিবে ও ডিমগুলি পালটাইবে। পেটালু মার্ক কলে কলিকাতা বিদ্যুৎ সাহায্যে ডিম ফোটান যায়। সব প্রকার কলও বই আমি আনাইয়া দিতে পারি। পত্র দিলে সকল খপর দেওয়া যাইতে পারে। ঠিকানা প্রফেসার পিঃ সিঃ, সরকার, ৩১ নং এলগিন রোড, কলিকাতা।

অনাবৃষ্টিসহ শস্য

আমরা দেখিতে পাই যে অতি বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হয়। অতিবৃষ্টি হইয়া ফসল নষ্ট হইলে জঙ্গলাদি ও ফসলাদি পচিয়া জমি অত্যন্ত সারবান হয় এবং পর বর্ষে দ্বিগুণ কিম্বা ততোধিক ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে কিন্তু অনাবৃষ্টির হাত হইতে রক্ষার উপায় কি দেখিতে হইবে। সেচের জলের ব্যবস্থা করা অনাবৃষ্টি রূপ আপদ নিবারণের এক মাত্র উপায়, আর উপায় অনাবৃষ্টি সহ শস্য উৎপাদন করা।

যে বৎসর অতি সামান্য পরিমাণে বৃষ্টি হইবার কারণ ধান্যাদি প্রধান শস্য সমুদায় নষ্ট হইয়া যায়, সে বৎসরেও দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন শস্য উত্তম জন্মিতেছে। যে সকল শস্য স্বল্প পরিমাণ বৃষ্টিপাত দ্বারাই প্রস্তুত হইয়া যায়, ঐ সকল প্রত্যেক কৃষকেরই জন্মান কর্ত্তব্য। ইহাদের মধ্যে প্রধান অনাবৃষ্টি সহ ধান্য ইহার বিষয় কৃষকে আমরা আলোচনা করিয়াছি।

ফাপর তৈল-প্রদ বীজ ও রবি শস্য সকল জন্মাইতেও অধিক বৃষ্টি পাতের আবশ্যকতা হয় না। যে সকল স্থানে বৃষ্টি অল্প হইয়া থাকে তথায় বর্ষা শেষ আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে, উক্ত ফসল গুলি লাগান উচিত। বঙ্গ দেশের অনেক স্থানে বৃষ্টি অধিক হয়, এইজন্য বাঙালা অপেক্ষা ছোট নাগপুর অঞ্চলের কৃষকগণ তৈল-প্রদ বীজ ও রবি শস্য সকল লাগাইয়া অপেক্ষাকৃত অধিক লাভবান হইয়া থাকে। ফাপর বা রাজগীর নামক শস্য (Bauk wheat) নিতান্ত নীরস প্রস্তরময় জমিতেও জন্মিয়া থাকে। ইহার বীজ হইতে গোধূমের ময়দার ন্যায় ময়দা প্রস্তুত হয়। কার্ত্তিক মাসে এই শস্য লাগান উচিত। বিঘা প্রতি ৮।১০ সের বীজ ছিটান আবশ্যক। সিমুল-আলুর গাছও সামান্য বৃষ্টি দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। এই গাছের মুল হইতে ময়দা ও ছাতু প্রস্তুত করিতে পারা যায়। যেখানে বৃষ্টি কম সেখানে ইহার প্রধান হওয়া আবশ্যক।

ভুট্টা—স্বল্প পরিমাণ বৃষ্টিপাত দ্বারা ভুট্টা গাছ জন্মিয়া থাকে, ইহার কারণ, ভুট্টা গাছের শিকড় ৫।৬ ফুট পর্য্যন্ত গভীর মৃত্তিকাতে প্রবেশ করে।

চৈত্র মাসের পূর্ব্বেই গভীর ভাবে চাষ দিয়া ভূমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া, ঐ মাসে যে দিবস অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া যাইবে, ঐ দিবসেই, অর্থাৎ জমি সরস থাকিতে থাকিতেই শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বীজ লাগান কর্ত্তব্য। শ্রেণী গুলি এক হাত অন্তর করা উচিত এবং বীজ আধ হাত অন্তর করিয়া পুঁতিয়া যাওয়া উচিত। সকল প্রকার ভুট্টা অপেক্ষা জুয়ানপুরের ভুট্টা হইতে ভালফল পাওয়া যায়। ভুট্টা প্রায় তিন মাসের মধ্যেই পাকিয়া যায়; ইহা হইতে কিছু অধিক ফসলও জন্মিয়া থাকে, দেখিতে ইহার দানা গুলি শুভ্রবর্ণ এবং খাইতে সুমিষ্ট। বীজ লাগাইবার পরে গাছগুলি প্রায় এক হাত পরিমাণ উচ্চ হইলে উহাদের গোড়ায় মাটি চাপাইয়া আইল বাঁধা আবশ্যক। কাঁচা অবস্থায় যদি ভুট্টা গুলি ব্যবহার বা বিক্রয় করিতে পারা যায়, তাহা হইলে গাছ গুলি গোরুর আহারার্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। কাঁচা ভুট্টার গাছ গোরুর অতি উত্তম খাদ্য। ভাল করিয়া চাষ করিতে পারিলে এক বিঘা জমি হইতে ৭।৮ মণ ভুট্টার দানা এবং ১০০।২০০ মণ ডাঁটা পাওয়া যাইতে পারে। ভুট্টা পাকিয়া গেলে গাছ গুলি গোরুর আহারের জন্য বিশেষ উপকারে আইসে না। কিন্তু কাগজ প্রস্তুতার্থে ইহা ব্যবহারে আনা যাইতে পারে। কাঁচা অবস্থায় মক্কা গুলি ভাঙ্গিয়া বিক্রয় বা ব্যবহার করিতে পারিলে গাছ গুলি পরে শুকাইয়া গেলে ও গরুকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিলে গোরু উহা খাইয়া থাকে।

নিম্ন বঙ্গদেশের লোক ভুট্টা বা মক্কা খাইয়া পরিপাক করিতে পারে না বলিয়া, কৃষকেরা প্রায় এই ফসলটী অগ্রাহ্য করিয়া থাকে। কিন্তু বিশেষ প্রণালী দ্বারা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিলে ভুট্টার দানা হইতে সহজ পরিপাচ্য আহার্য্য সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারা যায়। অপরিপক্ক অবস্থায় ভুট্টার দানা সিদ্ধ করিয়া খাইলে উহা পরিপাক হইয়া থাকে। কিন্তু কাঁচা ভুট্টা দুই চারি দিবসের অধিক ভোজ্য অবস্থায় রক্ষিত হইতে পারে না। দানা গুলি এক কালীন পাকিয়া গেলে ধান্য বা কলাইয়ের ন্যায় ইহা সহজেই রক্ষিত হয়। এ অবস্থায় ভুট্টা মোটা মোটা করিয়া ভাঙ্গিয়া, উহা জলে সিদ্ধ করিয়া, উহা হইতে ভাতের ন্যায় খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাঁওতাল প্রভৃতি জাতি ভুট্টার ভাত খাইয়া পরিপাক করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাও নিতান্ত সহজ পরিপাচ্য সামগ্রী নহে। পাকা ভুট্টার দানা ভাজিয়া বা দগ্ধ করিয়া, এমন কি, খৈ করিয়া খাইলেও, সহজে পরিপাক করিতে পারা যায় না। আমেরিকাবাসীরা ভুট্টার দানা হইতে "কর্ণফ্লাউয়ার" নামক অতি সহজ পরিপাচ্য আহার সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই সামগ্রী রোগীরও আহার বলিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্রে ব্যবহার হইয়া থাকে। "কর্ণফ্লাউয়ার" বা ভুট্টার পালো "সরল কৃষি-বিজ্ঞানের" উপায়ে প্রস্তুত করিতে পারা যায় তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল—

ভুট্টার পালো—শুষ্ক ভুট্টার দানা গামলার মধ্যে রাখিয়া উহার সহিত ফুটন্ত জল মিশাইয়া দিতে হয়। সমস্ত রাত্রি এই জলের মধ্যে ভুট্টার দানা থাকিয়া

নরম হইয়া যায়। পর দিবস ঐ দানা যাঁতায় পিষিয়া বা ঢেঁকিতে কুটিয়া লইয়া, যে মণ্ড প্রস্তুত হইবে, উহা কাপড়ের উপর রাখিয়া, কাপড় সমেত পরিষ্কার জলের মধ্যে ছাঁকিতে ছাঁকিতে পালোটা সমস্ত জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া, জলের নিম্নে ক্রমশঃ জমিতে থাকিবে। পরে আর এক গামলা পরিষ্কার জলের মধ্যে কাপড় সমেত মণ্ডের অবশিষ্ট অংশ নাড়িয়া নাড়িয়া ছাঁকিতে ছাঁকিতে যখন দেখা যাইবে যে আর শ্বেত সার বা পালো নির্গত হইতেছে না, তখন কাপড়ে অবশিষ্ট সামগ্রী বা সিটা নিংড়াইয়া রৌদ্রে শুকাইতে হয় এবং গামলা দুইটার জলের নিম্নে যে শ্বেত-সার জমিয়া যায় উহা, দুই এক ঘণ্টার পরে উপরিস্থিত জল ফেলিয়া দিয়া, পুনরায় গামলার মধ্যে পরিষ্কার জল দিয়া, মিশাইয়া দিয়া, এক ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিয়া পুনরায় উপরিস্থিত জল ফেলিয়া দিয়া, সংগ্রহ করিতে হয়। উপরিস্থিত জল গামলা কাত্ করিয়া ফেলিয়া দিয়া, নিম্নস্থ শ্বেত-সার রৌদ্র-মুখী করিয়া রাখিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। এই শুষ্ক শ্বেত-সার পাক করিয়া খাইলে অতি সহজে পরিপাক হয়। সিটে ভাগ রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া গোরুর আহারের জন্য ব্যবহার করা চলে। ইহা হইতে পেষণ দ্বারা ময়দা নির্গত হয় বটে, কিন্তু এই ময়দা সহজে পরিপাক করা যায় না বলিয়া, সিটে গবাদি জন্তুর আহারার্থই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। গবাদি রোমন্থক জন্তুর পাকস্থলী চারিভাগে বিভক্ত এবং অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। এ কারণ উহারা মানুষের বা অশ্বের অপরিপাচ্য সামগ্রীও পরিপাক করিতে পারে।

দেব-ধান্য বা জুয়ার—এই ফসল অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইলেও জন্মিয়া থাকে। ইহা নানা জাতীয় হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে যেমন ধান্য প্রধান শস্য, মান্দ্রাজ প্রদেশে সেইরূপ দেব-ধান্য বা চোড়াম্ প্রধান শস্য। ইহার দানা পাকিয়া গেলেও ইহার গাছের উপরিভাগের অর্দ্ধেক গোরুর আহারের জন্য ব্যবহার হইতে পারে। নিম্নের অর্দ্ধেক জ্বালানী কাষ্ঠের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যদি গাছ গুলি ফুল হইবার পূর্ব্বেই ঘাসের ন্যায় কাটিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে আগা-গোড়া সমস্তই ছোট ছোট করিয়া খণ্ড করিয়া কাটিয়া দিলে গোরুতে খাইয়া ফেলে। এই প্রকার জোয়ার ও ভুট্টা গাছের গবাদির সংরক্ষিত খাদ্য হইতে পারে। মৃত্তিকাভ্যন্তরে গর্ত্ত খুঁড়িয়া যথাবিধি সংরক্ষণ করিতে হয়। এই গর্ত্তকে (silo) সাইলো বলে। ভুট্টা বা জোয়ার প্রভৃতি গাছ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া গর্ত্তে চাপিয়া রাখিতে হয়—অসময়ে ব্যবহারের জন্য। এক বিঘাজমিতে ৮।১০ মণ দানা ও ১৫০/ হইতে ২০০/ মণ পর্য্যন্ত ডাঁটা জন্মিয়া থাকে। এক একটী দেশী গরু প্রত্যহ ন্যূনাধিক অর্দ্ধ মণ ঘাস খাইয়া থাকে, উত্তমরূপে জোয়ার বা ভুট্টা বা বজরা বা ঘাস জন্মাইতে পারিলে এক এক বিঘা জমির দ্বারা একটী করিয়া গরু পুষিতে পারা যায়। কাঁচা অবস্থায় এই ঘাস কাটিয়া লইয়া রৌদ্রে শুকাইলে সম্বৎসরের জন্য গোরুর আহার এক

কালীণ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারা যায়। চৈত্র, বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ বপন করাও চলে, আবার ভাদ্র-আশ্বিণ মাসেও বীজ বপন করা চলে। চৈত্র-বৈশাখে বীজ বপন করিলে বীজ ভাল হইয়া থাকিতে পারে না, কেন না শ্রাবণ ভাদ্রে বর্ষার ধারায় ফুলের রেণুগুলি ধৌত হইয়া বীজ জন্মাইবার পক্ষে প্রতিবন্ধক হইয়া উঠে। কিন্তু চৈত্র-বৈশাখ মাসে দেবধান্যের বীজ ঘন করিয়া লাগাইয়া দিলে, আষাঢ় শ্রাবণ মাসে প্রচুর ঘাস পাওয়া যায়। এ কারণ, দেব-ধান্য, ঘাসের ন্যায় ব্যবহৃত হইলে, বিঘা প্রতি তিন সের বীজ ছিটাইয়া দেওয়া উচিত; যদি শস্যের জন্য ইহা জন্মান হয়, তবে ⁄১॥• সের মাত্র বীজ ব্যবহার করা উচিত। শস্যের জন্য যে বীজ লাগান হয়, উহা শ্বেত বর্ণের; ঘাসের জন্য যাহা লাগান হয়, ঐ বীজ লোহিত বা কৃষ্ণ বর্ণের হইয়া থাকে। জমির পাইট ভাল রকম না হইলে এবং গাছের চারা অবস্থায় অধিক বৃষ্টিপাত ও গাছের বর্দ্ধনশীল অবস্থায় বৃষ্টির অসম্ভব হইলে জুয়ার গাছ গুলি ছোট ও হরিদ্রা বর্ণের হইয়া থাকে। এরূপ নিস্তেজ ক্ষুদ্রকারের জুয়ার খাইয়া গবাদি জন্তু অনেক সময় রোগাক্রান্ত হইয়া মরিয়া যায়। জুয়ার গাছ জন্তুদের খাইতে দিবার সময় এই বিষয়টি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

সিমুল-আলু—এই ফসলটীও অতি সামান্য পরিমাণ বৃষ্টিপাত দ্বারা জন্মিয়া থাকে। সিমুল-আলুর গাছ কাটি কলম হইতে জন্মে। কলম গুলি ৩ হাত অন্তর লাগাইতে হয়। সকল ঋতুতেই কলম হইতে গাছ জন্মাইতে পারা যায়, কিন্তু ফাল্গুন মাসই কলম লাগাইবার প্রকৃষ্ট সময়। ভাল করিয়া জমিতে চাষ দিয়া, জমি হইতে জল যাহাতে বাহির হইয়া যায় এমন ব্যবস্থা করিয়া, কলম লাগাইয়া দিতে হয়। গাছগুলি দুই হাতের অধিক উচ্চ হইতে দিতে নাই। গাছ অধিক উচ্চ হইয়া গেলে মূলের পরিমাণ কম হয়। মধ্যে মধ্যে ডগা ভাঙ্গিয়া দিলেই গাছগুলির ঝাড় বাঁধিয়া যাইবে ও উহারা খর্ব্বাকার থাকিয়া যাইবে। পৌষ বা মাঘ মাসে মাটি খুঁড়িয়া মূল গুলি বাহির করিয়া লইতে হয়, ময়দা ও এরারুট প্রস্তুত করিতে হয়। প্রথমে মূল গুলি সমস্ত রাত্রি জলে ফেলিয়া রাখিয়া পরদিবস উহার উপরিভাগস্থ মোটা ছাল ছুরিকা দ্বারা ছাড়াইয়া লইতে হয়। জলে ভিজাইবার পরে ছাল কাটিয়া শাঁস বা শ্বেত সার সহজেই বাহির করিয়া লইতে পারা যায়। এই শাঁস কাঁচা অবস্থাতেও আহার করা যায়। ইহা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া পরিষ্কার জলে এক ঘণ্টা ফেলিয়া, রাখিয়া ঢেঁকিতে কুটিয়া উহা হইতে মণ্ড প্রস্তুত করিয়া পরে ঐ মণ্ড কাপড়ে রাখিয়া পরিষ্কার গামলার জলে নাড়িয়া-চাড়িয়া উহার শ্বেত-সার ভাগটি বাহির করিয়া লইতে হয়। ভুট্টার মণ্ড হইতে ঠিক্ যেরূপ ভাবে শ্বেত-সার বা পালো বাহির করিতে হয়, সিমুল-আলুর মণ্ড হইতেও সেই ভাবেই শ্বেত-সার বা এরারুট্ বাহির করিতে পারা যায়। সিটেটা গরুকে খাইতে না দিয়া, শুকাইবার পরে, উহা যাতায় পিষিয়া, চালুনী দ্বারা ছাঁকিয়া উহা হইতে ময়দা

প্রস্তুত করা যায়। সিমুল-আলুর পালো বিলাতে "এরারুট্" বলিয়া ব্যবহার হয়। সিমুল-আলুর ময়দা গমের ময়দার সহিত মিলাইয়া ব্যবহার করা উচিত।

চুবড়ি-আলু—বঙ্গ-দেশে যে চুবড়ি আলু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, উহা খাইতে সুস্বাদু নহে ; কিন্তু চুবড়ি-আলু জাতীয় কয়েক প্রকার মূল বিলাতি আলুর পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। একটী আফ্রিকা দেশীয় চুবড়ি আলু, আর কয়েক প্রকার দেশী চুবড়ি আলুও খাইতে উত্তম।

আফ্রিকা দেশীয় চুবড়ি-আলু বা কাফ্রি আলু শিবপুর কৃষি-পরীক্ষা ক্ষেত্রে কয়েক বৎসর ধরিয়া জন্মান হইয়াছিল ; ওটাইটী-আলু আলিপুর জেলে, শিবপুর কৃষি-পরীক্ষা ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য স্থানে উত্তম জন্মিতেছিল। এই সকল জাতীয় চুবড়ি-আলু বৈশাখ মাসে ক্ষেত্রে লাগাইয়া, জল নির্গমনের পথ করিয়া দিয়া, পৌষ কিম্বা মাঘ মাসে খুঁড়িয়া উঠাইতে হয়। কাফ্রি-আলু দেখিতে চুবিড়ি আলুর মত হইলেও খাইতে ঠিক্ বিলাতি আলুর ন্যায়।

ওল্—ওল ও সামান্য পরিমাণ বৃষ্টি দ্বারাই জন্মিয়া থাকে। বোল্‌পুর, সাঁতরাগাছির ও গেঁয়োখালির ওলে মুখ লাগে না, এজন্য এই তিনটী স্থানের একটী স্থান হইতে বীজ বা মুখী আহরণ করিয়া আনিয়া, মাঘ-ফাল্গুন মাসে অথবা চৈত্র-বৈশাখ মাসে ইহা লাগাইতে হয়। মাঘ ফাল্গুনে বীজ বা মুখী লাগাইতে পারিলে ভাদ্র মাসেই ওল্ উঠাইতে পারা যায়, এবং চৈত্র বৈশাখ মাসে বীজ লাগাইতে পারিলে পৌষ মাসে ওল্ উঠান চলে।

আফ্রিকার ও দেশীয় চুবড়ি-আলু এবং ওল্ অনেক দিন পর্য্যন্ত রাখিতে পারা যায়, গোল-আলুর ন্যায় পচিয়া যায় না।

জেরুসালেম্ আর্টিচোক্—কি বর্ষাতে কি শীতে, দুই ঋতুতেই এই ফসলটী জন্মাইতে পারা যায় ; অনাবৃষ্টী বা অতিবৃষ্টির দ্বারা ইহার ক্ষতি হয় না, কিন্তু ইহার গোড়ায় জল দাঁড়াইলে চলিবে না। বিলাতি ফসলের মধ্যে এরূপ সুস্বাদ মূল-বৃক্ষ সকল ঋতুর উপযোগী আর কোন ফসল নাই। উত্তমরূপে সার ও চাষ দিয়া, চৈত্র বৈশাখ মাসে ইহার মুখীগুলি দেড় হাত অন্তর লাগাইয়া দিলে, বর্ষাকালে গাছগুলি স্বতেজে বাড়িয়া যায়। আষাঢ় মাসে গাছগুলির গোড়ায় মাটি দিয়া দাঁড়া ও জুলি বাঁধিয়া জল নিষ্ক্রমণের পথ করিয়া দিতে হয়। গাছগুলি শুকাইতে আরম্ভ করিলে উহাদিগকে উৎপাটন করিয়া উহাদিগের গোড়ার মূল বাহির করিয়া লইতে হয়। বড় বড় মূলগুলি আহারের জন্য রাখিয়া, মুখীগুলি অন্য জমিতে পূর্ব্ববর্ণিত প্রথায় পুনরায় লাগাইয়া দিতে হয়। অগ্রহায়ণ মাসে লাগান মুখী হইতে যে গাছ বাহির হইবে উহাকে জলসেচন দ্বারা বাঁচাইয়া বর্দ্ধিত করা আবশ্যক। দুই তিন বার জল সেচন ও একবার গোড়ায় মাটি চাপাইয়া দেওয়া শীতকালের কার্য্য। চৈত্র মাসে গাছগুলি

শুকাইয়া গেলে উহাদের উৎপাটন করিয়া গোড়ার মূলগুলি পুনরায় বাছিয়া পৃথক করিতে হয়। বড় মূলগুলি আহারে জন্য ব্যবহার এবং ছোট মূল বা মুখীগুলি ঐ মাসেই অন্য জমিতে লাগান আবশ্যক। এইরূপ বৎসরে দুইবার করিয়া এই উৎকৃষ্ট তরকারী আহরণ করিতে পারা যায়। জেরুসালেম আর্টিচোকের ডাল্‌না বা অন্য কোন তরকারী প্রস্তুত করিয়া খাইলে মনে হয় এমন উপাদেয় সামগ্রী অতি অল্পই আহার করিয়াছি। এই ফসলটী লাউ, বেগুন বা সীমের ন্যায় দেশময় প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য।

ফাপর বা রাজ-শীষ—ইংরাজীতে এই ফসলটীকে বাক্‌হুইট্ বা হরিণ-গোধুম কহে। ইহার বীজ পেষণ করিয়া যে ময়দা হয় উহা গোধুমের ময়দার ন্যায় ব্যবহার করিতে পারা যায় বলিয়া য়ুরোপে হুইট্ বা গোধুম নামে ইহা পরিচিত। বস্তুতঃ ফাপর গাছ আর গোধুম গাছ সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় গাছ। ফাপর গাছের পাতা ছোট ছোট ও চাকা চাকা, গোধুমের পাতা ঘাসের পাতার ন্যায়। ফাপর গাছ কিছু লতানে হয়, ঠিক্ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে না। ইহার বীজগুলি আকারে কতকটা গমের ন্যায় বটে, কিন্তু মেস্তা বা মেস্তা-পাটের বীজের ন্যায় এ বীজ পল্‌-তোলা বা কোণ-বিশিষ্ট। নিতান্ত নীরস ও প্রস্তরময় ভূমিতে এই ফসলটী জন্মে বলিয়া ছোট নাগপুর অঞ্চলে এবং পর্ব্বতময় ভূভাগে ইহার চাষ করা ভাল। ইহার শাক ও মানুষে খাইয়া থাকে এবং শস্য পাকিয়া গেলে, শুষ্ক ডাঁটা ও পাতা বিচালির পরিবর্ত্তে গোরুকে দেওয়া চলে। ইহার ফসল সমস্ত এককালে পাকিয়া যায় না। বীজ ছড়াইবার দুইমাস পরেই বীজ পাকিতে আরম্ভ হয় এবং চারি মাস পর্য্যন্ত ফসল জমিতে রাখিতে পারা যায়, তবে যখন অধিকাংশ ফল পাকিয়া যায় তখনই অর্থাৎ তিন মাসের মধ্যেই, ফসলটী কাটা উচিত। ইহাতে বীজও অধিক পাওয়া যায় এবং গাছগুলি এই সময়ে কিছু কাঁচা অবস্থায় থাকাতে লতাগুলি কাটিবার পরে যদি বৃষ্টি হয় তাহাতেও কিছু ক্ষতি হয় না, বরং গাছ জমিতে থাকিলে এ সময়ে বৃষ্টিপাত হইলে কাঁচা ফলগুলি পরে ভাল করিয়া পাকিয়া শুষ্ক হয়। পর্ব্বতময় ভূভাগে ইহা চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে লাগান হয়। বঙ্গ-দেশের নিম্ন ভূমিতে ফাপর লাগাইতে হইলে অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে বীজ বপন করাই কর্ত্তব্য। কর্দ্দমময় উর্ব্বর জমিতে এ ফসল ভাল জন্মে না, এবং নীরস প্রস্তরময় ভূভাগ ভিন্ন অন্যত্র এ ফসল লাগাইয়া বিশেষ কিছু লাভ নাই। বিঘাপ্রতি আট দশ সের বীজ বপন করিলে পর্ব্বতময় স্থানে পাঁচ ছয় মণ শস্য উৎপন্ন হয়। চারিসের ফাপরের ছাতু ছয় সের যবের ছাতুর সমান পুষ্টিকর। পক্ষীজাতির পক্ষে ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য। এই শস্য আহার করিলে পক্ষিগণ অধিক পরিমাণে ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে। সাধারণত তিন মাসের মধ্যেই ফসল পাকিয়া যায়, সামান্য বৃষ্টিতেও উত্তম জন্মে, নিকৃষ্ট জমিতে ভাল জন্মে, ফাপরের এই সকল বিশেষ গুণ আছে। দুর্ভিক্ষের সময় নিকৃষ্ট ভূমিতে এই ফসল অধিক পরিমাণে জন্মান কর্ত্তব্য, কেননা দুর্ভিক্ষ থাকিতে থাকিতেই ইহা লাগান ও

উঠান যাইতে পারে। দুইটী প্রধান ফসলের মাঝে এই ফসলটী ফলে বলিয়া ইহাকে বাঙ্গালা দেশের ফুটীর মত একটা বাড়্‌তি ফসল বলা যাইতে পারে।

চীনা-বাদাম—বালুকাময় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরময় জমিতে এই ফসল উত্তম জন্মে। ইহা একবার জমিতে লাগাইয়া দিলে, কোন কোন স্থানে জঙ্গলের মত চিরকালের ন্যায় ঐ জমি অধিকার করিয়া ফলে। বৈশাখে, কার্ত্তিকে এবং ফাল্গুনে, এই তিন মাসে বীজ লাগান চলে। বস্তুতঃ বর্ষায় দুই তিনমাস ভিন্ন যে সময়ে চীনাবাদামের বীজ বপন করা চলিতে পারে। কর্দ্দমময় জমিতে গাছ জঙ্গলের মত স্বতেজে বাড়িয়া যায় বটে, কিন্তু ফলের পরিমাণ নিতান্ত কম হয়।

গোরুর আহারের জন্য চীনাবাদামের গাছ যে সে জমিতে লাগান যাইতে পারে, কিন্তু ফলের জন্য লাগাইতে হইলে বালুকাময় দোয়াঁস জমিই নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। ফলগুলি মাটির মধ্যে আলু যেরূপ ভাবে জন্মে ঐরূপে জন্মে। কর্ষিত ভূমিতে বিঘাপ্রতি সাত সের বীজ অর্দ্ধ হাত অন্তর এক একটী দাদা করিয়া লাগাইয়া দেওয়া উচিত। গাছগুলি অর্দ্ধ হাত উচ্চ হইয়া গেলে ভূট্টার গাছের গোড়ায় যেমন কোদাল দিয়া মাটি চাপাইয়া দিবার নিয়ম আছে চীনাবাদামের জন্য এইরূপ পাইট আবশ্যক। পলিপড়া ভূমিতে বিঘাপ্রতি ১০।১২ মণ ফল উৎপন্ন হয়। চীনাবামের জল সেচন আবশ্যক করে না। ফল উঠাইয়া লইবার পরে আপনা হইতেই জমি আবার গাছে পূর্ণ হইয়া যায়। তবে ক্রমাগত একই জমিতে এক ফসল অনেককাল ধরিয়া রাখা ভাল নহে। দুই তিন বৎসর অন্তর জমি পরিবর্ত্তন করিয়া চীনাবাদাম লাগান উচিত। চীনাবাদামের ছাড়ান ফলের ওজনের শতকরা চল্লিশ ভাগ তৈল পাওয়া যায়। এই তৈল অতি সুস্বাদু এবং রন্ধন কার্য্যে অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে ইহা ঘৃতের পরিবর্ত্তে ও ঘৃতের সহিত ব্যবহার হইতেছে। সাবান প্রস্তুতের জন্যও ইহা আবশ্যক হয়। তৈল বাহির করিয়া লইয়া যে খৈলভাগ অবশিষ্ট থাকে উহা গোরুর ও মানুষের খাদ্য। যেমন তিলের খোলভাগ হইতে তিলকুটো সন্দেশ প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেইরূপ চীনাবাদামের খোলভাগ হইতে অতি উপাদেয় নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া থাকে। অধিক তৈল থাকিবার কারণ চীনাবাদাম খাইলে উদারময় পীড়া হইয়া থাকে, কিন্তু তৈলভাগ বাহির করিয়া দিয়া যে খোলভাগ অবশিষ্ট থাকে উহা রন্ধন করিয়া খাইলে কোন পীড়া হয় না। বস্তুতঃ চীনাবাদামের খোল অতি পুষ্টিকর খাদ্য এবং মান্দ্রাজ-প্রদেশে যখন ইহা মানুষের উপাদেয় খাদ্য বলিয়া প্রচলিত আছে, তখন বঙ্গদেশেও চেষ্টা করিলে এ খাদ্য বড়ির পরিবর্ত্তে প্রচলিত হইয়া যাইতে পারে। চীনাবাদাম ও চীনাবাদামের তৈল ফরাসি দেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইয়া থাকে।

একে নির্ভর ভাল নহে—অনাবৃষ্টি বশতঃ দেশের সকল ফসলই যে নষ্ট

হইয়া যায় এরূপ নহে। আমন ধান্য এককালীন মারা গেলেও আশু ধান্য অল্প বিস্তর জন্মিয়া থাকে। সকল প্রকার আশু-ধান্য নিকৃষ্ট ধান্য নহে। শিবপুর কৃষি পরীক্ষাক্ষেত্রে পঞ্জাব প্রদেশ হইতে আনীত সোয়াতি ধান্য এবং মধ্য প্রদেশ হইতে আনীত নাগপুরী ধান্য চাষ করা হইয়াছিল, ইহা হইতে অতি সুখাদ্য চাউল উৎপন্ন হয়, অথচ এই দুই জাতীয় ধান্য তিন মাসের মধ্যেই পাকিয়া যায়। এই দুইটি ধানের বীজ এখন পাওয়া যায় না এবং বাঙালায় ইহার চাষ সুবিধা মত হয় নাই। এখন কটকতারা ও অন্য ভাল আশুধান্য চাষ হইতেছে। যদি ভাদ্র মাসেই বর্ষা শেষ হইয়া যায়, তাহা হইলেও আশু জাতীয় ধান্যের কিছুই ক্ষতি হয় না। আশু জাতীয় ধান্যের দোকাট বীজ হইতে অধিকতর অনাবৃষ্টিসহ ও প্রচুরতর ফলোৎপাদক গাছ জন্মে। উপরি উক্ত কয়েকটী ফসল ভিন্ন আরও অনেকগুলির নাম করিতে পারা যায়, সেগুলি অল্প পরিমাণ বৃষ্টিপাত দ্বারাও উত্তম জন্মিয়া থাকে। এই সকল ফসলের উপর দরিদ্র ব্যক্তিগণ দুর্ভিক্ষের সময় সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সাদা ও রাঙ্গা আলু, ডুমুর, ফুটি ও কাঁকুড়, পটল, সাজনা, অড়হর, কলাই, চীনা, বাজরা, ইত্যাদি। কোন্ বৎসর অল্প বৃষ্টি হইবে কে বলিতে পারে? প্রত্যেক বৎসরেই কৃষকদের কর্ত্তব্য, উক্ত অনাবৃষ্টিসহ ফসলগুলির মধ্যে কয়েকটি জন্মান। কেবল আমন ধান্যের উপর নির্ভর করিলে পাছে কৃষক সমূলে নিধন প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্যই এই উপদেশ দেওয়া যাইতেছে। গাছের নিম্নে জল দাঁড়াইলে ধান ভিন্ন প্রায় সকল গাছেরই ক্ষতি হইয়া থাকে বটে, কিন্তু গাছের নিম্নে যাহাতে জল না দাঁড়ায় তাহার উপায়ও করা যাইতে পারে। একটি উপায়, জমিকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করিয়া চারিদিকে দাঁড়া বাঁধিয়া দিয়া দাঁড়ার উপর বীজ বা কলম লাগান যাইতে পারে। দাঁড়ার নিম্নে অর্থাৎ জুলির মধ্যে জল দাঁড়াইলেও দাঁড়ার উপরিস্থ গাছের ক্ষতি হয় না। জমিতে দাঁড়া বাঁধিয়া লইতে পারিলে বর্ষাকালেও কলাই, বরবটী, চীনারবাদাম, ইত্যাদি ফসলের বীজ বপন করা যাইতে পারে।

মেস্তা পাট মেস্তা-পাট নামক এক জাতীয় পাট জন্মাইতেও অতি সামান্য পরিমাণ বৃষ্টিপাতের আবশ্যক করে। যে সকল স্থানে বৎসরে ৫০।৬০ ইঞ্চির কম বৃষ্টি হইয়া থাকে ঐ সকল স্থানে এই জাতীয় পাটের প্রচলন দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। এই পাট সাধারণ পাট অপেক্ষা কিছু অধিক মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। পাটেরই ন্যায় এই গাছ জন্মাইতে হয়, কেবল বিঘা প্রতি এক সের বীজ ব্যবহার না করিয়া মেস্তা-পাট লাগাইতে হইলে বিঘা প্রতি পাঁচ সের বীজ ছিটাইতে হয়। আর আর পাইট সমস্ত ঠিক পাটের ন্যায়। মেস্তা-পাটের জমিতে আদৌ জল দাঁড়াইতে দেওয়া উচিত নহে।

অনাবৃষ্টি-সহ খাদ্য—বৃক্ষ ভিন্ন আরও কয়েক জাতীয় উদ্ভিদ্ সামান্য বৃষ্টি দ্বারাই পরিপুষ্ট হয়। ধান ও পাট জন্মাইতে গেলে সাধারণত অধিক বৃষ্টির আবশ্যক।

কিন্তু সকল প্রকার ধান ও সকল প্রকার পাঠ জন্মাইতে সমান পরিমাণে বৃষ্টির আবশ্যকতা নাই। আশু-ধান্য অল্প পরিমাণে বৃষ্টিতে এবং উচ্চ জমিতে জন্মিয়া থাকে। অধিককাল বর্ষা ভোগ করিতে ইহারা চায় না। শ্রাবণের শেষে, ভাদ্রের প্রথমে ইহারা পাকিয়া উঠে। কিন্তু ইহা নিকৃষ্ট ধান্য। ভাল আশু ধান্যও আছে এবং ইহাদের আরও উন্নতি হইতে পারে কিন্তু ফলন আমন অপেক্ষা কম। কিরূপ উপায়ে দোকাটের বীজ বপন করিয়া আশু ধান্যের ফলন বৃদ্ধি করিতে পারা যায় তাহা জানা উচিত। নিম্ন ও উচ্চ উভয় প্রকার ভূমিতেই আশু ধান্য জন্মাইতে পারা যায়। বঙ্গ দেশে এই জাতীয় ধান্যের চাষ প্রচলন করিতে পারিলে দেশের সমূহ উন্নতি হওয়া সম্ভব। দো-কাটের বীজ হইতে অধিক অনাবৃষ্টি-সহ গাছ জন্মে, ইহা দেখা গিয়াছে।

দোকাটের বীজ ধান্য এই কথাটা একটু বুঝাইয়া বলা আবশ্যক। সকলেই জানে যে আশু ধান্য বোনা হয়—বীজ ধান রোপণ করিয়া ইহার চাষ ক্বচিৎ কখন হইয়া থাকে। দোকাটের বীজ-আউস ধানের জন্য অপেক্ষাকৃত নামাল জমিতে আশু ধান্য রোপিয়া আবাদ করিতে হয়। ধান পাকিলে ধানের গোড়া কিঞ্চিৎ রাখিয়া কাটিতে হইবে। এই হইল প্রথম কাটের ধান। ধান কাটার পর ঐ জমিতে পাতলা ভাবে চাষ দিতে হইবে এবং কিছু সারও ছড়াইতে হইবে। ক্ষেত্রের ঐ সকল ধান্য গুচ্ছ হইতে তেউড় গজাইয়া আবার ধান ফলিবে। এই ফলন খুব কম হয় কিন্তু এই প্রকার চাষে যে বীজ পাওয়া যায় তাহা বিশেষ গুণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল ক্ষেতে জল থাকিবার আবশ্যক নাই কিন্তু জমিটি সরস থাকা চাই এই কারণে একটু নামাল জমির আবশ্যক।

ইক্ষুচাষের সার

ইক্ষু প্রচুর পরিমাণে সারভাগ গ্রহণ করিয়া ভূমিকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, এজন্য সার প্রয়োগ আবশ্যক কিন্তু সার অধিক দিলেই যে গুড় বা চিনি অধিক জন্মিবে এরূপ কোন কথা নাই; তবে সার প্রয়োগে গাছ সতেজ হয় ও মাতিয়া উঠে, ইক্ষুদণ্ডের সংখ্যাও বর্দ্ধিত হয় এজন্য গুড়ের পরিমাণ অধিক হয়; যাহা হউক ইক্ষুক্ষেত্রে পরিমিত সার প্রয়োগ করাই নিয়ম, অতিরিক্ত প্রয়োগ বৃথা অর্থব্যয় মাত্র। দেশের কোন জিলাতে বিনা সারেও ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে; যদি বিনা সারে বিঘাপ্রতি ১৫ মণ গুড় পাওয়া যায়, তবে ৫৲ টাকা সারের জন্য ব্যয় করিয়া ২৫ মণ গুড় পাইবার জন্য সার খরচ না করা মূর্খতা। বিঘাপ্রতি ক্ষার (ছাই) ৫।৭মণ ও গো মহিষাদির বিষ্ঠা ৭০।৮০মণ বা অশ্ববিষ্ঠা ৭০মণ বা রেড়ী ও সর্ষপখৈল ৮।১০মণ বা অস্থিচূর্ণ

৫ মণ বা সোরা ৩।৪মণ বা নীলের সিটী ৪০মণ বা পচা মৎস্য ১০মণ বা তুলাবীজ চূর্ণ ১৫মণ প্রয়োগ করিলে সুন্দর ইক্ষু জন্মে। ইক্ষুতে যেরূপ পরিমাণ নাইট্রোজেন (Nitrogen) প্রয়োজন হয় বায়ু ও ক্ষারেরও সেইরূপ আবশ্যক হইয়া থাকে; বিঘাপ্রতি ১০ পাঃ নাইট্রোজেন দিবারই নিয়ম, কিন্তু ইহার অধিকাংশ বিগলিত অবস্থায় বর্ষার জলের সহিত বাহিত হইয়া বা ভূমির নিম্নে চলিয়া যাওয়ায়, মূলকর্তৃক আকর্ষিত না হইবার জন্য গাছের বৃদ্ধির সহায়তা করে না এজন্য দ্বিগুণ পরিমাণে ইহার প্রয়োগ আবশ্যক। মৃত্তিকা জমিয়া কঠিন হইলে মূলে বায়ুসঞ্চার রোধ বশতঃও গাছের বৃদ্ধি হয় না। ইক্ষুর চাষে গো, মেষ, মহিষাদির বিশেষ সুলভ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার, কারণ ইহাতে প্রচুর পরিমাণ ইক্ষুর প্রাণধারণ ও বর্দ্ধনোপযোগী নাইট্রোজেন বিদ্যমান আছে; ইহাদের প্রয়োগে ভূমি শিথিল ও বায়ু প্রবেশশীল হইয়া উঠে, সুতরাং ভূমির অবিগলিত কঠিন পদার্থ সকল দ্রবীভূত ও বৃক্ষমূল দ্বারা আকর্ষিত হইয়া তাহার বর্দ্ধনের সহায়তা করে। গোময়াদি পশুবিষ্ঠা ও বৃক্ষপত্রাদি অর্দ্ধবিগলিত (আধপচা) অবস্থায় প্রয়োগ করিলে সারভাগ পচিয়া গাছের উপযোগী হইতে বিলম্ব লাগে সুতরাং সারগত নাইট্রোজেন Nitrogen) ভূমির নিম্নে বা অপর কোনদিক দিয়া বহিয়া যাইতে সহজে পারে না, ধীরে ধীরে গাছ সমস্ত অংশ গ্রহণ করে। পটাস সারের জন্য আপাং, তিলডাঁটা, কলাবাসনা, কুমড়াডাঁটা নারিকেল বা অপর কোন লতাপত্রভস্মাদি বিঘাপ্রতি ৫।৭মণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে; ক্ষার প্রয়োগেও ভূমি শিথিল ও বায়ু প্রবেশীল হইয়া উঠে অধিকন্তু ভূমি ও সারের অদ্রবনীয় পদার্থ সকল বিগলিত হইয়া গাছের সদ্য ব্যবহারোপযোগী হয় এবং কীটাদির উপদ্রবের অল্পতা ঘটে। উদ্ভিজ্জ সারের মধ্যে নীলের সিটী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সকল স্থানে ইহা পাওয়া যায় না, কিন্তু যথায় পাইবার সুবিধা আছে তথায় ইহা শুদ্ধ বা গোময়াদির সহিত আধাআধীভাবে প্রয়োগ করিলে সুন্দর ফসল জন্মিয়া থাকে। ইহাদিগের ন্যায় ইক্ষুর উপযোগী ব্যয়স্বল্প উৎকৃষ্ট সার দেখা যায় না। গোমহিষাদির বিষ্ঠা ৬ হইতে ৯ মাসের মধ্যে পচিয়া সার হয় কিন্তু অশ্ববিষ্ঠা দেড়বৎসরের পুরাতন না হইলে প্রয়োগ করা চলে না; ইহা অপেক্ষা অল্পদিনের হইলে সারের তেজে গাছ ঝান খাইয়া যাইতে পারে। জাপানে ও আমেরিকায় এবং অন্য দেশের কোথাও কোথাও বিঘাপ্রতি ২০০ শত মণ হিসাবে নরবিষ্ঠা ইক্ষুর সাররূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে কিন্তু ইহা প্রয়োগে না না আপত্তি উঠে এবং গবাদি পশুবিষ্ঠা ইহা অপেক্ষা গুণে কম উপকারী ও কম স্বাদবর্দ্ধক নহে। সুতরাং গোয়ালের সার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাইলেন ইহা না ব্যবহার করাই ভাল। খৈল, সোরা, অস্থিচূর্ণ, পচামৎস্য প্রভৃতি ইক্ষুর উপযুক্ত সার হইলেও ব্যয়াধিক্য আছে; এগুলি উপরোক্ত সারগুলির সহিত আধাআধী পরিমাণে মিশাইয়া ব্যবহার করিলে ব্যয় অল্প পড়ে। রেড়ি ও সরিষার খৈল ইক্ষু মাত্রেরই উপকারক। রেড়ির খৈলে শ্যামসাড়া

ইক্ষুর সুন্দর ফলন হইয়া থাকে, বিশেষতঃ খৈল প্রয়োগে গাছের শিকড়ের সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায় গাছ অত্যন্ত বলবান হয় ও ঝাড় বাঁধে এবং ঝড়ে বা বাতাসে সহজে পড়িয়া যায় না। সূক্ষ্ম চূর্ণিত সোরা বর্ষার শেষ বরাবর গাছের গোড়ায় দিতে পারিলে ভাল হয়; ভূমি শুষ্ক থাকিলে সোরা দেওয়া পর জলসেচন করিতে হইবে, নচেৎ সোরা শীঘ্র উদ্ভিদের আহারোপযোগী হয় না। অস্থি স্থূল ও সূক্ষ্মচূর্ণ ভেদে দুইপ্রকারে ব্যবহৃত হইতে পারে; বরিসাস প্রভৃতি স্থানে অস্থিচূর্ণই (bone dust) ব্যবহার হয়। শীঘ্রই উহা বৃক্ষোপযোগী আহারে পরিণত হয়, কিন্তু স্থূল অস্থিচূর্ণ ইহা (bone meal) বিলম্বে কার্য্যসাধক এজন্য চাষের সময় হইতেই ভূমিতে ছিটাইয়া চাষ করিতে হইবে।

ইক্ষুর মূল ভূমির অধিক নিম্নে যায় না এজন্য মূলের নিকটবর্ত্তী স্থানে সার প্রয়োগ করিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে সর্ব্বতোভাবেই সারের সার্থকতা হইতে পারে। সার, অস্থিচূর্ণ প্রভৃতি সার মূল্যবান; গবাদি পশুবিষ্ঠা ও উদ্ভিজ্জসার অর্দ্ধ পরিমাণে দিয়া ভূমি প্রস্তুত হইলে গাছ রোপণের পর পাইট করিবার সময় অর্দ্ধ পরিমাণ খৈল, অস্থিচূর্ণ প্রভৃতি দুইবারে অল্প পরিমাণে গাছের গোড়ায় দেওয়া যায়, তাহা হইলে সারে অল্প খরচ পড়ে অথচ ইক্ষু সতেজ বর্দ্ধিত হইয়া পুরা ফসল প্রদান করে। সারের মধ্যে সোরা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান সুতরাং ইহার প্রচলন নাই বলিলেই হয়; ২।৩মণ সোরা ও ৮।১০ মণ রেড়ির খৈল একত্র মিশাইয়া আশ্বিন মাসে একবারে গাছের গোড়ায় দিতে পারিলে ফলন ভাল হইয়া থাকে। সোরা একক অপেক্ষা অন্য সারের সহিত মিশ্রিত প্রয়োগে অধিক ফল দর্শে। অস্থিচূর্ণ প্রয়োগে ভূমির ক্ষয়িত ফস্ফরাস, চুণ, ক্ষার প্রভৃতি পদার্থের পূরণ হইয়া থাকে। বর্দ্ধমান পরীক্ষাক্ষেত্রে একরপ্রতি ৭০মণ গোবর ও ৩০মণ খৈল এই উভয়সার প্রয়োগ করিয়া ৩০ মণেরও অধিক গুড় উৎপন্ন হইয়াছিল। এই সকল সারের মধ্যে খৈল ও গোময়াদি পশুবিষ্ঠা বা খৈল, গোময় ও অস্থিচূর্ণ কিম্বা তুলাবীজ, সোরা ও অস্থিচূর্ণ একত্র প্রয়োগে ইক্ষু সুন্দর জন্মিয়া থাকে।

ইক্ষুক্ষেত্রে যত পরিমাণ সার দিতে হইবে তাহার তিন ভাগের দুইভাগ হলকর্ষণকালে এবং অবশিষ্ট ভাগ বপনকাল হইতে. বর্ষার পূর্ব্বে যতদিন না গাছ বিশেষ তেজ করে ততদিনে ৩।৪ বারে সামান্য পরিমাণে প্রতিবার নিড়াইবার সময় গাছের গোড়ায় মৃত্তিকার সহিত উত্তমরূপ মিশাইয়া দিতে পারিলে ফসল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎপন্ন হয়; ইহার পর বর্ষায় গাছ জোর করিতে থাকিলে আর সার দিবার আবশ্যক হয় না, বিশেষতঃ এ সময় শিকড় নাড়াচাড়ায় গাছের হানি হইতে দেখা যায়। কেহ বা আশ্বিন, কার্ত্তিকে গাছের গোড়ায় মাটী আলগা করিয়া দিয়া বিঘাপ্রতি ৫।৭ মণ রেড়ি বা সরিষার খৈল দিয়া থাকে, ইহাতে রসের গাঢ়ত্ব হয় ও দানাদার চিনি জন্মিয়া থাকে। পচা গোমূত্র সঞ্চিত থাকিলে জল মিশাইয়া এ সময় গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করিলে গাছের বিশেষ বৃদ্ধি হয়, কারণ গোমূত্রে প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজন

বিদ্যমান আছে। গোময়াদি পশুবিষ্ঠা এবং ধঞ্চে ভূরা প্রভৃতি কাঁচা উদ্ভিজ্জ সার একত্র ক্ষেত্রে দিলে ইক্ষুর আবশ্যকীয় নাইট্রোজেন ত প্রযুক্ত হয়ই, তদ্ব্যতীত ভূমি এরূপ শিথিলভাবাপন্ন ও বায়ুপ্রবেশশীল হয় যে, অন্য সার দ্বারা সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই, অধিকন্তু ভূমি শুষ্ক ও উচ্চদোয়াঁশ হইলে জল ধারণাশক্তি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। ধঞ্চে ভূমিকে সর্ব্বাপেক্ষা সারবতী করিয়া তুলে কারণ শিম্বীজাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে ধঞ্চেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ নাইট্রোজন সার সঞ্চয়কারী; ইক্ষুর চাষে নাইট্রোজন সার অত্যাবশ্যক, এজন্য ক্ষেত্রে ধঞ্চে জন্মাইয়া পশ্চাৎ ইক্ষুর চাষ করিলে অনেক সময়ে বিনাসারেই ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। শন ও অরহরও ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করে কিন্তু ধঞ্চের মত নহে।

ইক্ষু চাষে কীট ও রোগ নিবারক ঔষধ

ইক্ষু অত্যন্ত রোগপ্রবণ, তদ্ব্যতীত ক্ষেত্রে উই ও নানাবিধ কীটাদির উপদ্রব আছে, শৃগালাদির ত কথাই নাই; নির্দ্দোষ ইক্ষুবীজ রোপণ করিলেও সময়ে সময়ে দেখা যায় যে ক্ষেত্রটী কীট, উই বা পিপীলিকাক্রান্ত হয় ও নষ্ট হইয়া যায়। নীরস ভূমিতে বিশেষতঃ গাছের কল বাহির হইবার সময় উইয়ের ভয় অধিক হয়, গাছ সতেজ ও সবল অবস্থায় থাকিলে সহসা রোগাক্রান্ত হয়। চৈত্র, বৈশাখ মাসে ক্ষেত্রটি গভীররূপে ৫।৬বার লাঙ্গলদ্বারা কর্ষণ করিয়া মৃত্তিকা বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে পারিলে উই বা পিপীলিকা সমূহ মরিয়া যায় বা অন্যত্র পলায়ন করে। বপনের প্রাক্কালে নিম্নলিত ঔষধগুলিতে ইক্ষুখণ্ড ডুবাইয়া রোপণ করিলে কীট ও রোগ অনেক অনেক সময় নিবারিত হইয়া থাকে।

১। লবণ /৪সের হেঙ্গড়া (স্বল্প মূল্য হিং) আধপোয়া এবং সূক্ষ্মচূর্ণ সেঁকোবিষ ২॥ তোলা এবং আবশ্যক মত জল।

২। হেঙ্গড়া আধপোয়া, সরিষার খৈল /৮সের, পচা মৎস্য /৪সের, বচ বা আকন্দমূলচূর্ণ /২সের সমস্ত একত্রে আবশ্যকমত জলে মিশাইয়া লেয়ের মত তরল করিয়া অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে ইক্ষুদণ্ড ডুবাইয়া পরে রোপণ করিতে হইবে।

৩। শাখা পত্রাদি সহিত বাসক (বাকস) পত্র সিদ্ধ করতঃ তাহাতে সরিষার খৈল মিশাইয়া পূর্ব্ববৎ ব্যবহার্য্য।

৪। সেঁকোবিষচূর্ণ ১ তোলা, খানিকটা ময়দা ও গুড় একত্র মিশাইয়া বড় বড় গুলি পাকাইয়া নারিকেল মুচিতে ভরিয়া ক্ষেত্রমধ্যে দিলে গুড়ের গন্ধে আকৃষ্ট কীটাদি তাহা খাইয়া মরিয়া যায়; উই ও পিপীলিকা নিবারণের ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়

৫। ঘোল, হেঙ্গড়ী এবং অধিক পরিমাণ সরিষার খৈল একত্র জল মিশাইয়া ঘন লেহবৎ করতঃ ইক্ষুদণ্ড ডুবাইয়া রোপণ করিলে উই নিবারিত হয়; মধ্য ভারতবর্ষে এখনও এই আদিম উপায় প্রচলিত আছে।

৬। তুঁতিয়া ।/।০ পোয়া, হিং ২॥ তোলা, সূক্ষ্ম সেঁকোবিষ চূর্ণ ।৵ আধপোয়া, মুসব্বর ।/।০ পোয়া, ঝুল ।/১সের, ছাই ।/২সের, চুণ ।/॥০ আধসের, চূর্ণ সরিষার খৈল ১।/॥ দেড়মণ ও জল ২।/মণ একত্র মিশ্রিত আরকে ইক্ষুখণ্ড ডুবাইয়া রোপণ করিলে সর্ব্ববিধ কীট নিবারিত হয়; ঐ পরিমাণ আরকে ৪।৫বিঘা ভূমির রোপণ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। খৈল সংযোগবশতঃ ইহা শীঘ্র নষ্ট হয়, অতএব ইহার সত্ত্ব ব্যবহার করা উচিত।

৭। এই মিশ্রণ হইতে সেঁকো বাদ দিয়া ইক্ষুদণ্ডে পোঁচড়া লাগাইলে ধসা পোকা নিবারিত হয়; ধসাপোকা লাগিলে ইক্ষুদণ্ডে পিপীলিকা আশ্রয় করিয়া ফোঁপরা করিয়া ফেলে, এজন্য আক্রান্ত ঝাড়গুলি উঠাইয়া পোড়াইয়া ফেলা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে ইহা আর অন্য ঝাড়ে সংক্রামিত হইতে পারে না; ধসা আক্রান্ত ইক্ষুগুলির বৃদ্ধির হ্রাসের সহিত রসও অল্পপরিমাণে উৎপন্ন হয়। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ধোসাপোকা নিবারণের জন্য ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে অরহরের বেড়া দিবার প্রথা আছে, ইক্ষু রোপণের পূর্ব্বে শণ, ধঞ্চে, কলাই প্রভৃতি শিম্বীজাতীয় উদ্ভিদের চাষ করিলেও এই উদ্দেশ্যে সংসাধিত হইয়া থাকে।

৮। সোডা (Sodæ Bicarb)র জল ইক্ষুদণ্ডে পোঁচড়া লাগাইলে ধসা ও অন্যান্য কীট নিবারিত হয়। 'ফসলের পোকা' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ইক্ষুচারা উৎপাদনে সতর্কতা

বীজের নিমিত্ত রোগগ্রস্ত ইক্ষুদণ্ড কোনরূপেই গ্রহণ করা উচিত নহে; যাহা কোনপ্রকারে কীট ভক্ষিত বা যাহার পত্র শুষ্ক হইয়া উই কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে বা যে ইক্ষুর অভ্যন্তরস্থ মাংসভাগে লালচে দাগ পড়িয়াছে বা যে সকল জাতি সহজেই কীটাক্রান্ত হয়, বীজের নিমিত্ত তাহারা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। যে সকল ইক্ষু অতিশয় পুষ্ট, রসবহুল, দীর্ঘপাব ও গুরুভার, বীজের নিমিত্ত তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। নিম্নলিখিত চারিটী উপায়ে ইক্ষুর চারা প্রস্তুত হইয়া থাকে; আমাদের দেশে কর্ত্তিত অগ্রভাগ রোপণেরই প্রথা দেখা যায়।

১। সরস অথচ ছায়াময় স্থানে আবশ্যকমত দীর্ঘ ও প্রস্থ এবং ১ বা ১॥ হস্ত গভীর গহ্বর কাটিয়া পুরাতন গোবর ও জল মিশাইয়া ঘন কর্দ্দমের মত করিয়া ইক্ষুর অগ্রভাগগুলি তাহাতে অর্দ্ধশায়িতভাবে বসাইয়া উপরে লতাপাতা বা বিচালি বা চাটাই দিয়া আবৃত করিতে লইবে; এই উপায়ে ১৫।২০ দিনের মধ্যে প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে

কল ও নূতন শিকড় বাহির হইয়া থাকে, এই অবস্থায় উঠাইয়া ক্ষেত্রে রোপণ করাই নিয়ম।

২। অগ্রভাগ ব্যতীত সমগ্র ইক্ষুদণ্ড হইতেও চারা প্রস্তুত হইতে পারে; যাহাতে কল (bud) গুলি কোন রূপে নষ্ট না হয় এবং মধ্যে ৩।৪টী কলযুক্ত গ্রন্থি থাকে, এরূপভাবে ইক্ষুদণ্ড গুলি ১ফুট আন্দাজ দীর্ঘে খণ্ড খণ্ড কাটিতে হইবে; পরে দীর্ঘে প্রস্থে তিনহস্ত ও দুইহস্ত গভীর একটী গহ্বর কাটিয়া নিম্নে ভিজা বড় ও ছাই একস্তর বিছাইয়া তদুপরি কর্ত্তিত খণ্ডগুলি ঘনভাবে পাতিয়া উপরে আবার ভিজাখড় ও ছাই চাপা দিতে হইবে; যতক্ষণ না গহ্বরটী পূর্ণ হয় এইরূপে উপর্য্যুপরি সাজাইয়া সর্ব্বোপরি ঘন খড় দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। এই উপায়ে ১০।২০ দিবসের মধ্যে ইক্ষুর নূতন কল ও শিকড় বাহির হইয়া ক্ষেত্রে রোপণোপযোগী হইয়া উঠে। ইক্ষুর গ্রন্থি হইতে কল ও শিকড় বাহির হইলেই অবিলম্বে ক্ষেত্রে রোপণ করা কর্ত্তব্য।

৩। ইক্ষুদণ্ড একহস্ত প্রমাণ দীর্ঘে খণ্ড খণ্ড কাটিয়া একেবারেই ভূমিতে রোপিত হইতে পারে; এরূপভাবে রোপিত হইবার পূর্ব্বে সমস্ত ক্ষেত্রটী একবার সেচ দিয়া উত্তমরূপ ভিজাইয়া লইয়া ইক্ষুখণ্ড মৃত্তিকার ভিতর ৩।৪ ইঞ্চ গভীর বসান কর্ত্তব্য, নতুবা সকল গ্রন্থি হইতে কল বাহির হয় না।

৪। মরিসাস, জামেকা প্রভৃতি স্থানে ইক্ষুর বীজ হইতেও গাছ উৎপন্ন করিয়া চাষ হইয়া থাকে; অনেকের মতে বীজোৎপন্ন চারা রোগশূন্য হয়; ইক্ষু বীজ অনেকটা যবগোধুমের আকৃতিবিশিষ্ট, কোন জাতীয় বীজ ছোট কোনটী বা বড়। ভারতবর্ষে বীজোৎপন্ন ইক্ষুর চাষ প্রায় দেখা যায় না। যুক্তপ্রদেশের কোথাও কোথাও বীজ হইতে ইক্ষুর চাষ হইতেছে এরূপ শুনা যায়।

৫। ইক্ষু দণ্ডগুলি সমতলভাবে মাটিতে পাতা ও গোময়পচা ক্ষতমাটি প্রচুর ব্যবহার করা ও উত্তমরূপে প্রোথিত করিয়া চারা উৎপন্ন করাই ভাল। ইহাতে চারাগুলি ঋজু ভাবাপন্ন হয় এবং সরলভাবে তাহাদের শিকড় মাটিতে প্রবেশ করে। ক্ষেতে চারা বাহির করিতে গেলে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া আবশ্যক।

সামান্য জিনিষের অপব্যবহার

সকলেই শুনিয়াছেন ব্যবসায়ী পিপিলীকাও গুড় খাইলে পিপিলীকাটী পিষিয়া গুড় বাহির করিয়া লয়। এদেশে এই কথাটী কথায় চলিয়া আসিতেছে, কাজে বড় কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না—কাজে হয় বিলাতে। তুলা বীজের আমরা কি ব্যবহার করিতাম উহা যথা তথায় পড়িয়া পচিয়া দুর্গন্ধ ছড়াইত না কি? সার রূপেও উহার ব্যবহার ছিল না। কিন্তু এমেরিকাবাসীরা ঐ বীজ

হইতে তৈল বাহির করিতে ও ঐ বীজ গবাদিকে খাওয়াইতে শিখাইয়াছে। কলা গাছের কলা এবং আবশ্যক মত কলা পাতাই আমরা ব্যবহার করিতাম, এখন বিদেশীয়েরা সেই কলার খোলাটী ও থোড়টী লইয়া সূতা মোম প্রভৃতি কি না করিতেছেন। নারিকেলের ছোবড়া হইতে আঁশ বাহির করিয়া লইবার সময় যে গুড়াগুলি ঝরিয়া পড়ে তাহার কি ব্যবহার করি। তাহা কি সাররূপে ব্যবহার করা চলে না? না তাহা জমাইয়া পিচবোর্ডের মত কোন কাগজ হয় না কি? বিলাতে সবই হয় এখানে কিছুই হয় না—সেখানে সামান্য চুরুটের পরিত্যক্ত ভাগ রাস্তা হইতে সংগ্রহ করিয়া ব্যবসা চলে এখানে এদেশের লোকের কাছে মণি কাঞ্চনেরও যথোপযুক্ত আদর নাই। বিলাতে চাষিরা কিরূপে জমি সদ্ব্যবহার করে দেখুন—তাহারা পয়োনালার ধারে ধারে দু এক প্রকার শস্য লাগায়। তাহারা দেখিয়াছে যে জমির হইতে সার কিয়ৎ পরিমাণে ধৌত হইয়া পয়োনালার ধারে সঞ্চিত হয়. সুতরাং সে স্থান গুলি বড়ই উর্ব্বর, অতএব এই উর্ব্বরা ভূমিভাগ বৃথা পড়িয়া থাকে কেন? আমরা দেখিতে পাই না কি যে পগারের ধারে দু একটী গাছ কেমন সতেজ জন্মায়? আমরা দেখি এবং ভাবে বিভোর হইয়া ভগবানের গুণকীর্ত্তন করি। বিলাতে লোক দেখেন, দেখিয়া বৈজ্ঞানিক তথ্য নির্দ্ধারণ করেন এবং জ্ঞানটী কার্য্যোপযোগী করিয়া লন। বিলাতের লোকে যেন সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত—তিনি হারেন কি তাহারা হারে এই ভাবে কাজ করিতেছে। আমরা ভাবের গুরুতায় নিস্পন্দ নিশ্চেষ্ট। তখন আমাদের দেশে খাদ্য বস্তু প্রচুর ছিল এখন ক্রমেই তাহার অভাব হইয়া উঠিতেছে। আহার না মিলিলে ভাব আসে কোথা হইতে তাহাই এখন চক্ষু চাহিয়া কাজ করিবার সময় আসিয়া পড়িয়াছে। এখন সে কথা যাউক পগারের ধারে ধারে কি ফসল করা যায় তাহাই একবার ভাবিয়া দেখা যাউক। পগারের ধারে ধারে সরিষা বুনিলে মন্দ হয় না, কারণ সরিষার জমি বিশেষ সারবান হওয়া আবশ্যক। এই প্রকার পয়োনালার ধারে ফরাসী বুসবীন, বিলাতী মটর যাহাদের ছোট ছোট গাছ হয়, এমেরিকান বুলনোজ লঙ্কা প্রভৃতি ছোট খাট গাছগুলি সুন্দররূপে জন্মান যাইতে পারে।

জাপানী চন্দ্রমল্লিকা

জাপানে চন্দ্রমল্লিকা (Chrysnthemums)।—জাপানবাসীরা সৌখিন জাতি। তাঁহাদের বাগান নানাপ্রকার ফুলগাছে সর্ব্বদা সজ্জিত থাকে। জাপানের মিকাডো উদ্যানে অতি আশ্চর্য্য রকমের চন্দ্রমল্লিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার চন্দ্রমল্লিকার গাছ প্রায় এক একটী বৃক্ষের ন্যায় হয়। গাছটী সোজা হইয়া উঠে এবং গাছের কাণ্ড সম অন্তরালে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া শাখা প্রশাখা বাহির হয়। গাছটীর শোভা অতুলনীয়। তাহার উপর আবার প্রত্যেক শাখায় যখন এক একটী ফুল ধরে সে শোভা দেখিলে প্রাণ মন মোহিত হয়। ফুলগুলি সম্যক প্রস্ফুটিত হইয়া অবিকৃত অবস্থায় অধিক দিন থাকে। বিলাতি চন্দ্রমল্লিকা তুলিলে শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় কিন্তু জাপানি চন্দ্রমল্লিকা তদবস্থায়ও শীঘ্র নষ্ট হইতে চায় না। জাপান-বাসীরা যে এই চন্দ্রমল্লিকার জন্য অসাধারণ যত্ন ও চেষ্টা করিয়া থাকেন তাহা বলিয়া বোধ হয় না অন্যান্য গাছের যে প্রকার যত্ন করেন ইহারও তদ্রুপ। বিলাতে অসাধারণ ও অত্যাশ্চর্য্য রকম ফুল ফোটাইবার জন্য নানাপ্রকার গাছঘর আছে তাহা কাচনির্ম্মিত, তাহাতে ইথার, ক্লোরাফরম্ (Ether, chloroform) প্রভৃতি কত কি প্রয়োগ করা

হয়, নানাপ্রকারে বায়ুর উত্তাপে হ্রাস বৃদ্ধি করা হয়। জাপানে উক্ত প্রকার অত্যাশ্চর্য্যজনক চন্দ্রমল্লিকা ফোটাইতে বিশেষ কিছুই করিবার আবশ্যক হয় না। তথাকার মাটীর গুণে ও আবহাওয়ার গুণে আপনি হয়। যে মাটীতে চন্দ্রমল্লিকা হয় তাহাতে কর্পূর মিশ্রিত থাকে, সম্ভবতঃ কর্পূর গাছের (Camphor offcinarum) নিকটস্থ স্থানটী কর্পূর পাতায় ও শিকড়ে কর্পূর গন্ধে, কর্পূর রসে সিক্ত থাকে—সেই মাটীতেই চন্দ্রমল্লিকা ভাল হয়। অন্য দেশে এই মাটীর পরিবর্ত্তে হালকা দোঁয়াশ মাটী (light loam) ব্যবহার করা হয়। কর্পূর রসে সিক্ত মৃত্তিকাতে অন্যান্য ফুল চাষ করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না। সব ফুলই বোধ হয় ভাল হইবে। মাটীতে কর্পূর গন্ধ থাকিলে পোকার উপদ্রবও কম হয়। আমাদের দেশে চন্দ্রমল্লিকা গাছে প্রায় পোকা ধরিতে দেখা যায়।

জাপানি চন্দ্রমল্লিকার এদেশে আমদানী হইয়াছে। বঙ্গদেশে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে চন্দ্র মল্লিকা ভাল হয় না। পাহাড়িয়া ও কাঁকর মাটিতে ইহা উত্তমরূপ জন্মিয়া থাকে। কাশী, এলাহাবাদ ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে, দেওঘর ও মধুপুরে ইহার মনোহর ফুল হয়। শিলঙে ইহা ভালরূপ জন্মিতেছে।

M. de Loverdo gives in *L' Agricrlture Nouvelle* a very complete description of the system of culture obtained from M. Oasma gardener to a former Emparor of Japan :—

"The soil destined to receive the young plants, no matter of what consistency, demands a previous preparation. By the aid of a spade, a bank is made, 35 centimetres in thickness, heaped up to one side. The bottom of the excavated part is covered with from 8 to 19 centimetres of pebbles. Before being filled-in, the soil which has been removed is mixed with camphorated earth at the rate of 4 kilos, of that per cubic metre of soil. The quantity removed from a surface of 3 square metres corresponds to I cubic metre. This mixture, wich is well incorporated, is placed on the pebbles, and, the trench fiilled up, the soil left over is made use of for cultivation of Chrysanthemums in pots.

"Upon the soil thus prepared the newly-rooted plants are set out, 40 centimetres each way. At a distance of 3 centimetres from each plant Bamboo supports are placed, the surface being then covered with moss, save immediately around the plants. Around these, trench is dug of about 20 cenimetres. The object of these trenches is to keep off all larvæ, earwigs, snails, and other known enemies of the Chrysanthemum. The wall thus formed is sprinkled with pure camphorated earth, on which also is applied lime-wash, wich forms a kind of collar of protection around each plant. This done, winged insects only have to be feared, and these can easily be kept away by sprinklings made with a solution of camphor.—La Semaine Horticole.

Centimetre ⅖ ইঞ্চ ; Kilo ২⅕ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১ এক সের মাটি। যেখানে চন্দ্রমল্লিকা রোপণ করা হইবে তাহা কয়েক ইঞ্চ খুঁড়িয়া তলায় কাঁকড় দিয়া তাহার উপর কর্পূর রসে সিক্ত মাটি ও অন্য সারযুক্ত মাটি দ্বারা পূর্ণ করিতে হয়। ঐরূপ করিলে চন্দ্রমল্লিকা আকারে বড় হয়, রঙে মনোহর হয়।
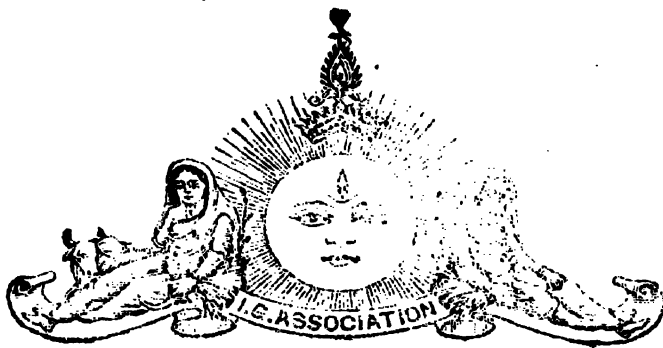
ভারতে বর্ত্তমান কৃষির অবস্থা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমন ধান—আমনের সমস্ত আবাদ শেষ হইয়া আসিল। হুগলী বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় জলাভাবে পুরা চাষ হয় নাই কিন্তু অন্যত্র সুবৃষ্টি হইয়াছে এবং অনেক জায়গায় ষোল আনার উপর আঠার আনা ফসল আশা করা যায়।

ঢাকাতে সিন্ধি গাভী—ঢাকা গভর্ণমেণ্ট কৃষিক্ষেত্রে করাচি হইতে কতিপয় সিন্ধিগাভীর আমদানী করা হইয়াছে। ইহাদের সমধিক দুগ্ধ দাত্রী বলিয়া খ্যাতি আছে। প্রথমে ইহাদিগকে রঙ্গপুর ফার্মে আনা হয় সেখানে ইহারা অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং দলের মধ্যে একটি মারা যায় এবং একটি এখনও ভুগিতেছে, বাকী গুলি ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। সেখানে ইহারা সকলেই সুস্থ আছে এবং দুগ্ধদান করিতেছে। কি পরিমাণ দুধ হইতেছে তাহা এখনও আমরা জ্ঞাত নহি। ইহাদের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান এখনও প্রস্তুত হয় নাই, অস্থায়ী ভাবে এখন ইহাদিগকে একটি চালা ঘরে রাখা হইয়াছে।

মোটর ট্রাক্টর—ঢাকাতে গ্লাসগো ট্রাক্টরের পরীক্ষা হইতেছে। আমরা অধিক মূল্যের কৃষি লাঙ্গলের পক্ষপাতী নহি কারণ সাধারণ চাষীতে ইহা কখন ব্যবহার করিতে পারিবে না। যাহা হাতে চালান যায় বা আমাদের দেশী বলদে টানিতে পারে এই প্রকার লাঙ্গলই এদেশের উপযোগী হইবে। এদেশের জমিগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্ধে বিভক্ত এবং চাষীরাও পয়সাওয়ালা নহে। বড় বড় ধনী ব্যবসায়ীর পক্ষে মোটর ট্রাক্টর ভাল। কিন্তু ধনী আসিয়া বৃহদায়তন জায়গা লইয়া কাজ আরম্ভ করিলে এবং কলে কাজ চালাইলে চাষীরা ক্রমশঃ ধনীর কবলে পড়িয়া বিপন্ন হইতে পারে। চাষীর স্বাতন্ত্র

বজায় রাখিবার পক্ষে ইহা একটি অন্তরায়ে পর্য্যবাসিত হইবারও সম্ভাবনা আছে।

ভারতের শিল্পোন্নতি—ভারতীয় শিল্পোন্নতি কল্পে অনেকে অনেক রূমক পরামর্শ দিতেছেন। অনেকে বড় বড় কল কারখানা প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী—তাঁহারা বলেন যে তদবস্থায় বিদেশের বাজারের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতায় দাড়ান যাইবে না। তাঁহারা কৃষির জন্য সুবৃহৎ ফার্ম্ম স্থাপন করিতে চান এবং তাহাতে বিলাতী কলের লাঙ্গলাদি চালাইবার মত মূলধন নিয়োগ করিতে বলেন। এটা কিন্তু আমাদের ভাবা উচিত যে য়ুরোপ এমেরিকায় কল কারখানার চরম হইয়া সেই স্থানের কলের মজুর ও কর্ম্মচারিগণের কি সুখ সুবিধা হইয়াছে! সেখানে আজ এত অশান্তি কেন? যাঁহার মূলধন তাঁহারাই সর্ব্বে সর্ব্বা—এই ব্যাপার সর্ব্বত্র। যাহারা তাহাদের পরিশ্রম নিয়োগ করিয়া ও মাথা ঘামাইয়া কারখানা চালাইবে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র উপায় হয়। তাহারা না দু দণ্ড বিশ্রামের অবসর পায়, না পায়, আরামের বস্তু উপভোগ করিতে। কুটীর শিল্পে মানুষ তাহার স্বাতন্ত্র রক্ষা করিতে পারে এবং আরামের ও সামাজিকতার সুবিধা পায়, তাহাদের সন্তানের শিক্ষা দানে অবসর থাকে এবং স্ত্রীপুত্র লইয়া সচ্ছন্দ বাসের সুযোগ ঘটে।

কুটীর শিল্পের আর একটা মহৎ উপকার এই যে ইহাতে সুনিপুণ শিল্পী তৈয়ারী হইবার অবসর থাকে এবং সমস্ত পরিবার শিল্পের আনুসঙ্গিক কর্ম্মে লিপ্ত থাকার হেতু তাহাদের মধ্যে অনেকেই ঐ শিল্পের অনুরাগী হয় এবং বিশেষ নৈপুণ্য দেখায়। এই জন্যই এদেশে কামারের ছেলে কামার, কুমারের ছেলে কুমার, চিকিৎসকের ছেলে চিকিৎসক, জেলের ছেলে জেলে, চাষীর ছেলে ভাল চাষী হইয়া থাকে। এই সকল কার্য্য তাহাদের অস্থিমজ্জাগত অভ্যাসের কার্য্য সুতরাং সুকর।

কলকারখানায় প্রবেশ করিয়া কেহই তাহার স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব বজায় রাখিতে পারে না। আর একটি বিশেষ কথা, চাষাবাদের কাজে লিপ্ত থাকিয়া অনেকেই ছোট খাট কুটীর শিল্প চালাইতে পারেন কিন্তু দেশে কল কারখানায় প্রাচুর্য্য হইলে দেশের কর্ম্মঠ ও বলিষ্ট লোক কলে প্রবেশ করিবে এবং তাহাতে চাষাবাদের লোকের অভাব পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ঘটিবে।

কলে প্রবেশ করিলে মানুষ কলের মানুষই হইয়া যায় ফলে তাহাদের অস্থি, মজ্জা মনুষ্যত্ব পিষ্ঠ হয়, তাহারা কলেরই অঙ্গীভূত হইয়া যায়। এই কারণে কৃষিতে বড় কলকব্জা নিয়োগ না করাই ভাল এবং কুটীর শিল্পের প্রাধান্য যাহাতে নষ্ট না হয় এমত চেষ্টা আমাদের অহরহ করা উচিত। বঙ্গের স্থানে স্থানে ধর্ম্মগোলা স্থাপন করিয়া অসময়ে জন্য শস্য সংগ্রহ করা এবং চাষীগণকে দালাল ও লোভী ব্যবসায়ীর হস্ত হইতে রক্ষা করা এবং যৌথ ঋণ দান সমিতি স্থাপন করিয়া চাষীদিগের চাষের সাহায্য করা এখন আমাদের প্রধান কার্য্য হওয়া উচিত।

এই সকল বিষয় হস্তক্ষেপ করিতে হইলেই প্রথমটা কিছু টাকার আবশ্যক হইবে। এই অর্থ গভর্ণমেণ্ট, রাজা জমিদারগণের নিকট যোগাড় করা ছাড়া উপায় নাই। এই জন্য মন্ত্রী মহাশয়গণের বিশেষ সাহায্য ও সহকারীতা প্রয়োজন। পরে যখন ধনীগণ এই কার্য্যে অগ্রসর হইবেন তখন গভর্ণমেণ্ট রাজা ও জমিদারগণ ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের টাকা উঠাইয়া লইতে পারিবেন অথবা টাকার বৃদ্ধি কল্পে এই কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে পারিবেন। সর্ব্বদাই শুনিতে পাই ইহাতে ব্যয়ের মত টাকার যোগাড় হওয়া সুকঠিন কিন্তু চাষাবাদ ও প্রজাকুল রক্ষা না হইলে গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব আসিবে কোথা হইতে বা জমিদারের জমিদারী থাকিবে কোথায়! যদি খাঁ বাহাদুরের চেষ্টায় গভর্ণমেণ্ট রাজা, জমিদার প্রজা সকলে একযোগ বঙ্গের কতকগুলি কৃষি অন্তরায় দূর করিবার সুব্যবস্থা হয় তাহা হইলে অনেকে ধন্য বলিয়া মনে করিবে।

অনেকের প্রার্থনা এই যে—

১। বঙ্গের পুরাতন মজা খাল বিলগুলির সংস্কার হয়। ইহাতে ভাসা জমি গুলির সংস্কার হইবে, সেচের জলের সংস্থান হইবে এবং মাছের অভাব দূর হইবে।

২। বঙ্গে পরিচয় দিবার মত একটিও ফলের বাগান নাই; কয়েকটি আদর্শ ফলের বাগানের প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যবসায়ের জন্য ফল উৎপাদন চাষীদিগকে শিক্ষা দেওয়া।

৩। বঙ্গে হলবাহী, দুগ্ধদায়ী ও মাংস প্রদানকারী পশ্বাদির দারুণ অভাব দিন দিন বাড়িতেছে। বঙ্গের স্থানে স্থানে পশু পালন ক্ষেত্র স্থাপন করিয়া তাহার অভাব বিমোচন করা।

৪। গভর্ণমেণ্ট ও জমিদার গণের সাহায্যে বঙ্গের লুপ্ত গোচারণ ভূমি গুলির পুনরুদ্ধার করা।

৫। বঙ্গের রেল লাইনের ধারে যে সকল পরিত্যক্ত জমি হাজার হাজার বিঘা পড়িয়া রহিয়াছে সেই গুলি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে গো মহিষ পালনের ব্যবস্থা করা এবং তৎসলগ্ন খাল গুলিতে মৎস্য আবাদের সুবিধা করিয়া দেওয়া।

৬। শুনা যাইতেছে যে কতকগুলি গ্রাম লইয়া এক একটি ইউনিয়ান করা হইবে। ইউনিয়ান গুলির মধ্য দিয়া উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা ১০০।১৫০ ফিট চওড়া রাস্তা প্রস্তুত করা হউক। রাস্তার ধারে ধারে পয়োনালা দিয়া গ্রাম সকলের জলনিকাশ হইবে, গ্রাম গুলিতে হাওয়া চলা চলের পথ সুপ্রশস্ত থাকিবে—অবাধে বাতাস খেলিবে, রৌদ্র প্রবেশ করিবে, রাস্তার ধারে গবাদি চরিতে পারিবে। এরূপ ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য সচীব ও কৃষি সচীব উভয়েরই স্বার্থ সিদ্ধ হইবে। উভয় সচীব একত্রে অনেক কাজ করিতে পারিবেন। ইহাতে রাজা প্রজা সকলেরই স্বার্থ আছে। সকলেই সহযোগী হইতে চায়। অসহযোগীতা মানুষের ধর্ম্ম নয়।

চারিদিকে এখন ফুটবল খেলার ধুম পড়িয়াছে। সুদূর পল্লীভূমিতেও এই খেলা

প্রবেশ করিয়াছে। ফুটবল খেলোয়াড় যেখানে সেখানে যেমন করিয়া পারে ২৷৩ বিঘা জায়গা যোগাড় করে। তাহারা যা পারে, দেশের মন্ত্রীগণ চেষ্টা করিলে অনায়াসে তাহা করিতে পারেন। প্রতি ইউনিয়নের দুই তিনটি কেন্দ্রে ১০ বিঘা হিসাবে জায়গার যোগাড় করা হউক। সেগুলি সমতল মাঠে পরিণত করা হইলে তাহাতে ঘাসতৃণাদি জন্মিবে এবং এ গুলিও গোচারণের মাঠ হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারিবে, এখানে ছেলেদের খেলাও চলিবে, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধগণ এখানে বেড়াইতে পারিবেন। মাঠের সন্নিহিত জলাশয় থাকিলে ক্ষতি নাই কিন্তু জঙ্গল না থাকে। গ্রামবাসীগণ স্বাস্থ্য রক্ষার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিলে তাহারা এরূপ মাঠ স্থাপনে যত্নবান হইবে। আমরা দেখিতে চাই সহজ সহজ কাজগুলি আগে আরম্ভ হয় এবং মেলেরিয়া প্রপীড়িত ও অস্বাস্থ্যকর স্থান সমূহে এবম্প্রকার কার্য্যের অবিলম্বে সুচনা করা হয়। এতদ্বারা গ্রাম সমূহের স্বাস্থ্যোন্নতি হওয়ার সম্ভব এবং গবাদির বিচরণ স্থানের সুবিধা হেতু কৃষিরও আনুকূল্য যথেষ্ট হইবে।

৮। আর একটা বিশেষ প্রস্তাব এই যে প্রতি ইউনিয়নে একটি বা দুইটি হিসাবে ভাল জাতীয় ষণ্ড রক্ষা করা হয়। তাহাতে আমাদের বাঙ্গালার অতি নিকৃষ্ট গবাদিরও ক্রমোন্নতি হইবে।

এখন আর কেবল কেবল মতলব ভাঁজিবার বা টাকা খরচের হিসাব দেখাইয়া নিরস্ত হইয়া বসিয়া থাকিবার সময় নাই। রাজা, প্রজা, জমিদার সকলে মিলিতে পারিলে দেশ রক্ষার, কৃষিরক্ষার একটা না একটা উপায় হইবেই। কৃষির উন্নতিতে ইতর, ভাদ্র, চাষী, রাজা, গৃহস্থ সকলেই আগ্রহান্বিত কিন্তু উদ্যমও উৎসাহ সকলের নাই। সকলে ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিত্যাগ করিলে এবং মহত্তর স্বার্থে অনুরাগ হইলে কাজে সিদ্ধি লাভ হইবেই হইবে। কৃষির উন্নতিতে দেশের উন্নতি হইবে, দেশের রাস্তা, ঘাট, জলাশয়ের উন্নতি হইবে। মানুষ একটু স্বচ্ছল হইলে সচ্ছন্দ উপভোগের চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারেনা। দেশের কাজ দশে না করিলে কে করিবে!

অন্তরজাতীয় কৃষিসমিতি।

(International Agricultural Assocation)

আমরা মধ্যে মধ্যে সমগ্র পৃথিবীর উৎপন্ন গমের পরিমাণ, খাদ্য-শস্যের পরিমাণ, রবারের পরিমাণ, এবং কোথায় কোন্ শস্য সমধিক পরিমাণ জন্মিয়া থাকে বা তাহার হেতু কি ইত্যাদি অনেক সার্ব্বভৌমিক খবর পাইয়া থাকি। কিন্তু কোথা হইতে এই সকল সংবাদ প্রচার হয় অনেকেই তাহার সন্ধান রাখেন না।

রোম নগরে ১৯০৫ শালে একটি অন্তরজাতীয় কৃষি-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সমস্ত পৃথিবীর চাষাবাদের খবর সংগ্রহ এবং তাহা সাধারণে প্রচার এই সমিতির উদ্দেশ্য। ইহাতে পৃথিবীর সকল স্থানে চাষীর চাষের ও ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। সমস্ত সভ্য জগত এখানে যথারীতি খবর ও আবশ্যকমত প্রতিনিধি পাঠাইয়া থাকেন। সকল দেশ এই সমিতির নিকট এক প্রকার সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ। সকল দেশই ইহার কার্য্য পরিচালনার্থ সঙ্গতমত ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন কারণ এরূপ একটা সমিতির যে প্রয়োজন তাহা সকলেই অনুভব করেন এবং সকলেরই ইহাতে স্বার্থ আছে।

এই সমিতি স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ইউনাইটেডষ্টেটের স্বর্গীয় মিঃ ডেভিড্ লুবিন। সমগ্র-ভূভাগের বিচ্ছন্ন কৃষক সম্প্রদায়কে এক সূত্রে বাঁধিবার ইচ্ছা সর্ব্বপ্রথমে ইহাঁর হৃদয়ে জাগিয়াছিল। পরস্পর একত্র হইয়া সংবাদের আদান প্রদান না করিলে কাহার কোনটি অভাব বুঝিতে পারা যায় না এবং সে বিদেশকে কি দিতে পারে, কি সে বিদেশ হইতে লইতে পারে এই প্রকারের খবর পাওয়া সমিতি স্থাপন ভিন্ন অন্য উপায়ে হয় না। মিঃ লুবিন ইটালীর রাজার নিকট এইরূপ সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তিনি সেই প্রস্তাবের সাদরে সমর্থন করেন এবং সমিতি শিঘ্রই স্থাপিত হয়।

এখান হইতে সমিতির দলভুক্ত সকল দেশেই ব্যবহারিক, ব্যবসায়িক কৃষি সম্বন্ধে সংগৃহিত তত্ত্বাদি পাঠান হয় এবং সকল স্থানের খবর এখানে সংগ্রহ করা হয়।

সমিতির জন্য সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং একা রোমের রাজা ইহার কার্য্য পরিচালনার্থ বৎসরে ১২,০০০ পাউণ্ড আয়ের সম্পত্তি নিয়োগ করিয়াছেন। সমিতির প্রধান লক্ষ্য জগতের উৎপন্ন শস্যাদির হিসাব সংগ্রহ করা। অতি লোভী ব্যবসায়ীগণ সময়ে সময়ে কোন একটা শস্য এক চেটিয়া করেন এবং অযথা দাম বৃদ্ধি করিয়া সাধারণের অর্থশোষণ করিয়া থাকেন। জগতের উৎপন্নজাতের সব খবর সকল দেশের লোক পাইলে লোভী ব্যবসায়ীর অসংযত কার্য্যগুলি কিয়ৎ পরিমাণে প্রশমিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এক দল কর্ম্মী লোকদ্বারা সমিতির কার্য্য পরিচালিত হয়—তাঁহারা বিভিন্ন গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি। তাঁহারা রোমেই অবস্থান করেন। মাসে একবার ইহাঁদের অধিবেশন হয় এবং সমুদয় জগতের প্রতিনিধি আসিয়া তাঁহাদের কার্য্যাবলির সমালোচনা মাঝে মাঝে করিয়া থাকেন। ইহাঁদের অধিবেশন বিশেষ কারণ উপস্থিত না হইলে হয় না। য়ুরোপ মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে দুইবার মাত্র ইহাঁরা একত্রিত হইয়াছিলেন।

এই কৃষি আগারের তিনটি বিভাগ আছে

১। উৎপন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ নির্ণয় করা,

২। কৃষি সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করা ও ফসলের পোকার খবর লওয়া,

৩। ব্যবহারিক কৃষিপণ্যের ও কৃষি-সংশ্লিষ্ট সমাজতত্ত্বের খোজ খবর লওয়া।

প্রত্যেক বিভাগ হইতে পত্রিকা প্রচার হয় এবং এখান হইতে সংবাদ পত্র সমূহে সাধারণে জ্ঞাপনার্থ সংবাদ পাঠান হয়। বৎসরে কৃষিজাত দ্রব্যের একটা শালতামামি হিসাব ছাপা হয় এবং কোথায় কৃষিসম্বন্ধে কি আইন প্রচলন হইল তাহার একটা সার সংগ্রহ প্রকাশ করা হয়। (বৈদেশিক সংবাদ পত্র হইতে সঙ্কলিত)

সৌন্দর্য্য বিজ্ঞান ও উদ্যান

(উদ্যানাচার্য্য শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে লিখিত কৃষকের প্রবন্ধ হইতে সংকলিত।)

সংসারে সৌন্দর্য্য বলিয়া কোন বিশেষ পদার্থ নাই কিন্তু সকল পদার্থেই সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। রমণীর মুখে, শিশুর কমনীয় কান্তিতে, স্রোতস্বিনীর কলকল গতিতে, গিরিরাজির অবয়বে, বিজন অরণ্যে—সকল স্থানে সকল পদার্থে সৌন্দর্য্য ছড়াছড়ি, সৌন্দর্য্য যেন সমুদ্র-বিশেষভাবে থাকিয়া তাবৎ সংসারকে আপ্লুত করিয়া রাখিয়াছে। এত সৌন্দর্য্যের মধ্যে থাকিয়া, নিজেও সৌন্দর্য্যের আধার হইয়া, সকল মানুষে সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। আবার এই সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতাভাব প্রযুক্ত মানুষে কতই সৌন্দর্য্যের বিনাশ সাধন করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সৌন্দর্য্য লইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে,—সৌন্দর্য্যের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হয়, সুতরাং সৌন্দর্য্য বিষয়ক জ্ঞান মানুষের স্বাভাবিক একটী দুগ্ধ পোষ্য শিশুর সম্মুখে লাল ও কাল বর্ণের স্বতন্ত্র দুইটী ঝুমঝুমী বা খেলনা দিলে, সে লাল ঝুমঝুমিটী বাছিয়া লয় বা স্বভাবতঃ টানিয়া লয়। ইহা উজ্জ্বল বর্ণের আকর্ষণশক্তির পরিচয় ভিন্ন আর কি হইতে পারে? বালক বালিকাগণ যখন খেলাঘর পাতিয়া খেলা করে তখন সেই স্থানে উপস্থিত হইলে কি দেখা যায়? দেখি যে ঘরটী তাহাদিগের নিজের মনোমতভাবে উত্তমরূপে সাজাইয়াছে,—যথানে যে জিনিষটী রাখিলে স্থানটী ভাল দেখায় এবং জিনিষেরও শ্রীবৃদ্ধি হয়, এমনই করিয়া সাজাইয়াছে। সৌন্দর্য্য জ্ঞান না থাকিলে কি তাহা হইতে পারে? তোমার আমার মার্জ্জিত রুচিতে হয়ত তাহা ভাল না লাগিতে পারে, তাই বলিয়া এমন কথা বলিতে পারি না যে, যাহারা সাজাইয়াছে, তাহাদিগের সৌন্দর্য্যজ্ঞান নাই। বলা বাহুল্য তাহারা ইতিপূর্ব্বে সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কোন শিক্ষা বা উপদেশ পায় নাই।

সৌন্দর্য্যজ্ঞান স্বাভাবিক হইলেও তাহার অনুশীলন করা আবশ্যক। দেশ কাল ও পাত্র ভেদে সৌন্দর্য্য রুচির প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সকল জিনিষের সৌন্দর্য্যই যে সকল সময়ে ও সকলের চক্ষে সুন্দর বোধ হইবে এমন আশা করা যায় না। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে রুচির পরিবর্ত্তন হইতেছে, কাজেই সময়ের সঙ্গে সৌন্দর্য্য-রুচিকেও যাইতে হইবে। মান্ধাতার আমলের রুচিকে বিংশ শতাব্দিতে ভেজাক দিলে চলিবে না। এই জন্য সৌন্দর্য্য জ্ঞানের চর্চ্চা করা আবশ্যক। কোন জিনিষের মধ্যে কি সৌন্দর্য্য আছে এবং কোথায়ই বা তাহা আছে, এ সকলের অনুসন্ধান করা যেমন আবশ্যক,

অন্তদিকে কিসে তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায় তাহার চেষ্টা করাও তেমনি প্রয়োজন। সৌন্দর্য্যের সন্ধান ও তাহার বৃদ্ধির উপায়—এতদুভয় লইয়াই সৌন্দর্য্য বিজ্ঞানের উৎপত্তি।

সৌন্দর্য্য বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, অন্যান্য বিষয় শিক্ষার ন্যায় ইহারও অনুশীলন করা আবশ্যক, এতদসম্বন্ধে বহুদর্শনও প্রয়োজন। যে কোন বিষয়ই হউক, চর্চ্চা করিলে সে বিষয়ে যে মানুষের অভিজ্ঞতা কিছু না কিছু পরিবর্দ্ধিত হয়, সে বিষয়ে সংশয় নাই। এই জন্য সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বাল্যবস্থা হইতেই কিছু কিছু শিক্ষা উচিত। বাল্যকাল হইতে ইহার চর্চ্চা করিতে করিতে ক্রমে উহা নিজ স্বভাবের সহিত বদ্ধমূল হইয়া যায়। তখন সেই বিজ্ঞান যাহাতে নিয়োগ করা যায়, তাহাতেই সাফল্য লাভ করিতে পারা যায়। যাহাদিগের রুচি পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহারা যে কোন জিনিষটী ব্যবহার করে, অথবা যে কোন জিনিষটী সাজায়, তাহাতেই সৌন্দর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদিগের অপেক্ষা য়ুরোপীয়দিগের সৌন্দর্য্য চর্চ্চা অধিক, এই জন্য তাহাদিগের ঘর বাড়ী, বেশ ভূষা, তৈজষ পত্র সকলের মধ্যে কেমন একটা পরিচ্ছন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যত মূল্যবান ও চাকচিক্যময় দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকি, সাহেবেরা তাহাপেক্ষা অনেক অল্প মূল্যের সামগ্রী ব্যবহার করেন, কিন্তু তাহাদিগের সজ্জিত করিবার প্রণালীর বিশেষত্ব হেতু আমাদিগের বহুমূল্য সামগ্রী সকল পরাভব মানে। জিনিষ অধিক হইলে কিম্বা অধিক জিনিষের একত্র সমবেশ হইলেই যে, সুন্দর দেখায় তাহা নহে। জিনিষকে সজ্জিত করিবার তারতম্যে এবং জিনিষের দ্বারা কোন ব্যক্তি, বস্তু বা স্থান মনোরম্য হইয়া থাকে। কোন সুন্দরী রমণীকে আপাদমস্তক বহুমূল্য বস্ত্র বা অলঙ্কার দ্বারা আবৃত করিলে শোভা বৃদ্ধি না হইয়া রমণীর সৌন্দর্য্য হানিকর হয় এবং সেই সঙ্গে অলঙ্কারদিও প্রভহীন হয়। আবার কোন কুরূপা মহিলাকে সুশৃঙ্খলার সহিত অল্পাভরণে সজ্জিত করিতে পারিলে তাহার শ্রী সম্পূর্ণই বর্দ্ধিত ও লাবণ্যময়ী হইয়া থাকে।

উদ্যান বিষয়েও ঠিক এইরূপ যিনি সৌন্দর্য্য বিজ্ঞানের কিছু আলোচনা করেন, এবং যাঁহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহার রচিত উদ্যানে বহুমূল্য উদ্ভিদ ও বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাদি না থাকিলেও, তাহা মনোরম্য হইয়া থাকে—সে কেবল সাজাইবার গুণে,—বিস্তৃত ময়দান ঘেরিয়া রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়া কতকগুলা বৃক্ষ রোপণ করিতে পারিলেই যে সুন্দর উদ্যান হইল, তাহা নহে। উদ্যান রচনা করিবার নিয়ম আছে, প্রণালী আছে,—গাছ নির্ব্বাচন করিবার ও রোপণ করিবার পদ্ধতি আছে। কোন প্রণালীরও নিয়মের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যে উদ্যান নির্ম্মিত ও রচিত হইয়াছে তাহা নয়নরঞ্জক ও প্রীতিদায়ক হইতেই পারে না। সুরচিত উদ্যান যথার্থ আরামের স্থান, অন্যথা তাহাতে প্রবেশ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

সুরম্য উদ্যান রচনা করিতে হইলে কয়েকটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। ভাবী উদ্যানের ছাঁচ বা নক্সা (Design)। ছাঁচের মধ্যে ঘাড়-মুড় ভাঙ্গিয়া ইউক্লিড সাহেবকে প্রবেশ করাইলেই নক্সা হইল না। সকল স্থানে জ্যামিতিক ছবি চলে না। স্থানের আয়তন, স্থানীয় দৃশ্য, ভূমির স্বাভাবিক উচ্চতা বা নিম্নতা বা কৃত্রিম অসমতলত্ব ইত্যাদি অনেক বিষয় বিশেষ বিবেচনা করিয়া নক্সা করিতে হয়। নক্সা করিবার কালে ইহাও স্মরণ রাখিতে হয়, যে নক্সার কোন স্থানে কোন গাছ বসিবে, কোথায় কিরূপ গাছ রোপণ করিলে স্থানীয় শোভা বৃদ্ধি পাইবে ইত্যাদি উদ্যানের মধ্যে কেবলই যে গাছ রোপণ করিতে হইবে তাহা নহে। কেয়ারি (Bed) পরস্পরের মধ্যে তৃণবীথিকা (Lawn) রাখা, রাস্তার কিনারায় মরসুমী বা স্থায়ী ফুলের হাঁসিয়া (Border) ইত্যাদি কোথায় কিরূপ হইবে, তাহাও ঠিক রাখিতে হইবে। আরও এক কথা—কাগজে নক্সা আঁকিয়া তদনুসারে ভূমিতে উদ্যান রচনা করিলে অনেক সময় মনোমত হয় না। উদ্যান রচনা করিবার কালে অনেক স্থলে নক্সা ছাড়িয়া স্বতন্ত্র প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়। নক্সার ক্ষুদ্র কলেবর মধ্যে যাহা সুন্দর দেখায়, তদনুসারে উদ্যান রচনা করিলে অনেক সময়ে তাহা ভাল হয় না। আবার অনেক রচিত উদ্যানের নক্সাকে কাগজে অঙ্কিত করিলে নয়নরঞ্জক বোধ হয় না। এজন্য কেবল নক্সার উপর নির্ভর করিয়া উদ্যান রচনা করা বড়ই ভুল। তবে মোটামুটি একটা কাটামো বা খসড়া খাড়া করিবার জন্য একখানা নক্সা করা ভাল এবং তাহারই অনুসরণ করতঃ রচনা করিবার কালে যেখানে যে পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করা উচিত। তাহা ব্যতীত কাগজে জমির স্বাভাবিক অবস্থা দেখাইতে পারা যায় না, এজন্য নক্সাতে যে চিত্র করা যায়, তাহা কোন মতে সম্পূর্ণ নহে বরং মাটীর ছাঁচে তাহা দেখান যাইতে পারে। সুন্দর অট্টালিকা, সুরম্য উদ্যান, কৃত্রিম পাহাড় বা হ্রদ নির্ম্মানের পূর্ব্বে ছাঁচ নির্ম্মানের আবশ্যক হয়। সেটা কেবল একটা আদর্শ (model) খাড়া করিবার জন্য। প্রকৃত আদর্শ কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুকরণ ও অনুসরণ করা। আবার ইহাও দেখা যায় যে আদর্শ লইয়া উদ্যান রচনা করিবার কালে, অনেক সময়ে রচিত অংশকে ভাঙ্গিয়া নূতন ভাবে গড়িতে হয়।

উদ্যান রচনা করা যেমন আনাড়ী ব্যক্তির কাজ নহে, তেমনি উদ্যান রক্ষা করা ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তির কাজ নহে। বহুদর্শী ও বিজ্ঞ প্রাকৃতিক উদ্যানের (Landscape gardener) দ্বারা উদ্যান রচনা করাইয়া লওয়া উচিত, এবং সক্ষম হইলে একজন ঐরূপ ব্যক্তিকেই তাহার রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত। এ সম্বন্ধে অধিক লিখিতে গেলে প্রবন্ধ বাড়িয়া যায়, অতএব এ প্রবন্ধের এই খানেই শেষ উদ্যান রচনা সম্বন্ধে মৎকৃত "মালঞ্চে" অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বৃষ্টি বিজ্ঞান

মার্গসিতোত্থা গর্ভাঃ শ্রাবণকৃষ্ণে প্রসূতিমায়ান্তি।
মাঘস্য কৃষ্ণপক্ষেণ নির্দ্দিশেদ্ভাদ্র পদশুক্লম॥
ফাল্গুন শুক্ল সমুত্থা ভাদ্র পদস্যাসিতে বিনির্দ্দেশ্যাঃ।
তস্যৈব কৃষ্ণপক্ষোদ্ভবাস্তু যে তেহশ্বযুক্ শুক্লে॥
চৈত্র সিতপক্ষজাতাঃ কৃষ্ণেহশ্বযুজস্য বারিদা গর্ভাঃ।
চৈত্রাসিতসম্ভূতাং কার্ত্তিক শুক্লেহভিবর্ষন্তি॥
পূর্ব্বোদ্ভূতাঃ পশ্চাদপরোত্থাঃ প্রাগভবন্তি জীমূতাঃ।
শেষাস্বপি দিক্ষ্বেবং বিপর্য্যয়ো ভবতি বায়োশ্চ॥
হ্লাদিমৃদূদক্শিবশক্রদিক্ ভবোমারুতো বিয়দ্বিমলম।
স্নিগ্ধসিতবহুল পরিবেষ পরিবৃতৌ হিমময়ূখার্কৌ॥
পৃথুবহুল স্নিগ্ধঘনং ঘনসূচী ক্ষুরক-লোহিতাভ্রযুতম্।
কাকাণ্ড-মেচকাভং বিয়দ্বিশুদ্ধেন্দু নক্ষত্রম॥
সুরচাপমন্দ্রগর্জ্জিত বিদ্যুৎ-প্রতিসূর্য্যকাঃ শুভা সন্ধ্যা।
শশিশিবশক্রাশাস্থাঃ শান্তরবাঃ মৃগপক্ষি সঙ্ঘাঃ॥
বিপুলা প্রদক্ষিণচরাঃ স্নিগ্ধময়ূখা গ্রহা নিরুপসর্গাঃ।
তরবশ্চ নিরুপসৃষ্টাঙ্কুরা নরচতুষ্পদা হৃষ্টাঃ॥
গর্ভানাং পুষ্টিকরাঃ সর্ব্বেষামেব যোহত্রতুবিশেষঃ।
স্বর্ত্তু স্বভাবজনিতা গর্ভবিবৃদ্ধৌ তমভিধাস্যে॥
পৌষে সমার্গশীর্ষে সন্ধ্যারাগোহম্বুদাঃ সপরিবেষাঃ॥
নাত্যর্থং মৃগশীর্ষেশীতং পৌষেহতিহিমপাতঃ॥
মাঘে প্রবলোবায়ুস্তুষারকলুষদ্যুতী রবিশশাঙ্কৌ।
অতিশীতং সঘনস্যচভানোরস্তোদয়ৌ ধন্যৌ॥
ফাল্গুনমাসে রূক্ষশ্চন্দ্রঃ পবমোহভ্র সংপ্লবাঃ স্নিগ্ধাঃ।
পরিবেষাশ্চাসকলাঃ কপিলস্তাম্রো রবিশ্চ শুভঃ॥
পবন-ঘন-বৃষ্টিযুক্তাশ্চৈত্রে গর্ভাঃ শুভাঃ সপরিবেষাঃ।
ঘন-পবন-সলিল-বিদ্যুৎ স্তনিতৈশ্চ হিতায় বৈশাখে॥

যদি গর্ভকালে আকাশ বিমল এবং উত্তর, ঈশাণ ও পূর্ব্বদিক হইতে মৃদু মন্দভাবে মনোহর সজল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে বা চন্দ্র সূর্য্যের মণ্ডলাদি স্নিগ্ধ শ্বেত ও বিশাল হয়, বা মেঘ সকল যদি অতি স্থূল, বিস্তৃত, স্নিগ্ধ বা ঘনসূচী, ক্ষুরের আকার বিশিষ্ট ব

লোহিত বর্ণ হয় বা আকাশ, চন্দ্র সূর্য্য, নক্ষত্রাদি বিমল হইলেও কাকাণ্ড ও বিচিত্র বর্ণ যুক্ত হয়, যদি ইন্দ্রধনু, মৃদু বজ্রগর্জ্জন, তড়িৎ, প্রতি সূর্য্য প্রভৃতি লক্ষিত হয়, যদি উভয় সন্ধ্যা পরম মনোরম এবং শান্ত মৃগপক্ষীকুল শান্তা দিক হইতে মনোহর রব করিতে থাকে, যদি প্রদক্ষিণগামী গ্রহগণ বিপুলাকায়, নিরূপসর্গ ও স্নিগ্ধ কিরণ বিশিষ্ট হয় এবং চরাচর জীবজগৎ সর্ব্বদা প্রমুদিত থাকে ও বৃক্ষ লতাদি সুপুষ্ট ও পল্লব সকল অভক্ষিত ও অমলিন এবং অঙ্কুর সকল জল শেচন ব্যতিরেকেও বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তৎকাল জাত গর্ভের প্রভুত পুষ্টি সাধন হইয়া থাকে এবং যথা সময়ে প্রচুর বারিও বর্ষিত হইয়া থাকে। গর্ভ পুষ্টিকর উপরি উক্ত সাধারণ লক্ষণগুলি ব্যতীত প্রত্যেক ঋতুগত আরও কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে; যথা, যদি অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে সন্ধ্যাদ্বয় লোহিত রাগ রঞ্জিত ও মধ্যে মধ্যে আকাশ বিশাল মেঘমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয় এবং অগ্রহায়ণ মাসে অল্প শীত ও পৌষে অল্প হিমপাত হয়, যদি মাঘ মাসে ঘোরতর শীত ও প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয় এবং চন্দ্র সূর্য্যের দীপ্তি তুষার পাতে অত্যন্ত মলিন ও অস্পষ্ট হয় এবং সূর্য্যের উদয় ও অস্তকালে আকাশ মেঘাবৃত থাকে; যদি ফাল্গুন মাসে সূর্য্য কপিশ বা তাম্রবর্ণ মেঘ সকল স্নিগ্ধ ও অসম্পূর্ণ মণ্ডলযুক্ত ও প্রচণ্ড রুক্ষ পবন প্রবাহিত হয়, যদি চৈত্রমাসে চন্দ্র সূর্য্য পরিবেশ যুক্ত এবং মেঘ বৃষ্টি ও বাতজ ত্রিনিমিত্ত গর্ভ পরিলক্ষিত হয়, ও বৈশাখমাসে মেঘ, বায়ু, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত জনিত পঞ্চ নিমিত্তক গর্ভ হয় তাহা হইলে ঋতু স্বভাবজনিত ও পুষ্ট তত্তৎকালীন গর্ভ অতীব প্রশস্ত।

অন্নং জগতঃপ্রাণাঃ প্রাবৃটকালস্য চান্নমায়ত্তম।
যস্মাদতঃ পরীক্ষ্যঃ প্রাবৃটকালঃ প্রযত্নেন॥
তল্লক্ষ্মানি মুনির্ভিযানি নিবদ্ধানি তানি দৃষ্ট্বেদ।
ক্রিয়তে গর্গপরাশর কাশ্যপ বাৎস্যাদি রচিতানি॥
দৈববিদবহিত চিত্তো হ্যনিশং যো গর্ভলক্ষণেভবতি।
তস্য মুনেরিব বানী ন ভবতি মিথ্যাম্বু নির্দ্দেশে॥
কিংবাতঃপরমান্যচ্ছাস্ত্রং জ্যায়োঽস্তি যদ্বিদিত্বৈব।
প্রধ্বংসিন্যপি কালে ত্রিকালদর্শী কলৌ ভবতি॥
কেচিদ্বদন্তি কার্ত্তিক্ শুক্লান্তমতীত্য গর্ভদিবসাঃ স্যুঃ।
নতু তন্মতং বহুনাং গর্গাদীনাং মতং বক্ষ্যে।
মার্গশীর্ষ শুক্ল পক্ষ-প্রতিপৎ প্রভৃতিক্ষপাকরেহষাঢ়াম্।
পূর্ব্বাং বা সমুপগতে গর্ভানাং লক্ষণং জ্ঞেয়ং॥
যন্নক্ষত্রমুপগতে গর্ভশ্চন্দ্রে ভবেৎ স চন্দ্রবশাৎ।

পঞ্চনবতে দিনশতে তত্রৈব প্রসবমায়াতি ॥
সিতপক্ষভবাঃ কৃষ্ণে শুক্লেকৃষ্ণা দ্যুসম্ভবারাত্রৌ ।
নক্তং প্রভবাশ্চাহনি সন্ধ্যা জাতাশ্চ সন্ধ্যায়াম্ ॥
মৃগশীর্ষাদ্যা গর্ভা মন্দফলাঃ পৌষ শুক্লজাতাশ্চ ।
পৌষস্য কৃষ্ণপক্ষেণ নির্দ্দিশেচ্ছ্রাবণস্য সিতং ॥

উল্লিখিত শ্লোক গুলির সার মর্ম্ম এই যে, জীব জগতের প্রাণস্বরূপ অন্ন বর্ষাকালায়ত্ত, সুতরাং বর্ষার বিষয় অতি যত্নের সহিত অবগত হওয়া কর্ত্তব্য। পূর্ব্ববর্ত্তী গর্গ, পরাশর, কাশ্যপ, বাৎস্যাদি ঋষিগণ যে সমস্ত বর্ষালক্ষণ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, আমি (বরাহ মিহিরাচার্য্য) সে সমস্ত জগতের হিতের নিমিত্ত সংকলন করিলাম। যে সাম্বৎসরিক দিবারাত্র অবহিত চিত্তে গর্ভলক্ষণ সকল আলোচনা করিয়া বর্ষা নিরূপণ করেন, তাঁহার বাক্য অম্বুনির্দ্দেশে কখন নিস্ফল হয় না; ক্ষণাবধ্বংসী পাপ প্রবল কলিকালেও তিনি পূর্ব্বতন মুনিগণের ন্যায় ত্রিকালদর্শী। অতএব এই বর্ষাগণনা শাস্ত্রাপেক্ষা আর কোন্ শাস্ত্র অধিকতর শ্রেষ্ঠ ?

কোন কোন পণ্ডিতের মতে চান্দ্র কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষ অতীত হইলে গর্ভ আরম্ভ হয়,* কিন্তু গর্গাদি বহুতর ঋষিগণের মতে চান্দ্র অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লপক্ষ প্রতিপদ হইতে যখন চন্দ্র পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে গমন করে তৎকালীন গর্ভ প্রশস্ত ও গণনীয়। চন্দ্রের যে নক্ষত্র ভোগকালে গর্ভ হয় ত্রয়োদশ পক্ষান্তে বা ১৯৫ দিবস পরে পুনরায় যখন সেই নক্ষত্রে আগমন করে তৎকালে চন্দ্রবশে বর্ষণ হয়। শুক্লপক্ষ-ভবগর্ভ কৃষ্ণপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষ-ভবগর্ভ শুক্লপক্ষে;—দিবাভবগর্ভ রাত্রে, রাত্রিভবগর্ভ দিবায়; প্রাতর্ভবগর্ভ সন্ধ্যায়, সন্ধ্যাভবগর্ভ প্রাতে বর্ষিত হইয়া থাকে; যে দিকে গর্ভ হয় এবং তৎকালে বায়ু যে দিক হইতে প্রবাহিত হয়, প্রসবকালে তাহার বিপরীত দিকে বর্ষণ হয় এবং বায়ুও তদ্রূপ বিপরীত দিক হইতে প্রবাহিত হয়; অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে গর্ভ হইলে পশ্চিম দিকে বর্ষণ হয়, এবং গর্ভকালে বায়ু পূর্ব্বদিকে প্রবাহমান থাকিলে বর্ষণকালে পশ্চিম দিক্ হইতে প্রবাহিত হয়, অন্যান্য দিক সম্বন্ধেও এইরূপ বিপরীত ক্রমে বর্ষণ হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষজাত গর্ভ জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণপক্ষে এবং কৃষ্ণপক্ষজাত গর্ভ আষাঢ়ের শুক্লপক্ষে পৌষের শুক্লপক্ষজাত গর্ভ আষাঢ়ের কৃষ্ণপক্ষে এবং কৃষ্ণপক্ষজাত গর্ভ শ্রাবণ শুক্লপক্ষে বর্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপ উত্তরোত্তর মাসগত পাক্ষিক গর্ভ সকল যথাকালে বিপরীত পক্ষক্রমে অভিবর্ষণ করে;—কিন্তু অগ্রহায়ণ মাস ও পৌষের শুক্লপক্ষজাত গর্ভে উত্তমরূপে বর্ষণ হয় না।—ক্রমশঃ—শ্রীহেমচন্দ্র দে।

* কিন্তু কার্ত্তিকের প্রথম হইতে গর্ভ গণনা সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত।
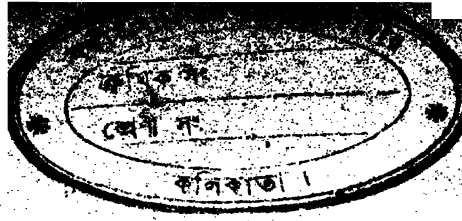
পশুর বংশোন্নতি

ভেটারিনারী ষ্টুডেন্ট লিখিত।

বৃষ নির্ব্বাচন

গাভী ও ষণ্ড এক স্থানীয় হওয়া স্পৃহণীয়। কারণ উভয়েই এক প্রকার আবহাওয়ায় এক প্রকার আহার পানে অভ্যস্ত হওয়ায় তদুৎপন্ন বৎস স্থানীয় আবহাওয়া সহিতে সমর্থ হইবে, স্থানীয় গাছ গাছড়া ও তৃণ জঙ্গলাদি আহার করিয়া পরিপুষ্ট হইবে, এবং তত্রত্য জলও তাহার অনুকূল হইবে, ইহা সহজেই আশা করা যাইতে পারে। স্ত্রী ও পুংপশু উভয়ই এক স্থানের না হইলে, তদুৎপন্ন বৎসের স্বভাব ও প্রকৃতি বিভিন্ন হইয়া পড়ে। কোন কোন ধনী লোকের সংসারে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বা পঞ্জাব অঞ্চলের কিংবা বিলাতী বৃহদাকার গাভী বা ষণ্ড দেখা গিয়া থাকে। বাঙ্গালা বা আসাম প্রদেশের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জাতীয় গোরুদিগের গর্ভে উল্লিখিত দেশসমূহের পশুর দ্বারা সঙ্কর পশু উৎপন্ন করিলে, অনেক সময়ে ক্ষতি হইবার আশঙ্কা করা যায়। বাঙ্গালা বা আসামের গরু যেমন আকারে ছোট, তাহার জরায়ু প্রভৃতিরও সেইরূপ সঙ্কীর্ণ থাকে। এতন্নিবন্ধন বৃহজ্জাতীয় ষণ্ডের ঔরসজাত বৎসকে ক্ষুদ্র গাভীর জরায়ু মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হয়, তাহাতে বৎস বিকলাঙ্গ হইয়া যাইতে পারে।

মতান্তরে ভিন্ন দেশ হইতে ভাল ষাঁড় আনাইয়া সঙ্কর উৎপাদন দ্বারা বাঙলার গোজাতির উন্নতি করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। খুব বৃহৎ ষণ্ড আনাইয়া গাভী সংযোজন কার্য্যে নিয়োগ করা ভাল নহে। এ দেশের জলহাওয়ার উপযোগী এ দেশের গাভীগণের পক্ষে উপযুক্ত ষণ্ড নিয়োগই কর্ত্তব্য এবং সেই রকম ষাঁড়ই অনাইতে হয়। ভাল জাতীয় ষণ্ড বৎস্য আনাইয়া এ দেশে তাহাদিগকে পালন করিলে এ দেশের জলবায়ুর উপযুক্ত হইবে।

এই প্রসঙ্গে গাভীর প্রসব বেদনার কথাও বিবেচ্য। এই ঘটনায় অনেকস্থলে গাভী সন্তান প্রসব করিতে না পারিয়া মরিয়া যায়। এ সকল ত পরের কথা। ক্ষুদ্র গাভীর জন্ত বৃহৎ ষণ্ড নির্ব্বাচন করায় গাভী ষণ্ডের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া ভূতলশায়ী হইয়া পড়িতেও দেখা গিয়াছে। আবার অনেকস্থলে বৃহৎষণ্ড নিকটস্থ হইলে, গাভী ভীতা হয় এবং পলায়ন করিবার চেষ্টা করে। এরূপ স্থানে জবরদস্তি করিয়া বংশ নির্ম্মিত হাড়কাষ্ঠে গাভীকে আবদ্ধ করিয়া জোড় দেওয়ান নিতান্ত গর্হিত কার্য্য। আর এক কথা এই যে, গাভীর ভীত বা শঙ্কিতাবস্থায় গর্ভ সঞ্চারিত হইলে, তদ্গর্ভজাত বৎস প্রফুল্লতাবিহীন হইবে,—ইহা নিশ্চিত। গাভীর ভীতি অমূলক

প্রতিপন্ন করিবার আবশ্যকতা হইলে, আনীত ষণ্ডকে গাভীর নিকটে বা সঙ্গে দুই এক দিবস থাকিতে দিলে মন্দ হয় না। এইরূপে গর্ভ সঞ্চারিত হইলে কোন কথাই নাই, কিন্তু যদি তাহাতে গাভী ষণ্ডের নিকটবর্ত্তী হইতে ভীত হয়, তবে গাভীকে সেই ষণ্ডের নিকট হইতে স্থানান্তর করাই উচিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গাভীগণ প্রতি তিন সপ্তাহ অন্তর ঋতুমতী হয়। তাহাদের প্রত্যেক ঋতুকাল এক দিন হইতে তিন দিন ব্যাপী। এই সময়ের মধ্যেই ষণ্ড যদি গাভীর মনোমত না হয়, তবে পরবর্ত্তী ঋতুকালে উহাকে অপর ষণ্ডের অধীন করিতে হইবে। গাভী ধীর ও মন্থরগতি হইলে তাহাকে সুলক্ষণা বলা যায়, কিন্তু বৃষের পক্ষে তাহা সদ্‌গুণ নহে। শারীরিক গঠন-সম্বন্ধে গাভীর যে যে লক্ষণ থাকা আবশ্যক, বৃষের পক্ষেও তাহা সুলক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে, কিন্তু স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে শারীরিক গঠন, ও প্রাকৃতিক বিভিন্নতা অবশ্য থাকিবে। বৃষের স্কন্ধ সমুচ্চ হওয়া অন্যতম সুলক্ষণ।

গর্ভাধান করিবার জন্য যে সমুদায় বৃষ রক্ষিত হয়, তাহাদিগকে বিশেষ ভাবে লালান পালন করিতে হয়। বৃষ সর্ব্বদা পালের বা দলের মধ্যে থাকিলে অপরিমিত ইন্দ্রিয়-উত্তেজনা হেতু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তদুৎপন্ন বৎস তেমন ভাল না হইবার কথা। এই কারণে উহাকে যথেচ্ছাচার করিতে না দিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত করা উচিত। বৎসর মধ্যে ৫০ হইতে ৬০টী অর্থাৎ প্রতিমাসে গড়ে পাঁচটীর অধিক গাভীকে ইহার নিকট আনয়ন করা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে। গাভী ও বৃষ নিরন্তর একত্র থাকিলে কোন কোন গাভীর অকালে ঋতুমতী হইবার সম্ভাবনা। অকাল-ঋতুতে গর্ভাধান হইলে গর্ভচ্যুতি ঘটিয়া থাকে। অতএব বৃষকে স্বতন্ত্রভাবে স্বতন্ত্রস্থানে রাখিতে পারিলে ভাল হয়।

আর এক কথা, উৎকৃষ্ট বাছুর উৎপন্ন করিবার জন্য ইহা সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, নিকৃষ্ট, ক্ষীণ, রুগ্ন, গাভীকে আদৌ গর্ভধারণ করিতে দেওয়া উচিত নহে। কারণ ইহাতে আশানুরূপ বৎস উৎপন্ন হয় না, পরন্তু নিকৃষ্ট গোরুর বংশ বৃদ্ধি হয় ও বৃষের বলক্ষয় হয় মাত্র। গো-বংশের উন্নতি করিতে হইবে বলিয়া, যে সে গাভীকে ভাল জাতীয় বৃষের অধীন করা ভাল নহে। ইহাতে ভাবী বৎস কিছু ভাল হইতে পারে, কিন্তু সে বংশকে আশানুরূপ করিতে অনেক সময় লাগে। এজন্য আমাদিগের মতে অকর্ম্মণ্য, কৃশ, রুগ্ন গাভীকে ভাল জাতীয় ষণ্ডের নিকটস্থ করা উচিত নহে। যে সকল সহরে ধর্ম্মের-ষাঁড় আছে, তথায় গাভীকে পাল দেখাইবার কোন অসুবিধা নাই। ধর্ম্মের ষাঁড়ের অভাবে মিউনিসিপ্যাল-ষাঁড় ব্যবহার্য্য। ধর্ম্মের ষাঁড় সাধারণতঃ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিয়া থাকে, আবার অনেকে পুণ্য সঞ্চয়াভিলাষে ইহাদিগকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কিছু কিছু খাইতে দেয়। এই জন্য ধর্ম্মের ষাঁড়গুলি যেমন হৃষ্টপুষ্ট

হয়, অন্য ষাড় প্রায় তেমন হয় না। ধনী লোকদিগের নিজস্ব দুই একটী ষাঁড় থাকে এই পশু দ্বারাই তাঁহাদিগের নিজ নিজ গাভীগণ এবং অনেক প্রতিবেশীর গাভীগণ গর্ভবতী হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা দেশের গাভীকে বছোরের বৃষের সহিত সংযোগ করিতে পারিলে, বঙ্গীয় গোবংশের বিশেষ উন্নতি হওয়া সম্ভবপর। বছোরের গাভী ও বাঙ্গালা দেশের ষণ্ডের সহযোগে উৎপন্ন বৎস নিকৃষ্ট হইবে, সুতরাং তাহাতে লাভ নাই। এতদ্ব্যতীত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন বিলাতি জার্সি (jersey) গরন্‌সি guernsey) ও আয়ারসায়ার (Ayra Shire) জাতীয় বৃষ নিয়োজিত করিলে বঙ্গে দুগ্ধ ঘৃতোৎপন্ন করিবার উপযোগী উত্তম গাভী জন্মিতে পারে। ইহারা খাস বিদেশী না হইয়া পাটনা, ভাগলপুর, মুলতান প্রভৃতি অঞ্চলের গাভীর সহিত সংযোগে তাহাদের সাঙ্কার্য্য যে পুংবৎস হইবে সেইগুলিকে এ দেশে জনন কার্য্যে নিয়োগ করা অধিকতর ফলদায়ী হয়। দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন উৎপন্ন করিবার পক্ষে এই তিন জাতীয় বিলাতী বৃষ বিশেষ প্রসিদ্ধ কিন্তু কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত করিবার কিংবা শকটাদি বহনের জন্য পশু উৎপন্ন করিতে হইলে বিলাতি অপেক্ষা অষ্ট্রেলিয়া দেশের বৃষ বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে। কারণ ইহারা বিলাতি গোরুর ন্যায় গোয়ালে আবদ্ধ থাকিয়া লালিত পালিত হয় না, অধিকন্তু ইহারা বিলাত অপেক্ষা উষ্ণতর দেশের আবহাওয়া সহিতে পারে। সুতরাং এদেশে আসিয়া উহারা মাঠে ঘাটে চরিয়া খাইতে পারে, এদেশের আবহাওয়াতে তাহারা বিশেষ কষ্টানুভব করে না। বিলাত অপেক্ষা অষ্ট্রেলিয়া হইতে ষণ্ড আনাইতেও অপেক্ষাকৃত অল্প খরচ পড়ে।

বিলাতী পশুগণ কৃত্রিম উপায়ে জীবনধারণ করে; সুতরাং এদেশের মোটাঘাস, শুষ্ক ভার জল এবং স্থানীয় রৌদ্রবৃষ্টির প্রকোপ-সহনে অসমর্থ হইয়া পড়ে। এজন্য ইহাদিগের ঔরসজাত বৃষের দ্বারা কৃষিকার্য্যোপযোগী পশু লাভ করা যায় না। চাষের বলদ উৎপন্ন করিবার জন্য, দেশীয় ভালজাতীয় ষণ্ড সর্ব্বাপেক্ষা স্পৃহণীয়। দেশীয় অর্থে যে কেবল বাঙ্গালা দেশের ষণ্ডই বুঝিতে হইবে, তাহা নহে। ভারতের নানা দেশে নানা প্রকার উৎকৃষ্ট জাতীয় গোরু বাছুর জন্মিয়া থাকে। চাষের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে নাগোরা বা নাগপুরী-বৃষ বাঙ্গালা দেশের উপযোগী। বছোরের গাভীর সহিত গুজরাটী বৃষের বেশ জোড় হইতে পারে, কিন্তু বছোরে এখনও ভাল ষণ্ড পাওয়া যায়, সুতরাং ইহার জন্য অন্য কোন দেশের বৃষ আনিবার প্রয়োজন হয় না। এখানে পয়স্বিনী গাভী আনিয়া স্থানীয় বৃষের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করাইলে দুগ্ধাদি উৎপন্ন করিবার উপযোগী উত্তম এক নূতন জাতীয় গোরু উৎপন্ন হইতে পারে। বাঁকিপুর অঞ্চলের টেলার বংশোদ্ভব গোরুর প্রসিদ্ধি আছে। কিছু দিন পূর্ব্বে মিঃ টেলার নামক জনৈক নীলকর সাহেবের চেষ্টায় এই সঙ্কর গো বংশের উৎপত্তি হইয়াছে।

ফল কথা, আমাদিগের মতে বাঙ্গালা বা আসাম প্রদেশের গাভীর গর্ভে স্থানীয়

উৎকৃষ্ট বৃষ, বা ভারতের অন্য কোন স্থানের বৃষের দ্বারা সঙ্কর পশু (cross bred) উৎপন্ন করিতে পারিলে ভাল হয়। যে সকল প্রদেশে বা জেলায় ষণ্ডের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে, তথায় স্থানীয় বৃষ ব্যবহার করা কোন মতে উচিত নহে।

গবীদিগের গর্ভাধানের নিমিত্ত রক্ষিত বৃষকে অতি যত্ন সহকারে পালন করিতে হয়। উহাকে চারণক্ষেত্রে বা মাঠে ময়দানে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেওয়া, ভাল ঘাস ও অন্য পুষ্টিকর খাদ্য আহার করিতে দেওয়া, অপরিমিত গর্ভাধান করিতে না দেওয়া প্রভৃতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। পূর্ণ বয়স্ক হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ ষণ্ড সংবৎসরে একশতটী গাভীর গর্ভোৎপাদনে সমর্থ। কিন্তু ইহাতে বৃষের শরীর ভগ্ন হইবার ও তেজ হ্রাস হইবার সম্ভাবনা বলিয়া আমাদের মতে উহাকে ঊর্দ্ধ সংখ্যায় ৬০টী গাভীর গর্ভাধানে নিযুক্ত করিলে ভাল হয়।

মহিষের প্রয়োজন

দুগ্ধ ঘৃতাদির জন্যই হউক,—কৃষিকার্য্যের জন্যই হউক, আর শকটাদি টানিবার জন্যই হউক, বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই প্রায় গো-জাতির প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং গৃহস্থ ও কৃষকগণ ইহাদিগকে বিশেষ সম্পত্তির মধ্যে গণ্য করিয়া থাকে। বেহার বা পশ্চিমাঞ্চলে, আসামেরও অনেক স্থলে, মহিষগণ এই সকল কারণে পোষিত হইয়া থাকে। আমাদিগের মনে হয়, গরু অপেক্ষা মহিষ অধিক মূল্যবান। মহিষ অধিক দিবস পর্য্যন্তও অধিক পরিমাণে দুগ্ধ প্রদান করে, এবং ইহার দুগ্ধ, গো-দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে মাখন বিশিষ্ট ও পুষ্টিকর। যাঁহারা গো-দুগ্ধ ব্যবহারে অভ্যস্ত, তাঁহাদিগের নিকট মহিষের দুগ্ধ প্রথম প্রথম রুচিকর হয় না, কারণ শেষোক্ত দুগ্ধে একটা গন্ধ পাওয়া যায়। অনভ্যাস হেতু সে গন্ধ সকলের প্রিয় হয় না। দুই দিবস ব্যবহার করিলে, পান করিবার সময়ে ইহাতে আর সে গন্ধ পাওয়া যায় না। মহিষের দুগ্ধে বিশেষ গুণ এই যে, অতি সুমিষ্ট, এবং অল্প জ্বালেই ইহাতে ঘন সর পড়ে। যাঁহারা মহিষ দুগ্ধ পানে অভ্যস্ত, তাঁহারা গো-দুগ্ধ পানে আরাম পান না, অধিকন্তু তাহাতে মিষ্টতার পরিবর্ত্তে লবণাস্বাদ পাইয়া থাকেন। আমরা বাঙ্গালা দেশে থাকিতে চিরকাল গো-দুগ্ধ ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু তখন মহিষ দুগ্ধ, বড় কেন আদৌ ভাল লাগিত না,—ভুলিতে কি সে দুগ্ধ পান করিতে প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত হইত না। কিন্তু বিহার প্রদেশে আসিয়া কয়েক বৎসর হইতে তাহা বিনা ওজর আপত্তিতে ব্যবহার করিতেছি, এখন গো-দুগ্ধ আর ভাল লাগে না।

গরু অপেক্ষা মহিষ অনেক বলবান ও বৃহদায়তন, সুতরাং হাল চালাইতে বিশেষতঃ বিলাতি turnwrest বা 'হিন্দুস্থান চাল' টানিতে ইহারা বিশেষ উপযোগী। বঙ্গের বৃষ বা বলদ উল্লিখিত হাল সহজে টানিতে পারে না, কিন্তু মহিষ উহা অনায়াসে টানিতে পারে। যে গুরুভার হাল টানিতে পারে, সে অনায়াসে কূপ হইতে 'মোট' দ্বারা জল তুলিতে পারে, অধিক পরিমাণে মাল বোঝাই গাড়ীও টানিতে পারে। ইহা দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, গরু অপেক্ষা মহিষ অধিক প্রয়োজনীয়। তবে ইহার একটা দোষ আছে। ইহারা রৌদ্র-সহ নহে, অর্থাৎ রৌদ্রে ইহারা শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়ে। গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের সময় ইহারা অধিকক্ষণ কোন কাজ করিতে পারে না, এবং পঙ্কিল ডোবা, পুষ্করিণী প্রভৃতির মধ্যে নিমজ্জিত থাকিতে ভাল বাসে। ক্ষেত্রকার্য্য গৃহস্থালী প্রভৃতি কার্য্যে মহিষ যখন আমাদিগের এরূপ সহায়, তখন উহার রৌদ্রকাতরতা দোষ উপেক্ষা করিয়া দেশ মধ্যে বহুসংখ্যক মহিষ আনয়ন করা উচিত। যে সকল সহরে লোকে বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাব বোধ করে, তথায় মহিষের দুগ্ধ প্রচলন করিলে এ অভাব অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইতে পারে। দুগ্ধের কাটতি অধিক, অথচ 'যোগান' তদনুরূপ নহে, কাজেই গোয়ালারা সকল খরিদ্দার বজায় রাখিবার জন্য উহাকে কৃত্রিম উপায়ে বর্দ্ধিত করে। কৃত্রিম উপায়ের মধ্যে গাভীকে ফুঁকা দেওয়া ও দুগ্ধে জল মিশ্রিত করা, এই দুইটী প্রধান। জল মিশ্রিত করিলে দুগ্ধ কেবল জলীয় হইলে তত ক্ষতি ছিল না। দুর্গন্ধযুক্ত, কীটপূর্ণ ও দূষিত নালা, ডোবা, পুষ্করিণী প্রভৃতির জল মিশ্রিত করা হয় বলিয়া, লোকের,—বিশেষতঃ দুগ্ধপোষ্য শিশুকুলের মধ্যে রোগের ও মৃত্যুর এত প্রাদুর্ভাব। দূষিত দুগ্ধ-পানে, শৈশবকাল হইতে সন্তান-সন্ততিগণ ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া থাকিলে তাহাদিগের ভবিষ্যৎ কি হইবে, তাহা ভাবিতেও কষ্ট হয়। ইদানীং শিশুকুলের মধ্যে যে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহার এক প্রধান কারণ এই দূষিত দুগ্ধ। মহিষ-দুগ্ধ সহজে পরিপাক হয় না বলিয়া বালক বালিকাদিগকে উহা পান করিতে দিতে অনেকের আপত্তি হইতে পারে, কিন্তু সহরের বালক বালিকারা যদি মিউনিসিপ্যাল ইন্স্পেক্টর দ্বারা নামে মাত্র পরীক্ষিত, দুর্গন্ধযুক্ত, জঘন্য কচুরী জিলাপী প্রভৃতি মিষ্টান্ন প্রতিদিন পরিপাক করিতে পারে, তবে মহিষের দুগ্ধ যে পারিবে না, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। টাটকা মহিষ-দুগ্ধ বালক বালিকাদিগের পক্ষে গুরুবোধ হইলে, প্রথমতঃ তাহাকে একবার জ্বাল দিয়া সর-সমেত কিছু বয়স্ক ব্যক্তিদিগের জন্য স্বতন্ত্র রাখিয়া অবশিষ্ট দুগ্ধে সিকি ভাগ জল মিশাইয়া আর একবার অল্প পরিমাণে 'জ্বাল' দিলে তাহাদিগের উপযোগী হইতে পারে। কিম্বা আর একটী উপায় করা যাইতে পারে। বালকদিগের জন্য গো-দুধ এবং অপর লোকেদের জন্য মহিষ দুগ্ধ লইলে চলিতে পারে। এরূপ করিলে গো-দুধের টানাটানি অনেক কমিয়া যাইবে, এবং সাধারণের মধ্যেও ইহা ক্রমে ছড়াইয়া পড়িবে। তদ্ভিন্ন বালকবালিকাগণও আবশ্যকমত

ও অপেক্ষাকৃত নির্জ্জলা দুধ পান করিতে পাইবে। তবে বয়স্ক ব্যক্তিগণ মহিষ-দুধ পরিপাক করিতে অক্ষম হইলে আমরা নাচার।

ইহার খোরাক অধিক লাগে বলিয়া মহিষ পুষিবার বিরুদ্ধে যে আপত্তি করা হয় তাহা নিতান্ত ভিত্তিহীন। যাহা হইতে অধিক উপকার পাওয়া সম্ভব, যাহার কার্য্যকারীতাও অধিক, তাহাকে পালন করিতে যে ব্যয় বা পরিশ্রম হয়, তাহাতে ক্ষতি না হইয়া লাভই থাকে। দুইটা বলদের কার্য্য একটী মহিষের দ্বারা সম্পন্ন হইলে, কিম্বা দুইটা গাভীর দুধ একটী মহিষী হইতে পাইলে লাভ অধিক হয়, না ক্ষতি হয়?

গো বংশের উন্নতি কিম্বা পালন সম্বন্ধে যে যে প্রণালী অবলম্বন করিতে হয় মহিষ সম্বন্ধেও তাহাই করিতে হয়। ইহাদিগের উন্নতির জন্য বিদেশী মহিষ আনিবার এখনও আবশ্যক হয় না। বংশোন্নতি করিতে হইলে হৃষ্টপুষ্ট, সবল ও বয়ঃপ্রাপ্ত মহিষ হইলেই যথেষ্ট হইবে।

বেহার, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ প্রভৃতি উষ্ণ ও নীরস দেশ অপেক্ষা আসাম, উত্তর-পূর্ব্ব ও নিম্নবঙ্গে মহিষ ভাল থাকে, ইহারা স্বভাবত রসা অর্থাৎ জলা দেশের প্রাণী। ইহাদিগের গাত্রে লোম না থাকায় ইহারা সূর্য্যের উত্তাপ অধিক সহিতে পারে না। গ্রীষ্মকালে ইহারা জলে থাকিতে ভাল বাসে। হালচালাইবার ও গাড়ি টানিবার জন্য ইহাদিগকে প্রত্যুষে ও অপরাহ্ন নিযুক্ত করা উচিত, কারণ এই দুই সময়ে ইহারা অনেকক্ষণ সচ্ছন্দে কাজ করিতে পারে।

মহিষীগণ আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে গর্ভবতী হয়। সচরাচর ইহারা দুই বৎসর অন্তর গর্ভবতী হইয়া থাকে। কোন কোন মহিষী প্রতি বৎসর, আবার কোন কোন মহিষী তিন বৎসর অন্তরও গর্ভবতী হয়। দুই বৎসর অন্তর যে মহিষী গর্ভবতী হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট, এবং গৃহস্থের উপযোগী। তিন বৎসর বয়ঃক্রমে ইহারা গর্ভধারণের উপযোগী হয়। ইহাদিগের গর্ভধারণকাল ন্যূনাধিক দশ মাস। প্রসব হইবার পর ইহারা প্রায় দেড় বৎসরকাল সমভাবে দশ বারো সের দুধ দিতে পারে গর্ভিনী হইবার দুই তিন মাস পূর্ব্বে দুধ বন্ধ হইয়া যায়।

মহিষগণ তিন বৎসর বয়সে কর্ম্মক্ষম হইয়া থাকে, তখন উহাদিগকে হলচালনায় ও গাড়ী টানা কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। তিন বৎসর উত্তীর্ণ হইলে মহিষকে মহিষীর গর্ভাধারনার্থ নিয়োজিত করা যাইতে পারে।

মহিষ বা মহিষী উভয়কেই দুই বেলা দুইটী 'ছানি' বা 'জাব' দেওয়া উচিত। অনেকে মহিষদিগকে 'ছানি' দেয় না, কিন্তু স্বাস্থ্যবান ও বলিষ্ঠ রাখিতে হইলে 'ছানি' দিবার বিষয়ে কৃপণতা করা উচিত নহে। প্রাতে মহিষকে 'জাব' না দিলেও, সায়ংকালে একটী পূর্ণ 'জাব' দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। যাহারা হাল টানে তাহারা চরিবার সময় খাইতে পায় না, সুতরাং তাহাদিগকে দুইবারই 'জাব' দেওয়া উচিত।

যে সমস্ত মহিষ প্রাতে হাল বহিয়া সমস্ত দিন চরিতে পায়, তাহাদিগকে একটী 'জাব' দিলেও চলিতে হয়। দুগ্ধবতী অবস্থায় ইহাদিগকে ভূষী, খইল, প্রভৃতির সঙ্গে নানাবিধ রসাল সামগ্রী, তৃণ, গিনীঘাস, বিয়ানা প্রভৃতি দিতে পারিলে দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং দুধ সারবান হয়। বলা বাহুল্য প্রত্যেক দুগ্ধদায়ী পশুকে প্রতিদিন এক ছটাক লবণ দেওয়া উচিত। সকল পশুতেই লবণ বিহীন খাদ্য অপেক্ষা লবণযুক্ত খাদ্য অধিকতর আগ্রসহকারে ভক্ষণ করে।

মহিষগণের দন্ত দেখিয়া এবং মহিষীগণের শৃঙ্গের দাগ দেখিয়া বয়স নির্দ্দেশ করিতে হয়। দুই বৎসর বয়ঃক্রমে মহিষদিগের প্রথম দুইটী 'দুধে-দাঁত' পড়িয়া যায় এবং তৎপরে প্রতি বৎসর এক জোড়া পড়িয়া যায়, আর এক জোড়া উঠিয়া থাকে পঞ্চম বর্ষে সমুদায় চোয়াল দন্তে পূর্ণ হয়। মহিষীগণের তৃতীয় বর্ষের পর হইতে শিঙের দাগ গণিয়া তাহার সহিত আর তিন বৎসর যোগ করিলে উহার বয়স ঠিক করা যায়।

মৃত্তিকার গঠন—জনসাধারণ সকল সময় কোন্‌টা কি জমি স্থির করিয়া উঠিতে পারে না। এরূপ অনুযোগ পত্র আমরা কখন কখন পাইয়া থাকি। সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত যে মাটীতে প্রধানতঃ বালি, কর্দ্দম, কিঞ্চিৎ জান্তব উদ্ভিজ্জাদি পদার্থ (humus) থাকে। ইহার মধ্যে বালি ও কর্দ্দম এই দুইটীই প্রধান উপাদান।

বেলে	মাটীতে	শতকরা	১০ ভাগ	কর্দ্দম
বালি-আঁশ	মাটীতে	শতকরা	১০ হইতে ৩৯ ভাগ	কর্দ্দম
দোআঁশ	মাটীতে	শতকরা	৪০ হইতে ৭০ ভাগ	কর্দ্দম
এঁটেল	মাটীতে	শতকরা	৭০ হইতে ৮০ ভাগ	কর্দ্দম

কলম বাঁধিতে মোম—জোড় কলম বাঁধিয়া কখন কখন তাহার উপর গোবরমিশ্রিত কাদার প্রলেপ দেওয়া হয়। এরূপ করিলে বাহিরের হাওয়া ও রৌদ্র লাগিতে না পাইয়া ক্ষতস্থানটী শীঘ্র শীঘ্র জুড়িয়া যায়। পাশ্চাত্য দেশে ইহার পরিবর্ত্তে কোথাও কোথাও মোমের প্রলেপের বিধান আছে। গোবর ও কাদার প্রলেপ অনেক সময়ে ফাটিয়া যায়, সুতরাং উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। আবার গোময় ও কাদার প্রলেপ ব্যবহার অপেক্ষা মোমের প্রলেপ ব্যবহার করা সুখজনক। কলম বাঁধিতে এই প্রলেপটী এতদ্দেশে বাঞ্ছনীয়। শুধু কলম বাঁধা কেন গাছের ডাল ছাঁটিয়া তাহার কর্ত্তিতাংশ-গুলিতে মোমের প্রলেপ দিলে সেই কর্ত্তিতাংশগুলি রৌদ্রের উত্তাপে বিশুষ্ক হইয়া যাইবার ভয় থাকে না।

বিলাতীফলের আবাদ

ফলের আবাদ সম্বন্ধে কৃষকে কিছু কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। ভারতের নানা প্রদেশে বিভিন্ন জলহাওয়ায় কোন্ ফল কোথায় ভাল হয় তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। ভারতের কোন্ কোন্ ফলের বিশেষ প্রয়োজন তাহা অনেকেই জানেন। কিন্তু ভারতবর্ষ বর্ত্তমানযুগে কেবলমাত্র ভারতবাসীর জন্য নির্দ্দিষ্ট নহে। ভারতে ইংরাজ ও যুরোপীয়ানগণের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। তাঁহারা ভারতের সহরবন্দরে কাজকর্ম্ম করেন কিন্তু বাস করেন শৈলাবাসে। এইজন্য কাশ্মির, কুলু, কোয়েটা, নিলগিরী, শিলঙে ভাল ভাল বিলাতী ফলের বাগান আছে।

এই সকল স্থানে আপেল, নাসপাতি, কুল, পিচ, ষ্ট্রবেরি, রাস্পবেরী, ওয়ালনট, কাবুলী বাদাম (Almonds) এই সকলস্থানে সহজে এবং সুন্দরভাবে জন্মিয়া থাকে। শিলঙে এই সকল ফলে আবাদ জন্য একটী পরিক্ষা ক্ষেত্র আছে; সেখানে বিদেশ হইতে নানা জাতীয় আপেল ও নাসপাতী আনাইয়া এদেশের জলহাওয়া সহিষ্ণু করা হইয়াছে এবং তাহারা এখন ভারত ভূমিতে সচ্ছন্দে জন্মিতেছে।

কাশী অঞ্চলে বিলাতী ও দেশী ফলের আবাদের বিশেষ সুযোগ আছে। কাশী এলাহাবাদ ও নিকটবর্ত্তী স্থানে নাসপাতি, কুল, পেয়ারা, পিচ উত্তমরূপ জন্মিয়া থাকে। এই সকল স্থানে সমতলভূমি যথেষ্ট পরিমাণ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা পাহাড়ের অংশবিশেষ এবং মৃত্তিকাও পাহাড়িয়া জমির সকলগুণ বিশিষ্ঠ। কাশ্মির, দেরাদুন, দার্জ্জিলিঙ তরাই, কালিমপঙ, শিলঙ, ডিব্রুগড়, কামাখ্যা, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ এই প্রকারের সমস্ত জায়গায়ই বিলাতী ফলের আবাদ সুন্দররূপে চলিতে পারে। একটি ফলের আবাদ লাভজনক করিতে হইলে আবাদের পরিমাণ অন্তত ১০একর অর্থাৎ ৩০বিঘা হওয়া আবশ্যক। ফলের চারা কলমগুলি নির্দ্দিষ্ট অন্তরে বসান আবশ্যক। ছোট অবস্থায় সেগুলি জমিতে অতিশয় ফাঁক দেখায় কিন্তু তাহারা পূর্ণায়তন হইলে কতটা বাড়িবে তাহা খেয়াল থাকা উচিত। পূর্ণায়তন হইলে গাছগুলির শাখা প্রশাখা পরস্পর ঠেকিয়া না যায়। আপেল নাসপাতি ২৫।৩০ ফিট অন্তর, কুল ১৫।২০ ফিট অন্তর, পেয়ারা ৩০ ফিট অন্তর বসাইতে হয়। এই জাতীয় গাছগুলি ১৫।২০ বৎসর পূর্ণমাত্রায় ফল প্রদান করে এবং এইকালে ফলের আকৃতি ও গুণ উত্তমই থাকে। ১৫।২০ বৎসর পরে গাছগুলি বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলে ক্রমশঃ ফল ছোট হয় এবং ফলের গুণও মন্দ হইয়া আসে। ফলের গাছ গুলিকে দীর্ঘকাল উত্তম ফলবতী রাখিতে হইলে প্রত্যেকবার ফলপ্রসবের পর গাছ ছাঁটা

আবশ্যক। এইকার্য্য নিপুণতার সহিত সম্পাদন করিতে হইবে—অধিক বা অল্প ছাঁটা না হয়। গাছের বাড় বৃদ্ধি অনুসারে গাছের স্বভাব জানিয়া গাছগুলিকে ছাটিতে হইবে। বক্তৃতা শুনিয়া বা বই পড়িয়া এই কার্য্যের সম্পূর্ণ শিক্ষা হয় না—হাতে হাতিয়ারে কাজ না করিলে উত্তম উদ্যান পালক হওয়া যায় না। পুস্তকাদিতে যাহা কিছু বলা হয় তাহা ইঙ্গিত মাত্র।

পিচের গুল কলম, দাবা কলম হয় আবার বন্য পিচের সহিত ভাল পিচের জোড় কলম করিলে ফলের সাতিশয় বৃদ্ধি হয় এবং গাছও খুব টেকসহি হইয়া থাকে। কুলের চোককলম হয়, বন্য কুলে ভালকুলের চোক বসাইতে হয়। বন্য ষ্টক হইতে গাছ বৃদ্ধির জোর পাইল এবং অগ্রভাগে ভাল গাছের শাখা থাকে বলিয়া ফল উৎকৃষ্ট হয়—সব জোড় ও চোক কলমের এই রীতি। গুল কলম, দাবা কলম, খোঁচা কলম আসল গাছের ডাল হইতেই উৎপন্ন হয়। শিলঙে এক প্রকার স্থানীয় নাসপাতি পাওয়া যায় তাহার ফলন অত্যন্ত অধিক। এই গাছের সহিত ভাল নাসপাতির জোড় বাঁধা যায় তাহা হইলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতে পারে। ফল গাছের গোড়ায় যাহাতে রস থাকে তাহার ব্যবস্থা চাই—গাছের গোড়া কোপাইয়া, মাটি দুরস্ত করিয়া গোড়ার রস রক্ষা করিতে হইবে। সমুদয় বাগানটি কোপাইয়া তৃণশূন্য করিয়া রাখাও কর্ত্তব্য। বাগানে মাঝে মাঝে লাঙ্গল মৈ দিলে জমির রস রক্ষা সহজে করা যায়। উদ্ভিজ সার, গোময় সার প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিলে জমির রস রক্ষা সহজে করা যায়। রস রক্ষা করিতে হইবে বলিয়া গাছে অতিরিক্ত জল ব্যবহার করাও খারাপ—গাছের গোড়ার অধিক জল বসিতে পাইলে শিকড় পচিবার এবং সেইজন্য গাছ খারাপ হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে গাছের পোকা লাগা ধসা ধরা রোগ হইয়া থাকে। বীজের চারার স্থানীয় গাছ বা লতায় রোগ কম হয়। তাহারা স্থানীয় জল হাওয়ায় সহজে দৃঢ় হইয়া উঠে এবং পোকার উপদ্রব এড়াইতে সক্ষম হয়। বিলাতী ফলের গাছ এদেশে জল হাওয়ায় দৃঢ় হইলেও তাহাদের কোমল স্বভাব সহজে পরিত্যাগ করিতে চায় না—এবং তাহাদের পোকা লাগায় ভয় যথেষ্ট থাকে। এখন দেখিতে হইবে পোকার প্রতিকার কি প্রকারে করা যায়। পোকা লাগিয়া ধ্বসা ধরিয়া গাছ নিস্তেজ হইলে বা ফলে পোকা লাগিয়া ফল নষ্ট হইলে ফলের আবাদে লাভ না হইয়া লোকসান্ হইবারই সম্ভাবনা।

পোকা গাছের পাতায় লাগে, ছালে লাগে, শিকড়ে লাগে। শিকড়ে পোকা লাগিলে শিকড়ের মাটি সরাইয়া শিকড়ে রৌদ্র বাতাস লাগাইতে হয় এবং রেড়ীর খৈল নিমের খৈল প্রভৃতি পোকা নিবারক সার ব্যবহার করিতে হয়। গাছের ছালে এক প্রকার এফিস্ নামক ছত্রক দেখা যায়, অন্য পোকাও পাতায় বসিয়া পত্রাংশ খাইয়া ফেলে। চূণ গন্ধক আরক, লেড আরসেনেট আরক বা পারমাঙ্গানেট অব পটাস আরকে পিচকারী দ্বারা গাছ ধুইয়া ফেলিলে উপকার পাওয়া যায়। মুকুল হইলেই

গাছে গন্ধকের ধোঁয়া দিলে ফলে পোকা লাগার ভয় থাকে না। ফলের বাগান করুণ বা সব্জী চাষ করুণ 'ফসলের পোকা' নামক পুস্তক খানি কাছে থাকিলে অনেক পোকার প্রতিকার করিতে পারেন।

ফল উৎপন্ন করিয়া বিক্রয়ের পন্থা দেখিতে হইবে। ভারতে ফল বিক্রয়ের যথেষ্ট হাটবাজার আছে। এই সকল বাজারে সাহেবগণ সমধিক পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন। শৈলাবাসে সাহেবগণ যথেষ্ট ফলব্যবহার করেন। আজকাল ভারতবাসীও সাহেবদের দেখিয়া বৎসরে কিছুকাল শৈলাবাসে কাটাইতে শিখিয়াছেন এবং তাহারা ঐ সকল ফলও যথেষ্ট ব্যবহার করিতেছেন। ভারতের প্রধান প্রধান সহর ও বন্দরে এই সকল ফলের যথেষ্ট আমদানী হয় কিন্তু সেইজন্য উৎপত্তি স্থান অপেক্ষা এই সকল স্থানে কিছু দাম অধিক। ফলের ব্যবহার যে ক্রমশই বাড়িতেছে ইহা সত্য।

ফলের আর একটা ব্যবসা—ফল হইতে জ্যাম, জেলী, চাটনী প্রস্তুত করা এবং ফল শুকাইয়া বা ফল টীনে সংরক্ষণ করিয়া বিদেশে পাঠান। অনেকে শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে—এখান হইতে ফল বিলাতে যাইয়া সেখান হইতে জাম জেলী রূপে বোতলে প্যাক হইয়া আবার ভারতের বাজারে আসিয়া বিকায়।

দেশের কথা

চর্‌কার আশ্চর্য্য শক্তি। লাখে আনে কোনটী।—কুড়ি লক্ষ চর্‌কার বছরে পঁচিশ কোটী টাকা মিলে। গুজরাটি "নবজীবন পত্রের অবলম্বনে শ্রীযুত লক্ষ্মীদাস পুরুষোত্তম চর্‌কার কাজের নিম্নলিখিত গণনাটি "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন :—

একটি চর্‌কায় প্রায় দশ নম্বরের সুতা কাটিতে প্রতিদিন পনের তোলা তুলার প্রয়োজন হয়। পনের তোলা পরিষ্কৃত তুলা পাইতে হইলে পঞ্চাশ তোলা আপেঁজা তুলা চাই। এই হিসাবে প্রত্যহ কুড়ি লক্ষ চর্‌কা ব্যবহারের জন্য ২৫ লক্ষ পাউণ্ড (এক পাউণ্ড প্রায় আধ সেরের সমান) অপেঁজা তুলার আবশ্যক। টাকার দশ পাউণ্ড দরে এই পরিমাণ তুলার দাম ২৫০০০০ টাকা। যদি এক কোটি টাকা মূলধন নিয়োজিত করা যায়, তবে তাহার দৈনিক সুদ শতকরা বার্ষিক ১২৲ টাকা হারে ৩৩৫০৲ টাকা হয়। সুতরাং এই দুয়ের একুন মোট ২৫৩৩৫০৲ টাকা প্রতিদিন কাজে লাগাইতে হইবে। প্রতিদিন ৫৭০০০০ পাঁউণ্ড কাপড় তৈয়ারী হইবে। প্রতি

পাউণ্ড এক টাকা ছয় আনা দরে এই উৎপন্ন কাপড়ের মূল্য ১০৩১২৫০৲ টাকা। তুলার বীজের দাম আনায় দশ পাউণ্ড দরে ৬২৫০০৲ টাকা হইতেছে। এই দুইটি একুন করিয়া প্রতিদিনের দৈনিক আয় হইতেছে ১০৯৩৭৫০৲ টাকা। এই টাকা হইতে পূর্ব্বোক্ত দৈনিক ব্যয়ের ২৫৩৩৫০ টাকা বাদ দিলে সমস্ত খরচ-খরচা বাদে দৈনিক আয় ৮৪০৪০০৲ টাকা হয়। সুতরাং এক বৎসরে ৩০০ দিন ধরিয়া বাৎসরিক ঠিক আয় ২৫,২১,২০,০০০৲ টাকা হইবে।

এই কার্য্যে ৬২৫০০ জন লোক তুলা পরিষ্কার করিবার জন্য, ৮৩৩৩২ জন তুলা পিঁজিবার জন্য, ২০ লক্ষ লোক সূতা কাটিবার জন্য, ৩ লক্ষ লোক তাঁত চালাইবার জন্য এবং তত্ত্বাবধানের জন্য ১ লক্ষ ব্যক্তি, মোট ২৫ লক্ষের কিছু উপর লোক নিয়োজিত হইতে পারিবে। এই ২৫ লক্ষ ছাড়া আর ১৬ লক্ষ লোককে আমরা পোষণ করিতে পারিব। কারণ প্রত্যেক পরিবারে ৪ জন করিয়া লোক ধরিলে প্রত্যেক শ্রেণীর নিযুক্ত লোকের মোট সংখ্যা ১৬ লক্ষ হয়। অতএব আমরা একচল্লিশ লক্ষের অধিক লোকের মধ্যে প্রতিদিন ৮ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা বণ্টন করিতে সমর্থ হইব। ইহা ছাড়া এ-কথাটও মনে রাখিতে হইবে যে, এই কুড়ি লক্ষ চরকা চালাইতে হইবে অনেকগুলি ছুতার, কামার ও অন্যান্য শিল্পীর ও পরিবারদিগের অন্ন সংস্থানের উপায় কতকটা করিয়া দিতে পারিব।

উপরের হিসাবটি বুঝিয়া দেখিলে চরকায় দেশহিতকর কার্য্যের অদ্ভুত শক্তি সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। মহাত্মা গান্ধী যে ঘর ঘর চরকা চালাইবার পরামর্শ দিয়াছেন তাহার সারবত্তা ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায়।—বসুমতী।

কার্পাসের কথা—বিগত বৎসর সমগ্র ভারতে প্রায় ২ কোটী ৩০ লক্ষ একর জমিতে কার্পাসের চাষ হইয়াছে। ঐ বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে মোট ৪২৮৩০০ টন কার্পাস বিদেশে রপ্তানী হইয়া গিয়াছে। এই কার্পাসের মূল্য ৫৮ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকা। কাঁচা মালের তুলনায় ভারতের প্রস্তুত কাপড় মোট ৮ কোটী ৭৩ লক্ষ টাকার বিদেশ রপ্তানী হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এ দেশে যে কার্পাস উৎপন্ন হয় তাহার সামান্য অংশ দেশের কলে ব্যবহৃত হয়, বাকী সমস্তই বিদেশ গিয়া বিদেশের কলওয়ালা, ব্যবসায়ী, ও শ্রমিকদের পালন করিতেছে। অনেকের ধারণা ভারতজাত তুলার অধিকাংশই ইংলণ্ডে রপ্তানী হইয়া থাকে; পক্ষান্তরে কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে। সম্প্রতি তুলা রপ্তানীর যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, ভারতজাত তুলার ৪ ভাগ মাত্র ইংলণ্ডে যায়; তদ্ব্যতীত ৩৯ ভাগ ইউরোপে অন্যান্য প্রদেশে, ৪৫ ভাগ জাপানে এবং ৯ ভাগ চীনে রপ্তানী হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে যে-পরিমাণ কার্পাসজাত বস্ত্রাদি বিদেশ হইতে আমদানী হয়, একমাত্র ইংলণ্ডই তাহার ৮৫ ভাগ প্রেরণ করে; অবশিষ্ট ১১ ভাগ জাপান ও ২ ভাগ মাত্র উরোপের অন্যান্য

প্রদেশ যোগায়। এই হিসাব হইতে বুঝা যায়, ইংলণ্ড ৪ ভাগ মাত্র তুলা এ-দেশ হইতে লইয়া লইয়া শতকরা ৮৫ ভাগ অথবা তুলার বিশ গুণের বেশী বস্ত্র আমাদিগকে যোগাইয়া থাকে।—সম্মিলনী।

বর্ত্তমান বর্ষে বাঙ্গালা দেশে ২০০৭৫৪ বিঘা জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে; গত বৎসর ২০৫৪১০ বিঘা জমিতে হইয়াছিল।—ঢাকা প্রকাশ।

পুরাতন জেলে তাঁতের ব্যবস্থা—মেদিনীপুর পুরাতন জেলে তাঁত শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। সূতা কাটার জন্য ১৫।১৬টি চর্‌কা ও কাপড় বোনার জন্য ১৫।১৬টি ঠক্‌ঠকী তাঁতও আনায়ন করা হইয়াছে। আমরা তাহাতে চাদর, তোয়ালে আদি বয়ন দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। তাঁতগুলি এখনও সব বসানো হয় নাই। সূতা কাটার ব্যবস্থাও কিছু দেখিলাম না। কলেজের ছেলেদের সূতা কাটা ও তাঁত বোনার জন্য জেলের চত্তরে বৃহৎ চালা নির্ম্মিত হইতেছে। স্কুল-কলেজের বাহিরের বালক,যুবক, বা উদ্যমী ব্যক্তিও বিনা মাহিনায় শিক্ষালাভ করিতে পারেন।—মেদিনীপুর-হিতৈষী।

তাঁতের কারখানা—আমরা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম যে চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ ধনী ও ব্যবসায়ী শ্রীযুত তেজেন্দ্রচন্দ্র ধর ও তাহার সহকারীগণ এই সহরে ৭০টি "fly shuttle" নামক উৎকৃষ্ট তাঁত যন্ত্র লইয়া একটা বড় রকমের দেশী বস্ত্র বয়নের কারখানা স্থাপনে মনোযোগী হইয়াছেন।—জ্যোতিঃ।

জাপানী 'খাদরে'—বাজার ছাইয়া গিয়াছে। জপানী খাদর একটু সস্তা এবং দেখিতে মনোরম। কলিকাতার ব্যবসায়ীগণ জাপানী মাল স্বদেশী বলিয়া চালাইতেছে, তাই আমাদের মনে হয় বঙ্গদেশীয় কংগ্রেস কমিটীর খাদর বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যদি ভারতবাসী সরু সূতার খাদরের পরিবর্ত্তে মোটা খাদর পরিতে আরম্ভ করিতে পারেন তাহা হইলে দুই দিকই রক্ষা পায়।—যশোহর।

খদ্দর—পশ্চিমাঞ্চলে যাহা খদ্দর বা খাদি নামে পরিচিত তাহা দেশীয় চর্‌কায় কাটা সূতার দ্বারা দেশীয় তাতে তৈয়ারী কাপড়। পশ্চিমাঞ্চলে খুব মোটা সূতার মোটা কাপড় হয়। কতকগুলি ত দানাপুরী খাড়ুয়া হইতেও মোটা; ঠিক পাটের তৈয়ারি চট ও কেন্‌ভাসের মত। সেই মোটা কাপড়ই এইক্ষণ বড় বড় লোকের পরিধেয় হইয়াছে। কারণ বড় লোকেরা তেমন মোটা কাপড় না পরিলে, সাধারণ লোকেরা তাহা পরিবে না।—জ্যোতিঃ।

সীম (Beans)

(কৃষিতত্ত্ববিদ্ শ্রীশশীভূষণ সরকার লিখিত।)

সীম দুই প্রকারের—১। যাহা ক্ষেতে চাষ হয়; ২। যাহা বাগানে তরকারি হিসাবে চাষ করা হয়।

সীম সংখ্যায় অনেক—এক বাগানের সীমই বহুবিধ প্রকারের দেখা যায়। আমাদের দেশের সীমগুলি প্রায় সবই পালায় উঠে এবং তাহাদের লতার বৃদ্ধিও খুব। বিলাতী পালা সীম ২।৩ প্রকার মাত্র আছে। উহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে Runner bean বা লতা সীম। ইহাদের লতা উঠিবার জন্য বড় বড় পালার ব্যবস্থা করিতে হয়, বিলাতী ব্রড বীনও পালায় উঠে। ইহাদের ব্রডবিন চওড়া হয় বটে কিন্তু মাখন সীমের মত এত চওড়া হয় না বা এতাদৃশ মিষ্ট হয় না। মাখন সীমকে ইহার গুণ হিসাবে Butter bean বলা হয়। বিলাতী কিড্‌নী বিন বেশ সুস্বাদু। ইহার বীজের কিড্‌নীর মত আকৃতি বলিয়া নাম হইয়াছে কিড্‌নী বীন। কিড্‌নী অনেকেই হয়ত বুঝেন না। ইহা শরীরের গণ্ড বিশেষ, বাংলা ৫ পাঁচের মত আকৃতি। ইহার গাছ ৫।৬ ফিটের অধিক বড় হয় না।

বিলাতী ফরাস বীন আঙুলের মত সরু ও ছোট হয়; ইহার গাছ ৪।৫ ফিটের অধিক লতায় না। ফরাসী বুসবীন গাছ ঝাড়াল ও ঝুপী এবং উর্দ্ধে ১।১॥ ফিটের অধিক বাড়ে না এবং সীমগুলি বিশেষ সরু হয় এবং এক গোছায় অনেকগুলি সীম ধরে।

আমাদের দেশে বরবটী, সাদা সীম, সয় সীম এগুলির মাঠে চাষ হয়। সাদা সীমের বীজকে হনুমান কড়াই বলে। ইহার দানা সাদা কিন্তু মুখের কাছে কাল দাগ এইজন্য উক্ত নামে খ্যাত। দুই, এক জাতীয় বরবটী আছে যাহার সীমগুলি বড় ও মোটা হয় এবং পালায় চাষ করিলে ফলন অধিক হইয়া থাকে। নবিয়ার চাষ পালায় ভিন্ন হয় না।

আমাদের বাগানের সীম সবই চওড়া এবং লম্বা ৪।৫ ইঞ্চির অধিক নহে। নবিয়া গোল ও লম্বা—দীর্ঘে ১৮।২০ ইঞ্চ হয়; তরকারির জন্য ইহার অধিক ব্যবহার। কাঁচা অবস্থায় রন্ধনে ইহা ক্ষীরের মত গলিয়া যায় এবং খাইতে সুস্বাদু। পুষ্ট হইলে সিদ্ধ খাইতে উত্তম। কেহ কেহ নবিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া আলুর সহিত ইহার ঘুগ্‌নী তৈয়ারি করিয়া থাকেন। সব সীম তরকারি হিসাবে রন্ধন করিয়া খাওয়া যায়। কিন্তু ইহা হইল সাধারণ ব্যবহার।

আর একপ্রকার সীম আছে যাহার পডগুলি চৌপল হয় এবং প্রায়। ১০।১২ ইঞ্চি দীর্ঘ হয়। কেহ কেহ ইহাকে চৌপলে সীম বলে। ইহার দানাগুলি গোল। শুকাইলে এই দানায় দাউল খাওয়া চলে। আর এক রকম এমেরিকান সীম এদেশে

আমদানী হইয়াছে। ইহার গাছ খুব লতাইয়া ভারায় উঠে এবং গুচ্ছে গুচ্ছে ছোট কলার ছড়ার মত সীম ফলে, খাইতে সুমিষ্ট। ইহার এক জাতীয় মখমলের গাত্র বিশিষ্ট (Velvetpod), অন্য প্রকারের গায়ে রোম নাই। এইগুলি অপেক্ষাকৃত ভাল। এই সীমের কলার মত আকৃতি বলিয়া কেহ তরুকলা বলে।

সীমের বীজ রাশি রাশি বাজারে আমদানী হয়। দেশী সীম যতপ্রকার আছে তাহাই যথেষ্ট; বিলাতী সীম আমদানীর এদেশে আবশ্যক নাই। শুষ্ক সীমদানা চূর্ণ করিয়া বেসম প্রস্তুত হয়। বরবটীর বেসম উৎকৃষ্ট। ইহার মিষ্টান্ন প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার হইয়া থাকে। অন্য প্রকারেও ইহা খাওয়া যায়। কত সীম আমরা অযত্নে নষ্ট করি। সীমের দানা ছাড়াইলে যে খোসা ও গাছের লতাপাতা থাকে তাহা গবাদির খাদ্য যোগাইতে পারে। বেসম জলে গুলিয়া গবাদিকে খাওয়ান চলে। সীমের দানা সিদ্ধ করিয়া গবাদিকে খাইতে দেওয়া যায়।

সীমের বেসম (Bean meal) সুখাদ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য। ইহাতে শরীর পোষণের প্রধান দুইটী উপাদান পাওয়া যায়—নাইট্রোজেন ও শ্বেতসার।

সীমের বেসমের উপাদানের পরিমাণ—

জল	১৪·৩
তৈল বা চর্ব্বি	১·৫
অণ্ডলালা	২২·৬
শ্বেতসার বা শর্করা	৪৫·৫
আঁশ (fibre)	৭·১
ছাই	৩·২
অন্য পদার্থ	২·৮
	১০০·০
অণ্ডলালা পদার্থের নাট্রোজেন ভাগ	৪·০৭

ইহা ঘোড়া ও মানুষের ভাল খাদ্য। সীমের দাউল জৈ, ছোলার সহিত মিশাইয়া ঘোড়াকে খাওয়াইলে ঘোড়ার স্বাস্থ্যরক্ষা এবং সস্তায় খোরাক জোগান চলে। দুগ্ধদায়ী গাভীকে খড় কুটার সহিত প্রতিদিন ৵২॥ সীমের বেসম খাওয়াইলে তাহারা সমধিক দুধ প্রদান করে। বিলাতে মাঠে যে সীমের চাষ হয় তাহাকে field Bean বা Horse bean বলে। English horse bean, Scotch Horse bean, Helegoland Bean, শীতের field bean এইগুলি প্রধান। ইহার বেসম হয় এবং সেই বেসম বিস্কুটের কারখানাতে প্রচুর ব্যবহার হইয়া থাকে এবং তথাকার গবাদির ইহা প্রধান খাদ্য।

মাঠের সীম এবং বাগানের সীমের তফাৎ এই মাঠের সীমের পডের খোসা পাতলা শক্ত এবং খাইতে তাদৃশ সুমিষ্ট নহে কিন্তু বাগানের সীমের পড চওড়া, মাংসল, নরম এবং খাইতে সুমিষ্ট এবং এই কারণে সিদ্ধ বা ব্যঞ্জনে ব্যবহার উপযোগী।

একবিঘা জমি হইতে ২।৩ মণ সীমের দানা পাওয়া যায়। তাহারপর লতাপাতা গাছে ৪।৫ মণ গরুর খাদ্য হিসাবে সংগ্রহ হয়। এই হইল সর্ব্বাপেক্ষা কম ফসল— ভাল জমি হইলে বিঘায় ফসল দুই কিম্বা ২॥ গুণ অধিক দাঁড়াইতে পারে।

সীম বরবটী চাষ সম্বন্ধে বহুবার কৃষকে আলোচনা করা হইয়াছে। তথাপি এই চাষের কিপ্রকার জমি চাই এবং সারই বা কি তাহার উল্লেখ প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।

সীম সকল মৃত্তিকায়ই চাষ হইতে পারে—কিন্তু দোঁয়াস মাটি ইহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী।

সীম মটর চাষে পটাস সার অধিক প্রয়োজন হয়। বিঘাতে ২৫।৩০ পাউণ্ড পটাস পড়ে এমন পটাস—প্রধান সার প্রদান করিতে হইবে। কাঠের ছাই, কলার পাতার ডাটার ছাই, বিলাতী পানার ছাই হইতে পটাস সংগ্রহ করিতে হইবে ইহার চাষে বিঘায় ১২।১৪ পাউণ্ড ফস্ফরিক অম্লের প্রয়োজন হয়। হাড়ের গুড়া হইতে উক্ত সার সংগ্রহ হইবে। নাইট্রোজেন লাগে ৭।৮ পাউণ্ড; খৈল হইতে উহা সহজে সংগ্রহ করা যায়। মটর সীমের ক্ষেতে পাতালভাবে শুষ্ক পাঁক মাটি ছড়াইলে উপকার পাওয়া যায়। সারের বিচার 'কৃষি রসায়ন' পাঠে বিশদরূপে জানিতে পারিবেন।

পত্রাদি

রেড়ীর চাষ—

শ্রীযুত গোলকচন্দ্র কুণ্ড, কাঁচড়াপাড়া, ই, বি রেলওয়ে

কাঁচড়াপাড়ার আমার পড়া বিস্তর আছে সেখানে রেড়ীর চাষ চলে কিনা।

(১) কি প্রকার জমিতে রেড়ার চাষ ভাল হয়?

(২) জমিতে যদি বালির ভাগ কিছু বেশী থাকে তাহাকে রেড়ীর চাষোপগী করিতে পারা যায় কি না? যদি যায় ত কি প্রকারে?

(৩) কোন্ মাসে কি প্রণালীতে রেড়ীর চাষ করিতে হয়?

(৬) কলিকাতায় রেড়ীর বীজের (demand) আছে কি না। কোন্ কোন্ firm ঐ বীজের ব্যবসায় করিয়া থাকেন?

(৭) রেড়ীর চাষে কিরূপ লাভ হইবার সম্ভাবনা।

উত্তরঃ—

১। দোআঁশ জমিতেই রেড়ী ভালরূপ জন্মে। নদীর ধারের জমী রেড়ী চাষের

পক্ষে প্রশস্ত। পাহাড়তলীর লাল মাটীতে রেড়ীর চাষ বেশ ভাল হয়। পড়া জমি সম্পূর্ণ বালুকাময় না হয় তবে তাহাতে রেড়ী চাষ নিশ্চয়ই চলিবে।

২। জমীর বালীর ভাগ অধিক হইলে তাহাতে ২ বৎসর ধঞ্চে চাষ করিয়া পরে রেড়ীর বা অন্য শস্যের আবাদ করিতে পারেন।

৩। বঙ্গদেশের কৃষকেরা তিন প্রকার রেড়ীর চাষ করিয়া থাকে, যথা ভাদই বাসন্তী এবং চনাকি। জৈষ্ঠ মাসে প্রথম জল পড়িলে ভাদই রেড়ীর দানা বোনা হয়; মাঘ মাসে ফসল তৈয়ারি হইয়া যায়। ভাদ্র আশ্বিন মাসে বাসন্তী রেড়ীর বুনন হয়। ক্ষেত ভাল করিয়া চষিয়া ১॥ বা ২ হাত অন্তর এক একটী বীজ বপন করিতে হয়। কোন কোন স্থানে জমী না চষিয়া কেবল ১ হাত অন্তর একটী গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতেই বীজ বপন করা হইয়া থাকে। বীজ বুনিবার সময় বীজের মুখের দিক নীচে রাখিতে হয়। এক বিঘাতে /৫ সের বীজ যথেষ্ট। যখন গাছ ছোট ছোট থাকে তখন মাঝে মাঝে লাঙ্গল দিলে উপকার দর্শে। লাঙ্গল দিলে ঘাস কম জন্মে গাছের গোড়া আলগা হইয়া গাছের বৃদ্ধি হয় এবং পাশের শিকড় ছিঁড়িয়া গিয়া পাশে ডাল গজাইয়া গাছ ঝাড়াল হয়।

৪। নদীর ধারে দোআঁশ জমীতে রেড়ীর চাষ করিলে কোন সারের বিশেষ আবশ্যক হয় না। বিশেষতঃ যে জমীতে নদীর জল উঠিয়া পলি পড়ে তাহা স্বভাবতই উর্ব্বরা। জমী কম জোর হইলে তাহাতে গোবর সার দিলেই যথেষ্ট হইবে। এক বিঘাতে ৫ হইতে ৭ গাড়ী গোবরসার দিলেই চলিবে। সার প্রয়োগ করিয়া বৃষ্টিপাত হইলেই দুই তিনবার চাষ দিলেই জমী তৈয়ারী হইয়া যাইবে।

৫। বীজ বপনের সময় হইতে ৭।৮ মাসের মধ্যে রেড়ীর বীজ পাকে। তখন রেড়ীর পাতা গুলি গবাদিকে খাইতে দেওয়া হয়। ডাল পালাগুলি জ্বালানি কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়। বীচিসমেত ফলগুলি স্তূপাকারে রাখিয়া তাহার উপর বিচালী চাপা দিয়া জাঁত দিয়া (ভার চাপাইয়া) সপ্তাহকাল রাখিতে হয়। তার পর দুই দিন রৌদ্রে শুকাইয়া কাষ্ঠ দণ্ড দ্বারা ভাঙ্গিয়া দানা বাহির করিতে হয়। একেবারে সব বীজ বাহির হইবে না, যেগুলি হইল ভালই—অবশিষ্ট গুলি আবার রৌদ্রে দিয়া পূর্ব্ববৎ ভাঙ্গিয়া লইলে সমস্ত দানা সংগ্রহ হইবে। কোথাও কোথাও স্ক্রু প্রেস দ্বারা ভাঙ্গিয়া বীজ সংগ্রহ হয়। ঢেঁকি কুটিয়াও বীজ বাহির করা যায়। বীজগুলি ছাড়াইয়া ঝাড়িয়া বাছিয়া লইলে বিক্রয়োপযোগী হইবে।

৬। কলিকাতায় অনেকগুলি রেড়ীর কল আছে এবং কলিকাতায় অনেক রেড়ী আমদানী হইয়া থাকে। রেল ষ্টেশনে মাল উপস্থিত হইবামাত্র অনেক দালাল যাইয়া ভিন্ন ভিন্ন কলের জন্য রেড়ী দানা খরিদ করিয়া থাকেন। কলিকাতায় রেড়ীর কাট্তি খুব। কিন্তু রেড়ী যে পরিমাণে উৎপন্ন হয় তদনুসারে রেড়ীর দরের তারতম্য হইয়া

থাকে। কলিকাতায় রেড়ীর তৈল তৈয়ারি হইয়া বিদেশে রপ্তানি হয়—সুতরাং বিদেশে রপ্তানির পরিমাণে কম বেশীতে রেড়ীর বাজার উঠে ও পড়ে। বঙ্গদেশ হইতে রেড়ীর বীজ বড় বিদেশে যায় না। বোম্বাই ও মাদ্রাজ হইতে অধিক রপ্তানি হয়।

রেড়ীর চাষ করিতে হইলে ভাল বীজ সংগ্রহ করা উচিত। পিরপৈঁতি ও কাহালগাঁর রেড়ী খুব ভাল। অতএব ঐ সকল স্থান হইতে রেড়ীর বীজ সংগ্রহ করা উচিত।

৭। শুদ্ধ রেড়ীর দানা বেচিয়া নিশ্চিন্ত না থাকিয়া রেড়ীর পাতাও একটা ব্যবহারে লাগান উচিত। উত্তর বঙ্গে এবং আসামে এড়ি নামক এক প্রকার রেশম কীট আছে। ইহারা রেড়ীর পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে। এই পোকার গুটী হইতে যে রেশম প্রস্তুত হয়, তাহাতে মজবুত রেশমী কাপড় তৈয়ারি হইতে পারে। আজকাল ভারতবর্ষ জুড়িয়া এড়ি কাপড়ের আদর। রেড়ী চাষের সঙ্গে এড়ি গুটীর চাষ করিতে পারিলে মন্দ হয় না। পোকাতে রেড়ীর পাতা খাইলে কিন্তু রেড়ীর দানার ফলন নিশ্চয়ই কমিয়া যায়। কিন্তু দুই দিক দিয়া লাভ হইলে মোটের উপর অধিক লাভ হওয়াই সম্ভব।

রেড়ীর সার পদার্থ হইল তৈল। রেড়ীর তৈলের ব্যবসায়ে লাভ মন্দ নয়। রেড়ীর তৈলের দর কলিকাতার বাজারে ১২৲ টাকা হইতে ১৮৲ টাকা পর্য্যন্ত মণ হয়। এক বঙ্গদেশ হইতেই অল্পাধিক প্রায় ৩০।৩৫ লক্ষ টাকার তৈল বিদেশে যায়। রেড়ীর খৈলের দাম খুব কম হইলে ৫৲ টাকা হইতে ৬॥০ টাকা মণ। চড়ার বাজারে ৮৲।১০৲ টাকা দর উঠে।

বাগানের মাসিক কার্য্য

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস

সব্জীবাগান—বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতির চারা বসান শেষ হইয়া গিয়াছে। সীম মটর, মুলা প্রভৃতি বোনাও শেষ হইয়াছে। যদি কার্ত্তিকের শেষেও মটর, মুলা, বিলাতী সীম, বোনার কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নাবী জাতীয় উক্ত প্রকারের বীজ এই মাসেও বোনা যাইতে পারে। নাবী আলু অর্থাৎ নৈনিতাল, বোম্বাই প্রভৃতি এই সময় বসান যাইতে পারে। পটল চাষের সময় এখনও যায় নাই। শীতপ্রধান দেশে এবং যথায় জমিতে রস অধিক দিন থাকে—যথা উত্তর-আসামে বা হিমালয়ের তরাই প্রদেশে এই মাস পর্য্যন্ত বাঁধাকপি, ফুলকপি বীজ বোনা যায়। নিম্নবঙ্গে কপিচারা ক্ষেত্রে বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে।

দেশী সব্জী—বেগুন, শাকাদি, তরমুজ, লঙ্কা, ভুঁই শসা, লাউ, কুমড়া, যাহার চৈত্র বৈশাখ মাসে ফল হইবে তাহা এই সময়ে বসাইতে হয়। বালি আঁশ জমিতে যেখানে অধিক দিন জমিতে রস থাকে তথায় তরমুজ বসাইতে হয়। নদীর চরে তরমুজ চাষ প্রশস্ত।

ফুলের বাগান—হলিহক, পিঙ্ক, মিগোনেট, ভার্বিনা, ক্রিসান্থিমম, ফ্লক্স পিটুনিয়া অ্যাষ্টারসম, সুইটপী ও অন্যান্য মরসুমী ফুল বীজ বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। অগ্রহায়ণের প্রথমে না বসাইলে শীতের মধ্যে তাহাদের ফুল হওয়া অসম্ভব হইবে। যে সকল মরসুমী ফুলের বীজের চারা তৈয়ারি হইয়াছে, তাহার চারা এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করিতে হইবে বা টবে বসাইয়া দিতে হইবে।

ফলের বাগান —ফুলের বাগানে যে সকল গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল কার্ত্তিক মাসে তাহাদের গোড়ায় নূতন মাটী দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, যদি না হইয়া থাকে তবে এ মাসে উক্ত কার্য্য আর ফেলিয়া রাখা হইবে না, পাঁকমাটি চুর্ণ করিয়া তাহাতে পুরাতন গোবর সার মিশাইয়া গাছের গোড়ায় দিলে অধিক ফুল ফল প্রসব করে।

কৃষি ক্ষেত্রে—মুগ, মসুর, গম, যব, ছোলা প্রভৃতির আবাদ যদি কার্ত্তিক মাসের মধ্যে শেষ হইয়া না থাকে, তবে এমাসের প্রথমেই শেষ করা কর্ত্তব্য। একেবারে না হওয়া অপেক্ষা বিলম্বে হওয়া বরং ভাল, তাহাতে ষোল আনা না হউক কতক পরিমাণে ফসল হইবেই। পশু খাদ্যের মধ্যে ম্যাঙ্গোল্ড বীটের আবাদ এখনও করা যাইতে পারে। কার্পাস ও বেগুন গাছের গোড়ায় ও নব রোপিত চারায় আইল বাঁধিয়া দেওয়া এ মাসেও চলিতে পারে। যব, যষ্ট, মুগ কলাই, মটর এই সকল রবি শস্যের বীজ বপন এবং পরে গমের বীজ বপন; আলু ও বিলাতী সজীর বীজ লাগান এই মাসেও চলিতে পারে; কপির চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে, তাহাদের তদ্বির করাই এখন কার্য্য। তরমুজ ও খরমুজের বীজ বপন; মূলা, বীট, কুমড়া, লাউ শসা, পেঁয়াজ ও বরবটীর বীজ বপন করা হইয়াছে ঐ সকল ক্ষেত্রে কোদালী দ্বারা ইহাদের গোড়া আল্গা করিয়া দেওয়া; আলুর ক্ষেত্রে জল দেওয়া এই মাসে আরম্ভ হইতে পারে; বিলাতী সজীর ভাঁটিতে জল সিঞ্চন, প্রাতে বেলা ৯টার সময় উদ্ভিদের আবরণ দিয়া সন্ধ্যায় আবরণ খুলিয়া দেওয়া; বার্ত্তাকু, কার্পাস ও লঙ্কা চয়ন ও বিক্রয়; ইক্ষুর ক্ষেত্রে জল সেচন ও কোপান এই সময়ের কার্য্য।

গোলাপের পাইট —কার্ত্তিক মাসে যদি গোলাপের গাছ ছাঁটা না হইয়া থাকে, তবে এ মাসে আর বাকি রাখা উচিত নহে। বঙ্গদেশে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনার সময় কাটিয়াছে। কালী পূজার পর ঐ কার্য্য করিলে ভাল হয়, উত্তর পশ্চিমে ও পার্ব্বত্য প্রদেশে অনেক আগে ঐ কার্য্য সমাধা করা যাইতে পারে। গোলাপের ডাল, "ডাল কাটা" কাঁচি দ্বারা কাটিলে ভাল হয়। ডাল ছাঁটিবার সময় ডাল চিরিয়া না যায় এইটি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হাইব্রিড গোলাপের ডাল বড় হয়, সেই গুলি গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিতে হয়। টীগোলাপ খুব ঘেঁসিয়া ছাঁটিতে হয় না। মারসাল নীল প্রভৃতি লতানীয়া গোলাপের ডাল ছাঁটিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না, তবে নিতান্ত পুরাতন ডাল বা শুষ্কপ্রায় ডাল কিছু কিছু বাদ দিতে হয়। ডাল ছাঁটিবার সঙ্গে গোড়া খুঁড়িয়া আবশ্যকমত ৪ হইতে ১০ দিন রৌদ্র খাওয়াইয়া সার দিতে হয়। জমি নিরস থাকিলে তরল সার, জমি সরস থাকিলে গুঁড়া সার ব্যবহার করা বিধেয়। গামলায় পোড়ামাটি, সরিষার খৈল, গোমুত্র ও অল্প পরিমাণে এঁটেল মাটি একত্র পচাইয়া সেই সার জলে গুলিয়া প্রয়োগ করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। সার-জল নাতি তরল নাতি ঘন হইবে। গুঁড়া সার—সরিষার খৈল এক ভাগ, পচা গোময় সার একভাগ, পোড়ামাটি একভাগ এবং এঁটেল মাটি দুই ভাগ একত্র করিয়া মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। গাছ বুঝিয়া প্রত্যেক গাছে সিকি পাউণ্ড হইতে এক পাউণ্ড পর্য্যন্ত এই সার দিতে হয়। ঐ মিশ্র সারে একটু ভুষা মিশাইলে মন্দ হয় না, ভুষা কলিকাতার বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। প্রতি পাউণ্ড মিশ্র সারে এক প্যাকেট ভুষা যথেষ্ট, ভুষা দিলে গোলাপের রঙ বেশ ভাল হয়। পাকা ছাদের রাবিশের গুড়া কিঞ্চিৎ, অভাবে পোড়ামাটি ও গুড়া চুণ সামান্য পরিমাণে মিশাইয়া লইলে গাছের ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।
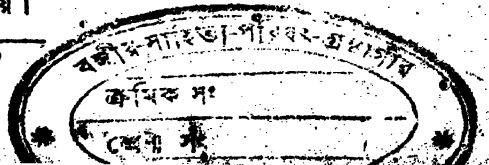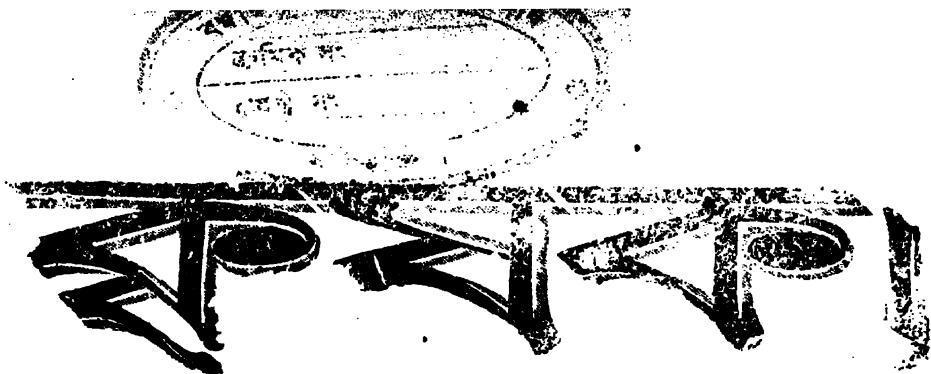
কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

২২ খণ্ড। } কৃষক—পৌষ, ১৩২৮ সাল। } ৯ম সংখ্য।

বস্ত্রাভাব

(কার্পাস চাষের কথা)

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ গুলির দর দিন দিন ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে, এমন কি কোন দ্রব্য দ্বিগুণ ত্রিগুণ কোন দ্রব্য চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, অন্যান্য জিনিস যাহা হউক তাহা হউক ফলতঃ বস্ত্র মূল্য ঠিক চতুর্গুণ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি হইবার আশঙ্কা নিয়তই মানবগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। দেশশুদ্ধ অন্ন বস্ত্রের জন্য হাহাকার উঠিয়াছে। লোকের পেটে অন্ন নাই, পরণে বস্ত্র নাই তদনুসঙ্গিক অন্যান্য জিনিস পত্রাদি অগ্নিমূল্য হওয়ায় লোকে কোন্ দিক সামলাইবে, তাহাদের বামে আনিতে ডাহিনে কুলায় না। দেশের পনর আনা লোকই মধ্য বিত্ত ও গরিব শ্রেণীভুক্ত বাকি এক আনা ধনী লোকের সুলভ বা দুর্ম্মূল্যে তত ক্ষতি বা বৃদ্ধি নাই। ইতর লোকে দিন মজুরীতেও প্রত্যহই যাহা কিছু আয় করিতেছে, কিন্তু ভদ্রলোকের মধ্যে যাহাদের স্বল্প বেতনের চাকরী উপজীবিকা কিম্বা যাহারা পৈতৃক সামান্য জমী জমার উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে অথবা চাকরী জীবির মধ্যে যাহারা কর্ম্ম দোষে বেকারাবস্থায় আছে তাহাদের এই মহার্ঘ্যতায় কিরূপ দুরাবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

কার্পাস আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। বহুপূর্ব্ব কাল হইতে ভারতবর্ষ কার্পাসের জন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল, মনুসংহিতায় কার্পাস সূত্রের উপবীত ধারণ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে বিহিত হইয়াছে। সুতরাং অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে মনুর সময়ও কার্পাসের প্রচলন ছিল। কার্পাসের উপকারিতা যে অশেষ তাহা জগতের কোন জাতিকেই বঝাইতে হইবে না। পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায়

বহু পূর্ব্ব কাল হইতে একমাত্র ভারতবর্ষ মধ্যেই সুন্দররূপে ও বহুল পরিমাণে কার্পাস উৎপন্ন হইত। ভারতবর্ষ হইতে এসিয়া ও ইউরোপের নানা স্থানে এবং আরব, পারস্ত মিশর দেশে কার্পাস প্রেরিত হইত। এমন কি শতাব্দী পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষই সমগ্র পৃথিবীর কার্পাস বস্ত্রের সরবরাহ করিত। দুঃখের বিষয় কাল মাহাত্ম্যে দেশে এখন কার্পাসের চাষ নাই, কার্পাস হইতে সূত্র নির্ম্মাণের বা সূত্র হইতে বস্ত্র প্রস্তুতের উন্নতি কল্পে লোকের তত চেষ্টা নাই। আজ ভারতবাসী বিদেশীয় কার্পাসের ও তদুৎপন্ন বস্ত্রের ভিখারী, যদি পূর্ব্বের ন্যায় দেশে কার্পাস চাষ বর্ত্তমান থাকিত, চরকায় সূতা কাটা হইত, ও তাঁতে বস্ত্র বয়ন প্রচলন থাকিত, তাহা হইলে কি আর আমাদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া ৬।৭ টাকা জোড়া দিয়া বস্ত্র ক্রয় করিতে হইত! যুদ্ধারম্ভ হওয়ার পর হইতে এযাবৎ দেশে যে বস্ত্র কিরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, তাহা আর কাহারও অবিদিত নাই, এই ছয় বৎসরে দেশ উলঙ্গ হইয়া গেল। দেশের প্রায় বার আনা লোকের একখানি ভিন্ন দ্বিতীয় বস্ত্র নাই। গৃহস্থের ঘরে মহিলা কুল যে কি দুরাবস্থায় লজ্জা নিবারণ করিতেছে তাহা ভগবানই জানেন। কত স্থানে বস্ত্রাভাবে কত যে আত্ম-হত্যাদি হইয়া গেল তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কত শত কুলমহিলা লজ্জায় গৃহের বাহির হইতে পারে না।

বিগত শতাব্দী হইতে ভারতে দৈনন্দিন কার্পাস চাষের অবনতি ঘটিতেছে। এবিষয় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এতদ্দেশে পাট ও শন চাষের আধিক্য ও কতিপয় উচ্চ শিক্ষিত লোকের চাকুরী প্রিয়তা ও বাবু গিরীতেই ইহার অবনতি। কেবল পাট ও শন চাষের আধিক্যে যে কার্পাসেরই অবনতি ঘটিয়াছে তাহা নহে। অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ও তৈলশস্য প্রভৃতি সমস্ত জিনিসেরই অবনতি ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান দেশব্যাপী দুর্ম্মূল্যতার করাণই ইহা। অধুনা ভারতবর্ষের লোকের কৃষি-বিজ্ঞান সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। তাহাতে আবার কৃষি বিজ্ঞানভিজ্ঞ অজ্ঞ কৃষকগণের উপরই সম্পূর্ণ কৃষিকার্য্যের ভার ন্যস্ত সুতরাং কৃষির উন্নতি না হইয়া ক্রমশঃ অবনতিই ঘটিতেছে; শিক্ষিতেরা "বাবু" সাজিয়া পরের দ্বারস্থ। বর্ত্তমান যুগে মার্কিন প্রভৃতি দেশে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনে কার্পাস চাষের উন্নতি চেষ্টা করা হইতেছে এবং তজ্জন্যই ঐ সকল দেশীয় কার্পাস গুণে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। এক্ষণে কার্পাস উৎপাদনে ভারতবাসীর দৃষ্টি পতিত হইয়াছে মাত্র বিশেষ কোন চেষ্টা অবলম্বিত হইতেছে কিনা বলা যায় না। প্রজা হিতৈষী সহৃদয় গবর্ণমেণ্টও কার্পাস চাষের প্রচলন জন্য চেষ্টা করিতেছেন। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ হইতে কয়েক বৎসর মার্কিন দেশীয় উৎকৃষ্ট বীজ কৃষকদিগকে বিতারিত হইয়াছিল, কিন্তু দেশীয় অজ্ঞ কৃষকগণের কার্পাস চাষ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা হেতু তাহারা সকলে সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এ বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তির উপদেশ ও যোগদান একান্ত কর্ত্তব্য এবং বাঞ্ছনীয়।

কার্পাস নানা জাতীয়। ইদানীং ভারতবর্ষের নানা স্থানে অত্যল্প পরিমাণ নানা প্রকারের কার্পাস উৎপন্ন হইতেছে। তন্মধ্যে কোন জাতীয় কার্পাস বঙ্গ দেশে সমধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে এবিষয়ে অনুসন্ধান লওয়া ও পরীক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য নিম্ন লিখিত কয়েক জাতীয় কার্পাস এ দেশে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

১। বড় কার্পাস—ইহাকে বোম্বাই বারাম কার্পাস বলে। ইহার গাছ অত্যন্ত বৃহৎ হয়। ১৪।১৫ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। এই কার্পাসের সূত্র মোটা, বীজ গুলি পরস্পর সংলগ্ন অর্থাৎ জোড়া ভাবে অবস্থিত। বীজের গায়ে অধিক পরিমাণে তুলা থাকে, কিন্তু বীজ হইতে তুলা অতি সহজে বিশ্লেষিত হয় না। ইহার পত্রগুলি বড় আকারের স্থল পদ্মের ন্যায় ও পত্রাগ্র পাঁচভাগে বিভক্ত এই জাতীয় কার্পাস এতদঞ্চলে অনেক গৃহস্থ বাটীতে ২।১০ টী করিয়া আছে।

২। ঢাকাই বা ছোট কার্পাস—এই কার্পাসের গাছ এদেশে অত্যল্প দেখা যায়। এই গাছ গুলিতে ৭।৮ বৎসর পর্য্যন্ত ফল দেয়। ইহার গাছ ৬।৭ ফিট লম্বা, পত্র গুলি ছোট ও পত্রাগ্র তিন ভাগে বিভক্ত ইহার সূত্র কোমল, সূক্ষ্ম, ও চিক্কণ এক কালে এই কার্পাসে জগদ্বিখ্যাত ঢাকাই মসলিন প্রস্তুত হইত।

৩। তোলা বা মোটা কার্পাস—ইহা আসাম, শ্রীহট্ট, জলপাইগুড়ী, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানের কোন কোন অংশে জন্মে। ইহার অনেক গুলি ফল হয় এবং উহা খুব মোটা হইয়া থাকে, সূত্রও মোটা হয়, পার্ব্বত্য প্রদেশে ভাল জন্মে।

৪। দেশী বা জেঠুয়া কার্পাস—ইহা বিহার প্রদেশের স্থানে স্থানে জন্মে; গাছ ছোট, সূত্র মোটা ও পরিষ্কার হয়।

এক্ষনে কার্পাস চাষের প্রণালী যৎকিঞ্চিৎ নিম্নে বর্ণিত হইল। যদিও এতদঞ্চলে ইহার চাষের বাহুল্য নাই, তথাপি গৃহস্থ বাটীতে আমরা যাহা সামান্য পরিমাণে রোপণ করিয়াছি, তাহাই এস্থলে লিখিত হইল।

দোয়াঁশ মৃত্তিকাই কার্পাস চাষের উপযোগী বাতাতপ সঞ্চার বহুল উন্মুক্ত উচ্চ ভূমি ও যে জমীতে নানা প্রকার তরি তরকারী উৎপন্ন হয় এবং যে জমীতে আশুধান্য, কপি, ফুল, ফল, আলু, ইক্ষু, পাট প্রভৃতি জন্মে সেরূপ মৃত্তিকাতেই কার্পাস চাষ করা আবশ্যক। উদ্ভিজ্জ বহুল মৃত্তিকা বা অনাবাদী জঙ্গলময় পতিত জমীতেও বেশ জন্মিতে পারে। মৃত্তিকায় বালির পরিমাণ, বেশী হইলে ঘন ঘন জল দেওয়ার আবশ্যক হয়। মাঘ বা ফাল্গুন মাস হইতে বৃষ্টি পতন হইলেই সুবিধা বুঝিয়া বৈশাখ পর্য্যন্ত প্রতিমাসে ২।৩ বার করিয়া গভীর রূপে জমীতে চাষ দেওয়া আবশ্যক। কর্ষনের পর মই দিয়া মৃত্তিকা সূক্ষ্ম রূপে চুর্ণীকৃত করা আবশ্যক। তৎপরে বৈশাখ মাসের মধ্য ভাগে প্রথম বৃষ্টিপাত হইলেই ৩।৪ হাত অন্তর দুই সারি বান্ধিয়া প্রত্যেক সারিতে ৩।৪ হাত অন্তর এক ইঞ্চ গভীর এক একটী গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে ৪।৫টী বীজ রোপণ করিতে হইবে।

রোপণের জন্য বীজগুলি উৎকৃষ্ট ও নূতন চাই। একেবারে বীজ সারিতে বপন বা হাপরে চারা তুলিয়া সেই চারা প্রত্যেক সারিতে একটী করিয়া বেশ সুপুষ্ট গাছ ৩।৪ হাত অন্তর রোপণ করিলেই চলিবে। তবে আষাঢ় মাসে এই কার্য্য শেষ করিতে হইবে। চারা নাড়িয়া রোপণ বা ক্ষেত্রে একেবারে বীজ বপন উভয়েরই ফলন একরূপ হইবে।

প্রতি বিঘায় দেড় পোয়া পরিমাণ বীজ লাগে, রোপণের পূর্ব্বে অত্যল্প পরিমাণ তুঁতিয়া মিশান ঘন গোময় জলে বীজ গুলি ভিজাইয়া রোপণ করিলে তদুৎপন্ন গাছ গুলি সতেজে বৃদ্ধি হইবে ও কীটাদি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। বর্ষাকালে কার্পাস গাছ সতেজে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই সময় মধ্যে মধ্যে নিড়াইয়া আগাছা পরিষ্কার ও মৃত্তিকা শিথিল করিয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন পাইটের আবশ্যক করে না। গাছ গুলির উভয় পার্শ্বে নালা কাটিয়া মাটি গুলি গাছের গোড়ায় দিতে পারিলে বর্ষার অতিরিক্ত জল নির্গমনের সুবিধা হয় ও প্রবল ঝড় বাতাসে বৃক্ষ পতিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। আবার শুকার সময় ঐ নালাতে জল সেচন করিলে তাহাতে গাছের বিশেষ উপকার সাধিত হয়। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে গাছের শাখার অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া দিলে ঝাড় বান্ধে ও ফলন বেশী হয়। ইহার জমীতে সার দেওয়া আবশ্যক। উপযুক্ত সার পাইলে ফলনও অধিক হয়। গোময়, গোমূত্র, পচা পাতা, নীলের শিটী প্রভৃতি সুলভ ও সহজ লভ্য সারই বিশেষ উপযোগী। ভূমি উর্ব্বরা ও উত্তমরূপে কর্ষিত হইলে বিনা সারেই প্রথম বৎসর সুফলপ্রদ হয়, কিন্তু গাছ গুলি যত দিন বাঁচিবে, তত দিন পূর্ণ ফসল প্রাপ্তির ইচ্ছা করিলে দ্বিতীয় বৎসর হইতে প্রত্যেক চৈত্র বা বৈশাখ মাসে জমীতে সার দেওয়া উচিত। তাহা হইলে বর্ষাকালে উহা পচিয়া বৃক্ষের পোষনোপযোগী হইবে। সার দিতে না পারিলে ভাল ফলন হইবে না। ক্ষেত্রে জল সেচনের আবশ্যক হয় না, তবে জমী নিতান্ত শুষ্ক ও গাছ সতেজে বর্দ্ধিত হইতেছে না দেখিলে প্রয়োজন মত জল সেচন করিতে হইবে।

যেখানে গাছগুলি সতেজে বৃদ্ধি হইয়া ৬।৭ হাত উচ্চ ও ঝোপ হইবে, তুলা সংগ্রহ হইবার পরই সেই গাছগুলি ছাঁটিয়া দিবে, আবশ্যক বোধ করিলে দুইটী গাছের মধ্যস্থ একটী গাছ কাটিয়া পাতলা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। নতুবা পর বৎসরে ঘন সন্নিবিষ্ট গাছে অত্যন্ত আওতা হওয়ায় ফলন অল্প হইয়া পড়ে। মূল কাণ্ডের দুই হস্ত মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া সমস্ত অংশ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা ছাঁটিয়া দেওয়া উচিত যাহাতে কোনরূপ গাছের শাখাগুলি ফাটিয়া না যায়। ফাটিয়া গেলে সেই শাখাটী শুকাইয়া যাইবে, তাহাতে নূতন পত্রোদ্গমাদি হইবে না। এমন কি এইরূপ ২।৩টী শাখা ফাটিয়া গেলে সেই গাছটী একেবারেই মরিয়া যাইবে। পুরাতন শাখার ফলন কম হয়। ও উৎপন্ন তুলা ও গুণে তত ভাল হয় না। ছাঁটিবার পূর্ব্বে বা পরে ক্ষেত্রটী কোপাইয়া

তাহাতে সার মিশাইতে হইবে, ইহাতে গাছের তেজ বৃদ্ধি হইবে। ঘন সন্নিবিষ্ট শাখার দুইটী গাছের মধ্যস্থ একটী গাছ কর্ত্তন করিয়া ফেলিলে সহজেই রৌদ্র ও বায়ু চলাচল করিতে পারে ও ঐগুলি সুন্দররূপে বর্দ্ধিত হয়। গাছ কাটিয়া পাতলা করিলে গাছের অল্পতা জন্য ফশলের কোন হানি হইবে না, অধিকন্তু কর্ত্তিত গাছগুলি জ্বালানী কাষ্ঠ জন্য ব্যবহৃত হইবে। অথবা মোটা শাখাগুলি ছোট ছোট খণ্ড করিয়া গর্ত্ত মধ্যে পুড়াইয়া লইলে সুন্দর তামাক খাওয়ার কয়লা হইবে, ইহা টিকে অপেক্ষাও তেজস্কর হইবে ও শীঘ্র আগুন ধরিবে।

অগ্রহায়ণ মাস হইতে ক্রমাগত ৩।৪ মাস পর্য্যন্ত ফলগুলি পরিপক্ক হইয়া ফাটিতে থাকে, তখনই বাছিয়া ফাটা ফলগুলি সংগ্রহ করিবে। প্রাতঃকালে তুলায় হিমজল মিশ্রিত থাকে, এই সময় সংগ্রহ করিলে দাগী হইতে পারে, সুতরাং বৈকালেই সংগ্রহ করিবে। একবারে সমস্ত ফল পরিপক্ক হয় না বলিয়া ২।৩ দিন অন্তর ফাটা ফলগুলি তুলিয়া ঝুড়িতে রাখিবে। ফাটা ফল তুলিবার পরেই তুলা ছাড়াইলে সমস্ত তুলা ছাড়াইয়া আইসে বীজ গাত্রে কিছুই লাগিয়া থাকে না। তুলা গুলির আঁইশ পাতলা করিবার জন্য ৩।৪ দিন রৌদ্রে বেশ করিয়া শুকাইয়া লইবে। প্রতি গাছ হইতে অন্যূন এক পোয়া হইতে অর্দ্ধ সের বা তিন পোয়া তুলাও সংগ্রহ হইতে পারে।

শ্রীগুরু চরণ রক্ষিত।

কামরাঙ্গা

আমাদের এই বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই যথেষ্ট কামরাঙ্গার গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার গাছ দেখিতে অতি সুন্দর এবং বাগানে লাগাইলে বাগানের শোভা বৃদ্ধি হয়। যখন কামরাঙ্গার ফল গুলি পাকিয়া উঠে তখন গাছটী ফলে ও পত্রে সুশোভিত হইয়া বড়ই সুন্দর দেখায়। ইহার প্রাকৃতিক শোভায় তখন সকলেই বিমোহিত হইয়া থাকে।

কামরাঙ্গা অম্ল রসাত্মক ফল, * তবে পরিপক্ক হইলে খাইতে অপেক্ষাকৃত সুস্বাদু হয়। কামরাঙ্গায় অম্লরসের আধিক্য হেতু পীড়াদায়ক বলিয়া অনেকেই ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু সুপ্রণালীমত প্রস্তুত হইলে ইহা রসনা তৃপ্তিকর অরুচি নাশক খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

কামরাঙ্গায় নানা প্রকার অম্ল মধুর, সুখাদ্য বস্তু প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুপ্রণালী

---

* কামরাঙ্গা ফলের উৎকর্ষ হইয়া এক জাতীয় অতি সুমিষ্ট কামরাঙ্গার সৃষ্টি হইয়াছে। এই কামরাঙ্গা খাইতে অতি সুস্বাদু এবং উহা মধুর রসে রসাল। ইহা সুমিষ্ট উত্তম ফলের মধ্যে স্থান পাইবার উপযুক্ত। এই কামরাঙ্গার কলম ভারতীয় কৃষি সমিতির বাগানে পাওয়া যায়। কৃঃ সঃ।

মত প্রস্তুত করিলে ইহার নানা প্রকার চাটনী ও মোরব্বা হইতে পারে। সুপক্ক কামরাঙ্গা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া সিরাপ বা ভিনিগারে কিছু দিন ভিজাইলে ইহাতে উৎকৃষ্ট মোরব্বা প্রস্তুত হয়, বিদেশে রপ্তানী করিতে পারিলে বোধ হয় ইহার বেশ কাটতি হইতে পারে। ব্যবসায়ীর চক্ষে কামরাঙ্গার পাতাও যথেষ্ট মূল্যবান, ইহা হইতে এক প্রকার উজ্জ্বল হরিদ্রা বর্ণের রং প্রস্তুত হইতে পারে, তদ্ভিন্ন মূল, পত্র, ত্বক নানাবিধ পীড়ায় ঔষধ রূপে ব্যবহৃত থাকে।

দোঁয়াশ ও পলী মৃত্তিকাই কামরাঙ্গা গাছের পক্ষে প্রশস্ত। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে ইহার চারা বা কলম রোপণ করিতে হয়, ইহার বীজেই গাছ উৎপন্ন হয়। তবে বীজের চারা অপেক্ষা কলমের চারায় ফল বড় ও অপেক্ষা কৃত অম্লের ভাগ কম হয়। গুল কলমেও চারা উৎপন্ন হইবে। চারা রোপণের ২।৩ বৎসর পরেই গাছ ফলবান হয়। গাছের গোড়া মধ্যে মধ্যে খুঁড়িয়া সার মাটী দিলে গাছের খুব তেজ হয় ও শীঘ্রই বাড়িয়া উঠে। গাছের মূলে বর্ষার বা বৃষ্টির জল বসিলে গাছের অনিষ্ট হয়, সেই জন্য গাছের মূলে জল বসিতে দেওয়া উচিত নহে।

সামান্য যত্ন করিলেই এরূপ আবশ্যকীয় গাছ সকলেই নিজ নিজ বাটীতে ২।১ টী জন্মাইয়া ইহার উপকারিতা সম্যক পরীক্ষা করিতে পারেন। ইহার কলম স্বল্প মূল্যেই ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত।

স্বাবলম্বন

যশোহর মাগুরার যদুনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় জন্মান্ধ। তিনি নিজের বুদ্ধি, পরিশ্রম ও প্রতিভাবলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উকীল হইয়াছিলেন। কেবলই ব্যবহার শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন না, তিনি অশেষ মনীষার আধার। তিনি অনেকগুলি উপন্যাস পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত পুস্তক তাঁহাকে সুধী সমাজে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তিনি জন্মান্ধ হইলেও তাঁহার অন্তর্দৃষ্টী যে অতি প্রবল ছিল তাহা তাঁহার প্রণীত পুস্তক পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

তাঁহার প্রণীত "সোণার সংসার" একখানি উপাদেয় গার্হস্থ্য উপন্যাস। উক্ত গ্রন্থে নীচজাতীয়া ধীবর কন্যা শান্তির চরিত্র অতি নিপুণ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শান্তি বালবিধবা, শৈশবে পিতৃহীনা। মাতাকে মাত্র অবলম্বন করিয়া কেবলমাত্র যৎসামান্য জমির উৎপন্ন ফসলের দ্বারা কেমন করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া

অন্যের উপকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল গ্রন্থকর্ত্তা তাহা অতি নিপুণ ভাবে দেখাইয়াছেন। কাল্পনিক চরিত্র শান্তির ন্যায় সহায়হীনা বালবিধবা এই পার্থিব জগতে অভাব নাই। অপরের গলগ্রহ না হইয়া কেবলমাত্র নিজের পরিশ্রমের দ্বারা এবং একমাত্র চাষ আবাদের সাহায্যে জীবিকা নির্ব্বাহের যে উপায় গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন তাহা শান্তির সম-অবস্থাসম্পন্ন স্ত্রীলোক কেন পুরুষেরও অবলম্বনীয় বোধে উক্ত গ্রন্থ হইতে সেই অংশ এক্ষণে উদ্ধৃত করিলাম। আশা করি পাঠকগণ ইহাতে উপকৃত হইবেন।

কাজ জানিলে কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কাহারও পক্ষে বিংশতি বা পঞ্চ বিংশতি মুদ্রা আয় করা কঠিন নহে। কার্য্য শিক্ষার অভাবে স্ত্রী স্বামীর মুখাপেক্ষী এবং স্বামী পরের মুখাপেক্ষী। আমাদের বঙ্গদেশে সকলেরই একখানি করিয়া বাড়ী আছে। একবিঘা বা দুই বিঘা জমি কিছুদিনের জন্য কৃষিকার্য্যের জন্য লওয়া সকলের পক্ষেই সম্ভব। পাঠক পাঠিকা শান্তির কার্য্য দেখুন। শান্তি ধনশীলা নহেন সত্য, কিন্তু অভাবগ্রস্থ নহেন। শান্তি আট বৎসর বয়সে বিধবা হয়েছে, সে শ্বশুরালয়ে কিছুমাত্র সম্পত্তি পায় নাই। শান্তির ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে তাহার পীতা ইহলোক ছাড়িয়াছেন; পিতার মৃত্যুর পর শান্তি ও শান্তির মাতা পাইল একখানি নদীতীরস্থিত দুই বিঘার বাড়ী। বাড়ীতে কয়েকখানি ঘর ভিন্ন তৃণ লতাপাতাও ছিল না। তাহারা আরও পাইল একগাছি জাল, একটি গাভী গরু তাহার কোলে একটি এঁড়ে বাছুর। ঘরের চার মণ ধান ও নগদ দুটি টাকা ও সামান্য ঘটী, বাটি, তৈজসপত্র। একখানি ঘর ও এঁড়ে বাছুর বেচিয়া ঘরের ধান্য ও কতক তৈজসপত্র শান্তি পিতৃশ্রাদ্ধ করিল, এখন তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয় কিসে? এপর্য্যন্ত শান্তি মাতাসহ পিতৃ অনুজ্ঞা পালন করিত এবং পিতৃ আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিত, এক্ষণে তাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে নূতন, তাহারা মাতাকন্যা উভয়েই স্বাধীনচেতা। তাহারা পরমুখাপেক্ষী হওয়া অপেক্ষা মৃত্যুকে শ্রেয়ঃ মনে করে। মাতা কন্যায় পরামর্শ করিল, তাহারা স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

মাঘমাসে শান্তি পিতৃহীন হইয়াছে। পিতৃশ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে, আর ঘরে কিছু নাই! তাহারা গাভী বিক্রয় করিল। বাঁশ কিনিল, বাড়ী ঘিরিল। তাহারা উভয়ে কোদাল ধরিয়া সকল বাড়ী কোপাইল। মাটী পরিষ্কার করিয়া ধুলা ধুলা করিয়া ফেলিল। তাহারা নানা জাতীয় কলার চারা আনিয়া কলার চারা, মরিচের চারা, কুলের চারা ও পঞ্চবটী করিবার জন্য নিম, বেল, হরীতকী, প্রভৃতি বৃক্ষের চারা আনিয়া রোপণ করিল। তাহারা বনে বনে ঘুরিয়া লোকের অগ্রাহ্য রচনা, হরীতকী, বয়ড়া, আমলকী, চালতা, কুল, পিপুল, চই কুড়াইতে লাগিল ও শুকাইতে লাগিল। তাহারা রাত্রে জাল, শিকা, শনের দড়া, পাটের দড়া প্রস্তুত করিতে লাগিল। তাহারা বয়ড়ার

তেল করিতে লাগিল, কুল চাল্‌তার গুঁড়া করিতে লাগিল, প্রদীপে জ্বালাইবার জন্য তাহাদের বয়ড়ার তৈল সুলভ দরে সকলেই কিনিতে লাগিল; তাদের কাঁথা, দড়ী সকলেরই নিকট আদরনীয় হইতে লাগিল, তাহাদের চাল্‌তা ও কুলের গুঁড়া লোকে আচার করিবার জন্য ক্রয় করিতে লাগিল, তাহাদের শুষ্ক হরীতকী, আমলকী প্রভৃতি বণিকগণ সেরদরে খরিদ করিতে লাগিল। কোনমতে মাতা কন্যার গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে লাগিল।

বৈশাখ মাস আসিল মধ্যে মধ্যে ধরিত্রী বৃষ্টি জলে গ্রাস করিতে লাগিলেন। শান্তি বাড়ীর উত্তর প্রান্তে ছয় ঝাড় বাঁশ রোপণ করিল। তাহাদের লঙ্কার গাছে অল্প অল্প লঙ্কা ধরিতে লাগিল; কতক কাঁচা বিক্রয় করিতে লাগিল, কতক শুকাইতে লাগিল। জৈষ্ঠ মাস আসিল, শান্তি ভাল ভাল আম কাঁঠালের বীজ রোপণ করিল, দুইএক গাছে কলার কাঁদি পড়িতে লাগিল। আষাঢ় মাসে শান্তি নারিকেল গুপারির গাছ রোপণ করিল ও নিচু,কুল, প্রভৃতি গাছের সন্ধান করিতে লাগিল। এ সময়ে লঙ্কা সুলভ হইয়া পড়িল, মাতা কন্যার গ্রাসাচ্ছাদন আর চলে না। শান্তি ধান কিনিয়া চাল, মুড়ী, চিঁড়া প্রভৃতি বিক্রয় করিতে লাগিল এবং কলাই কিনিয়া ডাল বিক্রয় করিল। আষাঢ় মাসের শেষ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত শান্তির বাড়ী বৃন্দাবন হইয়া উঠিল। তাহার উচ্ছে, পটোল, বেগুণ, ঝিঙ্গা, কাকরোল, ধুন্দুল, পোন্না, ডাঁটা, পুঁইশাক মিষ্ট ও চাল কুষ্মাণ্ড সকলে আদর করিয়া কিনিতে লাগিল। আশ্বিন মাসে শান্তির কিছু পাকা ও কাঁচা কলা বিক্রয় হইল; কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে কেবল লাউ, বেগুণ বিক্রয় হইল। পৌষমাস হইতে শান্তির বাটীর মুলা পালম শাক ও ছিল, লাউ, বেগুণ গ্রামের সকলেই কিনিতে লাগিল। এইরূপে তরীতরকারী লঙ্কা প্রভৃতি বিক্রয়লব্ধ অর্থে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন এবং দড়া, জাল, কাঁথা প্রভৃতি বিক্রয়লব্ধ টাকায় তাহাদের বস্ত্রাদি ক্রয় ও গৃহ সংস্কারের কার্য্যে ব্যয় হইত।

ক্রমে শান্তি পুতুল, প্রদীপ, মেটে ভাঁড়, মেটে বাটি গড়িতে পোড়াইতে ও রং করিতে শিখিল, বাঁশের চুব্‌ড়ি, ঝুড়ি, সাজী বুনিতে শিখিল; বেতের বাক্স, পেটরা, ঝাঁপি প্রস্তুত করিতে শান্তির শিক্ষা হইল বটে, কিন্তু অভাবে সকল সময়ে করিতে পারিত না।

পিতৃবিয়োগের পর দ্বিতীয় বৎসরে শান্তির অনেক অভাব দূর হইল, শান্তি গাভী কিনিল, শান্তির বাগানে যথেষ্ট কলা হইতে লাগিল, মাতা কন্যা সর্ব্বদা বাগানে পড়িয়া থাকে, আম কাঁটালের গাছের গোড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ও গোড়ায় সার মাটী আনিয়া দেয়, তরকারী বাগান তৃণশূন্য করে এবং বাগানের ঘাসে ও কদলীপত্রে গাভীর পূর্ণমাত্রায় ভোজন হয়। দ্বিতীয় বৎসরের শেষে শান্তির পেয়ারা গাছে দুই একটা পেয়ারা ধরিল।

তৃতীয় বৎসরে পেয়ারা গাছে খুব পেয়ারা ধরিল, অনেক আম গাছে বৌল আসিল এবং ২।১টা গাছে ২।১ টা আমও ধরিল ; ২।১টা কাঁঠাল গাছে কাঁঠালও ধরিল।

চতুর্থ বৎসরে শান্তির নারিকেল গুপারি ভিন্ন সকল গাছ ফলিল, তবে ফল যখন প্রথমে ধরে কিছু কম কম।

ষষ্ঠ বৎসরে শান্তির নারিকেল গুপারি গাছও নধর হইল। সপ্তম বৎসরে বাটীর দ্রব্যের খবরটি পাঠককে দিব :—

বাঁশ ১৮৲, নারিকেল ৬০৲, নারিকেলের পাতা হইতে ঝাটার শলা ১২৲, গুপারি ১৮৲, কাঁঠাল ৭২৲, আম ১৪৲, আমসত্ত ৮৲, আমসি ৩৲, পেয়ারা ৪৲, কুল ২৲, নিচু ৩৲, আমরুল ৪৲, বেল ১৲, আতা ৫৲, নোণা ৸০, কাগজি নেবু ৩।০ পাতি নেবু ১।০, বাতাবি ။৵০, বুনা নেবু ।৴, গোড়া নেবু ।৶০, কলা ১৫৲, লঙ্কা মরিচ ১২৲, সর্ব্ববিধ তরকারি ২০৲। মোট ৩০২॥৶০। এছাড়া শান্তির ফল অনেক দান বিতরণ ছিল। এই সময় পুতুল প্রদীপ হইতেই শান্তির আয় কিছু কিছু হইত।

শ্রীশীতলচন্দ্র সরকার
সেক্রেটারী, ঘাটাল থানার কৃষি-সমিতি।

ডেয়ারি-ফার্ম্মিং এবং পক্ষি চাষ

যদি ভারতীয় গোজাতির উন্নতি করিতে হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রে লিখিত বিষয়গুলি অনুধাবন করিতে হইবে। তাহা ছাড়া উল্লিখিত "গোপালবান্ধব" পুস্তক পাঠ করিতে বলি, এবং আমার স্বদেশী ভায়াদের বলি যে ঐ পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ যাহা চিকিৎসা সম্বন্ধীয়, মাত্র কেবল অর্থ সাহায্য দানে প্রকাশ করিয়া ভারতবাসীর মধ্যে প্রচার করুন। ইহা লাভের জন্য নহে শিক্ষার জন্য; আমার আরও আবেদন যে শিক্ষা বিভাগ এই পুস্তকটীকে পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে আশু তালিকাভুক্ত করুন। হীনবল দুর্ব্বল বাঙ্গালায় গাভীর শরীরে তেজী পাশ্চাত্যদেশের গাভীর শোণিত প্রবেশ করাইয়া নির্ব্বাচন ও পৃথক করন বিধির দ্বারা গোজাতির উন্নতি ও দুগ্ধ দায়িকা গুণের উন্নতি করিতে হইবে। সকল বিষয় আমার লিখিত প্রবন্ধগুলিও গোপাল বান্ধব পাঠে জানা যাইবে তাই বলি যে হে ভাই সহৃদয় বঙ্গবাসী ধনী দরিদ্র, আপনারা এদিকে দৃষ্টিপাত করুন।

আমাদের দেশে ডেয়ারি ফার্ম্মিং নাই কেন? তাহার উত্তর বড় বেশীদূর গিয়া

খুঁজিতে হয় না, তাহার বহু কারণের মধ্যে আমি নিম্নলিখিতগুলি প্রধান বলিয়া মনে করি :—১ শিক্ষার অভাব, পরিচারকের অভাব, রাজা এবং প্রজার অলসতা অসাবধানতা, দেশের নিস্বতা, চারণাভাব, খোঁয়াড় আইনের তীব্রতা, হিন্দু-মুসলমানে দ্বেষ, অবাধ গোহনন, অবাধ বিদেশে রপ্তানি, উচ্চ লবণ শুল্কের হার, সংজনন নীতির অনভিজ্ঞতা, বৃষের অভাব এবং দেশের গোয়ালাগুলির বিচ্ছিন্ন অবস্থান ইত্যাদি। দেশের সময় আসিয়াছে যে দেশের লোকগণ বিশেষতঃ নেতাগণ এদিকে দৃষ্টি ও চিন্তাদান করেন। আগে খাওয়া এবং পরিধান ও জীবন-ধারণ, তারপর রাজনৈতিক আন্দোলন, কৌটিল্যের যুগের মত আমাদের বর্ত্তমান সময়ে "গো অধ্যক্ষ" নাই। এরূপ অধ্যক্ষ দিনামার দেশ ও আমেরিকায় নিশ্চয়ই আছে; ইউরোপে ও পাশ্চাত্য খণ্ডে সকল দেশেই ডেয়ারি বিষয় শিক্ষার স্থান আছে। আমাদের দেশে ডেয়ারি কাজ শিক্ষা করিবার কোন স্থান নাই; শিক্ষা দিবার কোন লোকও নাই। পাকা গোতত্ত্ববিদ গোচিকিৎসক, গোসংজনন নীতিজ্ঞ, খাদ্য মিশ্রক গোসেবক এবং গোসম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়জ্ঞ এরূপ লোক আমাদের দেশে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাই বলি যে আমাদের দেশের নেতাগণ একবার দীন কৃষকদের শিক্ষার জন্য মাথা ঘামান যাহাতে দেশে কৃষিশিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা আশু হয়, তাহার উপায় চিন্তা করুন; স্যার আশুতোষ, স্যার নীলরতন, স্যার সর্ব্বাধিকারী, মিঃ চিত্তরঞ্জন, ডাঃ প্রথমনাথ, বাবু বসন্তকুমার প্রভৃতি বঙ্গমাতার হিতৈষী সন্তানগণ এদিকে মনোযোগ দিন এই আমার প্রার্থনা।

এইবার ২।৫ কথা পাখীচাষ সম্বন্ধে বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। পাখী চাষে সাফল্য লাভ করিতে হইলে খুব ধীরতা শান্ত প্রকৃতি, পরিশ্রমী লোক চাহি এবং সকল বিষয়ে পরিচ্ছন্নতা খুবই আবশ্যক। পালককে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতে হইবে যাহাতে সংক্রামক রোগ পাল মধ্যে প্রবেশ না করে, পাখীগুলির শোণিত বিশুদ্ধ থাকে; বেশী ডিম দেয় এবং তেজস্কর ছানা ফুটে ও তাহারা শীঘ্রই বড় হয়, শীঘ্র শীঘ্র হাটে পাঠান যাইতে পারে। আমার মনে হয় যে বাঙ্গালা দেশের মধ্যবিত্ত লোকগণ এত অর্থের জন্য লালায়িত, তাহারা তাহাদের মুসলমান ভায়েদের সঙ্গে সমবেত হইয়া ২।৫ জন করিয়া একত্রে ৩।৫ হাজার টাকা লইয়া পাড়াগাঁয়ে ছোট ছোট বাগানে বা পতিত জমিতে বা বড় বড় দিঘির উচ্চ পাড় ভূমিতে দেশী বা বিলাতী মুর্গি আনাইয়া কল সাহায্যে বেশ কারবার করিতে পারিবেন। পাখী, কলকব্জা, গাভী; বৃষ ইত্যাদি পাখী চাষ বা ডিয়ারি ফার্ম্মিংএর যাহা যাহা আবশ্যক পুস্তক আদি সহ আমি আনাইয়া দিতে পারি। সডাক পত্রে আমার সহিত চুক্তি স্থির করিয়া লইতে হয় বা সাক্ষাৎ করিয়া কথা বার্ত্তা কহিয়া লইতে হয়। এইরূপ করিলে আমার মনে হয় যে, কম লাভের বিষয় হয় না।

তবে সর্ব কাজে যেমন এখানেও তেমনি ; পরিশ্রমী ও ধার্ম্মিক লোক চাই। মুর্গি পালন ভিন্ন, মেজ মুক্ত বা ছানা উৎপাদনের জন্য যত্ন চাই ; সে সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ চয় নবযুগ কৃষিকথা, কৃষক, কৃষিসম্পদ আদি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এইগুলি আমার নিজ অভিজ্ঞতা ও পাশ্চাত্যদেশে লব্ধ জ্ঞানের উপর লিখিত। আমার একান্ত ইচ্ছা যে কোন দেশহিতৈষী মহোদয় এইগুলি সংগ্রহ করিয়া দেশমধ্যে প্রচার করুন ; ইহা সাম্প্রদায়িক কাজ নহে, ইহা জাতীয় কাজ, ইহা ব্যবহারিক জ্ঞান প্রচারের অঙ্গীভূত কাজ।

জলচর পাখী বা হাঁস পোষা একটি বেশ লাভজনক ব্যবসা আমাদের দেশে আরম্ভ করা যাইতে পারে। আমাদের দেশের হাড়ীবাগদী পোদ ইত্যাদি জাতিগণ ও নিম্ন মুশলমানগণ পাড়াগাঁয়ে ২।১০ টা হাঁস পুষিয়া ছানা তুলিয়া বাজারে হাটে বেচিয়া দুপয়সা আয় করিয়া থাকে এবং ডিমও বেচিয়া থাকে। বিগত কয় বৎসর হইতে মাংস ও ডিম খাদকের সংখ্যা খুবই বাড়িয়াছে। আমার মনে হয় যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্য সমিতি করিয়া ২।৫টি করিয়া প্রত্যেক গ্রামের নিম্ন গৃহস্থ পরিবারগণ বালক ও বালিকাদের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করাইয়া পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে জলচর পাখী পোষার ব্যবসা বেশ লাভজনকরূপে চালাইতে পারেন এবং এক একটি কল লইয়া ছানা তুলিয়া বেশ লাভ করিতে পারেন।

এই সম্বন্ধে ভ্রমণশীল লেকচার দিবার ব্যবস্থা মাননীয় ফজলহক, আবুল কাশীম, মুর্শিদাবাদের ও পাবনার তথা ঢাকার নবাব বাহাদুরগণ মুসলমান সম্প্রদায়ের জীবন রক্ষার জন্য ও মিঃ চিত্তরঞ্জন দাশ, ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, স্যার নীলরতন সরকার, প্রমুখ দেশীয় নেতাগণ জাতীয় শিক্ষা বিদ্যালয় প্রারব্ধ করিলে বস্তুত দেশের উপকার করেন তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং স্যার রাসবিহারী দত্ত টাকায় এই কাজ বেশ ভালরূপ সম্পাদিত হইতে পারে। ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষিগণের কি এদিকে কৃপাদৃষ্টি পড়িবে? বন্ধু ও আত্মীয় পালনে অযথা অর্থ ব্যয়িত না করিয়া এদিকে ঐ অর্থের কিঞ্চিৎ অংশ ব্যয় করিলে দেশের গরীব কৃষকদের প্রকৃত হিত সাধন করা হয়।

জলচর পাখী পালনের মধ্যে পাতীহাঁস, রাজ হাঁস, ও সোয়ান পালন বিশিষ্ট। পাতী হাঁস, চীনা, আইলবেরী, রাউয়েন, মস্কোভি, ইণ্ডিয়া রানার জাতীয় হইয়া থাকে। আমাদের দেশে কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চীনা জাতিই আমরা দেখিতে পাই। সডাক পত্র দিলে আমি অপর জাতীয়গুলিও আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি। এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে "Hurst's utility Duclro & Geese" পাঠ করুন তাহা ছাড়া American Poultry Book of Perfection পাঠ কর।

হাঁসী ২৮ দিনে ডিম ফোটায়। নবজাত ছানাগুলার খুবই যত্ন ও মুহুর্মুহু কাটা পৌটা

সামুক গুগলীচূর্ণ খাওয়াইতে হয় এবং বাজ, চিল, ইন্দুর, শিকরা সাপ, খটাশ, বিড়াল আদি শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করিতে হইবে। ছানাগুলিদের জলে এক মাস কাল পর্য্যন্ত ছাড়িবে না, তাহা হইলে ঠাণ্ডা লাগিয়া এক একদিন ২০০।৫০০ করিয়া মরিয়া যাইবে এবং পাল উজাড় হইয়া যাইবে। আমার মনে হয় খাল বিল নদীর ধারে আবাদের দেশে হাঁসের কারবারে বেশ লাভ করা যাইতে পারে।

পাশ্চাত্য দেশে কল সাহায্যে আজকাল খুব বেশী মাত্রায় হাঁস উৎপন্ন করা হয়। কলের মধ্যে সাইফার, কাণ্ডি, পেটালুমা; বাক্‌আই, প্র্যাট, মাল্‌টার বর্গেশ আদি উৎপাদকগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাজ হাঁসের চাষও আমাদের দেশে অল্পবেশী মাত্রায় হইয়া থাকে। সাদা ও কাল, রাজ হাঁস আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায়, সাদাগুলিকে এম্‌ডেন ও কালগুলিকে টুলুজ বলিয়া থাকে; ইহা ছাড়া রোমীয় এবং কানেডিয়া রাজহংস জাতিদ্বয়ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজ হাঁসী ৩০ হইতে ৩২ দিনে ডিম ফোটাইয়া থাকে। মুর্গীর নীচে ইহাদের ডিম বসাইয়া ছানা তোলারও বিশেষ ব্যবস্থা আমাদের ও পাশ্চাত্য দেশে আছে।

সোয়ানও কাল ও সাদা বর্ণের হইয়া থাকে; কাল সোয়ান অনেকেই কলিকাতার জু বাগানে দেখিয়া থাকিবেন, ইহারা অষ্ট্রেলিয়া দেশ হইতে আনীত হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশে ইহারা ছানা ফুটাইয়া থাকে। বিলাত ও আমেরিকাদি পাশ্চাত্য দেশে সাদা সোয়ান ঝিল সাজান বা বাগান সাজান উপলক্ষে পোষা হইয়া থাকে। ইহারা বড় দামী। ইহাদের পালকে কুইল পেন প্রস্তুত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ

অধ্যক্ষ প্রকাশচন্দ্র সরকার, M. R. A. S.
৩১ নং এলগীন রোড, কলিকাতা

পক্ষিচাষ বা পুল্ট্রী ফার্ম্মিং

মুর্গীচাষ সম্বন্ধে বিগত কয়েকটি পত্রে অনেক কথাই বলিয়াছি। শিক্ষানবিশ মুর্গী-পালক এটা বেশ স্মরণ রাখিবেন যে শুষ্ক খট্‌খটে বাসা ঘর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যকর বায়ু চলাচল যুক্ত স্থানে রাখিয়া পাখি চাষ করিলে তবেই লাভের আশা থাকে, নচেৎ নহে। প্রত্যেক মুর্গীকে ২ বর্গ ফিট স্থান থাকিবার জন্য দিবে।

একটা প্রশ্ন স্বতই লোকের মনে উদয় হয় যে কোন জাতীয় মুর্গ লইয়া কাজ আরম্ভ করা কর্ত্তব্য কি না। এ সম্বন্ধে কোন স্থির ও সুনিশ্চিত উত্তর এমন রূপে দেওয়া যাইতে পারেনা যাহা সকলের পক্ষে সমভাবে খাটিবে; কারণ সকল স্থানের জল, হাওয়া, মাটী, অবস্থা সমান নহে। কাজেই প্রত্যেক লোকের পক্ষে সেই জাতীয় মুর্গী পোষাই সমিচীন যে জাতির দ্বারায় তাঁহার বিশেষ লাভ জনক হয়। প্রথমে দেখা কর্ত্তব্য যে কি জন্য মুর্গী পোষা হইতেছে—ডিম, চূজা, রোষ্ট্ বা খাসী বেচার জন্য সেইরূপ দেখিয়া মুর্গীর জাতি নির্ব্বাচন করিবে; এসম্বন্ধে পূর্ব্বপূর্ব্ব পত্রেও যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি। বাফ্ অপিঙ্গটন জাতি রাখা সর্ব্বাপেক্ষা সমিচীন, তাহার পর ওয়াণ্ডোট রাখা তারপর প্লিমথ্ রক্ রাখাই উৎকৃষ্ট বলিয়া আমার মনে হয়। ওয়াণ্ডোট জাতির মধ্যে সাদা পরিবার ভুক্ত গুলিরই আদর বেশী। লাঙ্গশালগণ শীতকালে খুব বেশী ডিম পাড়িয়া থাকে। ডিমে "অ-বসিয়ে" গণ বেশী ডিম দাত্রী হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বের পত্রে বলিয়াছি এবং এই সব জাতির মধ্যে লেগহর্ণ (বাফ্ লেগহর্ণের আদর বড় বেশী) আন্‌কোনা, মিনর্কা, আন্দুলেশীর, কাম্পিণী ও হামবর্গের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। কাম্পিণীগণ বেলজিয়ম দেশাগত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহারা বেলে মাটীতে বেশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পাখিদের ডিম দেওয়ার "মোরসম" উত্তীর্ণ হলেপর পক্ষগলন (moulting) আরম্ভ হয়। এই সময় ভাল খাদ্য দিতে হয়। ডিম হতে ছানা বাহির হইবার পর ২।৪ হইতে ৩৬ ঘণ্টা খাবার দিবার দরকার হয় না তাহা পূর্ব্বেই বলেছি; তাহার পর প্রত্যেক ২ ঘণ্টা অন্তর খাবার দিবে। কলে ফোটা ছানাদের ব্রুডারে শীতের ঠাণ্ডার দিনে পালন করিবে নচেৎ শর্দ্দী ধরিয়া ঝাঁক কে ঝাঁক মরিয়া যাইবে। এই সময় ছানা পালন করা বড় যত্ন ও চেষ্টার প্রয়োজন। সকল কথাই পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছি। ২০ ঘণ্টা পরে প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তর ২ মাস পর্য্যন্ত খোরাক দিবে তাহার পর দিনে তিনবার এবং বেশ বড় পাট্টা হইলে দিনে দুই বার দিলেই চলে। খাদ্য সম্বন্ধে পর পত্রে আলোচনা করিব। এক এক জাতীয় পাখি দূরে দূরে পৃথক পৃথক্ এক এক স্থানে পালন করাই সমিচীন।

"ডিমে বসা ঘর (যে স্থানে মুর্গীগণ ডিমে বসিয়া আছে) ডিম দেওয়া ঘর হইতে

পৃথক স্থানে রাখিবে। যদি কেবল ডিমের ব্যবসা করা সংকল্প থাকে তাহা হইলে মোরগ পোষার দরকার দেখা যায় না; কেবল চুজা বা "চুবা "দুধে ছানার ' ব্যবসা সংকল্প থাকে, তাহা হইলেই মোরগ পোষা কর্ত্তব্য। চারি হইতে ৬ সপ্তাহ বয়স্ক ছানাদের চুজা বা দুধে ছানা বলা যাইতে পারে। ছানাদের মোটা করিয়া বুকে চর্ব্বি জমিলে বেচা কর্ত্তব্য। মোটা করা একটি ভিন্ন বিভাগ এই ব্যবসার অন্তর্গত হইতেছে, সে সম্বন্ধে পর পত্রে আলোচনা করিব। ডিমে বসা মুর্গীকে দিনে একবার লোকে খাইতে দেয় কিন্তু আমার মনে হয় যে ইহাদের দিনে দুইবার খাইতে দেওয়া সমিচীন। ডিমে বসা মুর্গীর নিকট লাটিন গার্দ্দা বা "ধুলা" খাদ্য, বালী চুণ কয়লাগুঁড়া হাড়চূর্ণ, শামুক গুগলীচূর্ণ আদি নির্ম্মল পানীয় জল রাখিবে। কুড়ুক মুর্গীকে ডিমে বসাইবার পূর্ব্বে বেশ করিয়া ধুলা মাখাইয়া কাট নাশ করিয়া দিবে ও মধ্যে কীট নাশক গুঁড়া মাখাইয়া কীট গাত্র হইতে পরিস্কার করিয়া দিবে। এই সময় "তা দিয়ে "মুর্গীকে তাপ উৎপাদক খাদ্য স্বতই দেওয়া প্রয়োজন আমাদের দেশে শুষ্ক ছাইয় উপর ডিম বসান হয়; সেটা মন্দ নহে, হাঁসকেও ঐরূপ ছাইর উপর বসান যাইতে পারে; কিন্তু ডিম ফোটার সময় সময় ছাইটাকে একটু জল ছিটাইয়া আর্দ্র করিয়া দেওয়া উচিত কারণ এই সময় ছানা বাহির হইবার পূর্ব্বে কিছু বেশী শৈত্যর (moisture) প্রয়োজন হয়।

কলে বা মুর্গীর নিচে ডিম ফুটাইতে হইলে ডিমগুলি এক সময়ে বসাইবে, তা দেওয়া ডিমের সহিত অপর নুতন ডিম আর সংযোগ করা বিধি নহে। মুর্গীর নীচে ৮।১০ বা ১২ টা ছানা ফুটিবে কিন্তু কলে ৩০ টা হইতে ১০।২০।৫০ হাজার ছানা ফুটিতে পারে বা ডিম বসাইতে পারা যায়; ডিমেবসা মুর্গীর ছানাগুলি পালন করিয়া পুনশ্চ ডিম দিতে তিন মাস সময় লাগে; ইহা উৎপাদকের পক্ষে একরকম লোকসান বলিতে হইবে কারণ সে ঐ কাল পর্য্যন্ত ডিম প্রাপ্তিতে বঞ্চিত থাকে। বিলাতে টুপ্ বার্গেস্ হিয়ার্সান আদির কলই বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে যেখানে মুর্গী পালন ও ডিমের ব্যবসা পুর্ণমাত্রায় পরিচালিত হয়, কাণ্ডি সাইফার, রাক্ আই, পেটালুমা, প্রভৃতি মেকের কলের আদরই বেশী কোন কোন বড় কারবা বিদ্যুৎ সাহায্যে কল চালাইয়া প্রভূত লাভবান হইতেছেন—আর হায়রে আমার দেশ! অন্যের মধ্যে N.Edwards এর কৃত "Poultry Answers" বইখানি আমি প্রত্যেক শিক্ষানবীসকে পাঠ করিতে বলি। তাহা ছাড়া Utility Ducks Geese by mr. Hurst হাঁস ব্যবসায়ীদের পড়া দরকার। এই সকল পুস্তক, কল আদি ও পাখি আমি পূর্ব্বে চুক্তি করিলে আনাইয়া দিতে পারি। আমাদের দেশের সামান্য সামান্য অর্থ পুঁজীর লোক এই ব্যবসা বেশ ভাল করিয়া চালাইতে পারেন।

মুর্গী, হাঁস পেরু, গিনিফাউল, রাজহংস ও অন্য পাখীর ডিম এক মুর্গীর নীচে

বা এক কলে কদাচ বসাইবে না; ইহাদের প্রত্যেকের কোটার কাল ভিন্ন ভিন্ন তাহা পূর্ব্বে পূর্ব্বে পত্রে বলিয়াছি। ভিন্ন বয়সের ছানাগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন খাঁকে বা পালে রাখিবে, এক সঙ্গে ঘেঁসা ঘেঁসী করিয়া কদাচ রাখিবে না। ২।২॥০ মাসের হইলেই মোরগ ও মেদীগুলিকে পৃথক পৃথক রাখিবে। মুর্গীগুলিকে ডিম পাড়ার জন্য দরকার হলেই মোরগ সহ সংযোগ করাইবে কিন্তু যদি মেজের জন্য হাটে পাঠাবার মৎলব হয় তাহা হইলে মোটা হইতে এবং তাজাও লাল হইতে থাকিলেই তাহাদের অন্তঘরে ও স্থানে স্থানান্তরিত করিবে, উত্তম খাদ্য দিবে যাহাতে পূর্ণমাত্রায় বাড়িতে পারে। অল্পবয়সে ডিম দিতে আরম্ভ করিলে "বাড়" কমিয়া যায়। যদি যুবা মুর্গীদের ডিমের জন্য পোষা হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের আর নাড়ানাড়ি করিবে না। ইংলণ্ড প্রতিবৎসর ১৫ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের কেবল মাত্র ডিম বিদেশ হইতে আমদানী করে। এই ডিম্ ডেনমার্ক ফ্রান্স বেলজিয়াম ও আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলীয়া হইতে আসিয়া থাকে। ভারত কি ইহার কোন ভাগ পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে? আমরা কেবল খাদ্য সম্ভার ও "র'মেটিরিয়াল" বিদেশী মহাজনদের দিয়াই দিন দিন নিঃস্ব হইতেছি, তাহা কি আমার হিন্দু ও মুসলমান স্বদেশী ভায়েরা দেখিতেছে না? জাতীয় ধন ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে হইলে দেশে খুব বেশী সংখ্যা পাখার চাষ ও ডেয়ারি ফার্ম্মিং আরম্ভ করিতে হইবে। যত দেশের মধ্যে পুল্‌টী ফারম্মিং বর্দ্ধিত হয় ও ডেয়ারি খোলা হয় তাহা ভাই ভারতবাসী কর। আর কথায় চিড়া ভিজিবে না, কাজ চাই; কাজ করিয়া দেশকে দেখাও। ২। ১০ জন এই সব কাজ পরিদর্শন করিতে ডেনমার্ক সুইডেন, বিলাত ও আমেরিকায় ২।৪ মাসের জন্য গিয়া দেখিয়া আইস ও দেশে এইসব ব্যবসা আরম্ভ কর। রাজা মাহারাজা, নবাব উল্‌মাগণ সমবেত হইয়া এইরূপ দেশের মধ্যে যৌথ কারবারের ভিত্তিব উপর প্রতিষ্ঠিত কারবারের পথপ্রদর্শক ও নেতা হন তাহা হইলে আমি যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারি বলিয়া মনে হয়। সাঁওতাল পরগণা গয়া জেলা, মেদিনীপুর জেলার পার্ব্বত্য ও পালামু জেলার সস্তা উচ্চ পার্ব্বত্য জমীতে এইরূপ ডেয়ারি ও পাখীচাষের ব্যবসা খোলার বিশেষ সহায়তা ও সুবিধা হইতে পারে বলিয়া আমার মনে হয়। অভাব কেবল honest men,capitalist, Expert এবং কর্ম্মীর; বিশ্বাসীলোক চাহি। তাহা যদি হইত তবে মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের এক কোটী টাকা মূলধনে গোরুক্ষা মণ্ডলী ভাসাইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে এত দিনে কোন অন্তরায় হইত না। হায়রে, আমার দেশ! ১৩২৫ সালের কৃষক পত্রিকায় (প্রাপ্তিস্থান ১৬২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা) আমার লিখিত পক্ষীর চাষ শীর্ষক প্রবন্ধ গুলি, ব্যবসা বাণিজ্য পত্রিকার মল্লিখিত প্রবন্ধ গুলি ৩য় ৪র্থ বৎসরের সংখ্যায় প্রাপ্তব্য; প্রাপ্তিস্থান ৬নং কলেজ স্কোয়ার ইষ্ট কলিকাতা সঞ্জীবনী আপিষে বাবু শচীন্দ্র নাথ বসুর নিকট প্রাপ্তব্য), বিগত ৪,২,২০, ১৭ই ২০, ৮, ৫, ২০ এবং

এবং ১০, ৭, ২০ তারিখের হিন্দু পত্রিকায় মলিখিত (হিন্দু আপিষ, মান্দ্রাজ) প্রবন্ধগুলি শিক্ষা নবীশ পাঠ করিয়া অল্প মাত্রায় একজাতীয় মুর্গী রাখিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া, অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে ব্যবসায়টিকে বাড়াইবে। এই সকল প্রবন্ধে অনেক উপদেশ পাইবে, অনেক পুস্তকের নাম পাইবে, সেই গুলি যত্নে এক একটি পাঠ করিয়া থিয়োরেটিক্যাল অভিজ্ঞতা লাভ করিবে। এই সকল পুস্তক আমি আনাইয়া দিতে পারি। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমাদের দেশে হাঁস ও মুর্গীর ব্যবসা অল্প পুঁজিতে খুব লাভজনকরূপে চালাইতে পারা যায়। এ সব কাজে একেবারে বেশী পুঁজী চালিতে নাই ; যৌথ কারবার যদি চালান হয় তবেই কেবল বেশী পুঁজী চালা যাইতে পারে। স্বল্প মাত্রায় এই ব্যবসা আরম্ভ করিলে প্রত্যেক জাতীয় পাখীর আচার, ব্যবহার, রীতি, ব্যায়াম, ব্যারাম, ও স্বাস্থ্যের বিষয় অভিজ্ঞতা লাভ করা যাইতে পারে ; তখন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে বড় বেশী আটকায় না। দেশী বেশ। ডিম দাত্রী খুবা মুর্গী এবং উন্নত বিলাতী মোরগ লইয়া কার্য্য ক্ষেত্রে নামা আমার সমীচিন বলিয়া মনে হয়। বিলাত ও আমেরিকার এক একটি বড় বড় মুর্গী ব্যবসায়ীর মূলধন ৫।৭ হইতে ২৫।৩০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত আছে ওয়েলফারম, ওপ্‌সোফারম রিঙ্গউড্ ফারম, ক্রোলী ফারম, বেষ্টারব্রুক্ ফারম্ লাগসিন পুল্‌ট্রীফারম অ্যালহ্যাম পুল্‌ট্রীফারম্, গ্রীনক্যালী পুল্‌ট্রীফারম্, পেন্‌সিলভেনিয়া পুল্‌টীফারম্, টানোহিল্‌ফারম্, পিট্‌স্‌ফিও পুল্‌টীফারম, টোরোন্টিব্রথ্ সেঞ্চুরী হ্যাচারি, ফিশেলের ফারম, ম্যাক্লেভের নিউলণ্ডন ফারম, ক্রু কাউর পুল্‌টীফারম, নরফোকের এবট্‌ব্রাদাস্, কেণ্টের অন্তর্গত মেরীক্রের কুকুকোং (অপিংটন মুর্গীর আদিম জনয়িতা), নিউইয়র্কের সন্নিকটস্থ কর্নিং ব্রাদাসের ফারম, ঐ নগরের ফাইলোন্যাশানেল ইনিসটীষ্টিউট এলমিরা, নিউইয়র্ক, সেকুউড্ ফারম, উড্‌লণ্ডফারম প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত মুর্গীর কারকারনা প্রতিষ্ঠিত আছে। মুর্গীরদের গ্রীষ্ম প্রধান দেশে দুই এবং উর্দ্ধ সংখ্যার তিন বৎসরের বেশী রাখিবে না ; তাহার পর হাটে পাঠাইবে। প্রথম দেড় বা দুই বৎসর ডিম ব্যবসায়ে রাখিবে এবং শেষের এক বৎসর বা উর্দ্ধ সংখ্যায় দেড় বৎসর উৎপাদন ব্যবসায়ে রাখিবে বা নিয়োগ করিবে। প্র-চ-স ৩১নং এলগীন রোড কলিকাতা।

ক্রমশঃ

বোম্বাই প্রদেশে ইক্ষু-চাষ

কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে বর্ত্তমান পত্রিকায় যুক্ত প্রদেশে ইক্ষু-চাষ সম্বন্ধে আমরা সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি। বঙ্গদেশে ইক্ষু-চাষের উপস্থিত যেরূপ অবস্থা, তাহাতে এই আয়কর ফসল সম্বন্ধে যথেষ্ট পর্য্যালোচনা হওয়া উচিত। বিভিন্ন প্রদেশে কি প্রণালীতে কোন্ ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে তৎ-সম্বন্ধে আলোচনা কখন নিষ্ফল হইতে পারে না। তন্নিমিত্তই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। বোম্বাই প্রদেশে যে সমস্ত জাতীয় আক উৎপন্ন হইয়া থাকে তৎসমুদয় এতদ্দেশে চাষ করিবার উপযুক্ত না হইলেও, উহাদের উৎপাদন প্রণালী আমাদের অধ্যয়নের উপযুক্ত তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। বোম্বাই প্রদেশে আকের জমি, তুলা অথবা গমের জমির সহিত পরিমাণে সমতুল্য না হইলেও এই ফসল হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ উক্ত তুই ফসলের মূল্যের সমতুল্য। কতিপয় কারণ বশতঃ তুর্ভিক্ষের হইয়া গিয়াছে? বর্ত্তমান সময়ে ইক্ষু আবাদের জমির পরিমাণ প্রায় ৬০,০০০ একার। পুণা, সেতারা, বেলগম এবং নাসিকেই যথেষ্ট পরিমাণ ইক্ষু উৎপাদিত হইয়া থাকে।

বোম্বাই প্রদেশে ইক্ষু আবাদে সুযোগ—ইক্ষু সমূহকে সাধারণতঃ তুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। (১) কোমল রসযুক্ত জাতীয় এবং (২) কঠিন ও অপেক্ষাকৃত অল্প রসযুক্ত জাতীয়।

দক্ষিণ অঞ্চলে পৌণ্ডাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ইক্ষু। দীর্ঘ, কোমল এবং বিলক্ষণ রসযুক্ত। ইহার রসে শর্করার পরিমাণ শতকরা ১৬—১৭.৫ ভাগ, অর্থাৎ বোম্বাই প্রদেশে জাত ইক্ষু সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ভাল চাষে এই জাতি হইতে সাধারণতঃ একর প্রতি ১০০০০—১২,০০০ পাঃ গুড় পাওয়া যায়।

বাঙ্গালা দেশের ইক্ষুর মধ্যে শাসসাড়া ইক্ষু কোমল রসযুক্ত এবং রস মিষ্ট বলিয়া ইহা চব্য ইক্ষু বলিয়া গৃহিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলায় মরিসস্ এবং ডোরাওয়ালা বোম্বাই ইক্ষু এখানে গুড় তৈয়ারি জন্য ব্যবহার করা হয়।

উপযুক্ত পরিমাণ জল না পাইলে আকের চাষ হয় না। সুতরাং যে স্থানে জলের সুবিধা, সেই স্থানেই আক চাষ হইয়া থাকে। বাঙ্গলা বোম্বাই, পাঞ্জাব, মধ্য প্রদেশে আক চাষের উপযুক্ত স্থান অনেক রহিয়াছে, কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলে যে নরম ও গভীর কৃষ্ণ বর্ণ মাটি পাওয়া যায়, তাহাই এতদুদ্দেশ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। আকের জমি ৯ ইঞ্চি হইতে একফুট গভীর পর্য্যন্ত উত্তমরূপে কর্ষিত হওয়া আবশ্যক। বোম্বাই দেশের লাঙ্গলে তিন বারে এই কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। কিন্তু লোহার

লাঙ্গল, যেমন মেষ্টন লাঙ্গল, ব্যবহার করিলে ইহার অর্দ্ধেক সময়ে এই কার্য্য হইতে পারে। চাষ দেওয়া ভিন্ন ক্ষেত্রে আগাছা থাকিলে তাহা হস্ত দ্বারা উৎপাটন করিয়া ফেলা হয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বারের পর উত্তমরূপে মই দিয়া মাটিকে উত্তমরূপে চূর্ণ করা আবশ্যক। বোম্বাই প্রদেশের 'ভামর' মই দ্বারা মাটি উত্তমরূপে চূর্ণ হইয়া থাকে।

ইক্ষুতে সাধারণতঃ অধিক পরিমাণ সার আবশ্যক হইয়া থাকে। কারণ সমধিক পরিমাণে পাতা এবং তন্তু প্রসব না করিলে রস সঞ্চিত হয় না। অধিকন্তু ইক্ষুর কাণ্ডই প্রয়োজনীয় অংশ বলিয়া কাণ্ডের পরিপুষ্টি জন্য অত্যধিক পরিমাণে নাইট্রোজন আবশ্যক হয়। পুণা কৃষি-ক্ষেত্রে নানাবিধ পরীক্ষা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, পৌণ্ডা জাতীয় আকের সম্যক পরিপুষ্টির জন্য বিঘা প্রতি ১ মণ ১০ সের (একর প্রতি ৩৫০ পাঃ) নাইট্রোজন আবশ্যক। আকের পরিপুষ্টির জন্য আবশ্যকীয় সার যথা চূণ, ফসফরিক্ এসিড, পটাশ প্রভৃতি যে প্রয়োজনীয় নহে তাহা নয়। বস্তুতঃ যে সার প্রয়োগ করা যায় তাহাতেই এই সমস্ত পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় এমন হিসাব করিয়া সার দিতে হয়। উপরোক্ত পরিমাণ নাইট্রোজন দিতে হইলে একার প্রতি ৬০ গাড়ি (প্রতি গাড়ি ৮/০ মণ) গোময়াদি ক্ষেত্র সংরক্ষিত সার * (Farm-yard manure) দেওয়া আবশ্যক। ইহাতে খরচ প্রায় ৩০৲ হইতে ৬০৲ টাকা এবং ইহার সহিত গাড়ী ভাড়া ইত্যাদি ধরিলে প্রায় এক শত টাকার কাছাকাছি খরচ পড়ে। এতদ্ভিন্ন এত অধিক পরিমাণ ক্ষেত্রসার সর্ব্ব স্থানে সকল সময় পাওয়া যায় না এবং পাওয়া গেলেও অন্ততঃ প্রথম বৎসরের ফসলে ইহার দ্বারা সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায় না। এই সমস্ত কারণে বোম্বাই কৃষি-বিভাগের কর্ত্তারা উপদেশ দেন যে, আবশ্যক পরিমাণ নাইট্রোজনের অর্দ্ধেকাংশ গোমায়াদি সার রূপে ফসল উৎপত্তির প্রারম্ভে দিয়া অপর অর্দ্ধেকাংশ খইল অথবা নাইট্রেট রূপে দিলে ভাল হয়। এই অর্দ্ধেকাংশ বিষ্ঠা-সার রূপেও দেওয়া যাইতে পারে। খইলের মধ্যে কুসুম ফুল, সরগুজা, রেড়ী, করঞ্জা, মহুয়া, চীনের বাদাম, তিল এবং তুলা বীজের খৈল সাররূপে পরীক্ষিত। ইহাদের মধ্যে কুসুম ফুলের বীজেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া গিয়াছে। করঞ্জা এবং রেড়ীর খৈল অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যয় সাধ্য কিন্তু ইহার দ্বারা উইয়ের দৌরাত্ম্য নিবারিত হয় এই বিশ্বাসে এই খৈল অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। গোময়াদি সার একবারেনা প্রয়োগ করিয়া শুদ্ধ খৈল সারে ইক্ষু উৎপাদিত হইতে পারে। নিম্নলিখিত তালিকায় (১) স্তম্ভে এক একারের পক্ষে আবশ্যকীয় ৩৫০ পাঃ নাইট্রোজনের জন্য যত পরিমাণ সার আবশ্যক হয় তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল। (২) স্তম্ভে

* ক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট গোশালার পরিত্যক্ত মলমূত্রাদি ও খোসা ভুসী ছাই প্রভৃতি আবর্জ্জনা মিশ্রিত সার।

২০০ পাঃ নাইট্রোজন ক্ষেত্রসার রূপে দেওয়ার পর অবশিষ্ট ১৫০ পাউণ্ডের জন্য অন্যান্য সার কত আবশ্যক হয় তাহার পরিমাণ দেওয়া গেল। মহুয়ার খৈল গাছ বসাইবার ঠিক আগে দেওয়া উচিত নহে।

সারের নাম	৩৫০ পাঃ জন্য টন (১)	১৫০ পাঃ শস্য টন ২)
খৈল কুসুম ফুল	২½—২¾	১⅛—
,, মহুয়া	৬	৩¼—৩½
,, তুলা	৪½—৫	২⅜
,, রেড়ী	৪—৪½	২⅛
,, করঞ্জা	৪½—৪¾	২½
,, চীনের বাদাম	২ ২½	১¼
,, তিল	২½—২¾	১½
,, সর গুজা	৩½—৩¾	২
,, বিষ্ঠাসার	১৫—২০	...
ক্ষেত্র সংরক্ষিত সার	২০—৩০	...
মৎস্য সার	২—২½	১⅛
নাইট্রেট অফ সোডা	১	½
সোরা (অপরিস্কৃত)	১—১½	½

বোম্বাই প্রদেশে হাড়ের সারে তাদৃশ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। সকল সারই একবারে দেওয়ার অপেক্ষা দুই তিন বারে দিলে ভাল হয়। ৫ম মাসে দ্বিতীয় বার সার দেওয়া যাইতে পারে।

ফসল লাগাইবার সময় সকল স্থানে সমান নহে। পুণা জেলায় ফেব্রুয়ারী মার্চ্চ মাসে আক লাগান হয়। বাঙলায় কখন বা কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে কখন বা মাঘ ফাল্গুনে আক লাগান হয়, সুরাট এবং দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে নবেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে ঐ কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। জলাদি ফসলে পোকার ভয় অল্প। বীজ আক পুঁতিবার প্রথা বিভিন্ন রূপ। গুজরাটে একটা অখণ্ড আক গভীরভাবে পুঁতিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এইরূপে প্রথায় আকে প্রথমতঃ না কি কম জল আবশ্যক হয় এবং আক পড়িয়া যায় না। কিন্তু এতদ্বারা অনেক চোক্ নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অনেক স্থানে বীজ ইক্ষুর কলা বা হোক বাহির হইলে তাহা ক্ষেতে খোঁচা কলমের মত বসান হয়। ইহা ঠিক প্রথা নহে। খণ্ড খণ্ড বীজ ইক্ষু ক্ষেতে শোয়াইয়া পোতাই ভাল। এইরূপে বসাইতে প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে সোজা চারা উদ্গত হয়। গুজরাটের অপর স্থলে তিনটি চোক্ বিশিষ্ট এক একটি খণ্ড ৩ হইতে ৪ ইঞ্চি গভীর গর্ত্তে ৪ হইতে

৬ ইঞ্চি ব্যবধানে বসানু হয়। প্রত্যেক দাঁড়ার মধ্যে ব্যবধান ২ ফিট। এই প্রথার উপকারিতা এই যে ইহাতে আক পড়িয়া যায় না, বাঁধার সুবিধা হয় এবং শিয়াল প্রভৃতিতে সহজে ফলস নষ্ট করিতে পারে না। আক পুঁতিয়া দেওয়ার পর একবার জল দেওয়া হয়। ইক্ষু ক্ষেত্রে কোন প্রকারে আগাছা জন্মিতে দেওয়া উচিত নহে। এতদ্ভিন্ন মাঝে মাঝে শুষ্ক পাতা প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া দেওয়া আবশ্যক। আক বসাইবার পর পঞ্চম মাসে আকের গোড়ায় মাটি দিতে হয়। এই মাটি দুই পাশ হইতে টানিয়া পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আক শুইয়া পড়িলে ফসল ভাল লওয়া হয় না। ইহাতে চিনির মাত্র কমিয়া যায়। ইহা নিবারণ কারার জন্য কয়েক গাছি ইক্ষু লইয়া ঝাড় বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বোম্বাই দেশের কোন কোন স্থানে বাঁশের খুঁঠি পুঁতিয়া তাহা উপর প্রস্থ ভাবে কঞ্চি অথবা বাঁখারি বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ঐ বাঁখারির সহিত দুই সারি আক বাঁধা হইয়া থাকে। যে স্থলে শৃগালে উপদ্রব অধিক সেরূপ স্থলে আক উহার পাতার দ্বারা জড়াইয়া দেওয়া হয়। যে সব আকের পাশ হইতে কলা বাহির হয় সেরূপ আকের এই প্রথা দ্বারা কলা বাহির হওয়া বন্ধ হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন জড়াইয়া দিলে আকের ছাল পাতলা হইয়া থাকে ও ফাটিয়া যায় না। কোন স্থলে আক পরিপুষ্ট হইবার অনতি পূর্ব্বেই কৃষকেরা পাতা ছড়াইয়া ফেলে তাহাদের বিশ্বাস যে পাতা ছড়াইয়া ফেলিলে চিনির মাত্রা অধিক হয়। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে বিশ্বাস ভ্রমাত্মক।

অনেকের বিশ্বাস যে ইক্ষু ক্ষেত্রে যত জল দেওয়া যায় ততই ভাল। কিন্তু বাস্তবিক অধিক জল পাইলে ইক্ষুর ক্ষতি হইয়া থাকে। পুণা কৃষি-ক্ষেত্রে পরীক্ষা দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে যে গ্রীষ্মকালে ১০ দিন অন্তর এবং শীতকালে ৮ দিন অন্তর ক্ষেত্রে ২২।৩ ইঞ্চি পরিমাণ জল প্রয়োগ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফললাভ করা যায়। আক কাটিবার দিন কয়েক পূর্ব্বে যথেষ্ট পরিমাণে জল দেওয়া আবশ্যক; ইহাতে রসের মাত্রা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অধিক পরিমাণে শর্করা বাহির হইয়া আইসে। কিন্তু যে স্থলে আর একটা ফসল তুলা হইবে বলিয়া আশা করা যায় সে স্থলে বিবেচনার সহিত জল প্রয়োগ করা উচিত, কারণ অধিক জল প্রয়োগে অবশিষ্ট আকের মূল পচিয়া যাইতে পারে। ইক্ষু পরিপক্ক হইতে ১০।১২ মাস লাগে। চর্ব্বণের জন্য আক কিছু আগেই কাটা হয়। আক কাটিবার পূর্ব্বে ২।৪ খণ্ড কাটিয়া লইয়া চিনি উপযুক্ত মাত্রায় পাওয়া যায় কি না পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

ইক্ষু ক্ষেত্রে সাধারণতঃ অন্যান্য ফসলও জন্মান হইয়া থাকে। পেঁয়াজ, শসা, ঢেঁড়স, প্রভৃতি প্রথমাবস্থায় উৎপাদন করিতে পারা যায়। কোন কোন স্থলে ভুট্টাও বপন করা হয়। ক্ষেতের নালার ধারে স্থানে স্থানে রেড়ীর গাছ জন্মান হয়। তদ্দ্বারা আকের কাণ্ড পড়িয়া যাইতে পারে না এবং রেড়ীর বীজেও কতক লাভ হয়। কোথাও

কোথাও ইক্ষু ক্ষেত্রে তামাকেরও চাষ হয় কিন্তু উহার পাতা পরিপক্ক হইতে অধিক সময় আবশ্যক হয় বলিয়া এই ফসল তাদৃশ লাভজনক নহে।

ইক্ষুর রোগ—উই ইক্ষুর পরম শত্রু। গুজরাটে জল নালার উপরিভাগে একটি চৌবাচ্চা করিয়া তাহাতে রেড়ীর খৈল রাখা হয়। সেচনের জল উহার ভিতর দিয়া আসিবার সময় উহার সার ধৌত করিয়া আসে। রেড়ীর খৈলের সারযুক্ত জলে উই নিবারিত হয়। উই নিবারণের আর একটি উপায় লবণ এবং হিং একত্র করিয়া একটি পুঁটলি বাঁধিয়া জল নালার মধ্যে রাখা। এতদ্বারা উভয় পদার্থ দ্রব হইয়া ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়ে।

আফিডিই জাতীয় পোকা আকের সমূহ ক্ষতি করে। পত্রের উপর এক রূপ চটচটে পদার্থের দ্বারা ইহাদের স্থিতি নির্দ্ধারণ করা যায়। মেঘ হইলে ইহাদের বৃদ্ধি হয়। কেরোসিন দ্রাবণই ইহাদিগকে দূরিভূত করিবার প্রধান উপায়। কেরো-সিন দ্রবণ নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত হয়। ⁄১ সের সাবন ⁄৫ সের জলে দ্রব করিয়া উহার সহিত ।০ সের কেরোসিন মিশাইয়া উহাকে বেশ করিয়া নাড়িতে হয়। ক্রমশঃ দুইটি মিশ্রিত হইয়া যায়। অতঃপর উক্ত মিশ্রন ২/০ মণ হইতে ৩/০ মণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিচকারি দ্বারা আক্রান্ত পত্র সমূহে প্রয়োগ করা হয়।

ডাএট্রিয়া স্যাকারেলিস্ (Diatræa Sacchraleis) নামক পোকা ছিদ্র করিয়া ইক্ষু দণ্ডের ভিতর প্রবেশ করে। রোগের প্রথমে ঠিক কাণ্ডের উপরিভাগের পত্র শুষ্ক হইয়া যায়। টানিলে কাণ্ডের অগ্রভাগ সহজেই উঠিয়া আইসে রোগের প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই আক্রান্ত দণ্ড গুলিকে মৃত্তিকা নিকট হইতে কাটিয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত। কাটিয়া না ফেলিলে পোকার ক্রমশঃ বংশ বৃদ্ধি হইয়া ক্ষেত্রজ বহু সংখ্যক ইক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। ইক্ষুর পাতার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোস্ত বীজের ন্যায় আকার ও বর্ণ বিশিষ্ট ডিম দেখিতে পাওয়া যায়।

ষ্ট্রীগা লুটিয়া (Striga lutea) নামক পরগাছা ইক্ষুর মূলের সহিত নিজের মূল জড়িত করিয়া ইক্ষু দণ্ডের সমস্ত রস টানিয়া লয়। ভালরূপ নিড়ানির দ্বারা ইহা অপসৃত করা যায়।

ভুট্টা, গোধুম প্রভৃতিতে এক জাতীয় যে রোগ দেখা যায় তাহার নাম স্মট্ (Smut)। ইক্ষুতেও তাহা দৃষ্ট হয়। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে ইহা প্রথম পুষ্প দণ্ডের প্রকাশ পায়। আমাদেয় দেশীয় আকে সাধারণতঃ ফুল হয় না। কিন্তু বিদেশ হইতে প্রবর্ত্তিত জাতি সমূহে ফুল হইয়া থাকে। সুতরাং এই রোগ বিদেশীয় জাতিসমূহেই দেখা যায়। আক্রান্ত দণ্ড গুলি পুড়াইয়া ফেলাই রোগ প্রতিকারের একমাত্র উপায়।

আক চাষ বোম্বাই প্রদেশে সাধারণতঃ একর প্রতি ৪২৲৹৲ টাকা খরচ পড়ে। গুজরাট প্রদেশে প্রায় তিন শত টাকা। অবশ্য এই সমস্ত হিসাবের মধ্যে গুড় তৈয়ারীর

খরচও রহিয়াছে। উৎপন্ন গুড়ের পরিমাণ ৮০০০ পাঃ হইতে ১৩৫০০ পাঃ। গুড়ের দাম মণ প্রতি (১/০ মণ=৮০ পাঃ) ৩৷০ হইতে পাঁচ টাকা।

বীট চিনি প্রস্তুত প্রণালী

ইক্ষুর ন্যায় বীটের রস হইতেও চিনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তবে ইক্ষু যেমন কলে মাড়িয়া রস বাহির করা হয় তেমনি বীট গুলি এককালে পেষণ করিয়া লইয়া যে রস পাওয়া যায় তাহাতে ভাল চিনি হয় না। বীটগুলি মূল ও অগ্রভাগ কিয়দংশ কাটিয়া ফেলিয়া কষ জলটা সরাইয়া লইয়া পরে এই শাঁসগুলি পেষণ করিয়া যে রস বাহির হইবে, সেই রস হইতে উৎকৃষ্ট চিনি প্রস্তুত হয়। বলা বাহুল্য যে উক্ত প্রকারে প্রস্তুত রস ছাঁকিয়া না লইলে বীটের শাঁস তাহাতে থাকিয়া যায় এবং ঐ রস জ্বাল দিলে গুড় ময়লা হইয়া দাঁড়ায়।

বীটের রস ইক্ষু রসের ন্যায় এক বৃহৎ গামলা বা নাদা পূর্ণ করিয়া অগ্নি সংযোগে জ্বাল দিতে হইবে। এক একটী নাদে ২/০মণ রস এককালীন জ্বালে চড়ান চলে। এই নাদাস্থিত রস গরম করিবার সময় এক বোতল জলে ৪০ ফোঁটা ফস্‌ফরিক এসিড মিশ্রিত করিয়া উহাতে মিশাইয়া দিতে হইবে। পরে রস ১৩০ (ফারণহিট) পরিমাণ উষ্ণ হইলে উহাতে চুণের জল ছিটাইতে হইবে। চুণের জল ইতিপূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। প্রত্যেক অর্দ্ধ মণে এক তোলা হিসাবে চূণ প্রয়োগ করা বিধি। সদ্যদগ্ধ পাথুরিয়া চুণ বোতলের রাখিয়া দিলে অনেক দিন অবিকৃত থাকে। পরে আবশ্যক মত জলে গুলিয়া রসে ঐ জলের ছিটা দিতে হয়। ইক্ষু কিম্বা বীটের রসের অম্লের ভাগ চুণের জল দ্বারা কাটাইয়া লইতে পারিলে তবে গুড় দানা বাঁধিয়া সারে পরিণত হয়। নতুবা মাতের মাত্রা অধিক হয়। চুণ যে কেবল রসের অম্ল কাটাইয়া দেয় তাহা নহে অধিকন্তু রসস্থিত জৈব পদার্থগুলি চুণ সংযোগে কঠিন চুর্ণ ভাব ধারণ করিয়া চুণের সহিত রসের নীচে পড়িয়া প্রায়। চুণ উক্ত কার্য্য সাধন করিবার পর তথাপিও রসের সহিত কিয়ৎ পরিমাণে মিশ্রিত থাকিতে পারে কিন্তু পূর্ব্বে যে ফস্‌ফরিক্ এসিড মিশান হইয়াছে, চুণ উহার সহিত মিশ্রিত হইয়া রসের নিম্নে পড়িয়া যায়। রসে চুণের ভাগ অধিক থাকিলে তাহা হইতে উৎপন্ন গুড় কাল হয়। রসে

জৈব পদার্থ বর্ত্তমান থাকিলেও গুড় অধিক দিবস ভাল থাকে না। বর্ষার সময় পচিয়া দুর্গন্ধ হইলে উৎপন্ন গুড়ে মাতের ভাগই অধিক হয়।

গুড়ে উক্ত প্রকারে জ্বাল দিতে ও চূণ ছিটাইতে ছিটাইতে যখন রস ঘন হইয়া আসিবে ও যখন উত্তাপের পরিমাণ প্রায় ২০০ ডিগ্রি হইয়া আসিয়াছে তখন রস হইতে উপরের ভাসমান গাদ (ময়লা) ঝাঁজরি দ্বারা কাটাইয়া ফেলিবে। গুড়ের ফুট ধরিলে বা রস যখন ফাঁপিয়া উঠিতে থাকিবে তখন ঝাঁজরি দ্বারা রসটী মধ্যে মধ্যে নাড়িয়া দেওয়া আবশ্যক। গুড়„ জ্বাল হইতে নামাইবার পূর্ব্বে একটু রস আঙ্গুলের মধ্যে লইয়া দুইটী আঙ্গুল দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে যখন দেখিবে যে অঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যে গুড় সুতার ন্যায় হইয়া উঠিতেছে এবং নাড়িতে নাড়িতে শুকাইয়া শ্বেতবর্ণ ধূলিবৎ হইতেছে তখন গুড়ের পাক ঠিক হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তৎপরে নাদাটী অথবা নাদাস্থিত গুড় (রস) নামাইয়া কিয়ৎ কাল কাষ্ঠ দণ্ড দ্বারা নাড়িতে হইবে এবং তদনন্তর উকড়ি মালা দ্বারা কলসীতে পূরণ করিতে হইবে। এক সপ্তাহকাল মধ্যেই কলসীর মধ্যে গুড়ে দানা বাঁধিলে কলসীর তলা ফুটা করিয়া দিলে কলসীস্থিত বাকী মাত নির্গত হইয়া যাইবে। ২০ কিম্বা ২৫ দিন পরে ঐ সকল কলসী ভাঙ্গিয়া উহার ভিতরের ভুরা গুড় কাপড়ে বিছাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া পেষণ করিয়া লইলে কাশির চিনির মত চিনি প্রস্তুত হইতে পারে।

ইহা হইতে স্বচ্ছ চিনি প্রস্তুত করিতে গেলে ঐ চিনির আবার রস করিয়া দুধের জল দিয়া গাদ কাটাইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। একটী চৌবাচ্চার উপর মাচান করিয়া মাচানের উপর মোটা কাপড় বিছাইয়া তাহাতেই এই দোপাকের রস ২।৩ ইঞ্চি পুরু করিয়া ঢালিয়া দিতে হইবে ও তাহার উপর শৈবাল বা পাটা শেয়ালা বিছাইয়া দিলে বেশ সুপরিষ্কৃত চিনি পাওয়া যায়। ইহাকে দোবরা চিনি বলে। চিনি মিছরি প্রস্তুত সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে "কৃষকে" বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে

সমস্ত পৃথিবীর শর্করা সবজীর পরিমাণ আনুমানিক ৬,৫০০০,০০০ টন ধরিলে, বীট চিনি পরিমাণ ৪,০০০,০০০ টনের অধিক হইবে না; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ইক্ষু হইতে এখনও প্রচুর পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হইতেছে এবং দেখা যাইতেছে যে ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের মত স্থানই ইক্ষু-চিনি প্রাপ্তির প্রধান উপায়। *ইক্ষু ব্যতীত খর্জ্জুর রস হইতে গুড় প্রস্তুত হইতে পারে।

বীট হইতে সুধু চিনি নহে উহা হইতে সুরাসার প্রস্তুত হইতে পারে। বীটের রস অম্ল সংযোগে মাতিয়া উঠিলে তাহা চোলাই করিয়া মদ্য বা সুরাসার (alchohol) প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

ফ্রান্স, জার্ম্মানি ও য়ুরোপের অনেক স্থানে এবং কানাডা, ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ও

নিউজিলাণ্ড প্রভৃতি স্থানে বীট হইতে বহুল পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে বীট চাষের বিশেষ সুবিধা নাই। যে সকল স্থানে প্রায়ই ৬২ হইতে ৬৫ ডিগ্রি ফার্ণহিট উত্তাপ থাকে সেই সকল স্থানই বীট চাষের উপযোগী এবং সেই জন্য ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় অধিকতর উষ্ণতা ও উপরন্তু শৈত্যপ্রযুক্ত এখানে বীট চাষ সর্ব্বত্র ভাল হইতে পারে না। শীতকালে সবজী বাগানে বীটের আবাদ হয় বটে কিন্তু অধিক জমিতে সাধারণ শস্যের ন্যায় শস্যক্ষেত্রে বীটের আবাদ হইতে এখানে দেখা যায় না। কিন্তু আখের আবাদ ও বিচের আবাদের তুলনা করা ও চিনির মাত্রা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য এবং আবশ্যক হইলে বিট চাষের প্রবর্ত্তন করিতে সাধারণকে যত্নবান হইতে হইবে।

পেঁপের শ্বেত আঠা—ইহা নানা রোগের ঔষধ। ইহার শ্বেত আঠায় কৃমি নষ্ট হইয়া থাকে। এক চামচ শ্বেত রস, এক চামচ মধু, উত্তমরূপে মিশাইয়া, চারি বা পাঁচ চামচ গরম জল একটু একটু করিয়া মিশাইয়া দুই ঘণ্টা অন্তর খাঁটি রেড়ীর তৈল, লেবুর রস বা ভিনিগার অর্থাৎ সির্কার সঙ্গে সেবন করিলে, দুই দিনের মধ্যে সমস্ত কৃমি নষ্ট হইয়া যায়। পেঁপের ভিতর গোল মরিচের মত যে বীজ আছে, তাহা খাইলেও পোক নষ্ট হয়।

পেপ্‌সিন—পেঁপে ছাড়াইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া সুরাসারে ফেলিয়া দিলে যে পরিমাণ বস্তু থিতাইয়া পড়ে, তাহাকে শুষ্ক করিয়া গুঁড়াইয়া লইলে ব্যবহারোপযোগা পেপ্‌সিন প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই পেপ্‌সিন অজীর্ণ রোগের এক মহৌষধ। ইহার শ্বেত রসে, বর্দ্ধিতায়তন প্লীহা ক্রমশঃ কমিয়া যায়; ছোট চামচের এক চামচা পাউডার ও সেই পরিমাণ চিনি দিয়া প্রত্যহ তিনবার সেবন করিলে রোগ এক বারে সারিয়া যায়। কাঁচা পেপে একটী থেঁতো করিয়া সমস্ত রাত্রি হিমে ফেলিয়া রাখিয়া লবণের সহিত সেবন করিলে প্লীহা রোগ আরাম হয়।

পেঁপের পাচক গুণ—মাংস সিদ্ধ করিবার সময় কয়েক ফোঁটা পেঁপের রস দিলে মাংস শীঘ্র গলিয়া যায়। কাঁচা পেঁপে মাংসে ফেলিয়া দিলেও কতকটা এই কার্য্যের সাহায্য হয়। মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া পেঁপের পাতায় ঢালিয়া রাখিলেও মাংস সহজে সিদ্ধ হয়। কাঁচা পেঁপে কাটিলে যে শ্বেত রস বাহির হয় তাহার গুঁড়া আহারান্তে দুগ্ধ বা চিনির সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার অজীর্ণ রোগ আরোগ্য হয়। ভৈষজ্য-তত্ত্ববিদ্‌দিগের দ্বারা ইহার গুণাগুণের সবিশেষ পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

---
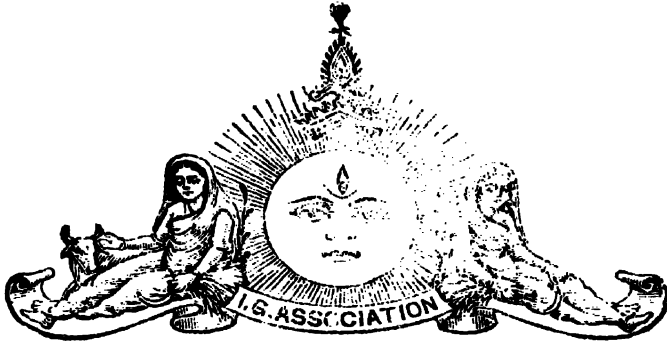
২২ খণ্ড। { কৃষক—পৌষ, ১৩২৮ সাল। } ৯ম সংখ্যা।

গৃহ ও অরণ্য

সাধারণতঃ গৃহ ও অরণ্য পরস্পর বিরোধী অবস্থা বলিয়া বিবেচিত হয়। গৃহ অর্থে মানব সমাজ ও সভ্যতা এবং অরণ্য অর্থে লোকালয় শূন্য স্বভাব জাত উদ্ভিদ সমষ্টি বলিয়া যদি ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে আলোক ও আঁধারের ন্যায় গৃহ ও অরণ্যের মধ্যে যে বিরোধ আছে তাহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সমকালে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে একের উপর অন্যের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। যেরূপ প্রথায় পৃথিবীর উদ্বর্ত্তণ হইয়া আসিয়াছে তাহাতে উদ্ভিদ্ ব্যতিরেকে মানবের অভিব্যক্তি সম্ভবপর হইত না। আবার মানবের দূরদর্শিতা ও চেষ্টা ব্যতীত অধিকাংশ স্থানেই বনভূমির অস্তিত্ব লোপ পাইত।

কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে, যখন এমন কি নরনারিও মানব জাতির আবির্ভাবের সূচনা করে নাই, সে সময় পৃথিবীর উদ্ভিদেরই রাজত্ব ছিল। সেই অঙ্গার যুগের বিশাল জলা-অরণ্যানির ধ্বংশাবশেষ, পাথুরে কয়লা লইয়াই বর্ত্তমান শক্তিমদমত্ত কল কব্জার যুগের উদ্বর্ত্তণ সম্ভবপর হইয়াছে। রাণীগঞ্জ ও ঝড়িয়ার প্রসিদ্ধ কয়লা ক্ষেত্র সমূহের প্রশীল উদ্ভিদ-কঙ্কাল এমন সহস্র সহস্র নরনারীর অন্নসংস্থান করিয়া দিতেছে ও পুণরুদায়মাণ ভারতের শ্রম শিল্পের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান, ইন্ধন, উৎপাদন করিতেছে।

কিন্তু সকল অবস্থাতেই উদ্ভিদ মানবের বন্ধুর কাজ করে না। বস্তুতঃ প্রকৃষ্ট অথবা প্রচ্ছন্নভাবে মনুষ্যের সহিত উদ্ভিদের অহরহ দন্দ্ব চলিতেছে। এক বৎসর মাত্র নর সমাজ যদি আত্ম রক্ষার জন্য কোন চেষ্টা না করে তবে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকায়ও

অরণ্য রাজের অগ্রদূত উপস্থিত হইবে; মানবের নিজস্ব, কর্ষিত ক্ষেত্র, অরণ্যের উদ্দাম সন্তান, আগাছায় পরিপূর্ণ হইবে এবং দেখিতে দেখিতে রাজপথ, সরোবর প্রভৃতি মানব কীর্ত্তি বন্য উদ্ভিদ্ সেনা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়িবে। কত স্বল্প কাল মধ্যে পরিত্যক্ত লোকালয় জঙ্গলে পরিণত হয়। উদ্ভিদের সন্তান-উৎপাদন শক্তি কত প্রবল তাহা প্রত্যেক উদ্ভিদ্‌বিদ্ মাত্রেই অবগত আছেন। প্রাগৈতিহাসিক মানবকে গৃহ রচনা ও রক্ষা করিতে যে কি কঠিন কষ্ট পাইতে হইয়াছিল তাহা আমরা ঠিক কল্পনা করিতে পারি না।

মানুষ আমিষ ও নিরামিষ উভয় বিধ আহার্য্য গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ ও বংশ বৃদ্ধি করিয়া থাকে বটে, কিন্তু সমষ্টি ভাবে প্রাণী অথবা উদ্ভিদ্ সমাজ, কাহারও উপর মানুষের ভালবাসা নাই। মনুষ্য-সমাজে কেবল কতিপয় প্রাণী অথবা উদ্ভিদ্ আদৃত হয়; অবশিষ্টাংশের সহিত ঘনিষ্ঠতা মানব বাঞ্ছনীয় মনে করে না। আমাদের ক্ষেত্র অথবা উদ্যান এই প্রকার উদ্ভিদ্ নির্ব্বাচনের ফল। অনেক স্থলেই অরণ্যের উচ্ছেদ সাধন করিয়া মানব নিজের প্রিয় অথবা ব্যবহার যোগ্য উদ্ভিদ্ সমূহের বসবাসের স্থান করিয়া দিয়াছে। কিন্তু স্বভাবত তরুলতাদি হইতে কর্ষিত উদ্ভিদ্ এত হীন বল যে মানুষের সাহায্য ব্যতীত ইহারা সামান্য কালও স্বকীয় প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে না। হয় তাহারা পূর্ব্বতন বন্য অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করে, না হয় বনের স্বাভাবিক সন্তান সন্ততীর প্রতিদ্বন্দ্বীতায় একবারেই বিলোপ পায়।

ভূপঞ্জরে উপর্য্যুপরিস্থিত কত স্তরে মহান অরণ্যরাজির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে এক একবার ভূবিপ্লবের সময় এক এক দেশব্যাপী অরণ্য একবারেই লয় পাইয়াছে। এখনও আমরা চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি যে ঝটিকা, জল প্লাবন, অগ্ন্যুদ্গাম প্রভৃতি প্রাকৃতিক উৎপাতে দেশ অথবা স্থান বিশেষের উদ্ভিদ্ সমষ্টি কতবার বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। কিন্তু উদ্ভিদ্ জীবন এক প্রকার অমর। আবার ২৫।৩০ অথবা ৫০ বৎসর মধ্যে সেই স্থানেই শ্যামল বনশ্রেণী দেখা দিতেছে। কেবল যে স্থানে মানব পরিণাম ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পর্ব্বত গাত্রে অথবা উচ্চ ভূমিতে বনস্পতিগণের সম্পূর্ণরূপ উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে, সেই স্থানেই অবশ্য গাছ সহজে জন্মিতে পারে নাই। ফ্রান্স ও আমেরিকায় বহু বিস্তৃত ভাবে এবং এতদ্দেশে স্থানে স্থানে অল্প বিস্তর ভাবে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। উচ্চভূমি বনশূন্য হইলেই তথায় বৃষ্টির জল আর সমভাবে সমস্ত স্থান সিঞ্চিত করিয়া ধীরে ধীরে গড়াইয়া যাইতে পারে না। ক্রমশঃ এক কালীন অধিক পরিমাণ জল সাতিশয় বেগে তরঙ্গাকারে নামিতে থাকে এবং তৎসঙ্গে উদ্ভিদ পোষণোপযোগী মৃত্তিকা পর্য্যন্ত ধুইয়া লইয়া যায়। সুতরাং সময়ে ঐ প্রকার ভূমি উর্ব্বর ক্ষেত্রে পরিণত হয়; মানবের বাসস্থানের পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে এবং মানবকেও বাধ্য হইয়া সেরূপ স্থান ত্যাগ করিতে হয়।

এইরূপ নগ্ন পর্ব্বত গাত্রে অথবা উচ্চভূমিকে আবার বনরাজি মণ্ডিত করা যে কিরূপ শ্রম, সময় ও অর্থ সাপেক্ষ তাহা ফ্রান্স ও আমেরিকার বন বিভাগের লুপ্ত অরণ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টার বিবরণ পাঠ করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। আমাদের দেশেও হিমালয়ের 'নাঙ্গা পর্ব্বত' চিরকালই কিছু নাঙ্গা ছিল না। কালকা হইতে সিমলার পথে যে বৃহৎ বৃহৎ গিরিপাদ দেশে প্রধানতঃ থোহড় (সিজজাতীয় গাছ) দ্বারা পরিপূর্ণ দেখা যায় তাহাও পূর্ব্বতন মূল্যবান অরণ্যের উচ্ছেদ সাধারণের পরিচায়ক।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে উদ্ভিদ্ প্রায় অমর। পৃথিবীর সমস্ত নগ্ন স্থান অধিকার করিবার জন্য দিবারাত্রি ইহারা কি না মহৎ প্রয়াস করিতেছে। সমুদ্র তীরে বিশাল বালুকাস্তূপ, নদী ও সাগর সঙ্গমের কর্দ্দমরাশি, প্রায় বারিহীন স্থানের নানা প্রকার লবণ মিশ্রিত বিপুল প্রান্তর, মরুভূমি, পর্ব্বতমালার নগ্ন শিখর শ্রেণী প্রভৃতি আজ যাহা তৃণ শূণ্য কাল তাহা সেরূপ থাকিবে না। দলে দলে অসংখ্য উদ্ভিদ এই সমস্ত দেশ জয় করিবার জন্য চলিয়াছে। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, যাহা অনুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতিরেকে নয়ন গোচর হয় না, সেরূপ উদ্ভিদ হইতে আরম্ভ করিয়া শতাধিক হস্ত উচ্চ দেবদারু ইহাদের সকলেরই নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে। ইহারা সকলেই উদ্ভিদ রাজ্য প্রসারের জন্য জীবন পাত করিতেছে। কিন্তু আজ যে স্থান উদ্ভিদ বিরহিত কাল সে স্থানে যে একবারে বিশাল বটবৃক্ষ জন্মিবে তাহা নহে। যে স্থানে নূতন মৃত্তিকা গঠিত হইতেছে সেরূপ স্থানে বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে প্রথমতঃ একরূপ নীচ শ্রেণীর উদ্ভিদ জন্মিতেছে, যদ্বারা কেবল মৃত্তিকা প্রস্তুত হয়। তৎপরে আর এক শ্রেণীর উদ্ভিদ জন্মিবে যাহারা উক্ত মৃত্তিকা সংরক্ষণ করিতে পারে। বহু পুরুষাবধি এই দুই অগ্রণী শ্রেণীর উদ্ভিদ্ কার্য্য করিয়া আসিলে তবে ভূমি সাধারণ ভাবে উদ্ভিদ্ বংশ বিস্তারের উপযোগী হইবে। তখন সেই ভূমি অধিকার করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দী উদ্ভিদ্ শ্রেণী সমূহ উপস্থিত হইবে এবং এ সময় যোগ্যতমের নির্ব্বাচন প্রণালী অনুসারে কোন নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর উদ্ভিদ অবশিষ্ট শ্রেণী সমূহের উপর আধিপত্য লাভ করিবে। যেখানে এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে সেই খানেই আমরা এক জাতির ও তাহার আত্মীয়গণের অধিক প্রতিপত্তি দেখিতে পাই। দেবদারু, চিল, বান, আখরোট্, নাল, বেহাল্, সেগুণ, শিশু, খয়ের, বাবলা প্রভৃতি বৃক্ষ এইরূপে ভারতের স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ ভূমিখণ্ড অধিকার করিয়া থাকে। অবশ্য সালের জঙ্গল বলিতে গেলে ইহা বুঝায় না যে তথায় শাল ব্যতীত আর কোন জাতীয় উদ্ভিদ নাই। বস্তুতঃ যে স্থলে বহুবিধ জাতীয় উদ্ভিদ থাকিতে পারে—কিন্তু অধিকৃত স্থানের পরিমাণে, পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধির হারে, এবং নিজেক জল বায়ু মৃত্তিকার উপযোগী করিয়া লইবার ক্ষমতার হিসাবে শালেরই উক্ত স্থানে প্রাধান্য। এইরূপ একজাতি প্রধান অরণ্য

সাধারণতঃ নিকৃষ্ট জমিতেই দৃষ্ট হয়। উৎকৃষ্ট মৃত্তিকায় নানা জাতীয় উদ্ভিদ জন্মিতে পারে ও পাশা পাশি বিভিন্ন জাতীয় তরুরাজি স্ফূর্ত্তি পাইবার সুবিধা হয়। সেই জন্যই আমরা নানাবিধ তরুলতা ও গুল্মাদিপূর্ণ-মিশ্র অরণ্য ঘাট দেশেই (দক্ষিণাবর্ত্ত) দেখিতে পাই—তথায় সারপূর্ণ মাটি, তাপ, রস, আলোক—কিছুরই অভাব নাই।

মনুষ্য যখন কোন স্থানে ২।৪ জাতীয় কাষ্ঠ অথবা বনজ দ্রব্য সংগ্রহের জন্য আদিম অরণ্য কাটিয়া, পোড়াইয়া বিলুপ্ত করিয়া দেয় তখন সে আদৌ ভাবে না যে উক্ত অরণ্য উদ্ভিদ্ সমাজের কত শতাব্দী ব্যাপী প্রয়াসের ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক হিসাবে আরণ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিলে অরণ্যের ক্ষতি হইত না এবং মনুষ্যগৃহও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালী হইত। কিন্তু ক্ষণিকের লাভের জন্য মনুষ্য নিজেরই ভবিষ্যতের মহত্তর লাভ পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছে। বনভূমির সহিত বৃষ্টিপাত ও জল সংরক্ষণের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। ছায়াপ্রদায়ী তরুরাজি পযুক্তউ পরিমাণে না থাকিলে কোন স্থানে মনুষ্যের বসবাস কষ্ট সাধ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় বহুবিধ দ্রব্যাদিতে যে নানা শ্রেণীর উদ্ভিদ আবশ্যক হয় অরণ্যের সান্নিধ্য ব্যতীত তৎসমুদয় সহজে পাওয়া যায় না। এই সমুদয় বিষয় ঠিক উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই মানব অরণ্যের বিলোপ সাধন করিয়া অসিতেছে। কিন্তু বিজ্ঞান এখন অন্ধ মানবের আঁখির আবরণ খুলিয়া দিয়াছে। নানা উন্নত দেশে, বিশেষতঃ জার্ম্মণিতে দেখান হইয়াছে যে ব্যবহারিক হিসাবে বনভূমি জাতীয় ধনাগমের প্রকৃষ্ট পন্থা। সেই শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া নানা দেশ অরণ্য সংরক্ষণের চেষ্টা করিয়াছে।

ভারতে বণ সংরক্ষণের চেষ্টা নিতান্তই আধুনিক। ১৮৫৬ সাল হইতে ইহার সূচনা হইয়াছে। ইহার মধ্যে অনেকটা উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইহা বলিলেই তার যথেষ্ট প্রমাণ হইবে যে বৃটিন-সাশিত ভারতের এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ প্রায় ২৪৯০০ বর্গ মাইল, বনভূমি দ্বারা অধিকৃত এবং উহা অল্প বিস্তর মাত্রায় সরকারী তত্ত্বাবধারণে পরিচালিত। কিন্তু বৃটিশ সাশিত ভারতের ভিতরে ও বাহিরে এমন অনেক অরণ্য আছে যাহার তালিকা সরকারী হিসাবে পাওয়া যায় না। তন্মধ্যে কতিপয় দেশীয় রাজ্য বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বঙ্গদেশের মধ্যে লক্ষাধিক একার পরিমিত অরণ্য কেবল ২৪ পরগণা, খুলনা, জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং, চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশেই অবস্থিত। আর বঙ্গে দেশীয় রাজন্যের মধ্যে পার্ব্বত্য ত্রিপুরার অরণ্যই প্রধান। কিন্তু মূল্যবাণ বৃক্ষের অরণ্য বঙ্গের বাহিরেই অধিক। মহীসূর, ত্রিবাঙ্কুর কেচিণ, কাশ্মীর, টিহার, গড়ওয়াল, সিকিম, শিরমুর প্রভৃতি অঞ্চলের অরণ্য নিচয় হইতে এমনও প্রভূত পরিমাণ ধনাগম হয়। পুরাতন অপচয়* বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাবধারণে কালক্রমে পূরণ হইলে এই অঞ্চলের বণভূমি যে বিপুল ধনের আচার হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

---

* "ভারতবর্ষ", মাঘ ১৩২৪, 'অরণ্যের অপচয়" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মনুষ্য সমাজের উন্নতির জন্য অরণ্যের প্রয়োজন আছে। কিন্তু অরণ্য ও ক্ষুদ্র জঙ্গলের মধ্যে অনেক প্রভেদ। বৃহৎ বৃহৎ তরুরাজির বিরল সমাবেশে অথবা অরণ্যের সান্নিধ্যে দেশ উর্ব্বর, সুস্নিগ্ধ ও স্বাস্থ্যকর হয়। পক্ষান্তরে মানব বসতির মধ্যে ঝোপ ঝাপ প্রভৃতি থাকিলে, বিশেষতঃ উক্ত স্থান সমতল হইলে আবাধে জল সঞ্চলনের অসুবিধা হয় স্থানে স্থানে জল জমিয়া ও পত্র পল্লবাদি পচিয়া ম্যালেরিয়া প্রভৃতির উৎপত্তির সহায়তা করে। এতদ্ভিন্ন কর্দ্দম ও আবর্জ্জনা রাশি ভূপৃষ্ঠ হইতে সূর্য্যোত্তাপে স্বাভাবিকরূপে জলীয় বাষ্প নিঃসরণের পথ রুদ্ধ করিয়া ভূমি সাতিশয় আদ্র করিয়া তুলে। ম্যালেরিয়াক্রান্ত গ্রাম সমূহে বৃহৎ বৃক্ষ অপেক্ষা ক্ষুদ্র উদ্ভিদেরই আধিক্য। যদি উপযুক্ত রূপ নির্ব্বাচন করিয়া গ্রাম মধ্যে নির্দ্দিষ্ট জাতীয় বৃক্ষাবলী রোপণ করা যায় তবে স্বাস্থ্যোন্নতি অবশ্যম্ভাবী। বিশেষ উদ্ভিদের সহিত স্থাণীয় স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ একটি গবেষণা যোগ্য বিষয়।

একদিকে ক্ষুদ্র জঙ্গলের আধিক্যের জন্য যেমন স্থান বিশেষে মনুষ্যের বসবাস অসম্ভব হইয়া পড়ে অন্যদিকে অন্য কারণে ক্ষুদ্র জঙ্গলের অভাবেও ঠিক সেই অবস্থা হয়। যুক্ত প্রদেশের উষর ক্ষেত্র সমূহ, পঞ্চনদের বারিহীন অঞ্চলের তৃণ বিরল ময়দান, রাজপুতনার মরুভূমি—এই সমুদয় শেষোক্ত অবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যদি কোন উপায় এই সমুদয় স্থানে বিশেষ বিশেষ জাতীয় উদ্ভিদ জন্মাইতে পারা যায় তাহা হইলে কালক্রমে তদ্দারা মৃত্তিকা গঠিত হইবে এবং মৃত্তিকা গঠিত হইলেই তৎপরে বনজ অথবা ক্ষেত্রজ উদ্ভিদ অনায়াসে উৎপাদিত হইতে পারিবে।

গৃহ ও অরণ্য পরস্পর বিরোধী অবস্থা হইলেও সম্বন্ধ বিহীন নহে। মনুষ্যের প্রথম গৃহ অরণ্যে—বিশাল দ্রুম রাজির শাখা প্রশাখায়; তৎপরে বনমধ্যে প্রাকৃতিক গুহায় এবং তাহার পর বন সন্নিকটে আরণ্য তরু গুল্মাদি দ্বারা আচ্ছাদিত কুটীরে। মনুষ্য ও উদ্ভিদের মধ্যে ভূভাগ অধিকার লইয়া চিরন্তন বিবাদ থাকিলেও মনুষ্যের পক্ষে উদ্ভিদ সমাজের প্রতিভূ অরণ্যের উচ্ছেদ সাধন স্বার্থের হিসাবেও সমিচীন নহে। আহার্য্য, পরিধেয়, গৃহ নির্ম্মান উপাদান, ও গৃহ সজ্জা, ও ঔষধ প্রভৃতিতে যে অসংখ্য জাতীয় উদ্ভিদ ব্যবহৃত হয়—এ সমস্তই আমরা অরণ্যের বিশাল ভাণ্ডার হইতে পাইয়াছি। এখনও কত অগণিত উদ্ভিদের গুণাবলী আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং মনুষ্য সমাজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম অরণ্য নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখিয়া সংরক্ষণ করা ও বন্য উদ্ভিদের জীবন বৃত্তান্ত ও কার্য্যকারিতায় অধিকতর মনোনিবেশ করা। আমাদের ভারতবাসীগণের হৃদয়ে অরণ্য প্রীতি আরও দৃঢ়তর ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, কারণ ভারতীয় সভ্যতা প্রথমে বনস্থলেই বিকশিত হইয়াছিল। জীবনের নির্দ্দিষ্ট সময় বনগমনের প্রথারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উদ্দেশ্য কতটা আধ্যাত্মিক ও কতটা ব্যবহারিক বলা যায় না, তবে ইহা ঠিক যে আজকাল অরণ্য নামের সহিত

সাধারণের হৃদয়ে যেরূপ একটা আশঙ্কা ও ভীতি বিজড়িত হইয়া আছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। আধুনিক জগতে শিল্পাদির উন্নতি দ্বারা সভ্য জাতিগণের সমকক্ষ হইতে হইলে ভারতবাসীর অরণ্যতত্ত্ব আলোচনা একান্ত আবশ্যক। নতুবা আমাদিগের অরণ্যজাত দ্রব্য সম্ভার লইয় অপর জাতি ধনবান হইবে, আমাদিগকে কেবল মজুরী মাত্র লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

দেশীয় কার্পাসের উন্নতির উপায়

দেশীয় কার্পাস সমূহের মধ্যে অধিকাংশেরই তন্তু হ্রস্ব, সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নের পক্ষে অনুপযুক্ত, এবং ক্ষুদ্র জাতীয় কার্পাস চাষে লাভের মাত্রা অত্যন্ত কম, এই সমস্তই কার্পাস ব্যবসায়ের অধোগতির প্রধান কারণ। বস্তুতঃ উন্নতির উপায় একটি মাত্র,—উৎকৃষ্ট জাতীয় কার্পাস উৎপাদন। কি প্রকারে সেই কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে তাহাই বর্ত্তমান কার্পাস উৎপাদন সম্বন্ধে আন্দোলনের মূখ্য বিবেচ্য বিষয়। ভারতীয় কৃষিবিভাগের কর্ত্তা (Inspector-general of Agriculture) মলিসন সাহেব কয়েক বৎসর এই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত কার্পাস বিবরণীতে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হইয়াছে তৎ-সমুদয়কে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। ১। দেশীয় কার্পাস সমূহের জাতিগত লক্ষণাবলী এবং পরস্পরের তুলনায় উৎকর্ষতা অপকর্ষতা নির্দ্ধারণ; ২। উহাদের উপযোগী জল, বায়ু ও মৃত্তিকা নির্ণয়; ৩। সঙ্কর উৎপাদন এবং বীজ নির্ব্বাচন দ্বারা উৎকৃষ্টতর জাতি উৎপাদন; ৪। বিদেশীয় জাতি সমূহ এতদ্দেশে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে কি না এবং প্রবর্ত্তিত হইলে তাহাদের উপযোগী জল, বায়ু, মৃত্তিকা ও চাষের ফলাফল নির্দ্ধারণ; ৫। কৃষকগণের কেবল হ্রস্ব-সূত্র কার্পাস উৎপাদনে আগ্রহাতিশয্যের কারণ নির্ণয় এবং উৎকৃষ্ট জাতি সমূহের চাষ বৃদ্ধির উপায়।

বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, উপরোক্ত পাঁচটি কার্য্যের মধ্যে কোনটিই সাধারণ কৃষক দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না। কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ এবং কৃষি-বিজ্ঞানবিৎগণ ইচ্ছা করিলে এই সমস্ত উপায় দ্বারা কার্পাস চাষের উন্নতির সহায়তা করিতে পারেন। শুদ্ধ ক্ষুদ্র জাতীয় কার্পাস চাষে কোন লাভ নাই। সুতরাং যাঁহারা এক্ষণে কার্পাস চাষ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উৎকৃষ্ট জাতীয় কার্পাস চাষ করিতে হইবে। আবার শুদ্ধ উৎকৃষ্ট জাতীয়

কার্পাস বলিলে কিছু বুঝিতে পারা যায় না ; আমেরিকার, মিশরের ও অষ্ট্রেলিয়ার অনেক জাতীয় কার্পাসই উৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাত। কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাদের বীজ লইয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিলেই যে আমেরিকা মিশর অথবা অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় তুলা এতদ্দেশে উৎপাদিত হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। পক্ষান্তরে অনেক স্থলে ইহা দৃষ্ট হইয়াছে যে, বিদেশীয় তুলা এদেশের জলহাওয়া ও মৃত্তিকায় তাহাদের স্বকীয় গুণাবলী রক্ষা করিতে না পারিয়া, দেশীয় নিকৃষ্ট জাতীয় কার্পাসের মত হইয়া যায়। এতদপেক্ষা দেশীয় জাতি সমূহের মধ্যে যে গুলি উৎকৃষ্ট, সেই রূপ জাতি চাষ করিয়া ফসলের বংশ পরম্পরাক্রমে উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর বীজ নির্ব্বাচন করিয়া লওয়াই শ্রেয়। বীজ নির্ব্বাচন, সঙ্কর উৎপাদন এবং উন্নত প্রণালীতে চাষ দ্বারা তুলার উন্নতি সাধিত হইতে পারে। কিন্তু বিদেশীয় জাতি সমূহের প্রবর্ত্তনের চেষ্টাও একান্ত আবশ্যক। যদি কোন জাতি এদেশে প্রবর্ত্তিত হইবার পর পূর্ব্বোল্লিখিতরূপে অধোগামী হইতে থাকে, তাহা হইলে উহার সহিত কোন উপযুক্ত দেশীয় জাতির সঙ্কর উৎপাদনপূর্ব্বক উহার উৎকৃষ্ট গুণাবলী রক্ষা করার চেষ্টা বিধেয়। প্রায় শতাধিক বর্ষ হইতে এতদ্দেশে নানাবিধ বিদেশীয় তুলা উৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে বিদেশীয় জাতি সমূহ কখনই এতদ্দেশে ভালরূপে জন্মায় নাই। বর্ত্তমান সময় আবার নূতন করিয়া কতকগুলি দেশীয় ও বিদেশীয় জাতির চাষ পরিসরের চেষ্টা করাকর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়।

বামন অথবা রাজ নারিকেল

নারিকেল সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি "কৃষকে" বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগের পাঠকবর্গ এখনও বোধ হয় 'বামন' অথবা 'রাজ নারিকেল' নামক মলয় দ্বীপজাত নারিকেল জাতির বিষয় শুনেন নাই। ইহা উর্দ্ধে দশ ফুট মাত্র হয়। পাতার বোঁটা হইতে পত্রান্ত ভাগের দৈর্ঘ্য প্রায় ১২ ফুট। পত্রের বোঁটা, মধ্য পত্রিকা, পার্শ্বস্থ শিরা, পুষ্পদণ্ড ও ফল সমস্তই সাধারণতঃ পীতবর্ণ। কিন্তু বর্ণ পীত না হইয়া ইষ্টক সদৃস রক্তবর্ণ হইতে হরিদ্বর্ণ এই উভয়ের অন্তবর্ত্তী যে কোন বর্ণ হইতে পারে। পীত বর্ণের জাতিই সমধিক পরিমাণে ফল প্রসব করে। অন্য বর্ণের জাতি উচ্চতর ও অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর ফল প্রসবী হইলেও মোটের মাথায় পীত বর্ণ জাতির সমকক্ষ নয়।

উত্তমরূপে চাষ করিলে তৃতীয় বৎসরেই বামন নারিকেলের পুষ্প হয়। প্রথমে পুং পুষ্প দেখা দেয়, কিন্তু অব্যবহিত পরেই যে সমুদয় পুষ্পদণ্ড বহির্গত হয় তাহাতে স্ত্রীপুষ্পের অভাব থাকে না। বস্তুতঃ ছয় বৎসরের গাছে ২০০ পর্য্যন্ত স্ত্রীপুষ্প পাওয়া গিয়াছে এবং এক এক কাঁদিতে এমন কি ৫০টি পর্য্যন্ত পাকা নারিকেল হইয়াছে। কাঁদিগুলি পূর্ণ পরিণত অবস্থায় মৃত্তিকা স্পর্শ করে। পুষ্প প্রসব হইতে ৯ মাসের মধ্যেই নারিকেল পরিপক্ক হইয়া উঠে। পাকা 'বামন' নারিকেল পরিধিতে ২৪ হইতে ৩২½ ইঞ্চি। খোলা পাতলা ; আঁশ ও শাঁসের ভাগ নারিকেলের আয়তনের অনুপাতে যথেষ্ট। মলয় দেশবাসীরা বলে যে ইহার শাঁসবড় জাতির নারিকেল অপেক্ষা অধিক মিষ্ট এবং শাঁসে তৈলের মাত্রাও বেশী।

আপাততঃ পৃথিবীর মধ্যে বোধ হয় কেবল এক স্থানেই ১৫০০ বিঘা পরিমিত জমিতে রাজ নারিকেলের বাগান আছে। উহা মলয়দ্বীপে সমূদ্র তীরে অবস্থিত। এই বাগানের ফসল সম্বন্ধে যতদুর জানা গিয়াছে তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে গড় পড়তায়

চতুর্থ বৎসরে প্রথম ফলনে বামন নারিকেলের গাছ প্রতি ১০টি ফল হয়। তৎপরে ৩০, ৬০, ৮০, ১০০ ও নবম বৎসরে গাছ প্রতি ১২০টি ফল প্রসব করিয়া বামন নারিকেল পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়। অবশ্য বড় নারিকেল অপেক্ষা বামন নারিকেলের শাঁস কিছু কম হইবেই। কিন্তু সংখ্যাধিক্যে শাঁসের স্বল্পতা পোষাইয়া যায়। ১০০ নারিকেল হইতে ন্যূনাধিক ১৩ সের কোপ্রা অর্থাৎ শুষ্ক শাঁস পাওয়া যায়।

বামন নারিকেলের গাছ বসাইতে হইলে ২৪ × ২০ ফুট অন্তর বসাইতে পারা যায়; তাহাতে বিঘা প্রতি প্রায় ৩০টি গাছ বসে। বড় নারিকেলের গাছ বিঘা প্রতি ইহার অর্দ্ধেক এবং হইবে ষষ্ঠ বৎসরের পূর্ব্বে বড় নারিকেলের ফলন হয় না। সুতরাং নয় বৎসর বয়স্ক বামন ও বড় নারিকেলের গাছ যদি তুলনা করা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে বিঘা প্রতি বামন নারিকেল ৩৬০০ ও বড় নারিকেল মাত্র ৬০০ হইবে। এরূপ অবস্থায় বামন নারিকেল চাষ যে অধিক লাভজনক তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। এতদ্ভিন্ন বামন নারিকেল গাছ ছোট বলিয়া গাছ ছাড়ান, ফল সংগ্রহ পোকা মাকড়ের প্রতিকার করা এ সমস্তই কথা আয়াস সাধ্য।

ভারতীয় ক্ষেত্রজ দ্রব্যাদির ব্যবসায়ের মধ্যে নারিকেলের ব্যবসায় নিতান্ত নগণ্য নহে। বৎসরে নারিকেল ও নারিকেলজাত যে সমস্ত দ্রব্যাদি রপ্তানি হয় তাহার মূল্য ১৯৭ লক্ষ টাকার কম নহে। এতদ্ভিন্ন অনেকে অনুমান করেন যে দেশমধ্যে বৎসরে অন্ততঃ ৪০ কোটি নারিকেল খরচ হয়। নারিকেল ছোবড়া, ছোবড়া হইতে প্রস্তুত দড়ী দড়া মাদুর ইত্যাদি, কোপ্রা, নারিকেল তৈল ও খৈল এ সমুদয় ত সর্ব্বজনবিদিত নারিকেলের ব্যবহার। ইহা ছাড়াও কৃত্তিম মাখম ও আহার্য্য তৈল, গ্লিসরিন, সাবান, বাতি প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য বিদেশে নারিকেলের কাটতি দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। আধুনিক গবেষণায় ইহাও প্রকাশ পাইয়াছে যে নারিকেলের খোলে যথেষ্ট পরিমাণ অ্যাসেটিক অ্যাসিড আছে; খোলার ছাই উত্তম পটাস প্রধান সার এবং খোলার কয়লায় বাষ্প শোষণ শক্তি এত অধিক যে বিগত মহা যুদ্ধের সময় উহা বাষ্প বিস্ফোরণ বোমার প্রতিষেধকরূপে ব্যবহৃত হইত।

এতদ্দেশে নারিকেল চাষের প্রধান কেন্দ্র,—বোম্বায়ে কাথিয়াবাড়, কানাড়া ও রত্নগিরি অঞ্চল, মান্দ্রাজে মালাবার, দক্ষিণ কানাড়া ও গোদাবরী নদীর দ্বীপ; ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাজ্য; গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের মোহানার নিকটবর্ত্তী স্থান সন্দহ ও ব্রহ্মদেশে ইরাবতী নদের দ্বীপ। কিন্তু এত স্থানে নারিকেল উৎপাদিত হইলেও ভারতে এমনও বৈজ্ঞানিক প্রথায় নারিকেল আবাদ আরম্ভ হয় নাই। প্রত্যেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে অনেক নিকৃষ্ট কৃষিজাত ফসল অপেক্ষা নারিকেল অধিক আয়কর ফসল। যে উদ্ভিদ্ হইতে এতপ্রকার ব্যবহারিক দ্রব্যের উৎপত্তি হয় তাহার আদর যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতীয় নারিকেলের কাজ একরকম জর্ম্মণদিগের হস্তগত ছিল। কিন্তু এখন টাটা কোম্পানী কল কব্জা বসাইয়া ঐ ব্যবসায় ভারতবাসীগণের হাতে কনার চেষ্টা করিতেছেন। নারিকেলের চাষ বিস্তারের এই প্রশস্ত সময় এবং চাষ বিস্তার করিতে হইলে উক্ত জাতি লবয়াই করা ভাল। আমরা এইস্থলে যে বামন নারিকেলের বিবরণ দিলাম ইহাই ভবিষ্যতের ব্যবসায়ের নারিকেল হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

ডেয়ারি ফার্ম্মিং ও পক্ষী চাষ

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার লিখিত।

এ সম্বন্ধে বহু কথা পূর্ব্বেই পত্রে বলিয়াছি। যদি আমাদের জাতি রূপে ধরা পৃষ্ঠে জীবিত থাকিতে হয় তাহা হইলে আমাদের কৃষি তথা কৃষির প্রধান সহায় গোরক্ষা করিতে হইবে, তাহার জন্য দেশের হোমরা চোমরা বাবুদের বড় ও ছোট দপ্তরে কৃষি-সম্বন্ধীয় অস্বাভাবিক আইনগুলি রদ করাইতে ও দণ্ড বিধি আইনের ধারা পরিবর্ত্তন করাইতে হইবে তাহা পূর্ব্বেই পত্রে বলিয়াছি। তাহা ছাড়া গোচারণ শুল্ক রহিত তথা প্রাচীন গো প্রচার গুলি রক্ষা ও উদ্ধার করিতে হইবে; তজ্জন্য চারণ ও বৃষ আইন নব ভাবে পাশ্চাত্ত দেশের অনুকরণে এদেশেও প্রবর্ত্তিত করান কর্ত্তব্য তাহাও বলিয়াছি।

১০নং ওল্ড পোষ্টাপিষষ্ট্রীটস্থ নিখিল ভারতীয় গো কনফারেন্সের পক্ষ হইতে মাননীয় সম্পাদক ও সুযোগ্য পণ্ডিত হিন্দু ধর্ম্মের তথা হিন্দুর তন্ত্র শাস্ত্রের মূল অর্থ প্রকাশক হাই-কোর্টের সুযোগ্য জজ সারজন উডরোফ্ এসম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন; এখন তাঁহাকে পত্র দিলেই এই গুলি পাওয়া যায়। আমার মনে হয় যে এই গুলি সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়া সমগ্র ভারতবাসীর মতামত লইয়া কোন সুযোগ্য বড় দর বারের সভ্য দ্বারা পেশ করাইলে বহু কাজ হয়; এ সম্বন্ধে ৺রাস বিহারী ঘোষ বড় দপ্তরের সভ্য থাকাকালে ১৮৯৪ সালের ২৯৷৩ তারিখে পেশ করিয়াছিলেন, তাহা ইণ্ডিয়া গেজেটে ১৪,৮, ৯৪ তারিখের ৬ষ্ঠ অংশের ২০৷২১পৃষ্টেব সবিস্তার লিখিত আছে যে অস্বাভাবিক নজীরগুলিকে রদ করাইতে হইলে পৃথক আইন আবশ্যক; তাহা আজ এই ২৫৷২৬ বৎসরে হইল না। ভারতে এখন কোন লোক নাই যে এ বিষয় লইয়া দাঁড়ান; হায়রে আমাদের দুর্দ্দিন! "বৃষ ও চারণ" বীলের খসড়া জজ উড়রোফ সাহেবকে পত্র দিলেই সহজে হস্তগত হইতে পারে কিম্বা আমার নিকট লোক পাঠাইলে তাহা নকল করিয়া লইয়া পাঠাইতে পারি।

বঙ্গের সংবাদ পত্র সমূহের সম্পাদকগণের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা যে তাঁহারা এই বিল দুটি দপ্তরে পেশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের সংবাদ পত্রে স্তম্ভে প্রকাশ করিয়া দেশের অভিমত সংগ্রহ করিয়া তবে মাননীয় গিরিধারীলাল আগরওয়ালা বা লালা সুখবীরসিংহ বা মাননীয় খাপার্দ্দে, বা মাননীয় সতীশচন্দ্র ঘোষ বা মাননীয় মহারাজ সার মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহাশয়ের দ্বারায় পেশ করিলে মনে হয় কিছু কাজ হইতে পারে। এখন চাই কোন ব্যক্তির নিস্বার্থ ভাবে (নাম কাওয়াস্তেনর) দাঁড়ান; আমি তাঁকে সব কথা ও অনুসন্ধানাদি দিতে পারি। বিগত ৫০৷৬০ বৎসরে এ সম্বন্ধে

আমরা কি করিয়াছি তাহার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বা বিবরণী সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকার স্তম্ভে প্রকাশিত করিয়াছি তাহা পাঠে দেশের অবস্থাটা কি, বেশ বুঝা যাইত। বিগত অতিরিক্ত কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় রাটোনার কশাইখানা লইয়া কিরূপ "লাফালাফি" দেশে হইল তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কলিতাবাসী মাড়োয়ারিগণ ১ কোটী টাকা ব্যয়ে এক গোশালা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। গোভক্ত ভারতমাতার বরেণ্য সন্তান মিঃ সুরতী অমর ধামে গেলেন, এবং সেই সঙ্গে মাড়োয়ারদের সে সংকল্প আকাশ কুসুমে পরিণত হইল। *

এখন দেশের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে বাঙ্গালী সম্প্রদায় এবিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন। তাঁহারা বিগত ১।৭৪।২১ সালে ৺রায় নন্দলাল বোসের বাটীতে মহাকালী গোরক্ষণী সভায় প্রথম অধিবেশন হয়। তার কর্ণধার মাননীয় হাঠখোলার বণিক ও জমীদার বাবু নিবারণ চন্দ্র দত্ত এবং এই যজ্ঞের সূত্রধার ছিলেন সার আশুতোষ চৌধুরী, মাননীয় ব্রজেন্দ্র কিশোর চৌধুরী, রায় রাধাচরণ পাল, অমূল্যধন আঢ্য, নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি মহাশয়গণ তাহার সহযোগী ছিলেন, আর দর্শক মধ্যে ছিলেন সেই যোগী কর্ম্মবীর, পণ্ডিত, গো সভার প্রেসিডেন্ট সার জন উডরোফ। গোরক্ষা করা বড় সহজ নহে। যদি সেই কাজে সাফল্য লাভ করিতে যাই তাহা হইলে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সমবেত হও, নিয়ম লিপিবদ্ধ কর, সরল ধার্ম্মিক কর্ম্মীদের ও বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হও, তাহাদের সাহায্য লও, দেশী লোকের মতামত লও, তাহাদের খুঁজিয়া বাহির কর, তাঁহাদের উপর বিশ্বাস কর, তাঁহারা সব কাজ করিয়া দিবেন। মাড়োয়ারিদের মনে বিশ্বাস নাই, পরের উপর নির্ভরতা নাই, তাই তাঁদের এত টাকা থাকিতেও কাজ হইল না। তাঁহাদের পিঁজরা পোলের অবস্থা দেখিয়া বুঝিয়া লও যে তাঁহারা এইরূপ একটা দেশ হিতকর কার্য্য গড়িয়া তুলিয়া সাফল্য লাভ করিতে পারিল না। তাই বলি যে যাঁহারা এই কার্য্যে আছেন তাঁহারা যেন আগে পাছে ভাবিয়া সৎলোকের পরামর্শ লইয়া, দেশের মত লইয়া, তবে কাজে নামেন, নচেৎ মাড়োয়ারীদের মত এই বহু লাঞ্ছিত বাঙ্গালি জাতি আর পুনরায় যেন লাঞ্ছিত না হয় এই আমার মনোগত ইচ্ছা! আমরা নামকা ওয়াস্তেদের জন্য জগতে বড় নিগৃহীত ও

---

* বাঙ্গালার কোন স্থানে এ প্রকার বিরাট গোশালাস্থান আপাততঃ মধুর সম্বন্ধ হইলেও ইহা সর্ব্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত নহে; প্রথম কারণ গোমড়ক উপস্থিত হইলে দেশে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা; দ্বিতীয় কারণ এরূপ বিরাট ব্যাপারে শৃঙ্খলারাখা সুকঠিন; তৃতীয় কারণ একশ্রেণীর লোকের উপর এই প্রকার কার্য্যের ভার ন্যস্ত হইলে তাহা একচেটিয়া কারবার হইয়া উঠিবে। আমরা বলি প্রত্যেক গ্রাম্য ইউনিয়নে স্বতন্ত্রভাবে ছোট ছোট গো-শালা প্রতিষ্ঠা করা হউক, এক কেন্দ্রসমিতি হইতে তাহার তত্ত্বাবধান করা হউক। ইহাতে ভাবীফল ভাল হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কৃঃ সঃ।

অন্তসার শূন্য হইয়াছি ও হইতেছি। যদি দেশ মাতৃকার প্রকৃত উপকার করিতে হয়, তবে প্রকৃত নিস্বার্থ কর্ম্মী যাঁহারা তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন, আমি আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক ও শরীর দ্বারা যত দূর এবিষয়ে সাহায্য করা সম্ভব তাহা করিব। এ কাজে হিন্দু মুসলমান, জৈন মাড়োয়ারী, ধনী দরিদ্র, রাজা চাষা সকলেই সমবেত হইলে তবেই কাজ হবে। যেমন তোমাদের জন্য মোড়ে মোড়ে চা খানা, ও হোটেল খোলা আছে সেইরূপ গোজাতির সেবা ও রক্ষার জন্য পাড়ায় পাড়ায় ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গো রক্ষার জন্য গোহোটেল খোল। এই গোহোটেল কি তাহা জানিবার জন্য গোপাল বান্ধব পড়। ইহা ভিপিতে আমার নিকট পত্র দিলে পাঠান হয় "গোপাল বান্ধব" ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কৃষক আপিসে পাওয়া যায়। আর এক কথা এই যে কোন গোবৎসল দেশ ভক্ত মহাশয় যদি এ বিষয়ে উদ্যোগী হন তবে মল্লিখিত এ সম্বন্ধে যে সব প্রবন্ধ যদি ভিন্ন ভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা মুদ্রিত করিয়া দেশ মধ্যে বিতরণ করুন। এই সকল লেখা আবশ্যক হইলে আমি দিতে পারিব বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গলায় এখন লোকের অভাব; টাকার অভাবত আছেই। এ কাজে হেমেন্দ্র প্রসাদের মত লোক চাই। এইবার মুর্গী চাষ সম্বন্ধে ২।৪ কথা যাহা বাকী থাকিয়া গিয়াছে, তাহা বলিয়া এই পত্র শেষ করিব।

যে মুর্গী ডিম দিতেছে এইরূপ মুর্গীই কিনিয়া পালক স্বীয় পাল গঠন করিবে। সাধারণতঃ অনেক মুর্গীই শীতকালে ডিম দেওয়া বন্ধ করে; কিন্তু যে সকল মুর্গী ডিসেম্বর মাসেও ডিম দেয়, তাহারা প্রায় সম্বৎসর ধরিয়াই ডিম দিয়া থাকে। সংখ্যায়ও এই সকল মুর্গী বেশী ডিম দেয়। শীতকালে ডিম ও মুর্গীর দাম একটু বেশী হয় বলিয়া এই সময় মুর্গী কিনিলে কিছু বেশী দাম দিতে হয়। আমার মনে হয় যে উপযুক্ত মুর্গী যদি পাওয়া যায় একটু অধিক মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হওয়া সঙ্গত নহে। ২টা মোরগ (খাঁটি বা pure bred) এবং ২০ টা সাদা লেগহর্ণ বা ওয়াণ্ডোট মুর্গী লইয়া কাজ আরম্ভ করা অসঙ্গত নহে। ২০টা মুর্গীর বৎসরে ৩২০০ টি ডিম পাওয়া যাইতে পারে। ডিম দেওয়া মুর্গীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য ৪০০ ডিম রাখিয়া বাকী ২৮০০ ডিম বিক্রয় করিয়া ফেলা যাইতে পারে। এই ৪০০ বসাইবার ডিম হইতে অন্ততঃ ৩০০টা "চুজা ছানা পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপে ৫।৬ বৎসরের মধ্যে বৃহৎ কারবার করা যাইতে পারে। আমি নিউ ব্রুনজুইক, নিউজার্সি, নিউইয়ার্ক, রোডআইল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে কোটি কোটি মুর্গী উৎপাদন কারী কারখানা দেখিয়াছি। অর্ডার পাইলে আমি এই সকল পালকদের কাছ হতে স্বল্প মূল্যে পক্ষী ও কল কবজা আনাইয়া দিতে পারি। ইহাদের আমি এজেন্সি রাখি। ৯০ বা ১০০টি মুর্গী লইয়া স্থায়ী ভাবে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে খরচ বাদে মাসে ৫০।৬৫ টাকা লাভ অবশ্যম্ভাবী; যাহাতে একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রের সংসার সহজেই নির্ব্বাহিত হইতে পারে। প্রতি বৎসর বাছিয়া কেবল মাত্র অধিকতর

ডিম প্রসবকারী মুর্গী রাখিলে ক্রমশঃ মুর্গীর ডিম দেওয়ার ক্ষমতারও উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে এবং ফলে তাহাতে লাভের পরিমাণও আরও বৃদ্ধি পাইবে। ডিম ব্যবসায়ীকে ইহা সদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যেন মুর্গীগুলি অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া অত্যন্ত মোটা না হইয়া পড়ে। মোটা হইলে ভাল মুর্গীও অনেক সময় ডিম দেওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দেয়। ভুট্টা বা মক্কা অত্যন্ত মেদ বৃদ্ধিকর খাদ্য; সেইজন্য ডিমের মুর্গীকে ক্রমাগত মক্কা খাইতে দেওয়া কখনও সঙ্গত নহে।

টাট্‌কা ডিম খাইতে অত্যন্ত সুস্বাদু ও দামও বেশী। ডিম যতই পুরাণ হইবে, তাহার মূল্য ততই কমিয়া যাইবে। ডিম আমাদের একটি মূল্যবান খাদ্য। খাদ্যদ্রব্যের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ও পুষ্টিকারিত্বের প্রতি সকলেরই তীব্র দৃষ্টি থাকা চাই। একজন্য ডিমগুলি এরূপ পরিপাটী রূপে রাখা আবশ্যক যে উহা দেখিয়াই ক্রেতার মনে ডিমগুলির নূতনত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। জলে না ধুইয়া একমাত্র মুর্গীর ঘরের পরিচ্ছন্নতার গুণে ডিম পরিষ্কার রাখিতে হইবে; জলে ধুইলে ডিম অনেক দিন টাট্‌কা রাখা যায় না, এবং ইহাতে ডিমের উর্ব্বরতাও কমিয়া যায়। জলে ধোয়া বীজডিম (বসাবার ডিম) ব্যবহার করিয়া আশানুরূপ ফল লাভে বঞ্চিত হইলে ক্রেতাগণ বিক্রেতার ডিমের কার্য্য কারিতার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতে পারেন। বিক্রেতার পক্ষে ইহা কম ক্ষতিকর নহে। তা দেওয়ার জন্য প্রথম সপ্তাহের ডিমই ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত এক সপ্তাহের অধিক পুরাতন ডিম না বসানই ভাল। অনুর্ব্বর ডিম গুলিকে বাজারে পাঠানই উচিত। আলোক সাহায্যে ইহা নির্ণীত হয়।

ডিম তাজা রাখিবার কয়েকটি উপায় আছে তাহার মধ্যে, তুষ, ছাই, কয়লার গুঁড়ার মধ্যে মোটাদিক উপরদিকে রাখিয়া চাপা দিবার প্রথাটি আমার বেশ সমীচিন বলিয়া মনে হয়। বাখারিচুণ, লবণ এবং ক্রীম অব টার্টারের জলে ডিমগুলি ডুবাইয়া রাখিলে বৎসরাবধি অবিকৃতাবস্থায় থাকিতে পারে। ডিমের ব্যবসায়ে প্রথম বৎসর বড় বেশী লাভ হয় না, বরং প্রারম্ভিক কার্য্যে কেবল মাত্র ব্যয়ই বহন করিতে হয়। দ্বিতীয় বৎসরে কিছু লাভ হয় এবং তৃতীয় বৎসর হইতে রীতিমত পুর্ণমাত্রায় লাভ হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ

গুড় ও চিনি

পূর্ব্বে একটী প্রবন্ধে দেখাইয়াছি ইক্ষু ও খেজুর হইতে আমাদের দেশে কত পরিমাণ গুড় ও চিনি উৎপন্ন হয়। দেশের লোক এই সকল বিষয়ে কোনও হিসাব রাখে না অথচ বিদেশের ব্যবসায়ীরা উহার সব খবর জানেন।

ইক্ষুর চাষ লাভজনক। আমাদের দেশে ইক্ষুর চাষের উন্নতি হওয়া উচিত, পেণ্ডেরিয়া আকের কথা অনেকেই জানেন। উহা পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে। উহার ফসল খুব ভাল হয়। ইক্ষুগুলি খুব শক্ত হয়। লাল ইক্ষু হইতে সাদা ইক্ষুগুলি বেশী মিষ্ট। বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানে শামশাড়া আখ চাষের চলন অধিক। এই ইক্ষু নরম এবং চিবাইয়া খাবার পক্ষে ভাল।

সরস উচ্চ জমিতে ইক্ষুর চাষ ভাল হয়। এই চাষের কোন অঙ্গই বিদেশে শিক্ষা করিতে হয় না। কৃষকেরা যেভাবে এদেশে ইক্ষুর চাষ করে ঐ ভাবেই চাষ করিলে এবং একটু অধিকতর যত্ন লইলে ইক্ষুর ফসল ভাল হয়। পাটের চেয়েও ইক্ষু লাভজনক কৃষি।

গত প্রবন্ধে বলিয়াছি নদীয়া, চব্বিশপরগণা, যশোহর প্রভৃতি জেলায় কোনও কোনও অংশ ইক্ষু চাষের পক্ষে উপযুক্ত। পশ্চিম বঙ্গের ও বীরভূমের ভাল ইক্ষু জন্মান যাইতে পারে।

ইক্ষু রস বাহির করিবার যন্ত্রও অতি সহজ। লৌহ ও কাষ্ঠ এই দুই প্রকার দ্রব্য দ্বারাই ইক্ষু পেষণের যন্ত্র তৈয়ারী করা যাইতে পারে। কাষ্ঠ নির্ম্মিত যন্ত্রই ভাল। তাহাতে খরচও কম। দুই রোলার বা তিন রোলারের কল আছে। দুটা বেলুনের মত কাঠ বা লোহা ঘেঁসাঘেঁসি বসান এবং সেই দুটিকে দাঁতওয়ালা চাকা দ্বারা ঘুরাইতে হয়। ইক্ষু রোলারের মধ্যে পিষ্ট হইয়া রস নির্গত হয়। আগমাড়া ভাল কল কলিকাতা বারণ কোম্পানির নিকট খরিদ করিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় কৃষিসমিতি ঐরূপ ভাল কল খরিদ করিয়া পাঠাইতে পারেন। রস জ্বাল দিবার মাটির গামলা এবং মাঝে মাঝে রস আলোড়ন জন্য কাঠের হাতা ব্যবহার করা উচিত।

ইক্ষু রসকে প্রজ্বলিত অগ্নিতাপে ঘন করিলেই গুড় উৎপন্ন হয়। ঐ গুড় অধিকতর আলোড়ন করিলে এবং উহার ময়লা ও গরদা উঠাইয়া লইলে উহার লালত্ব কাটিয়া যায়। গুড় প্রস্তুতের নিয়ম, অনিয়ম ভেদে গুড়ের গুণের ও বর্ণের তারতম্য হয়।

বাঙ্গালাদেশ ব্যতীত বেহারেও প্রচুর ইক্ষু জন্মে। সাহাবাদ জিলার প্রচুর ইক্ষু গুড় উৎপন্ন হয়। মাঘ,ফাল্গুণ এই সময়েই ইক্ষু গুড় সংগ্রহ করার সময়। আরা হইতে আরম্ভ করিয়া বক্সার পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যে প্রচুর ইক্ষু গুড় পাওয়া যায়। গুড় চিনি আমাদের প্রধানতম খাদ্যের মধ্যে অন্যতম। বিদেশী চিনির আমদানি বন্ধ করিতে হইলে বাঙ্গালার কৃষি ক্ষেত্রে এবং আসাম, রঙ্গপুর, পুর্ণিয়া, ময়ুরভঞ্জ, সিংহভূম, গয়া, সাহাবাদ, যেখানে চাষোপযোগী পতিত জমি আছে এই ইক্ষুর চাষ বাড়াইবার জন্য দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর উদ্যোগী হওয়া উচিত।

ইক্ষু যেমন সকল দেশে জন্মে খেজুর গাছ তেমন সকল দেশে জন্মে না। যে ভূমিতে লবণ ও সোরার ভাগ বেশী সেই ভূমিতে খেজুর গাছ। সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্থানে প্রচুর খেজুর গাছ জন্মে। নোয়াখালী, ত্রিপুরার দক্ষিণ অংশ, বরিশাল, খুলনা, ফরিদপুর,

চব্বিশ পরগণা, তমলুক, বালেশ্বর, পুরী এই সকল স্থানে প্রচুর খেজুর গাছ জন্মে। নোয়াখালী, ত্রিপুরা, খুলনা, ফরিদপুর ও যশোহরে খেজুর রস হইতে উৎকৃষ্ট গুড় তৈয়ারী হয়। কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানেও খেজুর রস হইতে গুড় উৎপন্ন হয়। কিন্তু ফরিদপুর, খুলনা, ও যশোহরের মতন নহে। নোয়াখালীর লক্ষীপুর মহাকুমার এলাকায় উৎকৃষ্ট গুড় উৎপন্ন হয়। খুলনা সদর প্রভৃতি স্থানে ভাল গুড় উৎপন্ন হয়, যশোহরের দক্ষিণ ভাগে অধিকতর খেজুর গুড় উৎপন্ন হয়, যশোহরে খেজুরগুড় হইতে চিনি উৎপন্ন করিবার বিস্তৃত কারবারও রহিয়াছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি শিক্ষিত সমাজ এই বিষয়ে মনোযোগী না হইলে কেবল কৃষকগণের উপর নির্ভর করিলে এই শিল্পের আশানুরূপ উন্নতি হইবে না। খেজুরের রস হইতেই গুড় উৎপন্ন হয়। খেঁজুর রস অপেক্ষা ইক্ষুরস অধিকতর মিষ্ট, কারণ উহাতে শর্করা ভাগ অধিক এবং মিষ্টতার হিসাবে ইক্ষুগুড়ই শ্রেষ্ঠ।

যথাযথ রূপে খেঁজুর গুড় সংগৃহীত হইলে ও আখের আবাদ বাড়িলে দেশের ব্যবহার বাদ উদ্বৃত্ত গুড় চিনিতে পরিণত করিয়া অনায়াসে বিদেশে চালান দেওয়া যাইতে পারে।

রীতিমত যত্ন করিয়া এই দুই ব্যবসায় উন্নতি করিতে চেষ্টা করিলে এদেশে বাজা চিনির বীটচিনির আমদানী একেবারেই রহিত হইয়া যায়।

তালের রস হইতেও গুড় উৎপন্ন হয়। তালের ফল হইতে নহে, তাল গাছের মাথায় যে সকল জটা বা শাষ বাহির হয়, তাহা কলমছে মত কাটিয়া এবং তাহাতে হাড়ি বসাইয়া রস বাহির করিয়া লইতে হয়। তালের রসকে পচাইয়া তাড়ি প্রস্তুত করে। খেঁজুর রসেও তাড়ি হয়। উহাতে নেশা হয়। আখের রস পচাইয়া শির্কা বা ভিনিগার প্রস্তুত হয়। বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র তাল গাছ আছে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেই তাল গাছের রস সংগ্রহ করা হয়। পূর্ব্ববঙ্গে তালের রস বাহির করা হয় না।

চিনি হইতে মিশ্রি প্রস্তুত হয়। তালের রসের গুড় হইতে উৎকৃষ্ট মিছরি তৈয়ার হয়। ঐ মিছরি অতিশয় উচ্চ দরে বিক্রয় হয়। তালের মিছরি কফ নাশক এবং ফুসফুসের উন্নতিসাধন করে ও কাশি নাশ করে। ইহা জরঘ্ন।

খেজুরের গাছ হইতে যেখানে অনবরত রস পড়ে সেই ভূমিতে সাজি মাটি উৎপন্ন হয়, তবে খুব পুরাতন গাছ হওয়া চাই। শর্করা উৎপাদক প্রধান কয়টি উদ্ভিদের নাম করা গেল। কিন্তু চাউল, ডাইল, সব্জী, তাল যাহা কিছু আমরা আহার করি তাহাতে অল্প বিস্তর মিষ্টত্ব আছে, উহা শর্করা থাকা হেতু বুঝিতে হইবে—জোয়ান লোকের প্রত্যেক দিন ৪০ তোলা শর্করা আবশ্যক নতুবা ঠিক ঠিক শরীর পোষণ হইবে না। প্রত্যেক দিন এই কারণে স্বতন্ত্র ভাবে অর্দ্ধ বা এক তোলা চিনি গ্রহণ করিতে পারিলে ভাল হয়। ইহাতে বুঝা যায় যে কত চিনির আমাদের আবশ্যক এবং ইহার জন্য আমরা কি ব্যবস্থা করিতেছি তাহা ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

জঙ্গলমহলে আয়

——(:*:)——

জঙ্গলমহলের এক বৎসরের বিবরণী আলোচনা করিলে জঙ্গল রক্ষা করা কেন প্রয়োজন তাহা বুঝা যায়। বঙ্গদেশে গভর্ণমেণ্টের কয়েকটি জঙ্গল মহল আছে, তন্মধ্যে সুন্দর বনটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ইহার পরিমাণ ২০০০ বর্গ মাইল; চট্টগ্রাম জঙ্গলের পরিমাণ ১৮০০ বর্গ মাইল। সিংভূমের জঙ্গলের পরিমাণ ৭৩০ বর্গ মাইল। জলপাই গুড়ির জঙ্গল প্রায় ৫০০ বর্গ মাইল ব্যাপ্ত। এতদ্ব্যতীত দার্জ্জিলিং সাঁওতাল পরগণা আঙ্গুল পুরী ও পালামৌ জেলাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল আছে। শাল গাছই বঙ্গদেশের জঙ্গল মহলের মূল্যবান সামগ্রী। তিস্তা, খরসাৎ, বক্সার ও সিংহভূমের জঙ্গল হইতে বিস্তর শালকাষ্ঠ বিক্রয় হইয়া থাকে। অনেক জঙ্গলে শালবৃক্ষের আবাদ করা হয়। দার্জ্জিলিং তরাইয়ে ও অন্য পাহাড়ী জঙ্গলে শালবীজ বপন করিয়া সন্তোষজনক ফললাভ হইয়াছে। কিন্তু অনেক জঙ্গলে গো মহিষাদি চরিবার ব্যবস্থা আছে, তথায় গো মহিষাদি দ্বারা চারা শালগাছ প্রভৃতি বিস্তর বিনষ্ট হয়। বিগত বৎসরের সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ যে, চৈত্র মাসের ঝড়ে জলপাইগুড়ির জঙ্গলের অনেক গাছ সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিল এবং বন্য হাতীর দৌরাত্মে দোয়ার ও আঙ্গুলে অনেক চারা গাছ মারা গিয়াছে।

সুন্দরবনের জঙ্গলে সুন্দরী গাছই বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। সুন্দরী গাছ অধিক থাকায় ইহার নাম সুন্দরী বন বা সুন্দর বন। সুন্দরী কাষ্ঠ হইতে গভর্ণমেণ্টের বিস্তর আয় হইয়া থাকে। কিন্তু এ বৎসর বাজারে বহু পরিমাণে কাষ্ঠ মজুত থাকায় আয়ের মাত্রা কম হইয়াছে। সুন্দর বনের জঙ্গলের মধ্যভাগে আর বড় একটা সুন্দরী গাছ জন্মাইতেছে না। তথায় আর জোয়ারের জল পৌঁছায় না, কিন্তু যে সকল তীরবর্ত্তী স্থানের জল অত্যন্ত লোনা নহে তথায় বীজ হইতে নূতন গাছ জন্মাইতেছে।

পুরী ও আঙ্গুলের জঙ্গলে সেগুণ গাছেরই প্রধান আওলাত, চট্টগ্রামেও অনেক মূল্যবান গাছ আছে। তিস্তার জঙ্গলে রবার গাছ পাওয়া যায়। কিন্তু প্যারা রবার নামে যে উৎকৃষ্ট রবার আছে তাহা এখানকার জল বায়ুতে ভাল জন্মায় না। জঙ্গলের বাঁশ হইতেও বিস্তর আয় হয়। বাঙ্গালার জঙ্গলে বৎসরে ৫০,০০০৲ টাকার অধিক বাঁশ বিক্রয় হয়। এতদ্ব্যতীত এখন বাঁশের দর বাড়িয়াছে; এক টাকার ২।৩।৪টার অধিক বাঁশ পাওয়া দুষ্কর।

গোলপাতা	হইতে	৬৩০৫১৲ টাকা।
উলু খড়	”	১১২০৩৲ টাকা।
সাবুই ঘাস	”	৩৭৫৮১৲ টাকা।
মধু	”	২০৮৮৲ টাকা।

ঘাস	”	৪৮৩০৲ টাকা।
বেত	”	৩১১৭৲ টাকা।
হেন্তাল	”	২৪৫৮৲ টাকা।
লাক্ষা	”	৫৫৫৬৲ টাকা।
কুচিলা	”	৫৫০৫৲ টাকা।
হরিতকী	”	৯০০৭৲ টাকা।

আয় হইয়াথাকে। এই সকল বনের ফল ও কাষ্ঠ ছাড়া জঙ্গল হইতে অন্য আয়ও আছে। অরণ্য মধ্যস্থিত অভ্রখনি হইতে প্রায় ১২,১৩ হাজারটাকার অভ্র বিক্রয় হইয়াথকে এবং সমুদ্র তীর ভূমি হইতে যে কড়ি, শাঁক ও সামুক পাওয়া যায় তাহাতেও ২।৩ হাজার টাকা আয় হইয়াছে।

সিংহভূমে প্রচুর পরিমাণ সাবুই ঘাস জন্মিয়া থাকে। যে স্থানে সাবুই ঘাস জন্মায় তাহা বৎসর বৎসর ইজারা দেওয়া হয়। গত পূর্ব্ব বৎসর ঐ ঘাস ইজারা দিয়া ২৪০০০৲ টাকা আয় হইয়াছিল, এ বৎসর ঐ জমি তিন বৎসর মিয়াদে ১,১০,০০০৲ টাকা ইজারা দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া মঞ্জিষ্ঠা, কমলা প্রভৃতি রঙ্গ করিবার উপযুক্ত উদ্ভিজ্জ হইতে, আকন্দ, সিমুল তুলা হইতেও কিছু কিছু আয় হইয়া থাকে এবং গো মহিষাদি বিচরণ করিতে দেওয়ায় যৎকিঞ্চিৎ আয় হয়। বাঙ্গালার সমুদয় জঙ্গল মহল হইতে সর্ব্ব প্রকারে ১০৫০০০০৲ টাকা আয় হইয়াছে। মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৭০০০০০৲ টাকা ব্যয় বাদে লাভ ৩৫০,০০০৲ টাকা।

আসামের সরকারী জঙ্গলের পরিসর ২২,২৮৭ বর্গ মাইল। গোয়ালপাড়া, শিবসাগর, কাছাড় প্রভৃতি জেলাতেই অনেকগুলি বড় বড় জঙ্গল আছে। বঙ্গদেশের জঙ্গলের ন্যায় এখানেও কাষ্ঠ হইতে প্রধানতঃ আয় হইয়া থাকে। শাল, সিমুল, নাহোর, খদির, জারুল ও মাকাই প্রভৃতি বৃক্ষই অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে দাবাগ্নিতে ও বন্য পশুর উপদ্রবে ঐ সকল বৃক্ষ বহু পরিমাণে নষ্ট হইত। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে এই প্রকারের উপদ্রব নিবারণের বিশেষ প্রকার চেষ্টা করিয়া থাকেন। গত বৎসর শাল প্রভৃতি কাষ্ঠ হইতে ৮৫,৯১২ খানি স্লিপার প্রস্তুত করিয়া রেল কোম্পানীকে দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে আরও ১০০,০০০ স্লিপার প্রস্তুতের বন্দোবস্ত হইয়াছে। আসামের মধ্য দিয়া যে রেলপথ নির্ম্মিত হইতেছে, তাহার সন্নিকটেই স্লিপার প্রস্তুতের উপযুক্ত গাছ সকল বিদ্যমান আছে। শাল কাঠের স্লিপার বিশেষ মজবুত হইয়া থাকে। শালের পরে নাহোর কাঠ স্লিপারের জন্য বিশেষ উপযোগী। এই নাহোর কাঠের স্লিপার অপেক্ষাকৃত কম চওড়া রেলপথের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আসামে চা প্যাক করিবার জন্য বিস্তর বাক্সের আবশ্যক হয়। পূর্ব্বে এই সমস্ত প্যাকিং বাক্স কলিকাতা হইতে আমদানী করা হইত, কিন্তু এক্ষণে উত্তর গোয়ালপাড়া ও লক্ষ্মীপুরের জঙ্গলে যে সমস্ত সিমুল গাছ জন্মিয়া থাকে তাহা হইতে সুন্দর চায়ের প্যাকিং বাক্স প্রস্তুত হইতেছে এবং কলিকাতা হইতে চায়ের বাক্স আমদানী অনেক কমিয়া গিয়াছে। সিমুলের তক্তা তত মজবুত না হইলেও উহা হইতে সুন্দর প্যাকিং বাক্স প্রস্তুত হয়।

আসামের জঙ্গলে ঘাট পথ ভালরূপ না থাকায় জঙ্গল হইতে কাষ্ঠাদি রপ্তানির বড়ই অসুবিধা হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে পাকা রাস্তা আছে, কিন্তু তাহা অতি বিরল। বর্ষাকালে কাঁচা রাস্তা দিয়া কাষ্ঠ চালান দেওয়া অসম্ভব। হাতির দ্বারা কাষ্ঠ চালাইবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায়, কিন্তু হাতী রাখা বহু ব্যয়সাধ্য এবং তাহাদিগকে শিখাইয়া লওয়ার বহু সময় ও আয়াস সাধ্য। গোয়াল পাড়াতে তাদৃশ নদী ও খাল না থাকায় জঙ্গলের দ্রব্যাদি প্রেরণের বড় অসুবিধা ছিল, কিন্তু এক্ষণে বহু ক্রোশ ব্যাপি রেলওয়ে ও ট্রামওয়ে নির্ম্মাণ হইবার পর অসুবিধা অনেক দূরীকৃত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ৮০০০০ ঘন ফুট বাহাদুরী কাষ্ঠ স্থানীয় জঙ্গল হইতে বিক্রয়ার্থ চালান হইয়াছে।

আসামের জঙ্গলে রবার হইতে এক্ষণে একটী আয় দাঁড়াইয়াছে। আসামের রবার কলিকাতায় যথেষ্ট আমদানী হয়। ১৮৩৬ সালে কলিকাতা হইতে ৮৲ টাকা মণ দরে ৫১৪ মণ রবার বিলাতে রপ্তানি হয়। গত ১৯০২ সালে আসামের কামরূপ, চারদুয়ার বামুণী প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় ১৬৩০৬৲ টাকা মূল্যের রবার লণ্ডনে প্রেরিত হইয়াছিল। ১৯০৩।৪ সালে ৮০৩৫৮৲ টাকার রবার লণ্ডনে বিক্রয় হয়। রবারের মূল্য এক্ষণে অধিক হওয়ায় অনেক অপরিণামদর্শি ব্যবসাদার রবার নির্য্যাস প্রসবকারী বট বৃক্ষগুলিতে যেখানে সেখানে ছিদ্র করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতেছেন। এই সকল বৃক্ষ যাহাতে নষ্ট না হয়, বন বিভাগের কর্ম্মচারীগণ তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিলে ভাল হয়।

উপরোক্ত দ্রব্যাদি ব্যতীত আসাম জঙ্গলে অগুরু বিলঘাস, মুথাঘাস, পাটী প্রস্তুত করিবার কাটী ও বাঁশ হইতে অনেক আয় হয়। এবং উক্ত জঙ্গল বন্য হস্তীর দন্তও পাওয়া যায়। এক একটী দাঁত ২৭৲ হইতে ৪৬৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে

জঙ্গল মহাল রক্ষার জন্য গভর্ণমেন্টের ব্যয় অনেক। বাঙ্গলার জঙ্গলের জন্য ৫ লক্ষ টাকার উপর ব্যয় হয় কিন্তু ব্যয় করিয়াও বৎসরে ৩।৪ লক্ষ টাকা মোট আয় হইয়া থাকে।

বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ

চতুঃষষ্টি কলার মধ্যে বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ অন্যতম-কলা-রূপে পরিগণিত হইয়াছে। পুরাণশাস্ত্রে নীতিশাস্ত্রে এবং কাব্যাদিতে বিক্ষিপ্তভাবে বৃক্ষায়ুর্ব্বেদবিস্তার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ঋষিযুগেও যে এই বিদ্যার সমাদর ছিল, তাহারও নিদর্শন বিলুপ্ত হয় নাই। বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় "বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ" নামক একটি প্রকরণের সন্নিবেশ করিয়াছেন। টীকাকার ভট্টোৎপল মূলবচনের বিশদিকরণাভিপ্রায়ে কশ্যপের অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে কশ্যপের একটি গ্রন্থ ছিল। সর্ব্ববিজ্ঞানের অধিষ্ঠান তন্ত্রশাস্ত্রও ও এতদ্বিষয়ে উদাসীন নহে। ভাগবতের টীকায় শ্রীধর স্বামী কলা-প্রসঙ্গে শৈবাগমোক্ত "বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ যোগের" উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীন মূলগ্রন্থ আছে কিনা, তাহার এ পর্য্যন্ত কোনও বিশেষ অনুসন্ধানের সুযোগ হয় নাই। তবে কলামাত্র বলিয়া নানা গ্রন্থপ্রাপ্তসূত্র হইতে এতদ্বিষয়ের যতটুকু তথ্য সংগ্রহ করা যায়, তদ্বিষয়েই যত্ন করা যাউক।

বরাহমিহির প্রথমেই বৃক্ষারোপণের উপযুক্ত ভূমির নির্দ্দেশ এবং তাহাকে রোপণীয় বৃক্ষের উপযোগী করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে মৃদু ভূমিই সমস্ত বৃক্ষের হিতকর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। উক্ত ভূমিতে প্রথমতঃ তিল বপন করিবে অনন্তর সেই তিলের গাছ পুষ্পিত হইলে সেই গুলিকে ভূমিতে মর্দ্দিত করিবে, ইহাই প্রথম কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে *(১) কিন্তু টীকাকার ভট্টোৎপল কশ্যপের যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার অর্থ হইতে জানা যায়, দূর্ব্বা এবং বিন্না (বেণা) এই উভয় সংযুক্তা জলভূয়িষ্ঠ মৃদু মৃত্তিকাই সুগন্ধি বৃক্ষ রোপণের উপযুক্ত †(২)।

বরাহমিহির বৃক্ষের শাখা রোপণের রীতি লিখিয়াছেন। এই প্রণালী আধুনিক কলম করার রীতি হইতে কতকাংশে ভিন্ন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মতে পনস, অশোক কদলী, জম্বু লকুচ (ডেউয়া), দাড়িম, দ্রাক্ষা, পালীবত বীজপূর ও অতিমুক্তক, এই সকল বৃক্ষ কাণ্ডরোপ্য অর্থাৎ ইহাদের শাখা রোপণ করিতে হয়। প্রথমতঃ উল্লিখিত বৃক্ষের শাখা গোময়ের দ্বারা লেপন করিয়া সেই শাখা মৃত্তিকাতে রোপন করিবে, অনন্তর অন্য বৃক্ষের মূল ছেদন করিয়া সেই ছিন্ন মূলের উপরে, অথবা বৃক্ষের যেস্থান হইতে ডাল দেখা দেয়, সেইস্থানে বৃক্ষকে ছিন্ন করিয়া, তাহার উপরে

---

* (১) মৃদ্বী ভূঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং হিতা তস্যাং তিলান্ বপেৎ।
পুষ্পিতাংস্তাংশ্চ মৃদ্নীয়াৎ কর্ম্মৈতৎ প্রথমং ভুবঃ।

† (২) দূর্ব্বা-বীরণ-সংযুক্তাঃ সানূপা মৃদুমৃত্তিকাঃ।
তত্র বাপ্যাঃ শুভা বৃক্ষাঃ সুগন্ধিফলশালিনঃ॥

বিজাতীয় বৃক্ষের শাখা রোপণ করিবে। *(৩) অনন্তর তাহাতে মৃত্তিকার লেপ দিবে।

অধুনা কিন্তু কথিত রীতিতে কলম করা দেখা যায় না, অধিকন্তু বিজাতীয় বৃক্ষের সহিতও মিল করা হয় না।

বরাহমিহিরের বচনে কেবল রোপণের ব্যবস্থাই দেখা যায়। কিন্তু ভট্টোৎপল কাশ্যপের যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে রোপণ এবং বপন এই উভয় পদ্ধতিরই পরিচয় পাওয়া যায় যথা—

"দ্রাক্ষাতিমুক্তকো জম্বু-বীজ-পূরক দাড়িমাঃ।
কদলী-বকুলাশোকাঃ কাণ্ড-রোপ্যাশ্চ বাপয়েৎ॥

বরাহমিহির বৃক্ষরোপণের বিধান বলিয়াছেন—

* (১) "গোঘৃত ও গোদুগ্ধ, বেনারমূল, তিল, মধু, বিড়ঙ্গ ও গোময়, এই সমস্ত জিনিস একত্র মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা বৃক্ষের মূল হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত লিপ্ত করিয়া বৃক্ষকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া রোপণ করিবে।

বৃক্ষরোপণের কর্ত্তা শুচি হইয়া স্নান ও অনুলেপনের দ্বারা বৃক্ষের পূজা করিয়া তাহাকে রোপণ করিবে। এইভাবে রোপণ করিলে যে সকল পত্রের সহিত বৃক্ষ রোপিত হয়, তাহার সেই পত্রগুলি আর শুকায় না, সেই পত্রের সহিতই তাহার বৃদ্ধি

---

* (৩) অধুনা কাণ্ডরোপ্যাণাং বিধানমাহ :—
পনসাশোককদলী-জম্বুলকুচদাড়িমাঃ।
দ্রাক্ষা-পালীবতশ্চৈব বীজপূরাতিমুক্তকাঃ॥
এতে ক্রমাঃ কাণ্ডরোপ্যা গো ময়েন প্রলেপিতাঃ।
মূলোচ্ছেদেঽথবা স্কন্ধে রোপণীয়াঃ পরং ততঃ॥
৫৪ অ। ,৪-৫।

টীকা—কাণ্ডরোপ্যাঃ কাণ্ডাঃ শাখা স্তান্ গোময়েন প্রলিপ্য রোপয়েৎ। ততোঽনন্তরং পরং প্রকৃষ্টং মূলোচ্ছেদে অথবা স্কন্ধে রোপনীয়াঃ। তস্তবৃক্ষস্ত মূলোচ্ছেদং কৃত্বা তস্ত ছিন্নমূলস্তোপরি বিজাতীয়ো বৃক্ষো রোপণীয়ঃ। অথবা স্কন্ধা-দুর্দ্ধাদস্তবৃক্ষং ছিত্বা তস্ত স্কন্ধমুৎকীর্য্য বিজাতীয়ো বৃক্ষো রোপণীয়ঃ। তত্র মৃত্তিকাপ্লেবং দাপয়েদিতি। ৫॥

---

* (১) ঘৃতোশীর-তিলক্ষৌদ্র-বিড়ঙ্গ-ক্ষীর গোময়ৈঃ।
আমূলস্কন্ধ-লিপ্তানাং সংক্রামণবিরোপণম্॥ ৭

হইয়া থাকে (২)। বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহাতে জলসেক করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে অপরাহ্ণে এবং পূর্ব্বাহ্ণে দুইবেলাই জলসেক কর্ত্তব্য। হেমন্ত এবং শীতকালে এক-এক দিন অন্তর জলসেক করিতে হয়, এবং বর্ষাকালে ভূমি শুকাইলেই জল দিতে হয়। (৩)

বরাহমিহির ষোড়শ প্রকার বৃক্ষকে অনূপজ অর্থাৎ জলবহুল ভূমিজাত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তিতে জম্বু, বেতস, বানীর, কদম্ব, উড়ুম্বর, অর্জ্জুন, বীজপূরক, মৃদ্বিকা, লকুচ, দাড়িম, বঞ্জুল, নক্তমাল, তিলক, পনস, তিমির ও অম্রাতক, এই ষোড়শ প্রকার বৃক্ষ অনূপজ। (৪)

অতঃপর তিনি রোপণীয়-বৃক্ষের অন্তর অর্থাৎ ফাঁক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিংশতি হস্ত অন্তর উত্তম, ষোড়শহস্ত মধ্যম, এবং দ্বাদশ হস্ত অধম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অর্থাৎ একটি বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার বিশহাত ব্যবধানে অপর একটি রোপণ করিলে সেই বৃক্ষ উত্তমরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, ষোড়শ হস্ত ব্যবধানে রোপণ করিলে মাঝামাঝি হইবে, আর বারহাত ব্যবধানে সামান্য বৃদ্ধি পাইবে। (৫)

কেবল পাশাপাশি বৃক্ষ রোপণ করিলে যে দোষ হয় তাহাও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। যথা—"সমীপজাত বৃক্ষসকল পরস্পর মিলিত হয়, এবং পরস্পর মূলের সংলগ্নতা নিবন্ধন তাহারা পীড়িত হয়, সুতরাং তাহারা উপযুক্ত ফলদানে সমর্থ হয় না। (৬)

কাণ্ডরোপণ প্রভৃতির প্রণালী কথনের পর, বরাহমিহির বীজবপনের প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—যে কোন বৃক্ষের বীজ দশ দিন পর্য্যন্ত দুগ্ধে ভাবিত

(২) শুচির্ভূত্বা তরোঃ পূজাং কৃত্বা স্নানানুলেপনৈঃ।
রোপয়েদ্রোপিতশ্চৈব পত্রৈস্তৈরেব জায়তে॥ ৮

টীকা। শুচিঃ সমাহিতো ভূত্বা তরোর্বৃক্ষস্য স্নানানুলেপনৈঃ স্নানেন অনুলেপনেন চ পূজামর্চ্চাং বিধায় রোপয়েৎ। এবমনেন প্রকারেণ রোপিতশ্চ তৈরেব পত্রৈর্যৈরেব রোপিতঃ তৈঃ সহ জায়তে ন শুষ্যতে। ৮।

(৩) সায়ং প্রাতশ্চ ঘর্ম্মান্তৌ শীতকালে দিনান্তরে।
বর্ষাসু চ ভুবঃ শোষে সেক্তব্যা রোপিতাঃ ক্রমাঃ॥

(৪) জম্ব-বেতসবানীর কদম্বোড়ুম্বরার্জ্জুনাঃ।
বীজপূরকমৃদ্বীকালকুচাশ্চ সদাড়িমাঃ॥
বঞ্জুলানক্তমালশ্চ তিলকঃ পনসস্তথা।
তিমিরোহম্রাতকশ্চেতি ষোড়শানূপজাঃ স্মৃতাঃ॥

(৫) উত্তমং বিংশতির্হস্তো মধ্যমং ষোড়শান্তরম্।
স্থানাৎ স্থানান্তরং কার্য্যং বৃক্ষাণাং দ্বাদশাবরম্॥ ১২॥

(৬) অভ্যাস-জাতাস্তরবঃ সংস্পৃশন্তঃ পরস্পরম্।
মিশ্রৈর্মূলৈশ্চ ন ফলং সম্যগ্ যচ্ছন্তি পীড়িতাঃ॥ ১৩॥

করিতে হইবে। ভাবনার নিয়ম—হস্তে ঘৃত মাখিয়া সেই হস্তে বীজ লইয়া সেই বীজ দুগ্ধ মধ্যে ক্ষেপণ করিতে হইবে, অনন্তর ঘৃতাভ্যক্ত হস্তের দ্বারা দুগ্ধ ভাবিত বীজগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে রাখিতে হইবে। এই ভাবে দশ দিন পর্য্যন্ত বীজগুলিকে শোধন করিতে হইবে। অনন্তর গোময়ের দ্বারা বীজগুলিকে অনেকবার মর্দ্দন করিতে হইবে; তৎপর সেই বীজ গুলিকে একটি ভাণ্ডের মধ্যে রাখিয়া শূকরমাংশের ও মৃগমাংসের ধুম বীজে লাগাইতে হইবে।

এই উভয় পদার্থ যুক্ত করিয়া পূর্ব্বোক্ত তিলবপন প্রভৃতির দ্বারা পরিকল্পিত অর্থাৎ সংস্কৃত ভূমিতে বপন করিবে। তৎপর তাহাতে দুগ্ধযুক্ত জল সেচন করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া করিলে উক্ত বীজ পুষ্পসংযুক্ত হইয়াই সঞ্জাত হয়, অর্থাৎ গাছ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় তাহাতে ফুল দেখা দেয়। (১)

বীজপ্রসঙ্গে তিন্তিড়ীবিধান অর্থাৎ তেতুল বীজ বপনের নিয়ম কথিত হইয়াছে, ব্রীহিচূর্ণ, শালিচূর্ণ, মাসচূর্ণ, তিলচূর্ণ, ও ছাতু এই সমস্ত বস্তু পচা মাংসের সহিত একত্র মিশাইয়া ইহার দ্বারা তেতুল বীজে সেক করিতে হইবে, অর্থাৎ বীজ গুলিকে ভিজাইতে হইবে, অনন্তর ইহাতে অনেক সময় হরিদ্রার ধুম লাগাইতে হইবে। এই প্রণালীতে শোধিত বীজ ভূমিতে বপন করিলে অতি কঠিন তিন্তিড়ী বীজ হইতেও অঙ্কুরোদ্গম হয়; সুতরাং অন্য বীজ হইতে যে অঙ্কুর হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? (২)

অনন্তর কপিত্থ—(কদবেল) রোপণের প্রণালী কথিত হইয়াছে। অনন্তমূল, আমলকী, ধব (বৃক্ষবিশেষ), বাসিকা এই চারিপ্রকার উদ্ভিদের মূল এবং মূলপত্র-যুক্ত বেতস বল্লী, সূর্য্যবল্লী, শ্যামলতা ও অতিমুক্ত, মিলিত এই অষ্টমূলীর সহিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত পরিভাষানুসারে দুগ্ধ পাক করিবে। অনন্তর সেই দুগ্ধ সুশীতল অর্থাৎ খুব ঠাণ্ডা হইলে, তাহাতে কপিথবীজ তালশতকাল অর্থাৎ একবার হাতে তালিদিতে যে সময় হয়, তাহার শতগুণ সময় পর্য্যন্ত রাখিতে হইবে, তৎপর সূর্য্যকিরণে বীজগুলি শুকাইতে হইবে। এই ভাবে একমাস পর্য্যন্ত বীজ শোধন করিবে, অনন্তর রোপণ করিবে। রোপণ বিধি—একহস্ত বিস্তৃত একটি গর্ত্ত করিতে হইবে, ঐ গর্ত্তের খাত দুই হস্ত পরিমিত হইবে, অনন্তর পূর্ব্বোক্ত আমলকী প্রভৃতির সহিত কথিত দুগ্ধের দ্বারা গর্ত্তটীকে রৌদ্রে শুকাইতে হইবে। তৎপর শুষ্ক গর্ত্তটীকে অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া ভস্মের সহিত মিলিত মধু ঘৃতের দ্বারা লিপ্ত করিবে। অতঃপর চারি অঙ্গুলি উন্নত গর্ত্তের মধ্যভাগ মৃত্তিকার দ্বারা পূর্ণ করিয়া মৃত্তিকার উপর চারি অঙ্গুলি স্থান মিলিত মাষতিল যবচূর্ণের দ্বারা পূর্ণ করিবে, এই ক্রমে পুনরায় মৃত্তিকা ও তদুপরি মাষাদি চূর্ণ দিয়া গর্ত্তটিকে পরিপূর্ণ করিবে। তৎপর মাছধোয়া জলের দ্বারা গর্ত্তের মধ্যে বেশ করিয়া ঘুঁটিবে। ঘুঁটিতে ঘুঁটিতে গর্ত্তের মধ্যস্থ মৃত্তিকা ও মাষাদিচূর্ণ বেশ ঘন হইলে, তন্মধ্যে চারি অঙ্গুল নীচে পূর্ব্বশোধিত বীজ রোপণ করিয়া তাহাতে মাছের জল এবং মাংশের জল সেচন করিবে।

এই প্রণালীতে উক্ত বীজ হইতে অতি অল্পকাল মধ্যে বিস্ময়জনক শাখাপল্লব সঞ্জাত হইয়া আধারস্থানকে আবৃত করে। (১২)

অন্যান্য বীজেরও আশ্চর্য্যকর রোপণ প্রণালী কথিত হইয়াছে। অঙ্কোল ফল-সম্ভূত বিজ্জলের দ্বারা অথবা ইহার তৈলের দ্বারা শতবার ভাবিত অথবা শ্লেষ্মাতক ফলের বিজ্জলের দ্বারা কিংবা ইহার দ্বারা তৈলের শতবার ভাবিত যে কোন বৃক্ষের বীজ করকাযুক্ত মৃত্তিকায় রোপণ করিলে সেই বীজ হইতে তৎক্ষণাৎ উদ্ভিদের জন্ম হয়, এবং তাহার শাখা ফলভরে পূর্ণ হয়, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় কি? অর্থাৎ অবশ্যই এরূপ হইয়া থাকে। ১৩)

শ্লেষ্মাতক বৃক্ষের বীজ পরিষ্কার করিয়া সেই বীজগুলিকে অঙ্কোল ফলের বিজ্জলের দ্বারা ছায়াতে সাতবার ভাবিত করিয়া সেইগুলকে মহিষের গোময়ের দ্বারা ঘর্ষণ করিবে, তৎপর সেই বীজগুলিকে ভাণ্ডের ভিতর রাখিয়া গোময়ের কারীতে স্থাপন করিবে। ভূমিতে করকাপাত হইলে সেই করকাযুক্ত মৃত্তিকায় উক্ত বীজ রোপণ করিবে। এই প্রণালীতে উপ্ত বীজ এক দিবসেই ফলকর হয়। (১৪)

(১) বাসরানি দশদুগ্ধভাবিতং
বীজমাজ্য-যুত-হস্ত-যোজিতম্।
গোময়েন বহুশো বিরুক্ষিতং
ক্রৌড়মার্গ-পিশিতৈশ্চ ধূপতম্॥
মাংসশূকরবসাসমন্বিতং রোপিতঞ্চ পরিকর্ম্মিতাবনৌ
ক্ষীর-সংযুত-জলাবসেচিতং
জায়তে কুসুম-যুক্তমেব তৎ॥ ২০॥

(২) তিন্তিড্যপি করোতি বল্লরীং
ব্রীহিমাসতিলচূর্ণশক্তুভিঃ।
পূতি-মাংসসহিতৈশ্চ সূচিতা
ধূপতা চ সততং হরিদ্রয়া। ২১।

(১) কপিত্থবল্লীকরণায়
মূলান্যাস্ফোত-ধাত্রী-ধব-বাসিকানাম্।
পলাশিনী-বেতস-সূর্য্যবল্লী-শ্যামাতিমুক্তৈঃ
সহিতাষ্টমূলী॥ ২২॥

ক্ষীরে শৃতে চাপ্যনয়া সুশীতে তালাশতং স্থাপ্য
কপিত্থবীজম্
দিনে দিনে শোষিতমর্কপাদৈর্মাসং বিধিষ্বেব
ততোঽধিরোপ্যম্॥ ২৩॥

হস্তায়তং তদ্দ্বিগুণং গভীরং খাত্বাহবটং
প্রোক্তজলাবচূর্ণম্।
কৃত্বং প্রবদ্ধং মধু-সর্পিষা তৎ
প্রলেপয়েদভস্মসমন্বিতেন ॥ ২৪ ॥
চূর্ণীকৃতৈমাষতিলৈর্যবৈশ্চ
প্রপূরয়েন্মৃত্তিকয়াহন্তরন্থৈঃ।
মৎস্যামিষাম্ভঃসহিতং চ হন্যাদ্যাবদ্ঘনত্বং
সমুপাগতং তৎ ॥ ২৫ ॥
উপ্তং চ বীজং চতুরঙ্গুলাধো মৎস্যাম্ভসা
মাংসজলৈশ্চ সিক্তম্।
বল্লীভবত্যাশু শুভপ্রবালা বিস্মাপনী
মণ্ডপমাবৃণোতি ॥
(২) শতশোহঙ্কোলসম্ভূত-ফলকল্কেন ভাবিতম্।
এতত্তৈলেন বা বীজং শ্লেষ্মাতকফলেন বা ॥ ২৭ ॥
বাপিতং করকোন্মিশ্রমৃদি তৎক্ষণজন্মকম্।
ফলভারান্বিতা শাখা ভবতীতি
কিমদ্ভূতম্ ॥ ২৮ ॥
(৩) শ্লেষ্মাতকস্য বীজানি নিস্তুলীকৃত্য ভাবয়েৎ
প্রাজ্ঞঃ।
অঙ্কোলবিজ্জনাদ্ভিশ্ছায়ায়াং সপ্তকৃত্বৈবম্ ॥
মাহিষগোময়ঘৃষ্টান্যস্য করীষে চ তানি নিক্ষিপ্য।
করকাজমৃদেযাগেন্যুপ্তান্যহ্নাফলকরাণি ॥ ৩০ ॥
"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"—আষাঢ়, ১৩২৮ সাল।

জলদ বৃক্ষ যজ্ঞডুমুর

যজ্ঞডুমুরের গাছ হইতে বিশুদ্ধ পানীয় পাওয়া যায়, ইহা জনসাধারণ অবগত আছেন কি না জানি না। এই জল কোন রোগে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে কি না তাহা পদার্থ-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলিতে পারেন।

অনেক পুথি-পুস্তকে পান্থ-পাদপ প্রভৃতির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই যজ্ঞডুমুরকে পান্থ-পাদপ বলিয়া স্বীকার না করিলেও, জলদ পাদপ নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে। ইহার গোড়ার যে কোনও একটি বড় শিকড় কলম-কাটার মত কাটিয়া

তাহার নীচে পাত্র স্থাপন করিলে অন্ততঃ তিন-চারি সের বিশুদ্ধ জল পাওয়া যাইতে পারে। আমি নিজে জল পান করিয়া দেখিয়াছি, জলে কোনরূপ খারাপ স্বাদ অনুভব হয় না। কলেরা কি অন্য কোন সংক্রামক ব্যাধির সময় এই জল পানীয় রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে কি না, তাহা বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন সব সময় বৃক্ষ হইতে জল পাওয়া যায় কি না পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। তবে যতদিন শীতকাল বর্ত্তমান থাকে ততদিন জল পাওয়া যাইতে পারে।

বিধি—প্রথমতঃ যজ্ঞডুমুর-গাছের গোড়া দুই-তিন হাত পরিমাণ খনন করিয়া একটা মোটা শিকড় পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া কলম-কাটার মত কটিতে হয় এবং সন্ধ্যাকালে তন্নিম্নে একটা পাত্র স্থাপন করিয়া রাখিলে প্রাতঃকালে পরিষ্কার জল পাওয়া যায়।

প্রজাপতির চাষ।

ফ্রান্সের মেন প্রদেশে একজন মহিলার একটী প্রজাপতির কারবার আছে। এই মহিলার মুরগীর কারবার আছে এবং তাহা হইতে তাঁর যথেষ্ট আয় হয়। প্রজাপতির কারবারে যদিও আয় কম, তবুও মহিলাটির এই বিষয়ে একটা নেশা আছে। তিনি প্রজাপতির কারবার করিয়া তাঁর বাড়ীর ছেলেমেয়েদের এবং গ্রামের অন্যান্য লোকদের প্রজাপতির সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা জন্মাইয়াছেন। তিনি যখন প্রথম এই কারবার আরম্ভ করেন, তখন জঙ্গল হইতে প্রজাপতির গুটি খুঁজিয়া আনিতেন। তাঁহার প্রজাপতির-খোঁয়াড়ে কেবল প্রজাপতির জন্মটুকুই হইত। কিন্তু এখন তাঁহার প্রজাপতি খোঁয়াড়ে প্রজাপতির ডিম পাড়া হইতে, সেই ডিমের নানা রকম অবস্থার মধ্য দিয়া গিয়া প্রজাপতিত্ব লাভ করা পর্য্যন্ত সমস্তই হয়। ভদ্রমহিলাকে আর প্রজাপতির গুটির জন্য আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া মাঠে ঘাটে এবং বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। প্রজাপতির ডিমে তা দিবার জন্য ছোট ছোট কাঠের বাক্স আছে—এই বাক্স লম্বায় ২ ফুট, চওড়ায় ১ ফুট এবং উচ্চতায় ১ ফুট। এই বাক্সের ছাদ এবং পাশ তারের জাল দিয়ে ঘেরা। বাক্সের নীচে মস্, খোয়া বা মাটি থাকে। এক এক প্রকারের প্রজাপতির গুটির জন্য এক এক প্রকারের বন্দোবস্ত প্রয়োজন হয়। বাক্সের উপরে একটি দুয়ার থাকে—এই দুয়ার দিয়া গুটি ভিতরে রাখা হয়।

নির্দিষ্ট স্থানে প্রজাপতির চাষ করার সব- চয়ে বড় অসুবিধা হইতেছে গুটিপোকাদের ধরিয়া রাখা। গুটিপোকারা বড় চঞ্চল—সব সময় যেখানে সেখানে চলিয়া যাইবার মতলব আঁটে, একটু সুবিধা পাইলে হয়, অমনি তাহার টিকি দেখা ভার হইবে। তবে গুটিপোকা একবার গুটির ভিতর প্রবেশ করিলে আর কোন ভয় নাই। গুটির মধ্যে

গুটিপোকা একেবারে অচেতন হইয়া নিদ্রা দেয় বা প্রজাপতি হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে।

প্রজাপতি গাছের পাতায় এবং ডালে ডিম পাড়ে, কোন কোন প্রজাপতি একবারে অনেকগুলি ডিম পাড়ে, আবার কোন কোন প্রজাপতি একবারে একটি মাত্র ডিম প্রসব করে। মাতা-প্রজাপতির মনে স্নেহ মমতা আছে। সে ডিম পাড়িয়া তাহাতে তা দেয়। এই সময় খুব নজর রাখিতে হয়। ডিম গুটিপোকা হইলে তাহাকে গাছের ডালে ছাড়িয়া দিতে হয়। গাছের ডালে আবার এই পোকা গুটি বাঁধে। গুটিপোকাদের গাছের ডালে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার কৌশল বা মন্ত্রটি ভদ্রমহিলা কাহাকেও বলিতে চান না—হয় ত মরিবার সময় তাঁহার প্রিয়তমা কন্যাকে শিখাইয়া যাইবেন। তারপর গুটিকে নির্দ্দিষ্ট বাক্সে বন্দী করা হয়। এই বন্দীশালায় প্রজাপতি-জন্ম লাভ করিয়া তাহার মুক্তি হয়।

এই প্রজাপতিগুলিকে কাঠ বা কাগজের তক্তার উপর আল্‌পিন দিয়া বিদ্ধ করিয়া আট্‌কান হয়, এবং বিক্রয় করা হয়। এই ভদ্রমহিলা পৃথিবীর আরো অনেক স্থান হইতে প্রজাপতি আমদানী করিয়া বিক্রয় করেন। তাঁহার কাছে এমন কতকগুলি প্রজাপতি পাওয়া যায় যাহা সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না।

চিনি পরিষ্কারের উপায়

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে "শেওলা" দিয়া গুড় পরিষ্কৃত হইত—এবং এখনও অনেক জায়গায় হয়। কিন্তু এই উপায় অতিশয় সময়-সাপেক্ষ, পরন্তু অল্প পরিসরে উহা সম্পাদিত হয় না। এই সকল কারণে উহা ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইতেছে।

রস ও গুড়ের মাঝামাঝি অবস্থাকে "রাব" কহে। এই রাব হইতে চিনি তৈয়ার করিবার একটি সহজ উপায় আছে। অতএব ইক্ষুর রসকে ফুটাইয়া রাবে পরিণত করিতে হইবে। অথবা গুড় থাকিলে তাহাতে জল মিশ্রিত করিয়া রাবে আনিতে হইবে। এই রাব একটি Centrifuge এর মধ্যে রাখিয়া দ্রুত ঘুরাইতে থাকিলে ইহার জলীয় অংশ বাষ্পাকারে নিষ্কাশিত হইবে এবং চিনির দানা পরিপার্শ্বস্থ তারের জালের গায়ে লাগিয়া থাকিবে। এই চিনির রং শাদা করিবার জন্য কল চলিবার সময় সোডা (Soda Bicarb.) বিশুদ্ধ সাজিমাটী (Sodium Carbonate) প্রভৃতি জলে গুলিয়া অথবা চুনের জলের ছিটা দিতে হইবে। এতৎউদ্দেশ্যে রীটা নীল প্রভৃতি ব্যবহার করিলে অতীব সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। অাখ্য রস ফুটাইবার সময় নিয়ম মত ঘী, কাঁচাদুধ, ঢেঁড়শের আটা প্রভৃতি দিয়া উহা যথারীতি শোধিত হওয়া চাই। Messrs. Thomas Broadbent and Sons, Huddersfield, England:—ইঁহাদের প্রস্তুত Hydro-extractor দ্বারা উপরোক্ত কলের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। কারণ উহা যুক্তপ্রদেশের ইক্ষুশাস্ত্র-বিশারদ হাদি সাহেবের নক্সা ও উপদেশ মত গঠিত ও ভারতবর্ষের জনসাধারণের উপযোগী করিয়া নির্ম্মিত। এই কল ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় চলিতেছে। তবে সব জায়গায় সমান লাভজনক হয় নাই।

উল্লিখিত উপায়ে ইক্ষুরস হইতে শর্করা প্রস্তুত করিবার বিশদ বিবরণ নিম্নলিখিত পুস্তিকাতে প্রাপ্তব্য—বইখানি Superintendant Government Printing, Allahabad, এই ঠিকানায় দশ পয়সা ষ্ট্যাম্প পাঠাইলেই পাওয়া যাইবে।

Bulletin' No. 19. Improvement in Native Methods of Sugar Manufacture. By S. M. Hadi.

অবশ্য কেহ আশা করিবেন না যে এই হাতকলে তৈয়ারী চিনি আমরা যে 'কলের চিনি' ব্যবহার করি তাহার সমকক্ষ হইবে। তাহা হইতে পারে না। কারণ শেষোক্ত চিনি অস্থি-অঙ্গার দ্বারা (Bonecharcoal) শোধিত হয় ও সেইজন্য এত শুভ্র। কিন্তু তাহাতে অনেকের ধর্ম্মহানি হয় বলিয়া এই উপায়ান্তরে কাজ চলিতে পারে।

যুক্তপ্রদেশে প্রতাপগড়ে সরকারি চিনির কারখানায় Centrifugal উপায়ে গুড় হইতে চিনি পরিষ্কার করিবার প্রকরণসকল শিক্ষা করা যাইতে পারে। Director of Agriculture, U. P., Allahabad—ইঁহার নিকট হইতে সমস্ত তথ্য জানা যাইবে।

হস্তচালিত কারখানায় চিনি প্রস্তুত করিবার উপায় মোটামুটী এইরূপ :—কলসী বা ভাঁড় হইতে গুড় ভাঙ্গিয়া বাহির করিয়া একটি বাঁশের পেতের মধ্যে রাখিতে হয় এবং ঐ পেতে একটি মাটির নাদার উপর বাঁশের তেকাটা দিয়া বসাইয়া দেওয়া হয়। পরে পেতের উপর শেওলা দিয়া কয়েকদিন ঐ অবস্থায় রাখিয়া দেওয়া হয়। এই অবস্থায় থাকিতে থাকিতে পাতলা অংশটা, যাহাকে মাৎ বলে, তাহা পেতে হইতে চোয়াইয়া বাহির হয় ও নিম্নের নাদার মধ্যে পড়ে। শেওলার সাহায্যে উপরকার গুড় পরিষ্কার হয়।

এইরূপে কয়েকদিন গত হইলে পেতের উপর হইতে শেওলা তুলিয়া গুড় যতদূর পর্য্যন্ত পরিষ্কার হইয়াছে তাহা কাটিয়া লওয়া হয়। পরে রৌদ্রে শুকাইয়া বেশ ভাল করিয়া পিষিয়া থলিতে বোঝাই করা হয়। এই প্রথমবারের চিনিই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম চিনি—সাধারণতঃ উহাকে "সরকাটা" চিনি বলে। পরে আবার শেওলা দেওয়া হয় এবং উপরোক্ত উপায়ে পুনরায় চিনি প্রস্তুত হয়—এইরূপে ক্রমাগত শেওলা দেওয়া ও পরিষ্কার অংশ কাটিয়া লওয়া হয়। নিম্নের নাদায় যে মাৎ জমে উহা একত্র করিয়া বড় বড় লৌহকটাহে জ্বাল দেওয়া হয় ও যাহাতে পুনরায় দানা বাঁধে তাহার জন্য বড় বড় হাতাদিয়া ঘাঁটিয়া মাটিতে যে-সকল বড় বড় পেতে পোঁতা আছে তাহাতে ঢালিয়া রাখা হয়। তারপর আবার ঐ গুড়কে পেতেয় দেওয়া হয় ও পূর্ব্বোল্লিখিত শেওলা দেওয়ার প্রক্রিয়ায় কতকটা পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়। এবারও যে মাৎ নির্গত হয় তাহাকে আবার জ্বাল দিয়া দানা বাঁধা হয় ও এইরূপে দুই তিন বার পেতে দেওয়ার পরে যে মাৎ নির্গত হয়—তাহাতে আর দানা বাঁধে না। কাজেই তাহা হইতে আর চিনিও প্রস্তুত হইতে পারে না। যশোহর জেলার মধ্যে কোটচাঁদপুর ও তাহেরপুর নামে দুইটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান আছে। গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার কারখানা এখানে কমের পক্ষেও ৫০ টি আছে। যে-কেহ ইচ্ছা করিলে এখানে আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া উক্ত কাজ শিখিয়া যাইতে পারেন।—প্রবাসী।
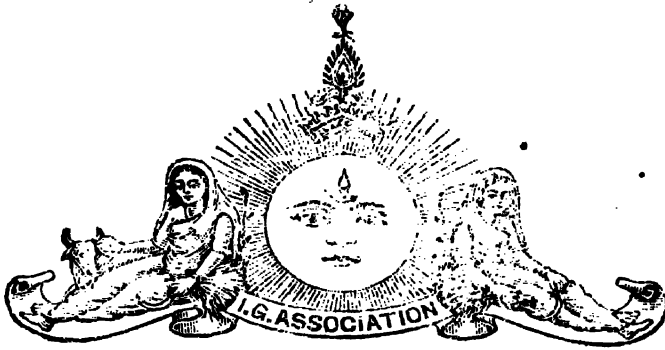
মাছের পোনার ডিম সংগ্রহ

বর্ষারম্ভ হইলে নদীতে যখন বাণ আসে সেই সময় রোহিতাদি মাছ ডিম প্রসব করে। গঙ্গা, দামোদর, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মার নানা স্থানে সূক্ষ্ম জাল দ্বারা জালুকগণ ডিম ধরে। সেই ডিম ইতস্ততঃ চালান হয়—পুষ্করিণী, দিঘি প্রভৃতি জলাশয়ে পোনার আবাদ করিবার জন্য। কিন্তু সব জলাশয়ে ডিম ফুটেনা—বড় বড় পুকুরে ডিম ছাড়িলে অন্য মাছে ও ব্যাঙ প্রভৃতি জন্তুতে ডিম ফুটিতে না ফুটিতে খাইয়া ফেলে। ঐ সকল জলাশয়ে ধানি পোনা (ক্ষুদ্র পোনা—ডিম ফুটিয়া যখন ধানের মত হইয়াছে) বা তদপেক্ষা বড় চালা পোনা ছাড়িতে হয়। এই প্রকারে পুকুর আবাদ হয় বটে—কিন্তু তাহাতে খরচ কিছু অধিক। ব্যবসায়ের কিন্তু এ নিয়ম নহে।

যাহারা পোনা বা চালা মাছের ব্যবসা করিবে তাহাদের ডিম ফুটাইবার পুকুর, ধানী পোনার পুকুর, চালা মাছের পুকুর রাখিতে হয়।

ডিম ফুটাইবার পুকুর—এই পুকুর গুলি ক্ষুদ্র হইলে চলিবে। ছোট ছোট ডোবা যাহার পরিসর ৫০'×৩০' হইলেই যথেষ্ট। এই গুলি খুব গভীর হইবার আবশ্যক নাই, কারণ গ্রীষ্মকালে ইহাদের জল শুকাইয়া যাওয়া চাই। জল শুকাইয়া গেলে ইহার তলদেশের পাক যখন ফাটিয়া উঠিবে তখন উহাতে গোময়, গোমূত্র, সহজ প্রাপ্য হইলে ভেড়ার নাদী দিয়া পচাইয়া লইতে হয় এবং এই সকল ডোবায় প্রথম বর্ষার জল নামিলে উহার ডিম ফুটানর পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয়। সারবান তেজস্কর জল না পাইলে ডিম ফুটে না। নদী খাল বিলের জল স্বভাবতই তেজস্কর এবং জলের আলোড়নে তথায় শীঘ্র ডিম ফুটে। ডোবা গুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয় এবং অন্য কোন জীবের উৎপাত না হয় তজ্জন্য বেশ সাবধান হওয়া আবশ্যক। যতক্ষণ না ডিম ফুটে ততক্ষণ জলে মাঝে মাঝে চালা দিতে হইবে। জল মধ্যে অক্সিজেন (Oxygen) প্রবেশ করানই জল আলোড়নের প্রধান উদ্দেশ্য। ডিম ফুটিবার পর এইগুলি লইয়া অন্য বৃহদায়তন জলাশয়ে ছাড়িতে হয় এবং

তথায়ও নানা প্রকার তদ্বির আছে। কাতলা পোনা খুব দরে বিক্রয় হয়। ডিম ফুটাইয়া ধানী পোনা প্রস্তুত করিতে পারিলে বিস্তর লাভ হয়। ধানী বিক্রয় করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা চালা মাছের পুকুরে ফেলিয়া রাখিতে হইবে এবং সেই পুকুর হইতে চালা মাছ সরবরাহ হইবে। বড় বড় জলাশয়ে চালামাছ ফেলাই ভাল। এই সময় মাছগুলিকে সম্পূর্ণ চেনা যায় এবং তাহাদের জাতি নির্ণয় সহজে হয়। এবং যদৃচ্ছা বাছাই করিয়া পুষ্করিণী আবাদ করা যায়।

মৎস্যাদি খাদ্যসম্বন্ধে এবং ইহার আবাদ সম্বন্ধে আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব।

মৎস্যের রীতিমত আবাদ করিতে হইলে কয়েকটি জলাশয় আয়ত্ব থাকা চাই।

১। একটি ডিম ফুটাইবার পুকুর। ইহার কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

২। চালা মাছ রাখিবার পুকুর ২।৩ বিঘা যাহার জলায়তন এমন পুকুর অন্ততঃ ৩টি থাকিলে ভাল হয়। এখান হইতে চালা মাছ বিক্রয় হইবে ও নিজেদের বৃহদায়তন জলাশয়ে ছাড়া হইবে।

৩। **আবাদী পুকুর**—এই সকল পুকুর বা জলাশয়ের আয়তন বিশেষ বড় হওয়া আবশ্যক। সম্ভব হইলে ২৫ হইতে ৫০ বিঘা জলকর হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সর্ব্বদা এ সুযোগ ঘটে না। নিতান্ত পক্ষে ছোট হইলেও ৫।৭।১০ বিঘা জলকর এমন দুই একটি পুকুর থাকা চাই। চৌকা জলাশয় অপেক্ষা লম্বা ঝিল বা বিল হইলে মন্দ হয় না। স্থূলকথা জোর বাতাসে জলাশয়ে তরঙ্গায়িত হওয়া দরকার। জলের ঢেউয়ের সঙ্গে মাছ ছুটাছুটি করিবে এবং তাহারা লম্বা দৌড় পাইবে। মাছের ধর্ম্ম তাহারা ঝাঁক বাঁধিয়া খেলা করিয়া বেড়ায় এবং কিনারায় যাইয়া গরু ছাগলের মত জলজ তৃণাদি মুখ দিয়া চরিয়া বেড়ায়। বৃহদায়তন জলাশয় হইলে তাহাদের চরিবার সুবিধা হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মৎস্য পৃথক পৃথক দল বাঁধে বৃহৎ জলাশয় না হইলে দলে দলে সংঘর্ষ বাঁধিয়া থাকে। এই সকল নানা কারণে মাছ বাড়াইবার আবাদী জলাশয় বিশেষ বড় হওয়া চাই। খালি বিল প্রভৃতিতে মাছের খাবার জিনিষ অনেক স্বভাবত পাওয়া যায়। কিন্তু বদ্ধ জলে আহার যোগাইতে হইতে হয়। স্নানের পুকুরে মাছেরা তৈল খাইতে পায়। কাছে গোশালা থাকিলে গোশালার ধোয়ানি পচানি নালা বাহিয়া আসিয়া পড়িলে মাছের উত্তম খাবার যোগাড় হয়। জলজ উদ্ভিদের মূল, পাতা, শিকড়, ও সেওলা ঝাঁজি মাছের আহার। উদ্ভিদ শূন্য নির্ম্মল জল ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পুকুরে মাছ তাদৃশ বাড়ে না।

৪। **জিয়ান্ পুকুর**—(Reserve Tanks) এই সকল পুকুরে আবাদী পুকুর হইতে মাছ চালিয়া আনিয়া জিয়ান বা জমা করা হয়। বিক্রয়োপযোগী বড়

মাছ এখানে থাকে এবং এখান হইতে মাছ বিক্রয় হয়। এই সকল জলাশয় তাদৃশ বড় হইবার আবশ্যক নাই। আবাদী পুকুর হইতে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে মাছ ধরা কালে সেই সময় অনেক মাছ বিক্রয় হয়। যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাদের বাড়াইবার জন্য জিয়ান পুকুরে রাখা আবশ্যক, মাছ যত বাড়িবে তত অধিক লাভ হইবে। এই জিয়ান পুকুর গুলির আয়তন ২।৩ বিঘা হইলেই চলে। ছোট ছোট পুকুর হইলে তত্ত্বাবধানেরও সুবিধা হয়।

পোনা পুকুর হইতে আরম্ভ করিয়া চালা মাছের পুকুর আবাদী পুকুর জিয়ান পুকুর সব পুকুরেই মাঝে জালের টানা দিতে হইবে। মাছ চালাচালি কালে ত জালের টানা পড়িবেই কিন্তু মাছ চালা বা ধরার আবশ্যক না থাকিলেও মাসে একবার পুকুরে জাল নামান আবশ্যক। জালের টানাতে মাছের গায়ের লালা ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাহাতে মাছের সজীবতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ঘোড়াকে আস্তাবলে রাখিয়া খাওয়াইলে দলাই মলাই ব্যতীত যেমন ঘোড়া ভাল হয় না তেমন মাছ চালাচালি ও জাল টানাতে জালের ঘা না পাইলে মাছ ভাল হয় না মাছ বাড়ে না। আরও অঙ্গ চালনা জীব জন্তুর বৃদ্ধির পক্ষে উভয়ই সমভাবে আবশ্যক।

যাহার যেমন কারবার জলের আয়তন ও জলাশয়ের সংখ্যা তদনুরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু দুই একটি ছোট পুকুর লইয়া মাছের আবাদে প্রবৃত্ত হওয়ার বিশেষ কোন লাভ নাই।

পত্রাদি

মান্যাস্পদ

শ্রীযুক্ত কৃষক সম্পাদক মহাশয়
সমীপে

মহাশয়,

আগামী সংখ্যার আপনার বিখ্যাত "কৃষক" পত্রিকার নিম্নলিখিত বিষয় গুলির উত্তর, প্রদান করিলে বিশেষ বাধিত হইব। আশা করি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উত্তর প্রদান করিতে অন্যথা করিবেন না।

ধান্যক্ষেত্রের সার।

আপনাদের বিবিধ কৃষি-পুস্তকে হাড়ের সার ধান্যের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া ভূয়ো ভূয়ঃ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু গত ১৩২৬ সালের ২৬ অগ্রহায়ণ তারিখের হিতাবাদীতে "কাজের লোক" হইতে ধান্য ক্ষেত্রের সার সম্বন্ধে এক অংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল; তাহাতে সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত হইয়াছে যে হাড়ের সার ধান্যের পক্ষে অতি

নিকৃষ্ট এবং রেড়ির খোলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই সিদ্ধান্ত গবর্ণমেণ্ট কৃষি পরীক্ষার ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে। আপনার অবগতির জন্য আমি হিতবাদীর ঐ অংশ এই পত্রের সহিত প্রেরণ করিলাম। আবার গত ১৩২৭ সালের ১৫ আশ্বিন শুক্রবার তারিখের হিতবাদীতে "অকাল মৃত্যুর প্রতীকার" শীর্ষক প্রবন্ধে হাড়ের সার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়টী লিখিত হইয়াছে :—"গবর্ণমেণ্ট প্রচারিত কৃষি সমাচার পাঠে জানা যায় রাজসাহী ও হুগলী জেলায় প্রায় সকল রকম শস্যের পক্ষে বিশেষতঃ ধান পাটের পক্ষে খৈল ও গোবরের সার বিশেষ উপযোগী। ময়মনসিংহ ঢাকা ও বর্দ্ধমান জেলায় হাড়ের গুড়া বিশেষ উপযোগী।" আশা করি আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক হাড়ের সারের উপকারিতা সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত করিয়া আবার সন্দেহ দূরীভূত করিবেন।

ধান্যক্ষেত্রে জলসার বরাহ।

আমাদের দেশে অনেক স্থলে গভীর খাত বিশিষ্ট নদীর ধারে সহস্র সহস্র বিঘা ধান্য ক্ষেত্র আছে। কিন্তু ঐ সকল নদীর "পাহাড়" এত উচ্চ যে তাহা হইতে "ডোঙ্গা প্রভৃতির দ্বারা জল সেচন করিবার সুবিধা হয় না; কালে অনাবৃষ্টি হইলে, ঐ সকল ধান্য একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। জল সেচনের সুবিধা করিতে পারিলে দেশে বহু ধান্য রক্ষা করিতে পারা যায়। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে এমন কোনও পম্প (Pump) আছে কিনা যদ্দ্বারা হোস (Hose) প্রভৃতির সংযোগে ঐ সকল নদীর জল উপরে উঠাইয়া ক্ষেত্রে দিতে পারা যায়। আর এরূপ Pump এর মূল্যই বা কি এবং কোথায় পাওয়া যায়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাও জানাইবেন।

কদলী বৃক্ষ।

আপনাদের কৃষি পুস্তকে আষাঢ় শ্রাবণ মাসে 'তেউড়' বসাইবার পদ্ধতি লিখিত আছে। কিন্তু আমার সচারচর দেখিতে পাই যে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে যত অগ্রে 'তেউড়' বসাইতে পারা যায়, ততই গাছের অবস্থা ভাল হয়। পূরা বর্ষার সময় গাছ বসাইলে অনেক গাছ নষ্ট হইয়া যায়" কিন্তু বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের গাছ প্রায় নষ্ট হয় না; অধিকন্তু বর্ষার বৃষ্টিতে ঐ সকল গাছ সমধিক তেজস্কর হইয়া উঠে। আবার অনেক স্থলে কৃষকের কার্ত্তিক মাসেও তেউড়' বসাইয়া থাকে। এই বিবিধ সময়ে তেউড় বসান ও তজ্জনিত ফলের পার্থক্য সম্বন্ধে আপনাদের অভিমত কি?

অনেক স্থলে কলাগাছ খুব তেজস্কর হইবে জন্মিলেও ধসা ধরিয়া নষ্ট হইয়া যায়। এই ধসা রোগে অনেক বড় বড় বাগান উৎসন্ন হইয়া কৃষককে মহাক্ষতিগ্রস্ত করে। আমার একটা বাগান এইরূপ ধসা রোগের জন্য আদৌ ফলপ্রসূ হইতেছে না। গাছ বড় হইয়া উঠিলেই ধসা লাগিয়া মরিয়া যাইতেছে। এই ধসা-রোগের প্রতিকার কি?

আম কাঁটাল প্রভৃতির বাগানের আওতায় কোন্ জাতীয় কলাগাছ রোপিত হইলে অধিক ফল প্রসূত হয়? কিনত শ্রীসহায় রাম মিত্র

বাগানের মাসিক কার্য্য।

পৌষ ও মাঘ

সব্জীক্ষেত্র—বিলাতী সব্জী প্রায় শেষ হইতে চলিল। যেগুলি এখন ক্ষেত্রে আছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন বিশেষ পাট নাই।

কপি প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া সেই ক্ষেত্রে চৈতে বেগুণ ও দেশী লঙ্কা লাগান উচিত।

ভুঁইয়ে শশা, করলা তরমূজ, প্রভৃতি দেশী সব্জীর জন্য জমি তৈয়ারি করিয়া ক্রমশঃ তাহার আবাদ করা উচিত। তরমুজ মাঘ মাস হইতে বপন করা উচিত। ফাল্গুন মাসেও বপন করা চলে।

ফলের বাগান—আম, লিচু, লকেট, পীচ এবং অন্যান্য ফল গাছের ফুল ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে। ফল গাছের এখন মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলে ফল বেশী পরিমাণে ধরিবে ও ফুল ঝরিয়া যাইবে না। আনারসের গাছের এই সময় গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া—গোময়, ছাই ও পাক মাটি আনারসের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। আঙ্গুর গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। যদি না হইয়া থাকে, তবে কালাবিলম্ব করা উচিত নহে।

ফলের বাগানের অনতিদূরে তৃণ, কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া, তাহাতে আগুণ দিয়া মুকুলিত বৃক্ষে ধোঁয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে ফলে পোকা লাগার সম্ভাবনা কম হয় এবং ফল ঝরা নিবারণ হয়। পশ্চিমাঞ্চলে আম বাগানে এই প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। গাছে অগ্নির উত্তাপ যেন না লাগে কিন্তু ধোঁয়া অব্যাহতভাবে লাগিতে পায়, এরূপ বুঝিয়া অগ্নিকুণ্ড রচনা করিবে।

বর্ষাকালে যে সকল স্থানে বড় বড় গাছ পুতিবে, সেই সকল স্থানে অন্ততঃ দুই হাত গভীর করিয়া গর্ত্ত করিবে এবং সেই খোঁড়া মাটি গুলি কিছুদিন সেই গর্ত্তের ধারে ফেলিয়া রাখিবে। পরে সেই মাটি দ্বারা ও তাহার সঙ্গে কতক সার মাটি মিশাইয়া সেই গর্ত্ত ভরাট করিবে। উপরের মাটি নীচে এবং নীচের মাটি উপরে করিয়া, খোঁড়া মাটি দ্বারা গর্ত্তভরাট করিবে।

পুরাতন ডালের কুল ও পিয়ারা ছোট হয় ও তাহাতে পোকা ধরে, সেই জন্য পেয়ারা ও কুলের পুরাতন ডাল প্রতি বৎসর ছাঁটা উচিত; কুল খুব অধিক ছাঁটিতে হয়; পেয়ারা তত নহে।

কৃষিক্ষেত্র—সম্বৎসরের চাষ মাঘ মাসেই আরম্ভ হইয়া থাকে। এইমাসে জল হইলেই জমিতে চাষ দিবে। যে সকল জমিতে বর্ষাকালের ফসল করিবে, তাহাতে এই মাসে সার দিবে। আলু ও কপির জন্য পলিমাটি দিয়া জমি তৈয়ারি করিয়া রাখিবে।

এই মাস হইতেই ইক্ষু কাটিতে আরম্ভ করে। মুলার অগ্রভাগ কাটিয়া মাটিতে পুতিয়া দিলে তাহা হইতে উত্তম বীজ জন্মে। ফুল ধরিবার আগে মুলার আগার দিকে চারি আঙ্গুলি রাখিয়া তাহার মধ্যে খোল করিবে এবং ঐ খোলে জল দিয়া নীচের দিকে মুখ রাখিয়া টাঙ্গাইবে। প্রতিদিন ঐ খোল পুরিয়া জল দিবে। ক্রমে উহার শীষ বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিবে। এই উপায়েও উত্তম বীজ উৎপন্ন হইবে। এই মাসের প্রথম ১৫ দিনের পর, হলুদ ও আদা তুলিবার আরম্ভ করিবে। হলুদের ও আদার মুখী বীজের জন্য শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে। হলুদ, গোবর মিশ্রিত জলে অল্প সিদ্ধ করিয়া শুকাইতে দিবে। হলুদ সিদ্ধ করিবার কালে একবার উৎলাইয়া উঠিলেই নামাইয়া ফেলিবে। আধ শুক্‌না হইলেহ হলুদগুলি রোজ একবার দলিয়া দিবে। দলিলে হলুদ গোল, শক্ত ও পরিষ্কার হয়। চীনা বাদাম এই মাসে উঠাইবে।

ফুলের বাগান—ফুলের বাগানের শোভা এখন অতুলনীয়। মরসুমী ফুল সব ফুটিয়াছে। গোলাপ এখন প্রচুর ফুটিয়াছে। গোলাপ ক্ষেত্রে এখন যেন জলের অভাব না হয়। গোলাপের কলম বাঁধা শেষ হইয়াছে। বেল, মল্লিকা, যুথিকা ইত্যাদি ডালের অগ্রভাগ ও পুরাতন ডালগুলি ছাঁটিয়া দিবে।

শীতপ্রধান পার্ব্বত্যপ্রদেশে এখন অষ্টার, হার্টিজ, লর্কস্পর, পিঙ্ক, ফ্লক্স, ডেজী, পিটুনিয়া প্রভৃতি মরসুমীর ফুলবীজ বপন করিতে হইবে এবং শীতকালের সব্জী যথা— গাজর, সালগম, লেটুস্, বাঁধাকপি, ফুলকপি, মুলাবীজ প্রভৃতি এই সময় বপন করিতে হইবে।

এই মাসের শেষে বেল, যুই, মল্লিকা, প্রভৃতি ফুল গাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুল গাছগুলির তদ্বির না করিয়া জল্‌দি ফুল ফুটাইতে না পারিলে ফুলে পয়সা হইবে না। ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।
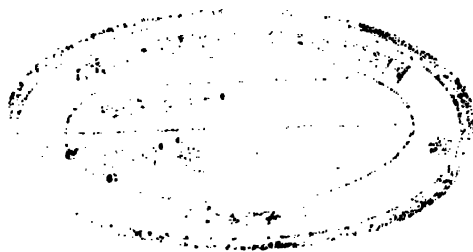
কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র

২২ খণ্ড। { কৃষক—ফাল্গুন, ১৩২৮ সাল } ১১শ সংখ্যা।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে পল্লীগ্রামের কৃষি শিল্পাদি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে পিতলের পাতে নির্ম্মিত কলসী, গামলা, থালা প্রভৃতি পাত্রের প্রচলন ছিল না। এখন বিলাতী পিতলের পাতে ঐ সকল পাত্র বহুল পরিমাণে নির্ম্মিত হইতেছে। পূর্ব্বে পিতলের পাত্র সকল পিটিয়া বা ঢালিয়া নির্ম্মাণ করিত। এখন বিলাতী পিতলের পাত পিটিয়া অনেক পিতলের পাত্র তৈয়ার হইতেছে। পূর্ব্বাপেক্ষা পিতলের মূল্য এখন বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

কাঁসা ও মিশ্র ধাতু। রাং ও তামা মিশ্রিত হইয়া কাঁসা হয়। ইহাতে থালা, ঘটী, বাটী, গেলাস প্রভৃতি অনেক পাত্র নির্ম্মিত হয়। পূর্ব্বে কাঁসার যেরূপ বড় বড় বাটী ব্যবহৃত হইত, এখন আর সেরূপ বাটী প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন বহুল পরিমাণে পিতলের গামলার প্রচলন হওয়ায়, পূর্ব্বের ন্যায় কাঁসার বড় বড় বাটী আর দেখিতে পাওয়া যায় না। পিতলের ন্যায় কাঁসার পাত্র ও পিটিয়া ও ঢালিয়া নির্ম্মিত হইয়া থাকে। খাগড়ার কাঁসার বাসন চিরপ্রসিদ্ধ। খাগড়ার ন্যায় কাঁসার বাসনের সুন্দর পালিস আর কোথাও হয় না। অন্যান্য স্থানে ও এখন কাঁসার বেশ পালিস হইতেছে। কিন্তু খাগড়ার কাঁসার বাসনের ন্যায় নহে। খাগড়ার কাঁসার বাসনের মূল্য ও অনেক অধিক। আমাদের বর্দ্ধমান জেলার ও অনেক গ্রামে পিতল কাঁসার বাসন সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এই সকল শিল্পিরা পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করিলে অল্প বেতন ভোগী চাকরীজীবী অপেক্ষা স্বাধীন ভাবে যে অধিক পরিমাণে উপায় করিতে সক্ষম হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভাঙ্গা, ছেঁদা পিতল কাঁসার বাসন যাহারা মেরামত করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে ফেরি করিয়া বেড়ায়, তাহারা ও প্রতিদিন দেড় টাকা দুই টাকা উপায় করিয়া থাকে। প্রত্যেক গৃহস্থকে প্রতিদিন সর্ব্বক্ষণই পিতল কাঁসার বাসন ব্যবহার করিতে হয়, তজ্জন্য সকল গৃহস্থেরই ঐ সকল বাসন ভাঙ্গিয়া বা ছেঁদা হইয়া অব্যবহার্য্য হইয়া যায়, তজ্জন্য মেরামত করা আবশ্যক হইয়া থাকে। এজন্য মেরামত কারীরা ও উহা মেরামত করিয়া দিয়া বিলক্ষণ উপার্জ্জন করে।

পুরাতন ভগ্ন অব্যবহার্য্য পিতল কাঁসার বাসন বিক্রয় করিয়া বা তাহার পরিবর্ত্তে নূতন বাসন ও লওয়া হইয়া থাকে। নূতন বাসনের ওজনের দ্বিগুণ ত্রিগুণ সেই জাতীয় পুরাতন অকর্ম্মণ্য বাসন দিলে নূতন বাসন পাওয়া যায়। অনেক স্থলে ব্যবসায়ীরা ঐ পুরাতন, ভগ্ন বাসন মেরামত করিয়া কুঁদে দিয়া চাঁচাইয়া নূতন বলিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। যে ভগ্ন পুরাতন বাসন গুলি মেরামত করিবার অযোগ্য কেবল সেই গুলি গলাইয়া নূতন বাসন তৈয়ার করে।

পিতল কাঁসার ব্যবসায়ীরা নূতন বাসনের পরিবর্ত্তে বা ক্রয় করিয়া যে সকল পুরাতন পিতল কাঁসার জিনিস পায়, তাহা কারিকরদিগকে দিয়া নূতন বাসন তৈয়ার করিয়া লয় এবং নূতন বাসন নির্ম্মাণের সময়োচিত পারিশ্রমিক দিয়া থাকে।

সূত্রধর দিগের বিষয় লিখিবার কালীন একটী কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, সেকথাটী এই—চিঁড়া কোটা সূত্রধরদিগের একটী প্রধান ব্যবসায়। ইহাদের পুরুষেরা সচরাচর প্রায় চিঁড়া কোটে না। স্ত্রীলোকেরাই চিঁড়া কুটিয়া থাকে। চিঁড়া কোটায় বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে। অনেক অবিরা (পতি পুত্র বিহীনা) স্ত্রীলোক চিঁড়া কুটিয়া আপন গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিয়া ও বিলক্ষণ সঞ্চয় করিয়া থাকে। ধান একদিন ভিজাইয়া রাখিয়া, সেই ভিজা ধান (মুড়ি ভাজার খোলার ন্যায়) খোলায় রাখিয়া আগুণের জ্বাল দিলে, সেই ধান শুষ্ক ও উত্তপ্ত হয়। সেই শুষ্ক উত্তপ্ত ধান ঢেঁকিতে কুটিলে চেপ্টা হইয়া যায়। সেই চেপ্টা ধানের সহিত তুঁষ কুঁড়া মিশ্রিত থাকে, কুলার দ্বারা তুঁষ কুঁড়া পৃথক করিলেই চিঁড়া হয়। চিঁড়ার প্রচলন যে কত কাল হইতে হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। বোধ হয় ধান্য উৎপন্ন হইবার পর হইতেই চিঁড়ার প্রচলন হইয়া থাকিবে, আমাদের এখানে টাকা পয়সা দিয়া চিঁড়া কেনা হয় না। ধান্য বা চাউলের পরিবর্ত্তে চিঁড়া লওয়া হইয়া থাকে। আমাদের এখানে ওজনে ও চিঁড়া বিক্রীত হয় না। ওজন কর একসের চাউল যে বেত্র কাষ্ঠ নির্ম্মিত সেরে ধরিবে, সেই সেরে মাপিয়া একসের বা সওয়াসের চাউল কিম্বা কুলা দ্বারা আগরা ধুলা পৃথক করিয়া দুইসের বা আড়াই সের ধান মাপিয়া লইয়া, পূর্ব্বোক্ত সেরে মাপিয়া একসের চিঁড়া দিবে। সেরে মাপা এক সের ধানে সচরাচর সেরে

মাপা একসের অপেক্ষা বেশি চিঁড়া হইয়া থাকে। কুটিবার গুণে তাহা অপেক্ষা কম ধানেও সেরে মাপ একসের চিঁড়া হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে চিঁড়ার প্রচলন খুব বেশি ছিল। এখন যেমন লুচি সন্দেশ ইত্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মণাদি ভোজন করান হইয়া থাকে। অৰ্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বে এ প্রদেশের চিঁড়া, মুড়কী, দধি ইত্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মণাদি ভোজন করান হইত। পূর্ব্বে চিঁড়া ভাজা রোগীর পথ্য ছিল এখনও এপ্রদেশে অনেক স্থলে চিঁড়া ভাজা রোগীর পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শাঁখারী—শাঁখা নির্ম্মাণ করা কার্য্যই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা ছিল। এখন ও এই জাতিতে শাঁখা তৈয়ার করিয়া থাকে। এই জাতির সংখ্যা খুব অল্প। অৰ্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে হিন্দু সধবা স্ত্রীলোকগণের আভরণের মধ্যেই শঙ্খই আয়তির নিদর্শন ছিল। সে সময়ে এপ্রদেশে যে স্ত্রীলোকের হস্তে শাঁখা না থাকিত, অন্যান্য আভরণ পরিধান স্বত্তে তাহাকে বিধবা বলিয়া স্থির করিত। পূর্ব্বে সধবা মাত্রেই শাঁখা পরিত। স্বর্ণালঙ্কার ও বিলাতী চুড়ির প্রচলনের আধিক্যের সহিত শাঁখার প্রচলন ও ক্রমশঃ খুব কম হইতে লাগিল। ক্রমশ সধবা স্ত্রীলোকেরা শাঁখা পরিত্যাগ করিয়া চুড়ি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ২।১ বৎসর এ প্রদেশে ও শাঁখার প্রচলন কিছু বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল। আবার চুড়ির প্রচলন খুব বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। এ প্রদেশের অধিকাংশই দরিদ্র। তাহারা স্বর্ণালঙ্কার কোথায় পাইবে। তাহাদের স্ত্রীলোকেরা বিলাতী চুড়ি সুলভ মূল্যে পাইয়া, তাহা পরিধান করিয়া স্বর্ণালঙ্কারের ক্ষোভ নিবৃত্তিকরে। তবে শাঁখা যে একবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে; তাহা নহে, এখন ও অনেক স্ত্রীলোকে মধ্যে মধ্যে শাঁখা পরিয়া থাকে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই যে শাঁখার প্রচলন ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। দেবী পূজা মাত্রেই শাঁখা সাড়ী দিবার ব্যবস্থা আছে।

শাঁখা শাঁক হইতে প্রস্তুত হয়। শাঁক একপ্রকার সামুদ্রিক জন্তু। গুগ্‌লি, শামুক প্রভৃতি জলজ জন্তু যেরূপ পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ে উৎপন্ন হয়। শাঁক ও সেইরূপ সমুদ্রে উৎপন্ন হইয়া থাকে। পূজা, পার্ব্বণ, বিবাহ প্রভৃতি উৎসবে যে শঙ্খধ্বনি হয়, সেইশঙ্খ হইতেই শাঁখা তৈয়ার হইয়া থাকে। ঢাকা প্রভৃতি স্থানে এখন শঙ্খ হইতে শাঁখা ব্যতীত বালা, অঙ্গুরি, বোতাম প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। এখন ও প্রাচীনা অনেক সধবা স্ত্রীলোকে শাঁখা পরিয়া থাকেন।

মোদক—মিষ্টান্ন প্রস্তুত করাই এই জাতীর জাতীয় ব্যবসায়। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই জাতি মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া আসিতেছে। এই ব্যবসায়ে অনেক মোদক—জাতি বেশ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছে। পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরে মিষ্টান্নাদি প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইয়া থাকে, তজ্জন্য সহরের অনেক ময়রাই বেশ ধনশালী। পূর্ব্বাপেক্ষা

এখন যেমন বস্ত্রালঙ্কারের বাহুল্য ও পরিপাট্য হইয়াছে মিষ্টান্নের ও সেইরূপ হইয়াছে। পূর্ব্বে সকল বিষয়েই চালচলন যেরূপ মোটামুটি ছিল, মিষ্টান্নাদিরও সেইরূপ ছিল। অথবা বাল্যকালে (অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে) পল্লীগ্রামের ময়রার দোকানে, কেবল মুড়কী, পাটালী ও বাতাসা থাকিতে দেখিয়াছি ; ইহা ব্যতীত অন্য মিষ্টান্ন প্রায়ই প্রস্তুত থাকিত না। বিক্রয় হইত না বলিয়া অন্য প্রকার ভাল মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া দোকানে রাখিত না। লোকের ফরমাইস মত প্রস্তুত করিয়া দিত, তাহাও এখনকার মত ভাল মিষ্টান্ন নহে।

পূর্ব্বে এখনকার মত জাবা, মরিসস্ প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানী পরিস্কৃত শ্বেতবর্ণ চিনি পাওয়া যাইত না। দলো দ্বারা মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইত। মৃত্তিকা নির্ম্মিত গামলার উপর পেতে রাখিয়া গুড় ঢালিয়া দেওয়া হইত, তাহার উপর পুকুরের গাঁজ চাপা দেওয়া হইত, গুড় হইতে তরলাংশ পেতের ছিদ্র দিয়া তন্নিম্নস্থ গামলায় গিয়া পড়িত। গাঁজ-দেওয়ায় পেতের উপরকার গুড় কিছু পরিষ্কার (পাটল বর্ণের ন্যায়) হইলে, তুলিয়া লওয়া হইত, যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহার উপর আবার গাঁজ ঢাকা দিয়া রখিয়া সমস্ত গুড় ঐরূপে পরিষ্কার করিয়া লওয়া হইত। পল্লীগ্রামের ময়রারা বেশি পরিষ্কার না করিয়া সামান্য পরিস্কৃত হইলেই তুলিয়া লইত। গামলায় যে তরল গুড় পড়িত তাহা মাত গুড় বলিয়া বিক্রীত হইত এবং ময়রারা তাহার দ্বারা মুড়কী পাটালি প্রভৃতিও প্রস্তুত করিত। আক ও খেজুর উভয় প্রকার গুড়েই দানা প্রস্তুত হইত। পূর্ব্বে অনেক স্থানেই দলো ও চিনির কারখানা ছিল। সেই সকল কারখানা হইতে নানাস্থানে দলো ও চিনির আমদানী হইত। পল্লীগ্রামের ময়রার প্রস্তুত দলো অপেক্ষায় কারখানার দলো অধিক পরিস্কৃত। অধিক পরিষ্কার করিতে গেলেই দলোর পরিমাণ কম হইয়া, মাত গুড়ের পরিমাণ বেশি হয় বলিয়া পল্লীগ্রামের ময়রা সচরাচর লাল্‌চে দলো প্রস্তুত করিত। ঐ সকল দলোর প্রস্তুত মিষ্টান্নাদি লাল্‌চে হইত। এখন যেমন বিদেশী চিনিতে প্রস্তুত মিষ্টান্ন যেরূপ সাদা ধব্‌ধবে হয়, তখন সেরূপ হইত না। পল্লীগ্রামের ময়রার দোকানে আবশ্যক মত (ফরমাইস দিলে) ঐরূপ দলোর তৈয়ারী মণ্ডা বা সন্দেশ ছানা দিয়া পাক করিয়া প্রস্তুত করিত। সন্দেশের দর অনুসারে ছানার ন্যূনাধিক্য করিত। এখনও দর অনুসারে ছানার ন্যূনাধিক্য করিয়া থাকে। তখন আমাদের এখানে ঐরূপ মণ্ডা বা সন্দেশ ও মিঠাই ব্যতীত অন্যান্য মিষ্টান্ন প্রায়ই পাওয়া যাইত না। তবে সহর বাজারে যে পাওয়া যাইত না, তাহা নহে। এখন পল্লীগ্রামের ময়রার দোকানে মণ্ডা মিঠাই ব্যতীত অন্যান্য মিষ্টান্নও পাওয়া যায়। পূর্ব্বে দলো, ছানা, ঘৃত প্রভৃতি সস্তা থাকায় সকলপ্রকার মিষ্টান্নই খুব কম মূল্যে পাওয়া যাইত।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এ প্রদেশের কোন মধ্যবিত্ত অবস্থাবান ব্যক্তির বাড়ীতে বিবাহ

পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ, শারদীয় পূজা, অন্যান্য পূজাপার্ব্বণ উপস্থিত হইলে বাড়ীতেই মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত হইত। পূর্ব্বে ময়রা ব্যতীত অনেকেই মিষ্টান্নের ভিয়ান করিতে পারিত। পূর্ব্বে এ প্রদেশের কি ভদ্র কি ইতর সকলেরই চাষ ছিল। সকলেই কিছু কিছু আখের চাষ করায় সকলের ঘরেই গুড় থাকিত। সেই গুড়ে নিজেরাই মিষ্টান্ন তৈয়ার করিতেন। এখনকার মত সকল বিষয়ই সৌখিন ছিল না, সকল বিষয়ই মোটামুটি চালচলন ছিল। বেশ শক্ত মোটাকাপড়ে গুড় ঢালিয়া কাপড়ের চারি কোণ উপরিভাগে একত্রে পুটলী বান্ধার মত বান্ধিয়া একটী গামলার উপর বাঁসের তেকাটা (ত্রিভুজাকৃতি) করিয়া তাহার উপর গুড়ের পুটলী-স্থাপন করিয়া, সেই গুড়ের উপর ভারি বস্তুর (শিল বা যাঁতা) চাপ দিয়া রাখিতে হয়। একদিন চাপ দেওয়া থাকিলে গুড়ের তরল অংশ মোটা কাপড় ভেদ করিয়া নীচের গামলায় পড়িত। তৎপরে পুটলীর মধ্যস্থিত গুড় লইয়া ছানার সহিত পাক করিয়া সন্দেশ প্রস্তুত হইত। সেই সন্দেশ এখনকার ন্যায় সাদা না হইয়া লাল্‌চে হইত। সেই সন্দেশ দিয়া ব্রাহ্মণাদি ভোজন করান হইত। ঘরেই মুড়কী ও টানা নাড়ু বা সিঁড়ির নাড়ু প্রস্তুত করা হইত। সন্দেশ বা মিঠাই প্রস্তুত করিতে হইলে বেশম জলে গুলিয়া ছাঁকনী দ্বারা ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া উত্তপ্ত ঘৃত কটাহে নিক্ষিপ্ত করিয়া ভাজিয়া লইয়া পাককরা চিনির বা দলোর রসের সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। টানা নাড়ু ঘৃতে না ভাজিয়া তৈলে ভাজিয়া গুড়ের সহিত পাক করিলেই টানা নাড়ু বা সিঁড়ির নাড়ু তৈয়ার করা হইত। ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষে যে বাটীতে আসিত, তাহাকে মুড়ি, মুড়কী, টানা নাড়ু জল খাবার স্বরূপ দেওয়া হইত, এখনও ঐরূপ জল খাবার দেওয়া হইয়া থাকে। এখনও শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে কাঙ্গালী বিদায় করা হইয়া থাকে, তাহাতে সাধ্যমত এক আনাহইতে দুই আনা পয়সা ও মুড়ি,মুড়কী ২।১টা করিয়াটানা নাড়ু দেওয়া হইয়া থাকে। পূর্ব্বে টানা নাড়ুর যেরূপ প্রচলন ছিল এখন তাহা অপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে। এখন টানা নাড়ুর পরিবর্ত্তে মিঠাই আদি দিয়া থাকে।

বিদেশী পরিস্কৃত চিনি সস্তা হওয়ায় দেশী দলো বা চিনি একবারে উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে বিদেশী চিনি এত সস্তা হইয়াছিল যে গুড়ের মূল্য তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। তজ্জন্য নাতগুড়ের সহিত বিদেশী চিনি মিশ্রিত করিয়া পাক করা হইত। তাহাতে উত্তম পরিস্কৃত গুড় প্রস্তুত হইত। ঐরূপ গুড় প্রস্তুত করিবার জন্য বর্দ্ধমানে কয়েকটী কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। আসল গুড় অপেক্ষা কৃত্রিম গুড় দেখিতে বেশ পরিস্কৃত হইত এবং আসল গুড় অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রিত হইত।

পূর্ব্বে এ প্রদেশে হিন্দুয়ানী খুব প্রবল ছিল। ময়রার দোকানের ঘৃতপক্ক মিষ্টান্নাদি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা ভক্ষণ করিতেন না। তখন ব্রাহ্মণ ভোজনে এখানে মণ্ডা, গোল্লা বা রসগোল্লা ব্যতীত ময়রার দোকানের অন্যান্য মিষ্টান্ন চলিত না। ঘৃতপক্ক মিষ্টান্নাদি ব্রাহ্মণ

ভোজনে দিতে হইলে ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করাইতে হইত। এখন লুচি, ডাল, তরকারী ব্যতীত ময়রার দোকানের সমস্ত মিষ্টান্নই এখন ব্রাহ্মণ ভোজনে ব্যবহৃত হইতেছে। তখন শুদ্ধ ব্রাহ্মণ কেন কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরাও ময়রার দোকানের ঘৃতপক্ক মিষ্টান্ন ব্যবহার করিতেন না। তখন ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা ময়রার দোকানের ঘৃতপক্ক মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতেন না বলিয়া ময়রার দোকানে ঘৃতপক্ক মিষ্টান্ন তৎকালে খুব কমই থাকিত। এখন আর সেকাল নাই, ময়রার দোকানে বসিয়া কত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর হিন্দু লুচি তরকারী নির্ভয়ে ভক্ষণ করিতেছেন। পূর্ব্বাপেক্ষা হিন্দুয়ানী অনেক কমিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে কায়স্থের বাড়ীতে ব্রাহ্মণ ভোজন হইলে, লুচির সহিত লবণ বিহীন তরকারী মাত্র ভক্ষণ করিতেন এখন লবণ সংযুক্ত ডাল ও মৎস্যের তরকারী অবাধে চলিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে অনেকস্থলেই চিড়া, মুড়কী দধি দ্বারাই এ প্রদেশের অনেকস্থলেই ব্রাহ্মণ ভোজন হইত। যাঁহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত, তাঁহারাই লুচি সন্দেস দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন।

পূর্ব্বে কলের ময়দার প্রচলন ছিল না, গম যাঁতায় পেষণ করিয়া ময়দা প্রস্তুত করিত। অনেক গৃহস্থের চাষে গম হইত, বাড়ীতে যাঁতা থাকিত। যাঁতা দ্বারা গম পেষণ করিয়া আবশ্যকমত ময়দা প্রস্তুত করিত। কলের ময়দা যেরূপ সূক্ষ্ম অণুতে পরিণত হয়, যাঁতা ভাঙ্গা ময়দা সেরূপ হয় না। কলের ময়দায় লুচি ভাজিতে হইলে প্রতিমণে অর্দ্ধমণ ঘৃতের কম ভাল হয় না। এখন কলের ময়দার ময়ান না দিলে লুচি খাইতে পারা যায় না। পূর্ব্বে এ প্রদেশে ময়দা দিয়া লুচি ভাজার প্রথা ছিল না। যাঁতাঙ্গা ময়দায় বিনা ময়ানে লুচি তৈয়ার হইত। তখন একমণ ময়দায় লুচি প্রস্তুত করিতে আটসের হইতে দশসের ঘৃত লাগিত। সেই লুচি দ্বারা ব্রাহ্মণাদি ভোজন করান হইত। সেই লুচি নিতান্ত মন্দ হইত না, খাইতে কষ্ট হইত না। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এ প্রদেশের অনেকস্থলে ব্রাহ্মণ ভোজনে ডাল তরকারীর পরিবর্ত্তে লুচির সহিত কাঁচা গুড় দেওয়া হইত। এখন যেমন সকল বিষয়েরই বাড়াবাড়ি ও আড়ম্বর হইয়াছে তখন সেরূপ ছিল না, সকল বিষয়েই মোটামোটি চাল চলন ছিল।

বর্দ্ধমানের মিষ্টান্ন মধ্যে মিহিদানা ও সীতাভোগ খুব উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের ময়রার দোকানে সচরাচর ভাল গোল্লা, মণ্ডা বা সন্দেশ পাওয়া যাইত না। ভাল গোল্লা বা মণ্ডা লইতে হইলে ফরমাইস দিতে হইত। বর্দ্ধমানে এখন সচরাচর ভাল গোল্লাও কিনিতে পাওয়া যায়। মিহিদানা সীতাভোগ ঘৃতপক্ক মিষ্টান্ন বলিয়া পূর্ব্বে অনেক উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ময়রার দোকানের ঐ সকল খাদ্য দ্রব্য খাইতেন না। একারণ বর্দ্ধমানে ঐ মিহিদানা সীতাভোগ প্রভৃতি ঘৃতপক্ক দ্রব্য ও লুচি কচুরি ব্রাহ্মণের দোকানে ও বিক্রীত হইত। পূর্ব্বে ময়রার দোকানে লুচি, কচুরি আদৌ বিক্রয় হইত না। কারণ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের দোকানের ব্যতীত লুচি কচুরি কোন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুই ক্রয় করিতেন

না। তখন জলখাবার স্বরূপে লুচি কচুরি খুব কমই ব্যবহৃত হইত। মধ্যবিত্ত লোক মাত্রেই মুড়ি, মুড়কী জল খাবার রূপে ব্যবহার করিতেন। এখন পরিচ্ছদের পারিপাট্যের সহিত খাদ্য দ্রব্যের ও পারিপাট্য হইয়াছে। এখন মধ্যবিত্ত লোকেও জল খাবার জন্য মুড়ি, মুড়কী ক্রয় করেন না।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এপ্রদেশে চায়ের প্রচলন থাকা দূরে থাকুক চায়ের নাম পর্য্যন্ত জানিত না। এখন পল্লীগ্রামে ও চায়ের প্রচলন ক্রমশ খুব বর্দ্ধিত হইতেছে। এমন কি স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত চা পানে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ সহরে চায়ের প্রচলন এত বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, চা পান করে না, এমন লোক সহরে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রতিদিন অন্যূন দুইবার করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিই চা পান করিয়া থাকেন। চায়ের প্রচলন হওয়ায় জলখাবার খাওয়া কমিয়া গিয়াছে। চা পান সকলের পক্ষে ইষ্ট কি অনিষ্ট তাহা বলিতে পারি না, চা পান আমাদের পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট কর। ইহাতে ক্ষুধামান্দ্য অজীর্ণ প্রভৃতি হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে জলখাবার স্বরূপে মুড়িই ব্যবহৃত হইত। মধ্যবিত্ত লোকে মুড়ি, মুড়কী বা গুড় মুড়ি ব্যবহার করিতেন। এখনও এ প্রথা কিয়ৎ পরিমাণে প্রচলিত আছে। পূর্ব্বে এঅঞ্চলে সকল প্রকার মিষ্টান্নই সস্তাছিল, এমন কি টাকায় চারিসের হইতে ছয়সের পর্য্যন্ত পাওয়া যাইত।

মালাকার—এই জাতির জাতীয় ব্যবসায় ফুলের বাগান প্রস্তুত করিয়া সেই বাগানজাত পুষ্প বিক্রয় করা, সোলার কারুকার্য্য, প্রতিমার ডাক সাজ, বম্ হাউই প্রভৃতি বারুদেরকার্য্য। আমাদের ন্যায় পল্লীগ্রামে পুষ্প বিক্রয় হয় না, তজ্জন্য ইহারা ফুলের বাগান প্রায়ই তৈয়ার করে না। সহর ও তীর্থ-স্থানে প্রচুর পরিমাণে পুষ্প বিক্রয় হয় বলিয়া সেই সকল স্থানে এই জাতির দ্বারা ফুলের বাগান প্রস্তুত হইয়া থাকে। পল্লীগ্রামে এই জাতির সংখ্যা খুব কম। সকল গ্রামে এই জাতির বাস নাই। পল্লীগ্রামের মালাকরেরা বিবাহকালীন বরের মাথায় টোপর, সোলার ফুলছড়ি, আলোদিবার জন্য অভ্রের গেলাসের ঝাড়, বম্ হাউই, রংমসাল, দীপক, তুবড়ি প্রভৃতি বাজী প্রস্তুত করে। প্রতিমার ডাক সাজ, অভ্রের বা সোলার চাঁদ মালা ইত্যাদিও তৈয়ার করিয়া থাকে। ইহারা এই সকল কার্য্য বহু পূর্ব্ব হইতে করিয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বে লোকের হিন্দু ধর্ম্মে বিশেষ ভক্তিছিল। একারণ অনেক গৃহস্থেই পূর্ব্বে দেবদেবীর প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিতেন। এখন লোকের হিন্দু ধর্ম্মে অবস্থা কমিয়া যাওয়ায়, প্রতিমা পূজাও বহুল পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। একারণ মালাকরের কার্য্য অনেক কমিয়া গিয়াছে। এখন লোকের ছেলে মেয়ের বিবাহে বাজে খরচ কমাইয়া দেওয়ায় মালাকরের কার্য্যের ও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। জাতীয় ব্যবসায় দ্বারা পল্লীগ্রামের মালাকরের এখন আর গ্রাসাচ্ছাদন চলে না, একারণ তাহাদের অনেককেই

এখন কৃষি বা অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। অর্দ্ধশতাব্দীর বহু পূর্ব্বে প্রতিমা ডাক সাজ দ্বারা সজ্জিত না করিয়া মৃত্তিকার অলঙ্কারাদি দ্বারা সজ্জিত করা হইত।

বণিক—এপ্রদেশে দুই প্রকার বণিক জাতি আছে, গন্ধবণিক ও সুবর্ণ বণিক। ব্যবসাই ইহাদের জাতীয় বৃত্তি। স্বর্ণ রৌপ্য ক্রয় বিক্রয়ই সুবর্ণ বণিকের জাতীয় বৃত্তি। এই জাতির অধিকাংশেরই অবস্থা খুব উন্নত। স্বর্ণ রৌপ্যের ক্রয় বিক্রয় ব্যতীত এই জাতি অন্যান্য অনেক প্রকারের ব্যবসা ও করিয়া থাকেন। এই জাতির মধ্যে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও আছেন। এই জাতি বহু পূর্ব্ব হইতেই ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া আসিতেছেন। গন্ধবণিকেরাও বহু পূর্ব্বকাল হইতেই ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া আসিতেছেন। ইহারা সকল প্রকার ব্যবসায়ই করিয়া থাকেন। এই জাতি বহু পূর্ব্বে যে জলযান করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যে জন্য ভিন্নভিন্ন দেশে গমন করিতেন, কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মসলার ব্যবসায়ই ইহাদের প্রধানতঃ জাতীয় ব্যবসা। এজন্য মসলার দোকানকে "বেনের দোকান" বলে। যদি ইহারা এখন জলযানে করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বিদেশে গমন করেন না বটে, কিন্তু ব্যবসায়াদি করিয়াই ইহারা গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করে। পূর্ব্বে ডাক্তারী চিকিৎসা প্রচলন ছিল না। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এপ্রদেশে ডাক্তারই ছিল না; তখন এখনকার মত দেশে ম্যালেরিয়ারও প্রাদুর্ভাব ছিল না। সামান্য সামান্য রোগের চিকিৎসা বাড়ীর গৃহিণীরাই করিতেন। রোগ কঠিন হইলে কবিরাজের দ্বারা চিকিৎসা করান হইত। কবিরাজেরা রোগীর চিকিৎসা কালীন দেশীয় গাছ গাছড়ার পাঁচন ও মুষ্টি-যোগ ব্যবস্থা করিতেন। গন্ধ বণিকের পাঁচন ও মুষ্টিযোগের উপাদান সকল যথা সময়ে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন; কবিরাজের ব্যবস্থামত পাঁচন ও মুষ্টিযোগের উপাদান সকল বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভ করিতেন। কোন্ কোন্ পাঁচনে কোন্ কোন্ উপাদান দিতে হইবে, পূর্ব্বে গন্ধ বণিকদের তাহা অভ্যস্থ ছিল যেমন কবিরাজে দশমূল পাঁচনের ব্যবস্থা করিলেন, কি কণ্টিকারী পাঁচনের ব্যবস্থা করিলেন, দশমুল পাঁচনে বা কণ্টিকারী পাঁচনে যে যে উপাদান লাগিবে, পূর্ব্বে গন্ধ বণিকদিগের তাহা অভ্যস্থ থাকায় অনায়াসে তাহারা তাহা বাছিয়া দিতে পারিতেন। কোন্ কোন্ পাঁচনে কোন্ কোন্ উপাদান দিতে হইবে, গন্ধ বণিকেরা তাহা খাতায় লিখিয়াও রাখিতেন। এখন আর কবিরাজী চিকিৎসার আর তাদৃশ প্রচলন না থাকায় সকল বেণের দোকানে পাঁচন ও পাওয়া যায় না। এখনকার গন্ধ বণিকদের মধ্যে অনেকেই পাঁচনের গাছ গাছড়া চেনে না, বিক্রয় হয় না বলিয়া পাঁচনের গাছ গাছড়া ও সংগ্রহ করেনা। পূর্ব্বে গন্ধবণিকের দোকানমাত্রেই পাঁচন ইত্যাদি পাওয়া যাইত। এখন পাঁচনের আবশ্যক হইলে, তাহা সংগ্রহ করা নিতান্ত কষ্ট সাধ্য। পূর্ব্বে পাঁচন বেচিয়া গন্ধ বণিকেরা বিলক্ষণ লাভবান্.

হইতেন। এখনও কি পল্লীগ্রামে কি সহরে অধিকাংশ দোকানই গন্ধ বণিকের। মসলার দোকান ব্যতীত মুদিখানার দোকান ও গন্ধবণিকেরা করিয়া করিয়া থাকেন। ফলতঃ বণিক মাত্রই ব্যবসায়ী। ব্যবসায় করিয়া অনেক গন্ধ বণিকই বেশ ধনশালী হইয়াছেন। পল্লীগ্রামে সামান্য দোকান করিয়া ধনশালী হইবার সম্ভাবনা নাই। পল্লীগ্রামে দোকান করিয়া কিছু সঞ্চয় করিয়া সহরে গিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া অনেকেই ধনশালী হইয়াছেন। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার ন্যায় বাণিজ্য প্রধান সহর অতি সামান্য স্থান ছিল, ইংরাজ রাজত্বের পর অনেক ব্যবসায়ী জাতি কলিকাতায় গিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া প্রচুর ধনশালী হইয়া পল্লীগ্রামের বাস ত্যাগ করিয়া কলিকাতা বাসী হইয়াছেন। এইরূপেই অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় অনেকেই পল্লীগ্রামের বাসত্যাগ করিয়া কলিকাতাবাসী হইয়াছেন। তজ্জন্যই কলিকাতা এক্ষনে এতজন বহুল স্থান হইয়া উঠিয়াছে। গন্ধবণিক অপেক্ষা বোধ হয় সুবর্ণ বণিকগণই অধিক ধনশালী এপ্রদেশে গন্ধবণিক অপেক্ষা সুবর্ণবণিকের সংখ্যা খুব কম। আমার বোধ হয় বাঙ্গালী মধ্যে কলিকাতায় সুবর্ণ বণিকগণই অধিক ধনশালী ইংরাজ রাজত্বের প্রাক্কালে ব্যবসায় ইত্যাদি দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় যাঁহারা কলিকাতায় গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশের বংশধরগণই এক্ষণে কলিকাতার মধ্যে ধনশালী। গন্ধবণিকদিগের মধ্যে অনেক দরিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সুবর্ণ বণিকদিগের মধ্যে ক্বচিৎ দরিদ্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখনও গন্ধবণিকেরা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। হীন অবস্থাপন্ন গন্ধবণিক ও ফেরি করিয়া অথবা সামান্য মুদিখানার দোকান করিয়া ও পরিবার প্রতিপালন করিয়া থাকে।

বৈদ্য—চিকিৎসাই এই জাতির জাতীয় বৃত্তি। পূর্ব্বে ডাক্তারী চিকিৎসাই ছিল না। বৈদ্যেরাই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়া চিকিৎসা ব্যাবসায় অবলম্বন করিতেন। এই জাতির সংখ্যা কম। পল্লীগ্রামের সকল স্থানে এই জাতির বাস নাই। আমাদের এ প্রদেশের নিকটবর্ত্তী স্থানে বৈদ্যের বাস নাই। বর্দ্ধমান জেলার অনেক গ্রামেই বৈদ্যের বাস আছে। আমাদের এপ্রদেশে বৈদ্যের বাস না থাকিলে ও হাতুড়ে কবিরাজের অভাব ছিলনা। বৈদ্য ব্যতীত অন্যান্য অনেক জাতিতেই কবিরাজী চিকিৎসা করিতেন। তাঁহারা যে বিশেষ সুশিক্ষিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। বৈদ্য ব্যতীত অনেক জাতিই পুরুষানুক্রমে কবিরাজী চিকিৎসা করিতেন। ডাক্তারী চিকিৎসার বহুল প্রচলন হওয়ায় অনেকেরই কবিরাজী চিকিৎসা ব্যবসায় লোপ হইয়া গিয়াছে।

অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এপ্রদেশে ডাক্তারী চিকিৎসা প্রবিষ্ট হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। তখন সামান্য সামান্য রোগের চিকিৎসা প্রায়ই পাড়ার স্ত্রীলোকেরা করিতেন। বিশেষতঃ বালক বালিকাগণের পীড়া হইলে অনেক স্থানই বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা সামান্য গাছ গাছড়ার মুষ্টিযোগেই আরোগ্য করিতেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, আমাদের

এপ্রদেশে বৈদ্যের বাস নাই। বৈদ্য ব্যতীত অন্যান্য জাতিতেও কবিরাজী চিকিৎসা করিতেন। বৈদ্য ভিন্ন অন্যান্য জাতির মধ্যে অনেকেরই পুরুষানুক্রমে কবিরাজী চিকিৎসা ব্যবসায় ছিল। ঐ সকল কবিরাজের মধ্যে অনেকেই বিশেষ সুশিক্ষিত ছিলেন না। সকল গ্রামে ও ঐরূপ কবিরাজ ছিলেন না, এক এক জন কবিরাজ ২।৩ বা ততোধিক গ্রামের চিকিৎসা করিতেন। ঐ সকল কবিরাজেরা ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ ভিন্ন ভিন্ন কাগজের মোড়কে করিয়া সকলগুলি একত্রে উত্তরীয় বসনের এক প্রান্তে বান্ধিয়া প্রাতঃকালে বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া এক এক গ্রামে গমন করিতেন। রোগী দেখিয়া বিবেচনামত পাঁচন, মুষ্টিযোগ বা ঔষধ অনুপান সহ সেবনের ব্যবস্থা করিতেন। এখনকার ডাক্তার কবিরাজের মত ভিজিট দিতে হইত না। রোগ আরোগ্য হইলে আট আনা বা এক টাকা দিলেই কবিরাজ মহাশয় সন্তুষ্ট হইতেন। রোগ সুকঠিন হইলে এবং দীর্ঘকাল ঔষধাদি সেবন করিতে হইলে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতেন। তখন সকল বিষয়ই খুব অল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হইত।

যে সকল বৈদ্য সুশিক্ষিত কবিরাজ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতেন, তাহারা প্রায়ই সামান্য পল্লীগ্রামে থাকিতেন না। তাহারা সহরে যাইয়া চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন। এজন্য কলিকাতা সহরে পূর্ব্বে তত খ্যাতনামা কবিরাজের আবির্ভাব হইয়াছিল। এবং এখনও হইতেছে। পূর্ব্বে বৈদ্য ব্যতীত অন্যান্য জাতির মধ্যেও অনেক সুশিক্ষিত খ্যাতনামা কবিরাজ দেখিতে পাওয়া যাইত। এখনও যে দেখিতে পাওয়া যায় না তাহা নহে। পুর্ব্বে কবিরাজ দ্বারা ক্ষত চিকিৎসা হইত না, অস্ত্র প্রয়োগ ক্ষত চিকিৎসা ক্ষৌর কার দ্বারা সম্পাদিত হইত।

পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে প্রায়ই সুশিক্ষিত খ্যাতনামা কবিরাজ দেখিতে পাওয়া যাইত না। তখন অধিকাংশ গ্রামেই হাতুড়ে কবিরাজে চিকিৎসা করিতেন। তখন পল্লীগ্রামে টাকার নিতান্তই অভাব ছিল, অধিক অর্থব্যয় করিয়া রোগের চিকিৎসা করান, অধিকাংশ লোকেরই অসাধ্য ছিল। সুশিক্ষিত খ্যাতনামা কবিরাজগণ তজ্জন্য পল্লীগ্রামে না থাকিয়া অধিক অর্থোপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষায় সহরে গিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন এখন আর পল্লীগ্রামে হাতুড়ে কবিরাজ তত দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন পল্লীগ্রামে অনেক হাতুড়ে ডাক্তারের আবির্ভাব হইয়াছে। অন্যান্য জাতির ন্যায় এখন অনেক বৈদ্য মেডিকেল কলেজর মেডিকেল স্কুলে ডাক্তারী বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া সুশিক্ষিত ডাক্তার হইয়াছেন এবং হইতেছেন এখন খ্যাতনামা কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসিত হওয়া বহু ব্যয় সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ কবিরাজের প্রস্তুত একই প্রকারের ঔষধ যে মূল্যে বিক্রিত হয় খ্যাতনামা কবিরাজের সেই ঔষধ তাহা অপেক্ষা দুই হইতে চারিগুণ অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকেন। ধনী ব্যতীত সাধারণ লোকের তাহা ক্রয় করিবার শক্তি নাই। এখন কবিরাজী চিকিৎসা বহু ব্যয়সাধ্য বলিয়া, অনেকেই কবিরাজী

চিকিৎসা করাইতে সক্ষম হয় না। কবিরাজী চিকিৎসায় গবর্ণমেণ্টেরও সহানুভূতি নাই।

ক্ষৌরকার—এই জাতির জাতীয় ব্যবসায় ক্ষৌরকর্ম্ম অন্য কোন জাতিতেই ক্ষৌর কর্ম্ম সম্পন্ন করে না। পল্লীগ্রামের বাঙ্গালী ক্ষৌরকারেরা অনেক নীচ জাতির ক্ষৌর কর্ম্ম সম্পন্ন করে না। ঐ সকল নীচ জাতির মধ্যে কোন কোন জাতির স্বতন্ত্র ক্ষৌরকার আছে, অথবা নিজেরাই নিজ নিজ ক্ষৌরকর্ম্ম সম্পন্ন করে। সহরে এ সকলের ধরাধর নাই, বিশেষতঃ সহরের অধিকাংশ নাপিতই হিন্দুস্থানী। সহরের হিন্দুস্থানী নাপিতেরা সকল জাতিকেই কামাইয়া থাকে। পূর্ব্বে অনেক নাপিতই ক্ষত চিকিৎসা ও ক্ষতে অস্ত্র প্রয়োগ করিত, একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এখন ও অনেক নাপিত উত্তম ক্ষত চিকিৎসক এবং অস্ত্র প্রয়োগে পারদর্শি।

বারুই—পানের চাষই এই জাতির জাতীয় ব্যবসায়। অন্য কোন জাতিকেই প্রায় পান চাষ করিতে দেখা যায় না। বহু পূর্ব্ব কাল হইতে এই জাতির পানের চাষ একচেটিয়া। এই জাতির সংখ্যা খুব কম। এপ্রদেশের সকল গ্রামে বারুই জাতির বাস থাকা দূরে থাকুক।—২।৪ ক্রোশ অন্তর অন্তর ও বারুই জাতি দেখিতে পাওয়া যায় না। যে গ্রামে বারুই জাতির বাস থাকে, সে গ্রামে ৫।৭ ঘর হইতে ২০।২৫ ঘর বারুই জাতির বাস দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য নীচ জাতীর লোক বারুই জাতির কৃষাণ থাকিয়া, তাহাদের সহিত একত্রে পান চাষের কার্য্যে লিপ্ত থাকায়, সেই সকল নীচ জাতীয় লোকেরাও পান চাষ প্রণালী শিক্ষা করিয়া ২।১ জনকে পান চাষ করিতে দেখিয়াছি। কিন্তু সেরূপ লোকের সংখ্যা খুব কম। ফলতঃ পান চাষ বারুই জাতির এক চেটিয়া।

পানগাছ প্রখর রৌদ্র, প্রবল বৃষ্টি ধারা সহ্য করিতে পারে না; তজ্জন্য পানের ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে ও উপরিভাগে সামান্য রূপে আচ্ছাদিত করিয়া দিতে হয়। যে সকল স্থানে পাটের চাষ হয়, সেই সকল স্থানের বারুইরা পাটগাছের আঁস বাহির করিয়া লইলে, সেই পাটের ডাঁটার দ্বারা পানের ক্ষেতের বেড়া ও আচ্ছাদন করিয়া থাকে। আমাদের এ প্রদেশে প্রায়ই পাট চাষ হয় না, তজ্জন্য এখনকার বারুইয়েরা ধঞ্চে গাছের ডাঁটা দিয়া চতুর্দ্দিকে বেড়া দিয়া থাকে। উপরিভাগে কেশো গাছের আচ্ছাদন দিয়া থাকে। পানের চাষ খুব যত্ন সহকারে না করিলে ভাল পান হয় না সকল স্থানের মৃত্তিকায় ভাল পান জন্মে না। দোআঁস মৃত্তিকা ভিন্ন পান গাছ ভাল হয় না। পান গাছে প্রচুর সার ও খইল দিতে হয়। পান লতা জাতীয় গাছ। পান গাছের লতা টুকুরা টুকুরা করিয়া কাটিয়া রোপণ করিতে হয়। সার খইল মিশ্রিত করিয়া মাটী প্রস্তুত করিতে হয়। ভেলি কাটিয়া ভেলির উপর খণ্ডিত লতা রোপণ করিতে হয়। বৃষ্টির জল কোন স্থানে জমিতে না পারে, এরূপভাবে নালা

কাটিয়া জল নির্গমনের ব্যবস্থা করিতে হয়। অনাবৃষ্টির সময় জল সেচন আবশ্যক। পান গাছের নিমস্থ মৃত্তিকা সকল সময়েই সরস থাকা চাই। পান গাছ যত সতেজ হইবে, উহার পাতা ও তত বড় ও অধিক হইবে। যে পান খুব বড়, তাহার মূল্য ও খুব বেশি। পানের ক্ষেতে বিশেষরূপে সার খইল না দিলে, পান গাছ সতেজে উত্থিত হয় না। জমিতে জল না দাঁড়ায় এবং জমির মৃত্তিকা সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক না হয়, সে বিষয়ে ও বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। জমির মৃত্তিকা শুষ্ক হইলেই জল সেচন করিয়া দেওয়া চাই। নিকটে জলাশয় না থাকিলে পান চাষ করা চলে না। শীত কালে গ্রীষ্মকালে মধ্যে মধ্যে জল সেচন বিশেষ আবশ্যক। যে সকল স্থানের মৃত্তিকা স্বভাবতঃ সকল কালেই সরস থাকে, সে সকল স্থানে তত জল সেচনের আবশ্যক হয় না। পানগাছ লতা জাতীয় গাছ স্বভাবত উপরদিকে উঠিতে পারেনা, একারণ এক একটী পান গাছের নিকট এক একটী পাট বা ধঞ্চের ডাঁটা পুঁতিয়া দিতে হয়। পানগাছ ঐ ডাঁটা আশ্রয় করিয়া উপরদিকে উঠিতে থাকে। পান ক্ষেতের চারি হাত উর্দ্ধে আচ্ছাদন দেওয়া হইয়া থাকে। পানের লতা উপরিস্থ আচ্ছাদন পর্য্যন্ত উঠিয়া, আচ্ছাদনের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া থাকে। এইরূপে আচ্ছাদিত পানের ক্ষেতকে "বোরজ" বলে। অনেকেই পানের বোরজ দেখিয়াছেন। কলিকাতা প্রভৃতি সহরবাসী অনেকেই রেলে গমন কালীন, রেলের পাশে কোথাও কোথাও পানের বোরজ দেখিয়া থাকিবেন।

ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কাল হইতে পানের যে প্রচলন আছে, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বহু রোগে পান দ্বারা ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা আছে। অল্প পরিমাণে পান খাওয়ায় ইষ্ট ব্যতিত অনিষ্ট হয় না। বহু পরিমাণে পান খাইলে অনিষ্ট হয়। আমাদের ভারতবর্ষে পানের যেরূপ বহুল প্রচলন আছে, অন্য কোন দেশে তত নাই। পূর্ব্বে পান খুব সস্তা ছিল এমন কি বড় বড় পান এক পয়সায় একশত পর্য্যন্ত পাওয়া যাইত। বর্ষাকালে পানের পাতা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, আষাঢ় মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত পান সস্তা থাকে। শীতকালে পান গাছ হইতে পাতা বাহির হয় না বলিয়া পান মহার্ঘ হয়। পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে পান খুব মহার্ঘ হইয়াছে। সময়ে সময়ে একশত বড় পানের দাম আট আনা হইতে দশ আনা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। খুব সস্তার সময়ে ও বড় পান চারি আনা পাঁচ আনার কমে একশত পান পাওয়া যায় না।

আমাদের এ প্রদেশের বারুইয়েরা ১২ গণ্ডায় গোছ করিয়া থাকে, ২ গোছে ২৪ গণ্ডায় একশত ধরিয়া থাকে। কোন স্থানে ৮ গণ্ডায় গোছ করে, ৩ গোছে অর্থাৎ ২৪ গণ্ডায় একশত ধরা হয়। ছোট বড় অনুসারে পানের মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে।

উগ্রক্ষত্রিয়, ও সদ্‌গোপ—এই উভয় জাতিই কৃষিজীবি।[*] পূর্ব্বে ইহাদের বিষয়ে বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে। এই উভয় জাতিরই মধ্যে স্বহস্তে হল চালনা নিষিদ্ধ নহে। এই উভয় জাতিই বিলক্ষণ মিতব্যয়ী। প্রথমে এই উভয় জাতিই স্বহস্তে চাষ করিয়া সঞ্চয় করে, তৎপরে ব্যবসায়াদি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠে। এক্ষণে এই উভয় জাতির মধ্যে অনেক শিক্ষিত, চাকরী জীবি ও সঙ্গতিপন্ন হইয়াছেন। এই উভয় জাতির অধিকাংশ লোকই এখনও স্বহস্তে চাষ করিয়া থাকে। অনেকেরই অবস্থা অনুন্নত। এই উভয় জাতিই বেশ পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী বলিয়া, সহজেই সঞ্চয় করিতে সক্ষম হয়।

গোপ—গরু প্রতিপালনই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় এই জাতির অনেকে গরুর সহিত মহিষও প্রতিপালন করিয়া থাকে। গরু মহিষের দুগ্ধ ও তজ্জাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। গোচর ভূমি আবাদী ক্ষেত্রে পরিণত হওয়ায় এক্ষণে গরু প্রতিপালন করা নিতান্ত কষ্টকর ও বহু ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গবাদি পশু গোচর ভূমিতে চরিয়া আপনাদের উদর পূর্ণ করিত। পূর্ব্বে গরু প্রতিপালন করা কষ্টকর বা ব্যয়সাধ্য ছিল না। এ কারণ প্রত্যেক গোপেই বহু সংখ্যক গবাদি পশু প্রতিপালন করিত। পূর্ব্বে গোপ ব্যতীত অন্যান্য অনেক জাতিই দুগ্ধের জন্য গরু রাখিত। নিজ আবশ্যক মত দুগ্ধ রাখিয়া অবশিষ্ট দুগ্ধ বিক্রয় করিত, অথবা ঘৃত করিয়া সময়ে সময়ে বিক্রয় করিয়া বিলক্ষণ লাভবান হইত। গবাদি পশুর স্বাভাবিক খাদ্য তৃণ—কাচা ঘাস খাইতে গরু যেরূপ ভালবাসে ও আগ্রহ প্রকাশ করে, অন্য খাদ্যে সেরূপ করে না। কাঁচা ঘাসে গরুর যেরূপ পুষ্টি সাধিত হয়, অন্য খাদ্যে সেরূপ হয় কিনা সন্দেহ। কাঁচা ঘাস খাইয়া গরু যেরূপ অধিক পরিমাণে দুগ্ধ প্রদান করে, অন্য খাদ্যে সেরূপ করে না। কাঁচা ঘাস যেরূপ অনায়াস লভ্য ছিল, অন্য খাদ্য সেরূপ ছিল না। আমাদের এখানে ফাল্গুন মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত মাঠে কোন শস্য থাকে না,—এ কারণ ঐ সময়ে মাঠে অবাধে গরু চরিয়া থাকে। বৃষ্টি না হইলে ফাল্গুন চৈত্র মাসে মাঠে ভাল ঘাস থাকে না। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি হইলে মাঠের ঘাস সকল গজাইয়া উঠে, সেই ঘাস খাইয়া গবাদি পশু বিলক্ষণ পুষ্ট হয়। দুগ্ধবতী গাভীর দুগ্ধও বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। ঐ ঘাস খাইয়া গাভীর দুগ্ধ দেড়গুণ দুইগুণ বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়। ঐ সম্বন্ধে পূর্ব্বে "গরু" প্রবন্ধে আমরা বিস্তারিতরূপে লিখিয়াছি। হেলে গরু দিনের অধিকাংশ সময় কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, সুতরাং তাহাদের চরিয়া খাইবার সময় খুব কম পাওয়া যায়। একারণ তাহাদিগকে খইল খড় খাইতে দেওয়া হইয়া থাকে। পূর্ব্বে খইল খড় খুব সস্তা ছিল, খড় অনেকের চাষেও উৎপন্ন হইত, এখনও হইয়া থাকে। পূর্ব্বাপেক্ষা এখন খইল খড়ের মূল্য প্রায়

অষ্টগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। এ কারণ গরু প্রতিপালন করা লোকের নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে গরুতে যে পরিমাণে দুগ্ধ দিতে দেখিয়াছি, এখন আর সেরূপ দুগ্ধ দিতে দেখা যায় না। পূর্ব্বে যেরূপ বৃহদাকার, বলবান, হৃষ্টপুষ্ট গাভী দেখা যাইত, এখন আর সেরূপ দেখা যায় না। এখন আহারাভাবে ও বৈজিক দোষ ক্ষুদ্রায়তন, দুর্ব্বল গরু উৎপন্ন হইতেছে। সুতরাং দুগ্ধও খুব কম হইয়া পড়িয়াছে। পল্লীগ্রামের কঙ্কালসার গাভীগুলি দর্শন করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।

যে গ্রামে বহু বিস্তীর্ণ গোচর ভূমি থাকিত, সেই গ্রামেই বহু সংখ্যক গোপ জাতির বাস থাকিত। তাহাদের প্রত্যেকেরই বহু সংখ্যক গাভী ও বলদ থাকিত। গাভীর দুগ্ধ বিক্রয় করিত, অবশিষ্ট দুগ্ধ, দধি ছানা, ঘৃত করিত। পল্লীগ্রামের যে গৃহস্থের বাড়ীতে দুগ্ধ থাকিত না, সেই গৃহস্থের বাড়ীতে রোজ রোজ দুগ্ধ প্রদান করিত। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, পূজা পার্ব্বণ ইত্যাদিতে লোকজন খাওয়ান হইত, তাহাতে দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা প্রদান করিয়া মূল্য গ্রহণ করিত। পূর্ব্বে দধি, দুগ্ধ, ছানা বিক্রয় না হইলে, দুগ্ধ হইতে ঘৃত করিয়া মজুত রাখিত। অধিক পরিমাণে ঘৃত মজুত হইলে, সেই ঘৃত বিক্রয় করিত। এখনকার ন্যায় পূর্ব্বে দুগ্ধের এত খরিদ্দার ছিল না, তাহার কারণ তখন অধিকাংশ লোকের বাড়ীতেই গাভী থাকিত, তজ্জন্য তাহাদের দুগ্ধের অভাব হইত না।

গোয়ালারা স্বহস্তে চাষাদি কার্য্য ও সম্পন্ন করিত। সকলেরই ঘরে গাভীর সহিত বলদ থাকিত, সেই বলদ দ্বারা চাষ করিত। প্রত্যেক গোপের বাড়ীতে বহু সংখ্যক গরু থাকায়, বিস্তর গোবর জমিত, সেই সকল গোবর চাষের জমিতে দিয়া প্রচুর শস্য প্রাপ্ত হইত। দুগ্ধ, দধি, ছানা, ঘৃত বিক্রয় করিয়াও চাষ করিয়া অনেকেই আপনার অবস্থা বেশী উন্নত করিত।

পূর্ব্বে দধি, দুগ্ধ, ছানা ঘৃত খুব সস্তা ছিল, তখন দুই পয়সা সের দুগ্ধ, ১ টাকা হইতে ১॥ মণ দধি, টাকায় ষোল সের করিয়া ছানা, এবং টাকায় দুই সের আড়াই সের ঘৃত পাওয়া যাইত। পূর্ব্বে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে সময়ে সময়ে ছানা এত সস্তা হইত যে, দুইপয়সায় একসের ছানা পাওয়া যাইত। তাহার কারণ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে গাভীতে এত দুগ্ধ প্রদান করিত যে, তাহার সমস্ত বিক্রীত হইত না, সুতরাং ছানা করিয়া সস্তায় বিক্রয় করিতে হইত। পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে দধি দুগ্ধের কিছু মাত্র অভাব ছিল না। এখন দধি দুগ্ধের এত অভাব হইয়াছে যে, সময়ে সময়ে উচ্চ মূল্য দিয়াও দধি দুগ্ধ কিনিতে পাওয়া যায় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীরাজনারায়ণ বিশ্বাস
মাহার বিলগ্রা, (বর্দ্ধমান।)

দুধের গুণ

দুধের অশেষ গুণ তাহা অনেকেই জানেন। দুধের উপদান গুলির বিষয় আলোচনা করিলে তাহা বেশ বুঝা যায়।

বিভিন্ন দুগ্ধের একশত ভাগে কোন্ উপাদান কত পরিমাণে অবস্থান করে তাহার এক তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

দুগ্ধের বিবরণ	জল	শর্করা	নবনী	ছানা	লবণ বা ভস্ম
নারী দুগ্ধ	৮৯·০	৪·৩	২·৬	৩·৯	০·২
গাভী দুগ্ধ	৮৬·০	৫.০	৪·০	৩·৩	০·৭ *
মহিষ দুগ্ধ	৮৩·০	৫·০	৭·২	৪·০	০·৮
ছাগ দুগ্ধ	৮৭·৬	৪·০	৪·০	৩·৫	০·৯
গর্দ্দভ দুগ্ধ	৯০·০	৬·০	১·৩	২·৩	০·৪

* দুগ্ধে ভস্মের উপাদান—

ক্যালসিয়াম ফস্ফেট—	·২৩১	পোটাসিয়াম্ ক্লোরাইড—	·১৪৪
ম্যাগ্নেসিয়াম্ ফস্ফেট—	·০৪২	সোডিয়াম্ ক্লোরাইড—	·০২৪
ফেরিক্ ফস্ফেট—	·০০৭	সোডিয়াম্ কার্ব্বনেট—	·০৪২

কৃষি-রসায়ন

শরীর রক্ষা পক্ষে দুধ যে কত আবশ্যক তাহা অতি বিস্তারে বলিবার আবশ্যক নাই। গোময় বা গোয়ালের সার যেমন সম্পূর্ণ সার—সম্পূর্ণ এই হিসাবে ইহাতে নাইট্রোজেন, পটাস, ফস্ফরিকাম্ল অল্প বিস্তর পরিমাণে আছে; তেমনি দুধে—মানুষের খাদ্য শর্করা, তৈল, লবণ এবং নাইট্রোজেন যুক্ত সার সবগুলই আছে। ইহাতে Vitramines ভিট্রামাইন নামক এক প্রকার পদার্থ আছে যাহাতে প্রোটিন (Proteins) বেশ বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় এবং যাহা সহজে পরিপাক হয়। এই প্রোটিন হইতেছে নাইট্রোজেন যুক্ত খাদ্যোপাদান। ইহাতে শরীরের বৃদ্ধি ও পোষণ হয়। এতদ্ব্যতীত ইহাতে খনিজ পদার্থ যথা চুণ আছে। চুণ দ্বারা মনুষ্য শরীরের হাড় গঠিত হয়। ইহা বালক বালিকাগণের শরীর বৃদ্ধির বিশেষ সহায় ইহাতে ঘৃত আছে যাহা তৈলাক্ত পদার্থ। কিন্তু তৈল পদার্থ সহজে পরিপাক হয় না। দুগ্ধস্থিত তৈল পদার্থ এমন সহজ পাচ্য ভাবে আছে যাহা পরিপাকে বিশেষ কষ্ট হয় না।

ইহার আর একটা বিশেষ গুণ এই যে, যে এই খাদ্য গ্রহণে বিশেষ কিছু আয়াস নাই। ভাত দাউল, মাছে, সবজী মাংস প্রভৃতি রন্ধনের একটা হাঙ্গামা আছে কিন্তু দুধ গরম করিয়া সহজেই গ্রহণ করা যায়; এমন কি সদ্য দোহা দুধ গ্রহণ করাও চলে। আগে

গো-দুগ্ধ সহজ প্রাপ্য এবং সস্তা ছিল এবং নানা কারণে ইহা লোকের প্রধান খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইত এবং মৎস্য মাংস খাওয়া অপেক্ষা লোকে তখন দুধ পান করা সহজ ও সমিচীন বলিয়া মনে করিত।

আয়ুর্ব্বেদ পণ্ডিতগণ বলেন যে উপযুক্ত মাত্রায় দুধ পান করিতে পাইলে লোকে রোগের হাত হইতে মুক্ত হইতে পারে। দধি ও ঘোলের অনেক রোগ জীবাণু নষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে।

ইংরাজী ভাষায় ফল ভক্ষণের গুণ ব্যাখ্যায় এক চলিত কথা আছে:— "An apple a day will keep the doctor away." আমরাও জানি যে রোগী প্রাতে বেল খাইলে লোকে নিরোগ হয়। কিন্তু আমাদের ইহাও নিশ্চয় করিয়া জানা উচিত এক মাত্র দুধ মানুষকে সবল ও সুস্থকায় রাখিতে পারে এবং ইংরাজী অনুকরণে আমরা বলিতে পারি যে "an Ample supply of milk a day will keep the doctor away"

আমরা এখন মাংসাহারের জন্য লালায়িত হই কিন্তু ইহা আমরা বেশ জানি গো মহিষ, ছাগ, ভেড়া ইহাদের মাংস না খাইয়া যদি ইহাদের দুধ ব্যবহার করি তাহা হইলে আমাদের আরও বল কারক ও পুষ্টি আহার করা হয়।

অনেকের ধারণা যে মাছে ফস্ফরস অধিক মাত্রায় থাকায় মাছ খাইলে ধী শক্তি বাড়ে। তাহা সম্ভব হইলেও ইহাও আমাদের যেন ভুল না হয় যে শর্করা মিশ্রিত ছানার (সন্দেশ) মস্তিক গঠনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে। আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ আগের কালে দুধ, ছানা, মাখন ও দুধজাত মিষ্টান্ন খাইয়া অসামান্য ধী শক্তি সম্পন্ন হইতে পরিয়াছিলেন।

কিন্তু বাঙ্গালা এখন গো শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। আগে গৃহস্থ বলিলে বুঝিতে হইত যে তাহার বাটীতে দুই চারিটা গো মহিষ আছে। এখন গৃহস্থ গরু রাখে না বা রাখিতে পারে না। অনেকেই এখন গরুর খোরাক যোগাইতে অসমর্থ হইয়াছে। গো-চারণের মাঠ নষ্ট হওয়ায় এই অনর্থ-ঘটিয়াছে। তার উপর লোকের অবসাদ ভাব আছে-মানুষ এখন সহজেই নিজের হিতে উদাসীন এবং পরমুখাপেক্ষী বাঙ্গালার সংসার আবার সাবেক কালের মত গড়িয়া তুলিতে না পারিলে উপায় নাই। পল্লীস্থ সকলে মিলিয়া গো-চারণের মাঠের পুন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং যৌথ প্রথায় চাকর রাখিয়া গরুর সেবা চালাইতে হইবে। গরু চরাইবার তখন রাখাল-বালক পাওয়া যাইত এখনও সেই রাখাল বালকের সঞ্চার করিতে হইবে। দুধ না হইলে সন্তান পালন সহজসাধ্য হইবে না। দুধ অভাবে আজ এত শিশু রুগ্ন এবং অকালে মৃত্যু ঘটে।

মুর্গীচাষ বা পুলট্রিফার্ম্মিং—

পালকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে হইলে প্রতি দুই বৎসর অন্তর পুরাতন মুর্গীগুলিকে বাজারে পাঠান কর্ত্তব্য এবং তাহাদের স্থানে নবজাত তেজস্কর দোষহীন পাখীগুলির দ্বারা স্থান পূরণ করিতে হয়। বংশ, ডিমদানগুণ ইত্যাদি জানিবার জন্য পাখীগুলিকে রিঙ্ দ্বারা চিহ্নিত করিয়া রাখিবে এবং একটি পুস্তকে সকল নিদর্শন লিখিয়া রাখিবে। আমি পূর্ব্ব পত্রে বলিয়াছি যে ডিম বসাইবার সময় ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া বসাইবে। প্রধানতঃ ডিম তিন প্রকারের হয়। ১। সজীব ভ্রূণযুক্ত উর্ব্বর। এইগুলি হইতেই ছানা ফুটিয়া যথাসময়ে বাহির হয়। ডিম টেষ্টার দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বেশ পরিদৃষ্ট হইবে যে সজীব ডিমের ভিতর ভ্রূণটি মাকড়সার আকারে কুসুমের মধ্যে ভাসিতেছে। যদি ডিমটি স্বচ্ছ দেখায় তাহা হইলে বুঝিবে যে ভ্রূণটি মৃত হইয়াছে বা ডিম গাঁজিয়া গিয়াছে। এইরূপ ডিম হাতে পড়িবামাত্রই কল বা মুর্গীর নিচে হইতে অপসারিত করিবে, যেহেতু ইহার দূষিত বায়ু অপর ভাল ডিমগুলির জীবিতভ্রূণ গুলির স্বাস্থ্য খারাপ করে। পচাডিমের মধ্যে ভ্রূণটি নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাতে দুর্গন্ধ হয়; ইহাতে ছানা ফুটেনা। অনুর্ব্বর ডিমগুলিকে পাকশালায় ব্যবহার করিবে যদি ডিমে রক্তের ছিটা দেখায়, তাহা হইলে বুঝিবে যে কুসুমভাঙ্গিয়া গিয়াছে; এইরূপ ডিমে ছানা ফুটেনা। পরীক্ষার পরে কল বা মুর্গীর নিচে হইতে যে সকল ডিম স্থানান্তরিত হইয়াছে তাহার স্থান কদাচ নূতন টাট্কা ডিম দ্বারা পূরণ করিবে না। টাট্কা ডিমের ভিতরের বায়ুর গোলকটি ছোট থাকে, ডিম যত পুরাণ হয় এই বায়ুর গোলক ততই বড় হয়। পুরাণ ডিম জলে ভাসিয়া উঠে। এইজন্য মাখম লাগাইয়া ডিম রাখিয়া দিলে তাহা অনেক দিন পর্য্যন্ত অবিকৃতাবস্থায় থাকে। রক্ষিত ডিম রন্ধনশালায় ব্যবহার করিবে; ইহা কদাচ বসাইবেনা। ডিম যত পুরাণ হয় বা তায়ে বা কলে থাকে ততই ইহার বায়ু গোলক বড় হয় এবং ইহা হইতে কার্বণেড অব সাইড্ গ্যাস উদ্গীর্ণ হইয়া থাকে; সেই জন্য কলের মধ্যস্থ ডিমবসা কামরাটির বায়ু সদাই নির্ম্মল ও স্বাভাবিক যাহাতে থাকে তাহার প্রতি তীব্রদৃষ্টি রাখিতে হয়। এসম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা ডিমবসান বা কল পরিচালনা সম্বন্ধে পরবর্ত্তী পত্রে করিব।

অনেক সময়ে হাঁস মুর্গী-পেরু আদি "বাওয়া ডিম" পাড়ে; যে ডিম মোরগের সাহায্য ব্যতিরেকে উৎপন্ন হয় তাহাকে "বাওয়া ডিম" বলে; ইংরাজীতে ইহাকে "unfertileeggs" বলে। পরীক্ষায় দ্বারায় এইরূপ ডিম নির্ণিত হয়। পরীক্ষা সম্বন্ধে উপরে বলিয়াছি। বাইসিকিল বা মোটরের তীব্র আলোতে অন্ধকার রাত্রে একটি ডিমেরমত, মোটা পেষ্টবোর্ডে ছেঁদা করিয়া, ডিমটিকে দুই আঙ্গুলে লম্বা-দাঁড়ি করিয়া

ধরিলে এবং ডিমটিকে ছিদ্রের সমক্ষে রাখিয়া আলোরদিকে চক্ষু করিয়া দেখিলে বেশ ভ্রূণপরিক্ষক টেষ্টারের কাজ চলে। কলের টেষ্টার আমেরিকা বা বিলাত হইতে আমি ২।৩ টাকামূল্যে আনাইয়া দিতে পারি। ইহা বহুকাল রাখিয়া কাজ চালান যাইতে পারে। মোরগ সংযোগের ৩।৪বা ৫।৭ দিন পরে যে ডিম পাওয়া যায় সেইগুলি প্রায় সবই উর্ব্বর ডিম হয়। মোরগ অপসারণের ৫।৭ দিন বা ৭।৮ দিন পর যে ডিম হয় তাহা অনুর্ব্বর হইয়া থাকে; এই ডিম খাইবার পক্ষে বেশ উপযোগী; ইহা বসাইলে ছানা ফুটে না তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শিক্ষা নবীস এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে লিউ-ইসের Poultry Laboratory guide এবং লিউয়ারের "Poultry Keeping" যত্ন সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি; প্রত্যেক পুল্‌ট্রীচাষীকে Reliable Poultry Journal or Feathered World or পুল্‌ট্রীনামক পত্রিকা পাঠ করিতে অনুরোধ করি; কিন্তু আমি Reliable Poultry Journal পত্রিকাটিকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পাঠ করিতে সম্মতি Preference প্রদান করি; ইহা পাঠকরা প্রত্যেক পক্ষিচাষী, ও শিক্ষানবীসের কর্ত্তব্য। আমার মনে হয় যে মুর্গীচাষ অপেক্ষা আমাদের দেশে হাঁসের চাষ করিলে কম পুঁজী ও খরচায় পরিচালিত হইতে পারে এবং লাভও বেশী হয়, যেহেতু হাঁসের ডিমের কাট্‌তি আমাদের দেশে বেশী; চাকুরী চাকুরী করিয়া নিস্ব বাঙ্গালী লালায়িত হইবে সে ভাল, কিন্তু স্বল্পপুঁজিতে স্বাধীন-জীবিকা নির্ব্বাহ হয় এইরূপ ব্যবসা কদাচ করিবেনা। পক্ষিপালন, দুগ্ধ ব্যবসা, ডেয়ারি পরিচালন, মৌমাছিপালন ইত্যাদি ব্যবসা কদাচ করিবে না, শিখিবে না, পড়িবেনা !!! আমাদের দেশে মাত্র কেবল চিনা হাঁস বা পেকীন বংশীয় ছোটহাঁসই বেশী দৃষ্ট হয়। কিন্তু রাণার, কাউসা, মস্‌কোভী, আইল্‌সবেরী, রাউয়েন প্রভৃতি অনেকপ্রকার হাঁস বিলাতী ও আমেরিকায় বাজারে দৃষ্ট হয়। বিলাতেও আমেরিকায় ইহাদের সমিতি আছে। তাঁহারা প্রত্যেকজাতির প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছেন। আমাদের দেশের লোক খাইতে জানে, উন্নতি করিতে জানে না। সবই শিক্ষার অভাব; এই কৃষকদের শিক্ষার অভাবে আমাদের সবই প্রায় গিয়াছে ও যাইতেছে। আমাদের দেশের কৃষক-কুল এতই অজ্ঞ এবং একগুঁয়ে যে নুতন কোন জিনিষ সহজে মাথায় লইবে না; এমনই তাহাদের কুসংস্কার। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশের কৃষককুল কেন, চালক এবং কৃষকপত্নী-গণ বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত সত্যগুলি যত্নে গ্রহণ করেন এবং পক্ষিপালনে মনঃ সংযোগ করিয়া প্রভূত ধনাগম করিয়া থাকেন। ঐ সকল দেশের কৃষক কুলের অবস্থা আমাদের দীন দেশের কৃষককুল অপেক্ষা যে কত উন্নত তাহা বলা যায় না! রাজহংসও এম্‌ডেন্, টুলুজ আফ্রিকান, আমেরিকান প্রভৃতি বহুজাতীয় হইয়া থাকে। সোয়ান ও কাল ও সাদা ও অন্য বহুপ্রকারের হয়। অষ্ট্রেলিয়ান কাল কাল সোয়ানের আদিম জন্মস্থান; কিন্তু এখন সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতায় জুবাগানে কাল সোয়ান আছে।

এসম্বন্ধে জেম্‌স্‌র‍্যাঙ্কিনের Duck Culture, Hurst এর utility Ducks and geese, All about Indian Runner Ducks, How to make Ducks pay প্রভৃতি পুস্তক যত্নে পাঠকগণকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সকল পুস্তকই আমি আনাইয়া দিতে পারি। মোটর, ডাইনামো ইনকুবেটার, পাখা, গুরণী, মরদা ইত্যাদির সকল প্রকার কল কব্জা, পূর্ব্বে সড়াক পত্রে চুক্তি ঠিক করিলে বা আমার নিকট আসিয়া ঠিক করিলে আনাইয়া দিতে পারি। মুর্গী জাতীর পীড়া, ও তাহার চিকিৎসা এবং তাহাদের সম্বন্ধে আর আর যাহা যাহা জ্ঞাতব্য আছে, পাত্মদান ইত্যাদি বিষয়গুলি সবিস্তার আলোচনা করা হয় নাই; অধিকন্তু কল পরিচালনা সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের শিক্ষার জন্য সবিশেষ আলোচনা প্রয়োজন তাহা পর পর পত্র সমূহে আলোচনা করিব। ক্রমশঃ

অধ্যাপক শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার, ৩১নং এলগীন রোড, কলিকাতা।

পাল্‌টা-পাল্‌টী চাষ

(শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত)

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন উর্ব্বরা ভূমিতে প্রথম বৎসর যেরূপ শস্য উৎপন্ন হয়, তৎপর বৎসর অর্থাৎ দ্বিতীয় বৎসর তাহা অপেক্ষা পরিমাণে কম হয়, এবং ক্রমাগত একই ফশলের চাষ করিলে উত্তরোত্তর ভূমির উৎপাদিকা শক্তির হ্রাস হইয়া উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ক্রমশঃ অল্প হইতে অল্পতর হইয়া যায়। এইরূপে বহু বৎসর অতীত হইলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি একেবারেই নষ্ট হইয়া থাকে। সকল ফশলের খাদ্য একরূপ নহে, শ্রেণীভেদে খাদ্যেরও ভেদ হয়, এক জমীতে একই ফশলের ক্রমিক চাষ করিলে যে খাদ্য সেই ফশলের বিশেষ আবশ্যক, জমী হইতে সেই খাদ্য অত্যল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে উদ্ভিদের পোষনোপযোগী ধাতব ও বাষ্পীয় প্রভৃতি বহু পদার্থই সঞ্চিত থাকে। জল বায়ু ও উত্তাপ সংযোগে উক্ত পদার্থ গুলিতে রাসায়নিক ক্রিয়া আরব্ধ হয়, এবং এই কার্য্যের ফলেই সঞ্চিত খাদ্য বিগলিত হইয়া, রসের সহিত উদ্ভিদ শরীরে প্রবিষ্ট হয়। সঞ্চিত খাদ্য বিগলিত হইলে তাহা হইতে শিকড়গুলি আপনার খাদ্যদ্রব্য শোষণ করিয়া লয়, অন্যান্য দ্রব্যগুলি মৃত্তিকাতেই থাকিয়া যায়। ক্রমাগত একই খাদ্য শোষণ করাতেই তাহা নিঃশেষ হইয়া যায়। ফলে অপর খাদ্য প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিলেও সে ফশল আর হয় না। কিন্তু সেই জমীতে

অন্যান্য শস্যের চাষ করিলে, তাহা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, এ জন্য একই জমীতে প্রতি বৎসর এক জাতীয় শস্যের চাষ না করিয়া তাহার পরিবর্তন করা আবশ্যক। এই-রূপে এক ফশলের পরিবর্তে অন্যপ্রকার শস্য রোপণ করাকেই পাল্‌টা-পাল্‌টী চাষ বলে। পাল্‌টা-পাল্‌টী চাষে ভূমীর উর্ব্বরতা সহজে নষ্ট হইতে পারে না। অধিকন্তু বহুপ্রকার ফল লাভ হয়। নিম্নে কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া গেল।

(১) ধান্য, গম, যব, ভুট্টা প্রভৃতি এক জাতীয় ফশল এবং মটর, মসুর, মুগ, অরহর প্রভৃতি অন্য জাতীয়, প্রথমোক্ত ফশলগুলিকে অন্ন জাতীয় ও শেষোক্তগুলিকে দাইল জাতীয় বলা যায়। দাইল জাতীয় ফশলগুলি বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজান বাষ্প সংগ্রহ করিয়া আপন দেহ পুষ্ট করিয়া থাকে। এ ক্ষমতা অন্ন জাতীয় ফশলের নাই, অথচ ইহাদেরও পুষ্টির জন্য নাইট্রোজান বিশেষ আবশ্যক, এইজন্যই ধান্য গম প্রভৃতি বপন করিবার পূর্ব্বে দাইল জাতীয় শুঁঠীধারা ফশলের চাষ করিয়া লইতে পারিলে যথেষ্ট সুফল লাভ করা যায়। দাইল জাতীয় ফশলের চাষ করিলে মৃত্তিকায় যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজান সঞ্চিত হয়, তৎপর ধান্যাদির চাষ করিলে সুফল লাভ সুনিশ্চিত। বিশে-ষতঃ ইহাতে মৃত্তিকার পূর্ব্ব সঞ্চিত নাইট্রোজানের অভাব হয় না, ভূমির খাদ্য ভূমিতেই সঞ্চিত থাকে। অথচ পর্য্যায় রোপণের ফলে সুফল লাভেও বঞ্চিত হইতে হয় না।

(২) প্রতি বৎসর একই জমীতে এক প্রকার ফশলের চাষ করিলে সেই ফশলের বিঘ্নকর নানা প্রকার কীটের উপদ্রব বড়ই বৃদ্ধি পায়। যে জাতীয় পোকা যে শস্য খাইয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে, সেই জাতীয় শস্যেই তাহারা বাস করে, এবং ঐ শস্য ভক্ষণ করিয়াই উহারা জীবন ধারণ করে। শস্য উঠিয়া গেলেও তাহাদের বংশধরগণ জমীতেই থাকিয়া যায়, শস্য একটু বড় হইলেই তাহারা আবার কার্য্যারম্ভ করে। ইহাদের হস্ত হইতে শস্য রক্ষা করা কষ্ট সাধ্য, কিন্তু অন্য কোন শস্য রোপণ করিলে কীটগুলির খাদ্যের অভাব উপস্থিত হয়, সুতরাং তাহারা স্থানান্তরে চলিয়া যায়। পাল্‌টা-পাল্‌টী চাষ করিলে, এই ভাবে কীটের হস্ত হইতে শস্য রক্ষিত হইয়া থাকে। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এক জমীতে উপর্য্যুপরি তিন বৎসর বেগুণ করিয়াছিলাম।

প্রথম বৎসরে সামান্য পোকার উপদ্রব হইল, দ্বিতীয় বৎসরে দ্বিগুণাপেক্ষাও বেশী হইল। তৃতীয় বৎসরে এতদূর উপদ্রব বৃদ্ধি পাইল যে গাছগুলি কিছুতেই বাঁচাইতে পারিলাম না। তৎপরে অন্য জমীতে চাষ করিয়া বেশ সুফল পাইতেছি।

(৩) প্রতি বৎসর এক জমীতে একই ফশলের আবাদ করিলে কেবল যে কীটেরই উপদ্রব বৃদ্ধি পায় তাহা নহে, উহাতে নানা প্রকার জঙ্গল আগাছাদি জন্মিয়াও শস্যের বিশেষ ক্ষতি সাধন করিয়া থাকে। আশু ধান্যের জমীতে ঘাসের উপদ্রব খুবই হয়, সমস্ত ঘাস নিড়াইয়া তুলিতে ব্যয় ও পরিশ্রম আবশ্যক। কৃষকেরা যথোপযুক্ত ঘাস বাছিয়া ফেলিতে পারে না বলিয়াই আশানুরূপ শস্য লাভ করিতে সক্ষম হয় না। ঘাসের

উপদ্রব বেশী হইলে মোটেই শস্য জন্মে না, পাল্‌টা-পাল্‌টা চাষ ভিন্ন ঘাসের উপদ্রব হইতে শস্য রক্ষা করিবার অন্য কোন প্রকৃষ্ট উপায় নাই। ধান্যের জমীতে শণ, পাট ইত্যাদি ঘন সন্নিবেশ বিশিষ্ট ফশল অথবা মুলা, গাজর, সালগমাদি মূলপ্রধান ফশলের চাষ করিলে আগাছা বাড়িতে পারে না। ধান্যের খাদ্য খাইয়া যাহারা জীবন ধারণ করিতে পারে, পাটের খাদ্য তাহাদের পোষণোপযোগী নহে, সুতরাং খাদ্যাভাবে অথবা যথোপযুক্ত পরিমাণে আলো, বাতাস ও উত্তাপের অভাবেই আগাছাগুলি বাড়িতে পারে না, কাজেই মরিয়া যায়। মৃত আগাছাগুলি মৃত্তিকায় পচিয়া গলিয়া যে খাদ্য সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা মৃত্তিকাতেই ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া যায়। এবং অন্য ফশলের আবাদ করিলে তাহা উহার সাররূপে প্রদান করে, অধিকন্তু ফশলও ভাল হয়।

(৪) কোন কোন শস্যের শিকড় ভূপৃষ্ঠের দিকে অধিক নিম্নদেশে প্রসারিত হয় না। এই সকল শস্য মৃত্তিকার নিম্ন স্তরের খাদ্য সংগ্রহ করিতে অসমর্থ, পক্ষান্তরে যে সকল শস্যের শিকড় মৃত্তিকার বেশী নিম্নভাগে প্রবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে পারে, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন স্তর হইতেই খাদ্য সংগ্রহ করিয়া লয়। পাল্‌টা চাষে উক্ত উভয় প্রকার শস্য রোপণ দ্বারা মৃত্তিকার ভিন্ন ভিন্ন স্তর হইতেই খাদ্য সংগৃহীত হইতে পারে বলিয়া মৃত্তিকার বহুদিন পর্য্যন্ত খাদ্যাভাব হয় না। ও শস্য ক্ষেত্রেও ক্রমশঃ অনুর্ব্বরা হইতেপারে না।

(৫) পাল্‌টা চাষের ফলে শস্যের এক প্রকার খাদ্য একেবারে নিঃশেষ হইতে পারে না, যে জাতীয় শস্যের প্রধান খাদ্য পটাশ, ক্রমাগত ২।৩ বৎসর সেই শস্যের আবাদ করিলে মৃত্তিকায় পটাশের অভাব হয়, কিন্তু পাল্‌টা চাষে যে বৎসর পটাস ব্যয়িত হইয়া গেল, তৎপর বৎসর হয়ত সোরাজানই ব্যয় হইবে, সুতরাং মৃত্তিকার পটাস বহু পরিমাণেই মৃত্তিকায় সঞ্চিত থাকিয়া গেল। কৃষকের অভিজ্ঞতানুযায়ী এই প্রকার চাষ আবাদ করিলে কখনই সুফল লাভে বঞ্চিত হইতে হয় না।

বস্ত্র-সমস্যা

সহরে চরকা

(আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখিত)

সহরে অনেক স্থানে সূতা কাটা আরম্ভ হইয়াছে। চরকার আলোচনা শুনিয়া ও দেশ সেবায় ইচ্ছুক হইয়া অনেকে চরকায় সূতা কাটিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সূতায় কি হইবে ?

চরকায় মধ্যবিত্ত লোকের যেমন সাংসারিক সাহায্য হইবে, উহা তেমনি একটা সৌখিন সামগ্রী বটে। চরকায় সূক্ষ্ম সূতা কাটা একটা উঁচু দরের আর্ট। কিন্তু কেবল সূতা কাটিয়া এই সখের তৃপ্তি হয় না, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারোপযোগী জিনিষ তৈয়ারী করিতে পারিলেই সখ মিটে। সকলের পক্ষে ঘরে তাঁত বসাইয়া এই সখ মিটাইবার সুযোগ নাই। আসামের প্রতি গৃহে ছোট ছোট তাঁত আছে। ধনী বা দরিদ্র সকল ঘরের মেয়েরাই তাঁতে কাপড় বুনেন। ইহাতে মজুরী বা দরের হিসাব আসে না। বাড়ীর বাগানে যে তরকারী হয় বা পুকুরে যে মাছ ধরা হয়, তাহাতে ব্যয় কত পড়িল, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। বাগানের তরকারী বলিয়া বা পুকুরের মাছ বলিয়া তাহার একটা বিশেষ মূল্য আছে। যাঁহাদের ফুলবাগানের সখ আছে, মূল্য হিসাবে তাঁহারা ত একটি পয়সাও তুলিতে পারেন না, কিন্তু ফুলবাগিচায় মাতিয়া আছেন, এমন লোকেরও ত অভাব নাই। আমি বলি, চরকা এবং তাঁতও আর দশটা সৌখিন জিনিষের মতই চলিতে পারে। ধাপায় কপির চাষ করিয়া অনেকে উপার্জ্জন করিতেছেন। পয়সা দিলেই কেনা যায়, তবু সুবিধা পাইলেই বাড়ীর বাগানে একটু তরকারী জন্মাইবার সখ কর্ত্তা ও গিন্নীর সমান। পয়সা দিয়া কেনা যায় বলিয়াই উহা অবজ্ঞেয় নহে। তেমনি চরকায় দরিদ্রেরা উপার্জ্জন করে বলিয়াই উহা অবজ্ঞেয় নহে। এত দিন চরকার চর্চ্চা ছিল না বলিয়াই চরকা বা তাঁতে সখ মিটাইবার কথা কেহ ভাবেন নাই। একটি বড় দরকারী জিনিষ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহার পুনরুদ্ধার হইয়াছে; এক্ষণে দরিদ্র উহাতে জীবিকা উপার্জ্জন করিবেন, মধ্যবিত্ত সাংসারিক ব্যয় কমাইতে পারিবেন, আর যাঁহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল, তাঁহারা সখ মিটাইতে পারিবেন।

ভাবিয়া দেখুন, আমাদের মেয়েরা লেস্ বুনিতে, কার্পেট বুনিতে কত সময় যাপন করেন। সেটা কিছু মন্দ কাজ নয়। কিন্তু তার সঙ্গে চরকাটাও ধরিতে পারেন; আর চরকায় কাটা সূতা বাড়ীতে বুনিয়া গামছা, আসন, ঢাকুনী ইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া কতই না আনন্দ পাইবেন। তাই বলিতেছিলাম, আসামের ভগ্নীদের তাঁত চালাইবার অভ্যাস থাকায় তাঁহারা চরকায় সূতা কাটিয়া পুরাপুরি সখ মিটাইতে পারেন। কিন্তু বাঙ্গালী মেয়েদের সে সুবিধা নাই, কেন না তাঁতটা আমাদের মেয়েদের মধ্যে কোন কালেই বড় একটা চলিত ছিল না। এখন যুবকদের কাজ তাঁতে লাগিয়া পড়া; অনে-

কের হয়ত তাঁত বুনিবার সখ আছে, কিন্তু এত অর্থ নাই যে, বাড়ীতে সমস্ত সরঞ্জাম কিনিয়া একটা তাঁত বসান। এ স্থলে পাড়ার কয়েকজন একত্র হইয়া একটী করিয়া তাঁত বসাইতে পারেন। আন্দাজ দুই শত টাকা হইলে যায় সরঞ্জাম একখানা তাঁত বসান যায়। প্রথম প্রথম একটু বেশী সময় দিতে হইবে। তাঁতের সরঞ্জাম যোগাড় করা এবং এমন লোক ঠিক করা দরকার যে, ঐ কাজে সাহায্য করিবে এবং দরকার হইলে বুনিতেও পারিবে। তাঁত বসাইবার কিছুদিন পরে কাপড় বোনা আরম্ভ হইলে হয়ত দেখা যাইবে যে, বুনিবার খরচ বেশী পড়িতেছে। কিন্তু লাগিয়া থাকিলে এটাও ঠিক যে ঘরে, বা নিজেদের সমিতিতে কাপড় বুনিলে বরাবর লোকসান যাইবে না।

যাঁহাদের শীকারের সখ আছে, তাঁহারা যখন শীকার করিতে বাহির হন, তখন যেন এক রাজসূয় যজ্ঞের যোগাড় আরম্ভ হয়। আবশ্যকীয় এটা সেটা সংগ্রহ করিয়া শীকার দলের লোকেরা কত আনন্দ পান। হয়ত দশ বারো টাকা ব্যয় করিয়া চড়াইভাতি ও শীকারের ব্যাপার মিটাইয়া যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন সঙ্গে ৪টী কি ৫টী পাখী, যার মূল্য দুই কি আড়াই টাকা। সখ মিটাইতে লোকে খরচ গ্রাহ্য করে না। কিন্তু চরকা ও তাঁতের সখ ঠিক এ ধরণের নয়। উহাতে শীকারের মত এত সাময়িক উত্তেজনা নাই। তাহা হইলেও অন্ততঃ ইহাকে তরকারী বাগানের সখের সহিত তুলনা করিতে পারা যায়। কালোপযোগী বীজ ফেলা, নিড়ান, ফসল তোলা লাগিয়াই আছে। বর্ষের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত মালীর কাজের শেষ নাই। একই জমিতে ভিন্ন ভিন্ন সার দিয়া কেমন ফল হয়, তাহা দেখার জন্য গৃহস্থ উৎকণ্ঠা ও আনন্দ অনুভব করেন। বয়ন কার্য্যেও তেমনি সূতায় ভিন্ন ভিন্ন রং ফলাইয়া, রকমারি পাড় তৈরী করিয়া বা টুইল ইত্যাদি জটিল বয়ন করিয়া সখ মিটান যায়—তাঁতিরও কাজের স্বভাব যায় না। আমার ইচ্ছা হয় দেখি যে, পাড়ার সান্ধ্য বৈঠকগুলিতে রাজা উজীর না মারিয়া কার বাড়ীতে কত সূতা হয়, কার চরকা ভাল, কে বেশী সূতা কাটেন ইত্যাদি আলোচনা হইতেছে। সেকালের ধরণের টানা হাঁটাই সুবিধা না ড্রামের উপর ঘুরাইয়া টানা করা মোটের উপর ভাল; "বোয়া" কেনাই ভাল, না প্রতিবারে "বোয়া" বাঁধাই ভাল, এইরূপ আলোচনা, বাংলা দেশের জড়তা দূর করিবে। স্পোর্টে যে বাঙ্গালীর সখ নাই, তাহাও নহে। মোহনবাগানের খেলার দিনে বাঙ্গালীর ভিড়ে মাঠে স্থান হয় না। আমি বলি, এই স্পোর্টিং ভাবটা আরো বাড়াইয়া চরকা, তাঁতে প্রয়োগ কর। খেল, সাঁতরাও লাফাও, বাইচ দেও, সঙ্গে সঙ্গে চরকা তাঁতটাও ধর—তবেই উহার মর্ম্ম বুঝিবে।

পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা করিতে বা স্কুলের পুরস্কারবিতরণ করিতে আমাকে কৃপা করিয়া কেহ কেহ ডাকেন, আমি, উহাতে আনন্দ পাই, তৃপ্ত হই। "চরকী" ও "তাঁতি"

সমিতির প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণে কবে আমাকে ডাকিবে, সেই আশা আজ করিতেছি।"

সেদিন ভবানীপুরে জাতীয় বিদ্যালয়ে সরস্বতী উপলক্ষে আমাকে ডাকিয়াছিলেন। সেখানে দেখিলাম, ছেলেরা সুন্দর সূতা কাটিতেছে। আর দেখিলাম, দুইটী যুবক তাঁত চালাইতেছেন, কি তাঁহাদের অনায়াস ও দ্রুত মাকু চালান! ফুসফাস্ শব্দ করিয়া মাকু বিদ্যুৎবেগে যাতায়াত করিতেছে, আর তিনখানি ঝাঁপ কেমন তালে তালে উঠিতেছে নামিতেছে! যুবকের দেহ-ভঙ্গই বা কি নয়নানন্দকর। বসন্তকাল আসিয়া পড়িয়াছে। বর্ষ শেষের আর বিলম্ব নাই। বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই কি সহরের পল্লীতে পল্লীতে তাঁত বসিয়া যাইবে না? বাংলার যুবকগণ, যাঁহাদিগকে প্রাণভরিয়া ভাল বাসিয়াও তৃপ্ত হই না—তাঁহারাই আমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন আমি জানি, যুবকেরা তাঁতের প্রতিষ্ঠা করিলেই ছোট ছোট তাঁত আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবে। বাংলার মেয়েরা আসামের মেয়েদের মতই তাঁত লইবেন। এই কলিকাতা সহরে এমন বিস্তর মধ্যবিত্ত পরিবার এবং অনাথ ও বিধবা আছেন, যাঁহারা চরকায় সূতা কাটিয়া বেশ দু'পয়সা রোজগার করিতে পারেন, এই বিষয়ে পরে বলিব।

বসুমতী—

বাঙ্গালার নীল

বাঙ্গলায় আবার না কি নীলের চাষ হইবে। অধ্যাপক আর্ম্মষ্ট্রং লণ্ডন "টাইমসে" এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন। এবার নীলের চাষ করিলে সফলতা না কি অনিবার্য্য। আগের বারে নীলকরেরা ছাড়াছাড়ি ভাবে নীলের চাষ করিতেন তাই সেবার তাঁহারা তেমন সুবিধা করিতে পারেন নাই। এবার সকলে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবেন; এই মিলনের গোড়াপত্তন স্বরূপ একটী Indigo Planter's Co-operative Association গঠিত হইয়াছে। এবং গত ১২ই জানুয়ারী কলিকাতায় তাঁহাদের প্রথম পরামর্শ বৈঠক হইয়া গিয়াছে। এখন না কি আর নীলের চাষের সফলতা সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তার কোন কারণ নাই। আর একটা সুবিধার কথা এই যে, জাপানে নীলের প্রয়োজন খুব বেশী। সেই কারণে কলিকাতার নীল খুব চড়া দামে বিক্রীত হইতেছে। বিশেষতঃ, জার্ম্মাণীর synthetic indigo বা কৃত্রিম নীলের সঙ্গে প্রতিযোগিতার কোন আশঙ্কা নাই। চীনেও নীলের কাটতি খুব আছে। এই সকল কারণে, প্রফেসর আর্ম্মষ্ট্রং সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভারতে যত নীলই উৎপন্ন হউক না কেন, চীন ও জাপানে তাহা কাটিয়া যাইবে।

দেশলাই

জাপান যে কেবল আমাদেরই বাঁচাইয়াছে, তাহা নয়। পৃথিবীর অনেক দেশকেই এখনও কিয়ৎপরিমাণে জাপানের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইতেছে। জাপানের দেশলাইয়ের বাণিজ্যের একটু বিবরণ শুনিলেই তাহা সহজে বুঝিতে পারিবেন। একখানি জাপানী মাসিক পত্রে দেখিলাম, জাপানী দেশলাই কেবল পূর্ব্বাঞ্চল, (East) দক্ষিণ সমুদ্র (Sout Seas), এবং ভারতে নহে,—ইয়োরোপ এবং আমেরিকাতেও চালান যাইতেছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে জাপান হইতে ৪,৫৫১০০০ গ্রোস দেশলাই জাপানের বাহিরে রপ্তানী হইয়াছে। তাহার মূল্য ৩২৯৬৯০০০ ইয়েন। ইহার মধ্যে ৪৯৫০০ গ্রোস সাংহাইএ ১৮৮০০ গ্রোস ফুকিয়েনে (? চীনে), ১১৯৭০০গ্রোস হংকংএ ৩৩৩০০গ্রোস সিঙ্গাপুরে, ৩৭৫০০গ্রোস রেঙ্গুনে,৪৬৮০০কলিকাতায়, ৭১৭০০গ্রোস গ্রোস বোম্বারে ৪৩০০০ গ্রোস যাভায় এবং ৪৮৫০০ গ্রোস ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে চালান গিয়াছে। ১৯১৫ অব্দ হইতে জাপানী দেশালাইয়ের ব্যবসায় কিরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহার একটা তালিকা দেখিলেই আপনাদের চক্ষু স্থির হইয়া যাইবে!—

সাল	পরিমাণ (গ্রোস)	মূল্য (ইয়েন)
১৯১৫	৪৪০৩৬০০০	১৪৭১৭০০০
১৯১৬	৪১৩২২০০০	২১১০৩০০০
১৯১৭	৪৪১৬০০০০	২৪৫৮৬০০০
১৯১৮	৩৯৪৬৭০০০	২৭৭৪৩০০০
১৯১৯	৪১৫৪১০০০	৩২৯৬৯০০০

যুদ্ধের পূর্ব্বে অবশ্য জাপানী দেশালায়ে কাট্‌তি এত অধিক ছিল না এই কলিকাতার বাজারেই তখন জাপানী দেশালাইয়ের কিরূপ আদর ছিল, তাহা কে না দেখিয়াছেন? জাপানীরা বিশ্বাস করেন যে, দেশালাইয়ের বাণিজ্য সম্পর্কে জাপানের যত কিছু সুবিধা আছে, চীন, ভারতবর্ষ কিম্বা দক্ষিণ সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী দেশসমূহের সে সুবিধা নাই। কারণ, এই সকল দেশে দেশলাই নির্ম্মাণের উপাদানের অসদ্ভাব। জাপানীদের এই বিশ্বাস ভাঙ্গিবার কোন উপায় নাই কি? বাস্তবিকই কি এদেশে দেশালাই নির্ম্মাণের উপাদানের একান্ত অভাব? যাক এ বিষয়ে পরে আর একবার আলোচনার প্রয়োজন ঘটিবে। আপাততঃ জাপানের কথাটাই শেষ করিয়া দিই। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর চীনে দেশালাইয়ের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার অবস্থা তেমন ভাল নয়। ইহার কারণ ভাল বুঝিতে পারিলাম না। হুমুরী চীন, বারুদের আবিষ্কারক চীন বাজী-রপ্তানীকারক চীন—সে চীনে কি দেশালাইয়ের উপাদানের অভাব? কে জানে! এদিকে জাপানের অবস্থা এমন অনুকূল যে, জাপানী দেশালাই প্রস্তুত কারকেরা বিবেচনা করেন, দেশালাইয়ের ব্যবসায়ে তাঁহারা ইয়োরোপ ও আমেরিকার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া তাহাদের হারাইয়া দিতে পারেন। বিশেষতঃ জাপানী জাহাজের ভাড়া অত্যন্ত কম; অন্য কোন দেশের জাহাজ-কোম্পানীরা এত কম ভাড়ায় মালের চালান লইতে পারেন না। ইহাই জাপানীদের প্রধান ভরসা। জাপানে এখন বেশী মূলধনের চারিটী মাত্র বড় দেশলাইয়ে কল আছে। তা' ছাড়া, ছোট ছোট কারখানা—যাহাকে কুটীর শিল্প বা Cottage Industry বলা হয়, এরূপ ধরণের—ব[illegible]থ্যক আছে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, অন্ততঃ দেশালাইয়ের ব্যবস[illegible]ব বড় কারখানা না করিয়াও চালানো যায়—অবশ্য যদি উপাদানের সত্য স[illegible]ভাব না হয়।
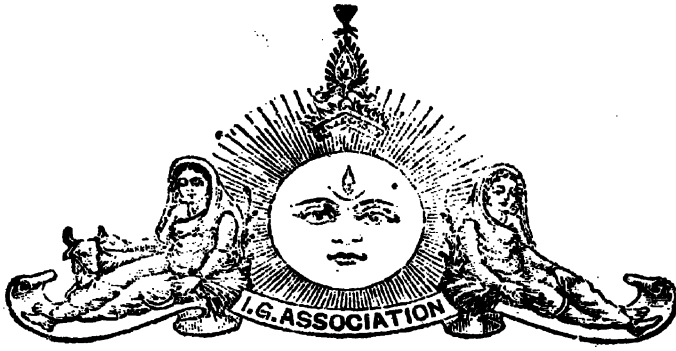
২২খণ্ড। { কৃষক—ফাল্গুন, ১৩২৮ সাল } ১১শ সংখ্যা।

নূতন নাইট্রোজেন প্রধান সার

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ রাসায়নিক পণ্ডিত সার উইলিয়ম ক্রুকস্ ব্রিটিস্ অ্যাসোসিয়েসনের অধিবেশনে যখন মন্তব্য প্রকাশ করেন যে জগতে যুক্ত সোরাজানের মাত্রা কমিয়া যাইতেছে তখন বিলাতী কৃষক সমাজে একটা হৈ চৈ পড়িয়া যায়। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সোরাজান না পাইলে অনেক অত্যাবশ্যকীয় ফসল উৎপাদিত হইবে না। ফসল উৎপাদিত না হইলে অনেক জীবজন্তু বিনষ্ট হইবে এবং এমন কি পরোক্ষভাবে বিশুদ্ধ মাংসভোজী প্রাণীরও প্রাণ ধারণ করা দুরূহ হইয়া উঠিবে।

কিন্তু বিংশতি শতাব্দীতে প্রাকৃতিক অবস্থায় কোন দ্রব্য পাওয়া যায় না বলিয়া যে কার্য্যতঃ তাহার অভাব হইবে, তাহা কখনই সম্ভবপর নয়। প্রাকৃতিক অবস্থায় যুক্ত সোরাজান কমিয়া যাইতেছে—আচ্ছা, তাহা যাইতে দেওয়া হউক। এখন অনুসন্ধানীয় বিষয় এই যে, কি উপায়ে ফলিত রসায়নের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলস্থিত অম্লজান ও সোরাজনকে সংযুক্ত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই বিষয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক মনঃসংযোগ করিলেন ও তাহার ফলে যুক্ত সোরাজান প্রস্তুত করার দুইটী প্রথা উদ্ভাবিত হইল। উভয়েরই মূল ক্রিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি ও তজ্জনিত তাপের উপর নির্ভর করে।

অনেক স্থলে জলপ্রপাতকে শৃঙ্খলীভূত করিয়া তাহা হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি আহরিত হইল এবং তাহার সাহায্যে বায়ুমণ্ডলের সোরাজানকে নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত করা হইল। আবার রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা নাইট্রিক অ্যাসিডকে চুণের সহিত সংযুক্ত করিয়া উহার দ্রাবণ হইতে নাইট্রেট অব্ লাইম বাহির করিয়া লওয়া হইল।

ইহা অভিনব প্রথা। ইহার পূর্ব্বেও নাইট্রোলিম্ অথবা ক্যালসিয়ম সায়নামাইড্ নামক একপ্রকার পদার্থ প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রথম প্রথম পরীক্ষাদির পর এই দ্রব্য সারের পক্ষে এত উপযুক্ত ও সুলভ বলিয়া প্রতীয়মান হইল যে আজকাল পৃথিবীর নানাস্থানে নাইট্রোলিম্ প্রস্তুত হইতেছে। তন্মধ্যে নরওয়ে দেশের ওড্ডা নামক স্থানে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ সায়নামাইড্ কোম্পানি নামক কোম্পানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

এতদিন পর্য্যন্ত নাইট্রেট অব্ সোডা ও সলফেট্ অব এমোনিয়াই দুইটি মহৎ প্রাপ্য নাইট্রোজেন-প্রধান-সার ছিল। কিন্তু সলফেট্ অব এমোনিয়া প্রত্যক্ষভাবে প্রস্তুত হয় না। ইহা গ্যাস, আলকাতরা প্রভৃতি কারখানার একটি গৌণ দ্রব্য। নাইট্রেট অব্ সোডাও একমাত্র দক্ষিণ আমেরিকায় অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়; সেখানেও নাইট্রেটট্ অব্ সোডার খনি আর অধিক দিন থাকিবে না বলিয়া অনেকের বিশ্বাস, সুতরাং এইরূপ অবস্থায় যে নূতন দুইটি নাইট্রোজেন-প্রধান-সার উৎপাদিত হইয়াছে, তাহা অবশ্য সুখের বিষয়। কিন্তু এই দুইটি নূতন সার, পুরাতন দুইটি সারের সমকক্ষ কি না, অথবা উৎকৃষ্ট কিম্বা অপকৃষ্ট তৎসমুদয় বিষয় জানিবার জন্য অনেকের আগ্রহ হইতে পারে। সম্প্রতি বিলাতে এই সম্বন্ধে কতকগুলি পরীক্ষা হইয়াছিল। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে উক্ত পরীক্ষা সমূহের ফলাফল আলোচনা করিয়া কয়েকটি সারের আপেক্ষিক উপকারিতা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

বিগত তিন বৎসর ধরিয়া পরীক্ষাগুলি নির্ব্বাহিত হয়। পরীক্ষার জন্য শালগম উপযুক্ত ফসল বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত তালিকায় বিভিন্ন বৎসর বিভিন্ন সার দ্বারা উৎপাদিত ফসলের ওজন প্রদত্ত হইল।

	১৯০৮	১৯০৯	১৯১০
	পাঃ	পাঃ	পাঃ
সার হীন	১২৯	৩৯¾	১৫৯½
ক্যালসিয়ম সায়নামাইড্	১৭৩	৪৬	১৮৭
ঐ (হাইড্রেটেড্)	—	—	—
এমোনিয়াম সলফেট্	—	৩৯½	১৬৯½
নাইট্রেট অব্ লাইম	—	৫৫½	—
নাইট্রেট অব্ সোডা	১৫৩	৫৬	২১৪½

যদিও তালিকায় প্রদর্শিত হয় নাই তথাপি অপরাপর পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে হাইড্রেটেড্ ক্যালসিয়ম সায়নামাইড্ ভিন্ন অপর, সকল সারের উৎপাদক শক্তি অনেক কম। তবে প্রত্যেক বৎসর জমি অবশ্য ঠিক ছিল না, এবং জল হাওয়াও সমান থাকে নাই, তজ্জন্যই ফলের কিছু অধিক তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যদি তিন বৎসরের গড় পড়তা করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে জলহাওয়ার জন্য তারতম্য

অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। এতদ্ সম্বন্ধে অপরাপর পরীক্ষা দ্বারাও বুঝিতে পারা যায় যে, ক্যালসিয়ম সায়নামাইড সত্বরে ফলদায়ক হয়। পক্ষান্তরে ইহার কার্য্য অধিক দিন স্থায়ী হয় না। হাইড্রেটেড্ ক্যাল্সিয়ম সায়নামাইডের আপাততঃ কার্য্য কম হইলেও উহা অপেক্ষাকৃত অধিক দিবস স্থায়ী। ক্যাল্সিয়ম সায়নামাইড নাইট্রেট অব লাইম অথবা নাইট্রেট অব সোডা অপেক্ষা মৃদু সার। যদি কোন ফসলে সঙ্গে সঙ্গে নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে উক্ত দুই সারই প্রকৃষ্ট। তাহার নিম্নে এমোনিয়াম সল্‌ফেট্ এবং ক্যালসিয়ম্ সায়নামাইড্। এই দুইটি সারও নাইট্রোজেনের পরিপরিমাণ হিসাবে একরূপ। হাইড্রেটেড ক্যালসিয়ম, সায়নামাইড সর্ব্বাপেক্ষা মৃদু সার।

নাইট্রেট অব লাইম যেরূপ অবস্থায় বাজারে পাওয়া যায়, তাহা দেখিতে অনেকটা ফিকে ধূসরবর্ণ। ইহার কোন প্রকার গন্ধ নাই এবং প্রথমতঃ অত্যন্ত চুর্ণের মত থাকে। এই মিশ্র পদার্থে শতকরা ৭৫—৭৭ ভাগ ক্যালসিয়াম নাইট্রেট থাকে, অবশিষ্টাংশ জল। পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ অত্যন্ত জলশোষক। নাইট্রেট অব সোডা ও ক্যালসিয়ম সায়নামাইডও তদ্রূপ। ক্যালসিয়ম সায়নামাইড, নাইট্রেট অব সোডা এবং নাইট্রেট অব লাইমের প্রত্যেকের ১০০ গ্রেণ ৫ দিন উন্মুক্ত অবস্থায় রাখিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহারা বায়ুমণ্ডলস্থিত জলীয় বাষ্প শোষণ করিয়া যথাক্রমে ১৫৮'৭, ২২৬'৯ ২৪৭'২ গ্রেণ হইয়াছে। ইহা একটা অনুধাবনার বিষয়, কারণ জল টানিলেই হয় সার জমাট হইয়া যায়, না হয় তরল হইয়া যায়, সুতরাং এই সমুদয় সার পিপে খোলার অনতিকাল পরেই ব্যবহার করা উচিত। নাইট্রেট অব লাইমে নাইট্রোজেনের মাত্রা শতকরা ১৩ ভাগ; অর্থাৎ নাইট্রেট অব সোডার সহিত তুলনায় ২'৭ ভাগ কম। মূল্যের তুলনায়ও সেই জন্য নাইট্রেট অব লাইমের কম মূল্য হওয়া উচিত। যদি সুপারফস্‌ফেটের সহিত নাইট্রেট অব লাইম মিশ্রিত করা হয়, তাহা হইলে উক্তমিশ্রিত সার অনতিবিলম্বে প্রয়োগ করা উচিত। নতুবা অনিষ্টকর রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হইতে পারে।

ক্যালসিয়াম সায়নামাইড দেখিতে সূক্ষ্ম, শুষ্ক কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণের ন্যায়। ইহাতে শতকরা ৫৭ ভাগ বিশুদ্ধ ক্যালসিয়ম সায়নামাইড, ১৪ ভাগ অঙ্গার এবং ২১ ভাগ কষ্টিক্ চুণ আছে। এতদ্ভিন্ন সামান্য সামান্য মাত্রায় গন্ধক, ফসফরাস, সিলিকন ইত্যাদিও আছে। মৃত্তিকায় জলের সহিত সংযুক্ত হইলে ইহা ক্যালসিয়ম, কার্ব্বনেট ও আমোনিয়ায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। মৃত্তিকাস্থিত জীবাণু নাইট্রোজেনকে বৃক্ষের আহারোপযোগী অবস্থায় আনিতে অনেক পরিমাণে সাহায্য করিয়া থাকে। ইহা বীজ বুনিবার অন্ততঃ তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত। নাইট্রোলিম্ এত সূক্ষ্ম যে ইহা সমানভাবে প্রয়োগ করা সুকঠিন। এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র অঙ্গারকণার ন্যায় বায়ুমণ্ডলে ঝুলিতে থাকে। এই সমুদয় অসুবিধা দূর করিবার জন্যই হাইড্রেটেড্ ক্যালসিয়ম সায়নামাইডের সৃষ্টি,

এ সমুদয় অসুবিধা হাইড্রেটেড অবস্থায় থাকে না, কিন্তু হাইড্রেটেডের ক্রিয়া অনেক বিলম্বে প্রকাশ পায়। সায়নামাইডের আর একটি সুবিধা আছে। অধিক দিবস সল্‌ফেট্‌ অব্‌ আমোনিয়া প্রয়োগ করিলে মৃত্তিকা অম্ল হইয়া উহার উর্ব্বরতা কমিয়া যায়; কিন্তু সাইনামাইডে কষ্টিক চুণ থাকার জন্য তাহা হইতে পারে না। নাইট্রেট অব সোডার ক্রমাগত ব্যবহারেও জমি খারাপ হইয়া যায়। তাহার প্রতিকার সুপার ফস্‌ফেট অব লাইম কিম্বা উক্তরূপ কোন সার প্রয়োগ।

আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত রাসায়নিক সারের প্রচলন হয় নাই এবং বিশুদ্ধভাবে রাসায়নিক সার প্রয়োগেরও আমরা পক্ষপাতী নহি। কারণ জীবজ অথবা উদ্ভিজ্জ্য সারের জমির প্রাকৃতিক গঠনের উন্নতি করার যেরূপ শক্তি আছে রাসায়নিক সারের সেরূপ কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু মিশ্রভাবে উদ্ভিজ্জ্য ও জীবজ সারের সহিত রাসায়নিক সার ব্যবহারে লাভ আছে। বস্তুতঃ সমস্ত সারের ব্যবহার সারের মূল্যের উপর নির্ভর করে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে দুইটি সারের উল্লেখ করিলাম, সে দুইটির দাম এখনও পর্য্যন্ত এত কমে নাই যে, আমাদের দেশে চলিতে পারে। কিন্তু সকল কৃত্রিম প্রণালীতে প্রস্তুত দ্রব্যের মূল্য কমা অবশ্যম্ভাবী এবং তখন ইহাদের প্রচলনও সম্ভব।

পত্রাদি

আলু সম্বন্ধে প্রশ্নাবলি—

(এই সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন অনেকের নিকট হইতে পাইয়া থাকি তন্মধ্যে কতকগুলির উত্তর নিম্নে দেওয়া গেল।)

১। আস্ত ও কাচা বীজ আলুর মধ্যে কোন্‌টা বসাইলে কিরূপ ফল হয়।

২। আলু বাড়ে কোন সময় কি প্রকারে ?

৩। কখন আলু গাছে বেশী আলু ধরে !

৪। কখন আলু ধরিতে আরম্ভ হয় ?

৫। মাটীতে কখন কি প্রকার রস থাকিলে আলুর ফলন বাড়ে !

৬। আলুর ফলনের জন্য কি প্রকার মাটির আবশ্যক ?

উত্তর ১। আস্ত আলু (whole tuber) ও কাটা আলু (cut pieces) বসাইয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করা হইয়াছে, পাশাপাশি মাদায় গোটা ও কাটা আলু বসান হইয়াছিল তাহাতে দেখা যায় যে আস্ত আলুর মাদাতে বেশী আলু ধরিয়াছে এবং ঐ মাদার আলু বড় হইয়াছে। যে মাদাতে কাটা আলু বসান হইয়াছিল তাহার ফলন অপেক্ষাকৃত কম এবং আলুও ছোট হইয়াছে।

ইহাও দেখা যায় যে বড় বীজ আলু বসাইতে পারিলে ছোট আলু বসান অপেক্ষা ফলন কিছু বাড়ে এবং কতকগুলি বিশেষ বড় আলু পাইবার আশা থাকে। কিন্তু

বাছাই বড় আলু বসাইতে হইলে বীজের খরচ অতিশয় অধিক হয় বলিয়া তাহা সকল সময় সম্ভব হয় না।

২। আলুর ক্ষেতে যখন গাছে ফুল ধরিয়া ফুল পূর্ণায়তন হয় তখনই আলু গুলির সম্পূর্ণ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু ইহাও সব সময় ঠিক ঠিক হয় না। এখন দেখা গিয়াছে যে মাদা হইতে বড় আলু তুলিয়া লইবার পরও মাদার ছোট আলু গুলি কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশে হুগলী জেলায় আলুর চাষ সমধিক পরিমাণে হয়। তথায় চাষীগণ মাদা হইতে প্রথম এক ক্ষেপ আলু তুলিয়া লইয়া পুনরায় মাদায় সার মাটি দিয়া জলের সেচ দেয়। এমতা—বস্থায় আবার গাছে আলু ধরে এবং আলু গুলিও বাড়িয়া থাকে। বাজারে অগ্রহায়ণের প্রথম যে আলু দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশ পাহাড়ী আলু। পাহাড়ে আগষ্ট মাসের শেষেই আলু বসান হয় সুতরাং সে ফসল কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে তৈয়ারি হইবার কথা। বৈদ্যবাটীর হাট হইতেও উপরুক্ত প্রকারে আলু তোলা হইয়াও বাজারে আসে। পাহাড়ে কার্ত্তিক মাঝে তুষার পাতে আলুর গাছ নষ্ট হইলেও মাটির ভিতর আলুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শেষকথা এই যে আলু বসাইবার পর ৮০ দিন পর্য্যন্ত আলুর বৃদ্ধি হয়। ২৪ পরগণা হুগলী প্রভৃতি জেলার সমতল ভূভাগ অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত আলু বসান হইয়া থাকে। তাহার আগে ভাল সুপুষ্ট পাহাড়ে বীজ আলু পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। দার্জ্জিলিঙ ও শিলং আলুর বীজ কিছু আগে কার্ত্তিক মাসে পাওয়া যায় কিন্তু নৈনিতাল বীজ ঐ সময়ে আগে পাওয়া যায় না।

৩। গাছ গুলি সম্পূর্ণ বাড়িলেই তাহাতে বেশী আলু ধরিয়া থাকে। যতদিন না গাছগুলি পূর্ণায়তন হয় ততদিন আলুর সংখ্যায় সম্পূর্ণ বৃদ্ধি হয় না। গাছের আয়তনের বৃদ্ধির জন্য এই কারণে বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক আর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে আধখানা আলু বসান অপেক্ষা গোটা আলু বসান ভাল। টুকরা কাটিয়া বসাইতে হইলে—টুকরা যত বড় হয় ততই ভাল। আস্ত বা বড় বসাইলে গাছ শীঘ্র ও সতেজে বাড়িয়া উঠে। পরীক্ষায় ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে একটা কাটা টুকরার ও একটা আস্ত আলুর ওজন যদি সমানও হয় তাহা হইলেও আস্ত আলু হইত অধিক পরিমাণে আলু জন্মিয়া থাকে।

৪। গাছ জন্মিয়া যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলেই আলু ধরিতে আরম্ভ হয়।

৫। আলুর জমির রস রক্ষাই এক বড় হিসাবে কথা। অনর্থক অধিক সেচের জলে আলুর ফলনের ব্যাঘাত হয়। আলু ধরিবার আগে সেচ দিয়া মাটি সরস করিয়া দিলে আলুর ফলনের সহায়তা হয়। ইহাতে আলুর সংখ্যা ও ওজন বাড়িয়া থাকে। আলুর মাটি সরস না থাকিলে আলু বাড়ে না, এই জন্য আবশ্যক মত মাঝে মঝে সেচ দেওয়ার আবশ্যক। কিন্তু এই সময় আলুর সংখ্যা বাড়িতে দেখা যায় না। কিন্তু

ফসলের মধ্যাবস্থায় কিছু আলু তুলিয়া লইয়া মাদার স্যার মাটি দিয়া সেচ দিলে তখনও আলু ধরিতে এবং আলুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে দেখা গিয়াছে। তবে ইহা সুনিশ্চিত আলু ধরিবার আগে যে সেচ দেওয়া হয় তাহাতেই গাছ বৃদ্ধি এবং আলু ধরিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা হয়।

৮। ভারি কর্দ্দমাক্ত মাটিতে আলুর ফলন ভাল হয় না। মাটি দোঁয়াল ও সার গোবর প্রয়োগ দ্বারা হাল্‌কা ও ফাঁপা হইবে। ততই আলুর ফলনের বৃদ্ধি হইবে। জল হাওয়া গুণে আলুর ফলনের কিছু তারতম্য হয় বটে কিন্তু তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। গোবর আলু বসাইবার অনেক আগে জমিতে প্রদান করা উচিত কিন্তু খৈল আলুর বসাইবার সময় প্রয়োগ করিতে হয়। উভয় সারেই জমি আলগা করে জমিতে রস রক্ষার সুবিধা হয়। ইহাতে গাছ বাড়ে এবং আলু বেশী ধরে। মাটির ফাঁপ রাখিবার জন্য হুগলী জেলার অনেক চাষী অধিক পরিমাণে খৈল ব্যবহার করিয়া থাকে। এমন কি বিঘার ২০ মণ ১৫ মণ খৈল দেয়। এই সার আলু ফসলে আংশিক ব্যয় হয় মাত্র বাকী সারের উপকার অন্য ফসলে পাওয়া যায় যেমন আলুর জমিতে কুমড়া দিলে। আলুর সংখ্যা ও ওজন বাড়াইবার জমিতে রস ও জমির আল্‌গা ভাব থাকা আবশ্যক।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

ফাল্গুন মাস

সব্জী বাগান—তরমুজ, খরমুজ, সশা, ঝিঙ্গা প্রভৃতি যে সকল সব্জী চাষ মাঘ মাসে প্রায় আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এই মাসে প্রায় শেষ করিতে হইবে। সব্জীক্ষেত্রে জল সেচনের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। চাঁপানটে বীজ এই সময় বপন করিলে ও জল দিতে পারিলে অতি সত্বর নটে শাক খাওয়া যায়।

কৃষি-ক্ষেত্র—ছোলা, মটর যব, সরিষা ধনে প্রভৃতি সমুদয় এতদিন ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া গোলাজাত করা হইয়াছে। এই সময় ক্ষেত্র চষিয়া ভবিষ্যতে পাট ধান, প্রভৃতি শস্যের জন্য তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে। ইক্ষু এই সময় বসান হইয়া থাকে।

ফলের বাগানে—ফলের বাগানে আম, লিচু, লকেট, পিচ প্রভৃতি ফলবৃক্ষে জল দিবার ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কার্য্য নাই।

ফুলের বাগান—এখন বেল, জুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি ফুলের বাগানে গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুলগাছগুলির তদ্বির না করিলে জল্‌দি ফুল না ফুটিলে পয়সা হইবে না। ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।

টব বা গামলার গাছ—এই টবে রক্ষিত পাতাবাহার, পাম প্রভৃতি ও মূলজ ফুল ও বাহারি গাছ সকলের টব বদলাইয়া দিতে হয়।

পান চাষ—পান চাষ করিবার ইচ্ছা করিলে এই সময় পানের ডগা রোপণ করিতে হয়।

বাঁশের পাইট—বাঁশ ঝাড়ের তলায় পাতা সঞ্চিত হইয়াছে, সেই পাতায় এই সময় আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সেই ছাই বাঁশের গোড়ায় সারের কার্য্য করে এবং নিম্ন-বঙ্গে যেখানে ম্যালেরিয়া প্রকোপ অধিক, সেইখানে এই প্রকার বহুদূরব্যাপী অগ্নি জ্বালিলে গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়।

ঝাড়ের গোড়া হইতে পুরাতন গোড়া ও শিকড় উঠাইয়া না ফেলিলে ঝাড় খারাপ হয়। আগুণ দ্বারা পোড়াইলে এই কার্য্যের সহায়তা হয়। পুকুরের পাঁক মাটিতে বাঁশের খুব বৃদ্ধি হয়।

২২খণ্ড। { কৃষক—চৈত্র, ১৩২৮ সাল } ১২শ সংখ্যা।

অৰ্দ্ধ শতাব্দি পূৰ্ব্বে পল্লীগ্রামের কৃষি শিল্পাদি

(পূৰ্ব্বানুবৃত্তি)

আমি একেই বৃদ্ধ,—তাহার উপর, আবার আমার দুইটীমাত্র শিক্ষিত উপায়ক্ষম পুত্রই আমাকে শোকানলে দগ্ধীভূত করিয়া অকালে পরলোকগমন করায়, আমি একবারেই অকৰ্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি। তজ্জন্য চাষ ত্যাগ করিয়া চাষের জমিবিলি বন্দোবস্ত করিয়াছি। কিন্তু দুগ্ধের জন্য আমার ৪।৫টী গাভী আছে। তজ্জন্য আমার প্রায়ই দুগ্ধের অভাব হয় না। চারিসের হইতে আট সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ প্রায়ই হইয়া থাকে। তজ্জন্য আমার বাড়ীতে দধি দুগ্ধ, ঘৃতের অভাব হয় না। দুইটী গাভী দুগ্ধ দিতে ছিল, গর্ভবতী হওয়ায় দুইটী গাভীই দুগ্ধ দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। একারণ দুগ্ধের নিতান্ত অভাব হইয়া উঠিয়াছে। উচ্চ মূল্য দিয়াও আবশ্যকমত দুগ্ধ ক্রয় করিতে পাইতেছি না। এক্ষণে পল্লীগ্রামে দুগ্ধ নিতান্ত দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। আগামী কাৰ্ত্তিক মাস হইতেই আমার দুগ্ধের অভাব দূরীভূত হইবে। পল্লীগ্রামে ভাদ্র হইতে পৌষমাস পর্য্যন্ত দুগ্ধের নিতান্ত অভাব হইয়া থাকে, তাহা আমরা পূৰ্ব্ব প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি।

পূৰ্ব্বে অনেক লোকই বেশ গোচিকিৎসক ছিল। কোন গাভী স্বাভাবিক উপায়ে প্রসব করিতে না পারিলে, গাভীর উদর মধ্যে হস্ত প্রবিষ্টকরিয়া প্রসব করাইতে পারিত; মৃতবৎস উদরের মধ্য হইতে বাহির করিতে পারিত। অনেক প্রথম প্রসূত গাভী দুগ্ধ দোহন কালীন লাফালাফি করিয়া দুগ্ধ দেয় না, কৌশল ক্রমে দোহন করিয়া গাভীটিকে শান্তভাবে দুগ্ধ প্রদানের উপযুক্ত করিয়া দিতে পারিত, এখন যদিও ২।১ জন ঐরূপ শিক্ষিত আছে বটে কিন্তু পূৰ্ব্বে যেরূপ ঐরূপ শিক্ষিত অনেক গোপ দৃষ্ট হইত, এখন আর তত নাই।

পূৰ্ব্বে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই বহু বিস্তৃত গোচরভূমি থাকায় গরু ছাগল মেষ প্রভৃতি

পশু প্রতিপালন করা বিশেষ লাভ জনক ছিল। পশুসকল সমস্ত দিন মাঠে চরিয়া আপনাদের পুষ্টিসাধন করিত, অন্য খাদ্য দিবার প্রায়ই প্রয়োজন হইত না। তখন অনেকেই ছাগল প্রতিপালন করিত। অনেক নীচ জাতীয়া অবিরা স্ত্রীলোকে ছাগল প্রতিপালন করিয়া আপনার গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিত। এখন ছাগল প্রতিপালন করিতে খুব কম লোককেই দেখিতে পাওয়া যায়। এখন ছাগলের মূল্য যেরূপ অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে গোচর ভূমির অভাব সত্বেও ছাগল চাষে এখনও প্রচুর লাভ হইতে পারে, অন্য কোন ব্যবসায়ে সেরূপলাভ হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। ছাগল চাষে এখনও যে প্রচুরলাভ হইতে পারে, তাহা আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে প্রদর্শন করিব বলিয়া ইচ্ছা রহিল।

পূর্ব্বে প্রত্যেক গোয়ালার যেরূপ বহু সংখ্যক গাভী থাকিত, এখন আর তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। গোচর ভূমির অভাব, গরুর খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ও গরুর মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়ায়, অনেক গোপই আর গাভী প্রতিপালন করেনা। পূর্ব্বে যেরূপ গাভীগুলি বৃহদাকার, হৃষ্টপুষ্ট ও প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধপ্রদানে সক্ষম ছিল, এখনকার গাভীগুলির আর তাহার কিছুই নাই। পূর্ব্বে অধিকাংশ গাভীতেই একবারে ৩।৪ সের দুগ্ধ প্রদান করিত, এখন তাহার চতুর্থাংশের একভাগও প্রদান করে কিনা সন্দেহ। সেই অন্যালনার দুর্ব্বল গাভী ও বলদ দ্বারা যে সকল বৎস জন্মে, তাহারাও নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া থাকে,—তাহার উপর আবার গাভীগুলির দুগ্ধ দুই বেলা নিঃশেষে দোহন করিয়া লওয়া হয়, তজ্জন্য আহারাভাবে বৎসগুলিও নিতান্ত দুর্ব্বল, কৃশ হইয়া পড়ে। এবং অধিকাংশ বৎসই অকালে প্রাণত্যাগ করে। পূর্ব্বে গাভীতে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ প্রদান করিত, এবং দুগ্ধের মূল্য ও খুব শস্তা ছিল তজ্জন্য গোয়ালা গাভীর দুগ্ধ নিঃশেষে দোহন করিত না, বৎসগুলিও গাভীর দোহনবিশিষ্ট দুগ্ধ পান করিয়া হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হইত। এক্ষণে কেবল গোয়ালা কেন, যাহাদেরই গাভী আছে, তাহারাই গাভীর দুগ্ধ দুই বেলা নিঃশেষে দোহন করিয়া থাকে। ঘাস খাইতে সক্ষম হইবার পূর্ব্বে বৎসগুলি মাতৃদুগ্ধ পান করিতে না পাওয়ায়, গরুর এত অবনতিও অকালমৃত্যুর সংখ্যা এত অধিক।

পূর্ব্বে অনেক স্থানের অনেক গোয়ালা মুসলমান দ্বারা স্বীয় স্বীয় পুং বৎসগুলির মুষ্কচ্ছেদন করাইয়া লইত, বৃদ্ধ, অকর্ম্মণ্য গরুগুলিকে অধিক মূল্যে মুসলমানদিগকে বিক্রয় করিত। এবং উত্তপ্ত দাগনী (লৌহ শলাকা) দ্বারা বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধের বৃষ দাগিত। পূর্ব্বে এপ্রদেশের গোয়ালারা ভদ্রলোকের বিবাহে ফুলশয্যায় ও অধিবাসের ক্ষীর দধির ভার স্কন্ধে বহন করিয়া দূরবর্ত্তী কুটুম্ব বাড়ীতে গমন করিত। এখন গোয়ালারা ঐ সকল কার্য্য নীচ জনোচিত কার্য্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে।

এখন চর্ম্মের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায়, বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য গরুর মূল্য ও খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ কারণ লোকে খাড়িয়া অনেকেই হত্যাকারী বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য গরু কেহ বা প্রকাশ্যে কেহ বা

গোপনে মুসলমানদিগকে বিক্রি করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত অনেক বলবান ও সন্তান প্রসবে সমর্থ গাভী ও হত্যা হইয়া থাকে। এইরূপে রোগে ও হত্যাজন্য দেশের লক্ষ লক্ষ গরু প্রতিবৎসর অকালে প্রাণত্যাগ করিতেছে। গরু প্রতিদিন নিয়মিতরূপে পুষ্টিকর খাদ্য, নির্ম্মল পানীয় জল পাইলে এবং পরিষ্কৃত ও বায়ু প্রবাহিত গৃহে বাস করিতে পাইলে প্রায়ই রুগ্ন ও অকাল মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। গরুর উন্নতি না হইলে দেশের উন্নতি সুদূর পরাহত। গরুর উন্নতি করিতে হইলে, এখন কেবল খাদ্য পানীয় ও বাস-গৃহের কেবল সুব্যবস্থা করিলে চলিবে না। দেশের বলদ গাভী যেরূপ শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে বলবান গোবৎস উৎপাদনের জন্য বলবান বলদের বিশেষ আবশ্যক। দুগ্ধ পুষ্টিকর খাদ্য, দুগ্ধের অভাবে দেশের লোক এত দুর্ব্বল রুগ্ন ও অল্পায়ু হইতেছে।

কৈবর্ত্ত,—এই জাতি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। একশ্রেণী কৃষিজীবী, আর একশ্রেণী মৎস্যজীবী। কৃষিজীবী কৈবর্ত্তদিগকে "চাষী কৈবর্ত্ত" বলে। মৎস্যজীবী কৈবর্ত্তদিগকে লোকে সচরাচর "জেলে" বলিয়া থাকে। এই শ্রেণীর মধ্যে আহার ব্যবহার প্রভৃতি কোন বিষয়েরই চলন নাই। উহারা পরস্পর স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত। মৎস্যজীবী কৈবর্ত্ত দিগের মধ্যে ও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আছে। তাহাদের মধ্যেও বিবাহ ও আহারাদির বিষয়ে প্রচলন নাই। আমাদের এপ্রদেশের মৎসজীবীরা আপনাদিগকে কৈবর্ত্ত বলিয়া পরিচয় দেয়। পশ্চিমাঞ্চলের মৎস্যজীবীদিগকে "কেয়ট" বলে। মৎস্য উৎপাদন, মৎস্য ধৃত করা ও মৎস্য বিক্রয়ই ইহাদের জাতীয় ব্যবসায়। পূর্ব্বে দেশে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য জন্মিত। তজ্জন্য মৎস্য খুব সুলভ ছিল। এমন কি পূর্ব্বে সময়ে সময়ে এক পয়সা, দুই পয়সায় একসের মৎস্য পাওয়া যাইত। এখন এপ্রদেশে মৎস্য এরূপ দুর্লভ হইয়াছে যে, সময়ে সময়ে উচ্চমূল্য দিয়াও মৎস্য ক্রয় করিতে পারা যায় না। পূর্ব্বে পুষ্করিণী আদিতে যেরূপ মৎস্য জন্মিত এখন আর সেরূপ দেখা যায় না। নদী, খাল পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় সকল এখন মজিয়া যাওয়ায় ও এখন লোকের পূর্ব্বেরমত মৎস্য উৎপাদন করিবার বিষয় যত্ন না থাকায় পূর্ব্বের ন্যায় মৎস্য জন্মিতেছে না। কাতলা, রুই, মির্গেল, কালবোস, বাটা প্রভৃতি মৎস্যের পোনা পুষ্করিণী আদি জলাশয়ে ফেলা হইয়া থাকে। ঐ সকল মৎস্যের পোনা নদী ব্যতীত অন্য জলাশয়ে জন্মে না। আমাদের এপ্রদেশের সকলেই দামোদর নদের পোনা পুষ্করিণী আদিতে ফেলিয়া থাকে। পূর্ব্বে দামোদর নদে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে পোনা জন্মিত ও সুলভ মূল্যে বিক্রিত হইত; এখন আর সেরূপ হয় না। দামোদর নদ এখন পূর্ব্বাপেক্ষা মজিয়া যাওয়ায় এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় পোনা হয় না। নদীতে জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসের প্রথম বন্যা হইলে. কাতলা, রুই মির্গেল প্রভৃতি মৎস্য ডিম ছাড়িয়া থাকে। সেই ডিম ছাড়িবার সময় উহা ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় জল মধ্যে ইতস্তত

সঞ্চালন করিয়া থাকে। তাহাই ধৃত করিয়া আনিয়া পুকুরে ফেলা হয়। উহার সহিত বুয়াল, চেতল প্রভৃতি অনেক মৎস্তভোজী মৎস্যের ডিমও মিশ্রিত থাকে। বুয়াল, চেতল প্রভৃতি মৎস্যের পোনা একটু বড় হইলেই রুই, মৃগেল, কাতলা প্রভৃতি মৎস্যগুলিকেই ক্ষুদ্র অবস্থায় ভক্ষণ করিয়া ফেলে। একারণ যে সকল পুকুর বড় ও গভীর সেরূপ পুকুরে ঐরূপ ডিম পোনা ফেলা উচিত নহে। অনতিবৃহৎ, অল্পগভীর পুষ্করিণীতেই ঐরূপ পোনা ফেলিয়া থাকে। ঐ সকল মৎস্যের ডিম বা পোনা ফুটাইবার ছোট ছোট অল্প গভীর জলাশয়কে "হাপর" বলে। হাপরের জল গ্রীষ্মকালে প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়। বর্ষাকালে নূতন জলে হাপরের কিয়দংশ পূর্ণ হইলে ডিম পোনা ফেলা হয়। নদীতে আষাঢ় শ্রাবণ মাসেই পোনা হইয়া থাকে। কৈবর্ত্ত ব্যতীত অন্যান্য অনেক জাতিতেই হাপরে ডিম পোনা ফেলিয়া থাকে পোনা একটু বড় অর্থাৎ ৩।৪ অঙ্গুলি পরিমাণে বড় হইলে তাহা ধরিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। তখন মাছের ছানাগুলিকে চিনিয়া লইতে পারা যায়। তাহার সহিত বুয়াল, চিতল প্রভৃতি মৎস্যভোজী মৎস্য থাকিলে চিনিয়া বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে। দামোদর নদের পোনার মূল্য অধিক এবং দামোদরের পোনায় অধিক মৎস্য জন্মে না। একারণ এপ্রদেশের অনেকেই সময়ে সময়ে গঙ্গার পোনা আনিয়া হাপরে ফেলে। গঙ্গার ডিম পোনায় দামোদরের পোনা অপেক্ষা অধিক মৎস্য জন্মে। কিন্তু দামোদর নদের পোনায় অল্পদিন মধ্যেই মৎস্য যেরূপ বড় হয়, এপ্রদেশে গঙ্গার পোনায় মৎস্য সেরূপ শীঘ্র বড় হইতে দেখা যায় না পূর্ব্বে এপ্রদেশে হাপরে বা পুকুরে গঙ্গার পোনা ফেলা হইত না।

এপ্রদেশের পুকুরে কাতলা মাছ যেরূপ শীঘ্র বড় হইয়া উঠে, রুই মৃগেল মাছ শীঘ্র সেরূপ বড় হয় না। একারণ কাতলা মাছের মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশি। হাপর হইতে ছোট মৎস্য ধরিয়া কাতলা মাছ বাছিয়া বিক্রয় করা হয়। ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক মাস মধ্যে হাপরের সমস্ত মৎস্য ধরিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। বৃহৎ হাঁড়িতে ঐ সকল ছোট মৎস্য রাখিয়া ভার করিয়া গ্রামে গ্রামে ফেরি করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। কাতলামাছের ভার স্বতন্ত্র থাকে। রুই মৃগেল প্রভৃতি মৎস্যের পোনার পৃথক ভার থাকে। সকল বৎসর পোনা মৎস্যের দরের স্থিরতা থাকেনা। এবৎসর ছোট ছোট কাতলা মাছের পোনা শতকরা ৫ টাকা হইতে ৮ টাকা মূল্যে এবং রুই মৃগেল প্রভৃতি মৎস্যের মিশ্রিত পোনা শতকরা ১টাকা হইতে ১॥০টাকা মূল্যে পাওয়া যাইতেছে। রুই মৃগেল প্রভৃতি মৎস্যের মিশ্রিত পোনাকে "হাব্‌জী" বলে। হাব্‌জী পোনাতে রুইমাছের ভাগ খুব কম থাকে। কাতলামাছের নীচে রুইমাছ অন্যান্য মাছ অপেক্ষা বেশি বাড়িয়া থাকে। যে হাব্‌জী পোনাতে রুইমাছের ভাগ বেশী থাকে তাহার মূল্য ও বেশি হয়। যে সকল পুষ্করিণী বড় ও গভীর, তাহাতেই এইরূপ বাছাই কাতলা, রুই মৃগেল প্রভৃতি মাছ ফেলা হইয়া থাকে। ঐরূপ

পুষ্করিণীতে ডিম পোনা ফেলিলে মৎস্যভোজী বুয়াল, চেতল প্রভৃতি মৎস্য জন্মিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা তজ্জন্য বিশেষ সাবধানতার সহিত বাছাই করিয়া ঐরূপ পুষ্করিণীতে মৎস্যের পোনা ফেলা নিতান্ত কর্ত্তব্য। নচেৎ বুয়াল প্রভৃতি মৎস্য জন্মিয়া পুকুরের মৎস্যের বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। বুয়াল, চেতল প্রভৃতি মৎস্য ভোজী মৎস্য অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় হয় যে,অন্য কোন মৎস্যই তত বড় হয় না। রুই কাতলা মাছকে পুকুর হইতে যেরূপ সহজে ধরিতে পারা যায়, বুয়াল চেতল প্রভৃতি মৎস্যকে সেরূপ সহজে ধরিতে পারা যায় না। বুয়াল চিতল মাছ পুকুরে জন্মিলে জল সেচন ব্যতীত, তাহা ধরিতে পারা যায় না।

এ প্রদেশের অনেক মধ্যবিত্ত লোকেরই পুষ্করিণী আছে, তাঁহারা ঐরূপ বাছাই করা পোনাই পুকুরে ফেলিয়া থাকেন। পোনা ফেলিলেই যে সকল পুকুরে সকল বৎসর সমান মৎস্য জন্মিবে, তাহা নহে। যেমন জমির উর্ব্বরতা অনুপাতে ফসলের তারতম্য হয়, পুকুরে মৎস্য জন্মিবার বিষয়েও সেইরূপ। খাদ্য না পাইলে যেরূপ জীব জন্তু উদ্ভিদ বাঁচিতে পারে না, সেইরূপ যে পুকুরে মৎস্য খাদ্য না পায়, সে পুকুরে মৎস্য জীবিত থাকিতে পারে না। এপ্রদেশে মাছকে খাদ্য দিতে দেখা যায় না, স্বাভাবিক উপায়ে যে পুকুরে মৎস্য খাদ্য পায়, সেই পুকুরেই প্রচুর মৎস্য জন্মিয়া থাকে। যে পুকুরে মৎস্য স্বাভাবিক উপায়ে ভাল খাদ্য না পায়, সে পুকুরে ভাল মৎস্য জন্মেনা বাছাই পোনা যাহা ফেলা যায়, তাহারও অধিকাংশ মরিয়া যায়। যাহা বাঁচিয়া থাকে, তাহা শীঘ্র বাড়ে না, নিতান্ত নিস্তেজ অবস্থায় থাকে। ঐ সকল মৎস্য কাটিয়া দেখিলে, উহাদের রক্তের ভাগ অন্যান্য পুষ্করিণীর মৎস্যের তুলনায় এত কম যে, নাই বলিলেই চলে। ঐ সকল পুষ্করিণীতে মৎস্যের খাদ্যোপযোগী পদার্থ এত কম যে, তাহাতে তাহাদের শরীরের পুষ্টি সাধিত হয় না, তজ্জন্য অনেক মাছই মরিয়া যায়, যাহা বাঁচিয়া থাকে, তাহাও মৃতবৎ অবস্থায় থাকে। খাদ্যাভাব বশতঃ অনেক পুষ্করিণীতেই ভাল মৎস্য জন্মে না। যদিও সামান্য জন্মে, তাহা শীঘ্র বাড়ে না। নিতান্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল অবস্থায় থাকে। ঐরূপ মৎস্য খাইতে অন্যান্য পুষ্করিণীর ন্যায় সুস্বাদ নহে।

গ্রামের মধ্যে বাসস্থানের মধ্যবর্ত্তী পুষ্করিণীতে মৎস্য স্বভাবতঃ বহুল পরিমাণে খাদ্য পাইয়া থাকে। একারণ গ্রামের মধ্যবর্ত্তী পুষ্করিণীতে মৎস্য সেরূপ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এবং অল্প সময়ের মধ্যে যেরূপ বড় বড় হয়, গ্রামের বাহিরের পুষ্করিণীতে সেরূপ হয় না। বাসস্থানের মধ্যবর্ত্তী পুষ্করিণীতে বৃষ্টি হইলে, লোকের বাড়ীর গো'ড় পুকুরে গিয়া পড়ে লোকে বাসন মাজে, রন্ধনের ও মুড়ি ভাজার চাউল ধৌত করে, লোকে স্নান করে, গাত্র ধৌত করে, জল শৌচ করে, মূত্র ত্যাগ ক'রে, পাহাড়ের কোন কোন অংশে মল ত্যাগ করে, সেই বিষ্ঠা বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া পুকুরে গিয়া পড়ে। যে সকল পুকুরে এই সকল বা ইহার আংশিক কোন কোন

বিরত মলাদিযুক্ত হয়, সেই পঙ্কিল পুকুরে মৎস প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া পুষ্ট ও শীঘ্র বৰ্দ্ধিত হয়। পুকুরের ঘাটে, বাসন মাজিলে ভুক্তাবশিষ্ট অনেক ভাত তরকারী পুকুরে গিয়া পড়ে, পুকুরে চাউল ধৌত করিলে, চাউলের সহিত সংলগ্ন কুঁড়া জলে ধৌত হইলে বহুসংখ্যক মৎস্য ঘাটে আসিয়া জলে সেই কুঁড়া ভাত ভক্ষণ করিতে থাকে।

যদিও এরূপ পুকুরে মৎস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে, কিন্তু এরূপ পুষ্করিণীর জল গো মনুষ্যের অব্যবহার্য্য, এরূপ মলিন জলে রন্ধন করা বা এরূপ জলপান করা নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর। গ্রামের মধ্যস্থিত প্রায় সমুদয় পুষ্করিণীর জলই প্রায় এইরূপ মলিন। মনুষ্যের অব্যবহার্য্য মলিন দ্রব্যের মধ্যেই মৎস্যের খাদ্য নিহিত থাকে। যে পুকুরের পাড়ে মলমূত্র ত্যাগ করা হয় বৃষ্টি হইলে বসত বাড়ী ও পাড় ধৌত হইয়া সেই জল পুকুরে গিয়া পড়ে, সে পুকুরের জল মলিন হয়, সুতরাং সে জল পান করা উচিত নয়। অধিকাংশ গ্রামেই নির্ম্মল সুপেয় পানীয় জলের পুষ্করিণী নাই—অগত্যা দূষিত জলপান করিতে হয়। দেশে যে এত রোগ ও অকাল মৃত্যুর আধিক্য হইয়া জনক্ষয় হইতেছে, মলিন দূষিত জলপান ও যে তাহার অন্যতম কারণ; তদ্বিষয় সন্দেহ নাই।

গ্রামের বাহিরের পুষ্করিণীর জল অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত ও নির্ম্মল হইতে পারে। অজ্ঞতাবশতঃ লোকে তাহার জল ও দূষিত করিয়া ফেলে। যে পুকুরের জলপান করা হয়, তাহারই পাড়ে মল মূত্র ত্যাগ করা হয়, ক্ষারে মলিন বস্ত্র ধৌত করা হয়, স্নান করা হয়, সুতরাং তাহারও জল দূষিত হইয়া পড়ে। অধিকাংশ গ্রামের পানীয় জলের পুষ্করিণী মজিয়া গিয়াছে। পুকুরে গাঁজ, দল, ঘাস, শৈবালাদি জন্মিয়াছে। পুষ্করিণী পঙ্কে পরিপূর্ণ হইয়াছে, গ্রীষ্মকালে ১॥ বা ২ হাতের অধিক জল থাকে না। পল্লীগ্রামের লোককে সেই সকল পুষ্করিণীর মলিন ও দূষিত জলই পান করিয়া রুগ্ন হইতে হয় মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। যে সকল পুকুরের জল নির্ম্মল ও যাহাতে পাঁক বেশি না থাকে, সে পুকুরের জল পানের উপযোগী হইলে ও তাহাতে ভাল মৎস্য জন্মে না, যাহা জন্মে তাহা ও ভাল বাড়ে না। খাদ্যাভাবই ভাল মৎস্য না জন্মিবার কারণ। ঐরূপ পুকুরে মৎস্য উৎপাদন করিতে হইলে, মৎস্যকে খাদ্য প্রদান করা অতীব কর্ত্তব্য। এরূপ খাদ্য প্রদান করিতে হইবে যে, যেন তাহাতে পুষ্করিণীর জল দূষিত না হয়। সর্ব্বসাধারণকে নির্ম্মল সুপেয় পানীয় জল প্রদান করা অতীব পুণ্য-জনক কার্য্য। পূর্ব্বের ন্যায় এখনকার লোকের মনে তাদৃশ ধর্ম্মভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনকার প্রায় সকলেই স্বার্থপর হইয়াছেন, স্বার্থের দিকেই তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি।

এখন অধিকাংশ পুষ্করিণীই মজিয়া গিয়াছে, গ্রীষ্মকালে প্রায় অনেক পুকুরেই জল থাকে না। প্রায় সমস্তই অংশের পুষ্করিণী হইয়া পড়িয়াছে; সকল অংশীদারে মিলিত হইয়া, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করা—বা পুষ্করিণীর উন্নতি সাধন ঘটিয়া উঠেনা। গ্রামের মধ্যস্থিত অধিকাংশ পুষ্করিণীর জলই মলিন,—সেই সকল পুষ্করিণীতে প্রায় পানা জন্মিয়া

থাকে। গ্রামের মধ্যস্থিত পুষ্করিণীতে সচরাচর তিন প্রকার পানা হইয়া থাকে। গ্রামের মধ্যস্থিত পুকুরে ক্ষুদ্রজাতীয় দুইপ্রকারের পানার মধ্যে যে কোন এক প্রকারের পানা প্রায়ই হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে—পোস্তদানার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানা সামান্য সামান্য উৎপন্ন হইয়া ৮।১০ দিনের মধ্যে পুকুর পানায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়. জল দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই পানা ২।১ মাস পুকুরে থাকিলে, তাহা হইতে আবার বড় পানা উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের নাকছাবির মত ক্ষুদ্র জাতীয় আর এক প্রকার পানা হইয়া থাকে, তাহাও পোস্তদানার ন্যায়, ক্ষুদ্রজাতীয় পানার মত প্রথমে সামান্য সামান্য হইয়া ৮।১০ দিন মধ্যে সমস্ত পুষ্করিণী আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। তাহাও কিছুদিন থাকিলে বড় পানায় পরিণত হয়। কোন কোন পুকুরে একবারেই বড় পানা জন্মিয়া থাকে। পুকুরের জল মলিন ও দূষিত না হইলে প্রায়ই পানা জন্মিতে দেখা যায় না। বসত বাটী বা ময়লা স্থান ধৌত হইয়া পুকুরে গিয়া পড়িলে, প্রচুর পরিমাণে মৎস্য জন্মে ও অল্পদিন মধ্যে মৎস্য বর্দ্ধিত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে পুকুরের জল দূষিত ও মলিন হয়। যে পুকুরের জল এইরূপ দূষিত ও মলিন,—সেই পুকুরেই প্রায় পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার পানার মধ্যে কোন না কোন প্রকারের পানা জন্মিয়া থাকে। পুকুরে দীর্ঘকাল পানা থাকিলে পুকুরের জল দুর্গন্ধময় হইয়া অব্যবহার্য্য হইয়া উঠে এবং পুকুরের মাছ ও মরিয়া যায়। যে সকল পুকুরের জল মলিন ও দূষিত তাহাতে পুনঃ পুনঃ পানা জন্মিয়া থাকে। ঐরূপ অনেক পুকুরে একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট জন্মিয়া থাকে যে পুকুরে ঐ প্রকার কীট জন্মে, তাহাতে পানা অপেক্ষাকৃত কম হইয়া থাকে। ঐ কীট মৎস্যের খাদ্য। যে পুকুরে ঐরূপ কীট জন্মে, সে পুকুরে প্রচুর মৎস্য হইয়া থাকে। পানা না থাকিলেও ঐরূপ পুষ্করিণীর জল অব্যবহার্য্য। পুকুরে পানা জন্মিলেই, তাহা তুলিয়া ফেলা আবশ্যক। বর্ষাকালে পুকুরের জল অধিক দূষিত ও মলিন হয় বলিয়াই ঐ সময়ে অধিক পানা জন্মিয়া থাকে। শীত গ্রীষ্মকালে পানা কম হইয়া থাকে। বর্ষাকালেই পুকুরে পোনা ফেলা হইয়া থাকে। সে সময়ে পোনা হইবামাত্র তুলিয়া না দিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যগুলি মরিয়া যাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। জল দূষিত হইলেও পানা জন্মিলে পুকুরের সমস্ত মাছ সময়ে সময়ে মরিয়া গিয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠে। অতএব পুকুরের জল যাহাতে সম্পূর্ণরূপে দূষিত না হয়, পুকুরে পানা জন্মিলামাত্র তুলিয়া ফেলা হয়, সে বিষয় বিশেষ মনোযোগী হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য।

এখন মৎস্য যেরূপ দুর্লভ ও দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে মৎস্যের চাষ একটী বিলক্ষণ লাভ জনক ব্যবসায়। মৎস্য জীবী কৈবর্ত্ত দিগের প্রায় সকলেরই নিজের পুষ্করিণী নাই, পরের পুকুরে ভাগে মাছ ফেলিয়া ও পরের পুকুরে মাছ ধরিয়া বেশ সুখ স্বচ্ছন্দে দিন পাত করিতেছে। এ প্রদেশে মৎস্য জীবী কৈবর্ত্তের সংখ্যা খুব কম। সকল গ্রামে কৈবর্ত্ত নাই। ২।১ ক্রোশ অন্তর কোন কোন গ্রামে ২।৪ ঘর কারিয়া

কৈবর্ত্তের বাস আছে। প্রত্যেক কৈবর্ত্তেরই নিকটবর্ত্তী ২।১ খানি করিয়া গ্রামে ভাগে মৎস্য ফেলিবার ও গৃহস্থের অধিকৃত পুষ্করিণীর মৎস্য ধরিবার অধিকার আছে। সে ব্যতীত অন্য কোন কৈবর্ত্ত তাহার অধিকৃত গ্রামে ভাগে মৎস্য ফেলিতে বা মৎস্য ধরিতে পাইবেনা। সে একাকী মৎস্য ধরিতে সক্ষম না হইলে, অন্যান্য কৈবর্ত্তকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিয়া আপন অধিকৃত গ্রামে মৎস্য ধরিতে আইসে। যদি কোন কৈবর্ত্ত বিনা অনুমতিতে অন্যের অধিকৃত গ্রামে ভাগে পুকুরে মৎস্য ফেলে বা মৎস্য ধরে, তবে তাহাকে কৈবর্ত্তদের সমাজে দণ্ডিত হইতে হয়। একারণ কোন কৈবর্ত্তই অন্যের অধিকৃত গ্রামে ভাগে মৎস্য ফেলিতে বা মৎস্য ধরিতে সম্মত হয় না। এই জাতির যেরূপ যেরূপ সামাজিক একতা দৃষ্ট হয়, অন্য কোন জাতির সেরূপ দেখা যায় না।

—— এ প্রদেশে যেরূপ বহু সংখ্যক পুষ্করিণী আছে, এবং অনেক মধ্যবিত্ত লোকেই ২।১ টী করিয়া পুকুর আছে, তাঁহারা যদি বিশেষ যত্নের সহিত মৎস্য ব্যবসায়ে মনোযোগী হন, তবে বিলক্ষণ লাভ বান হইতে পারেন। পূর্ব্বে যে মৎস্য ৩।৪ টাকা মন দরে বিক্রীত হইত, এখন সেই মৎস্য ২৫।৩০ টাকা মন দরে বিক্রীত হইতেছে। তাহা ছাড়া মাছের ডিম ফেলিয়া একটু বড় হইলে পোনা বিক্রয় করা একটী বিশেষ লাভ জনক ব্যবসায়। চাকরী ব্যতীত অন্যান্য ব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করা নীচ জনোচিত কার্য্য বলিয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর মধ্যবিত্ত লোকের ধারণা। এই কুসংস্কার যতদিন না দুরীভূত হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত দেশের উন্নতি সুদূর পরাহত। কেবল মৎস্য ব্যবসায় নহে সকল প্রকার স্বাধীন ব্যবসায়েই তাঁহাদের বীতরাগ। চাকরীই ভদ্রজনোচিত কার্য্য বলিয়া তাঁহাদের ধারণা অনেক ভদ্রলোকেরই পুকুর থাকিতে তাঁহারা নিজে পোনা না ফেলিয়া কৈবর্ত্তদিগকে ভাগে পোনা ফেলিতে দিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে পুকুরে এত পানা হইত না, তাহার কারণ তখন পুকুর এত মজিয়া যায় নাই। তখন পুকুরের চারিদিক উচ্চ পাহাড়ে বেষ্টিত থাকিত; কেবল পুকুরের যে যে স্থানে ঘাট থাকিত—কেবল সেই সেই স্থান অপেক্ষাকৃত এরূপ নামাল থাকিত যে সে স্থান দিয়া বাস্ত বা অন্য কোন দূষিত বস্তু বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া ঘাট দিয়া পুকুরে পড়িতে পাইত না। এক্ষণে সেই সকল ঘাট বহুদিন ব্যবহার জন্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া খুব নামাল হইয়া গিয়াছে—সুতরাং বাস্ত অন্যান্য বহু স্থান ধৌত হইয়া ঘাট দিয়া পুকুরে গিয়া পড়ে। এখানকার প্রায় সকলেরই গৃহের চাল বিচালী দ্বারা আচ্ছাদিত। এরূপ ঘরের চালের জল প্রাঙ্গণের ময়লা, গোবর গোমূত্র, ধৌত হইয়া পুকুরের জলে গিয়া পড়ে ইহাতে পুকুরের জল দূষিত হয় এবং পুকুর শীঘ্রই মজিয়া যায়। এরূপ পুকুরে বেশ মাছ জন্মিলেও পুনঃ পুনঃ পানা জন্মিয়া থাকে। ক্রমশঃ

পক্ষিচাষ বা পুল্ট্রি ফার্মিং

এ সম্বন্ধে এক এক করিয়া সকল কথাই বলিয়াছি। কলে ডিম ফোটান সম্বন্ধে যৎসামান্ত পূর্ব্বে বলিয়াছি; খাদ্য সম্বন্ধেও পূর্ব্ব ২ পত্রে সামান্তরূপ আলোচনা করিয়াছি এ সম্বন্ধে পরবর্ত্তী পত্রে সামান্ত আলোচনা করিব। আমেরিকাবাসীরা পক্ষিচাষে বেশী উন্নতি পৃথিবীর মধ্যে সকল জাতি অপেক্ষা করিয়াছে। কৃষিবিভাগের এই পক্ষিচাষ শাখায় তাহাদের জাতীয় ধনাগারের আয় দেড়মিলিয়ন ডলার ১৯১৭ সালে হইয়াছিল। বিগত কয়েকবৎসরে তাহা আরও বাড়িয়াছে। গত ১৯১৯-২০ সালে মার্কিণদেশ ২৫০ মিলিয়ন পাউণ্ডষ্টালিং মূল্যের মুর্গি ডিম আদি পুল্ট্রি উৎপাদন করিয়াছে; ইহার অধিকাংশই ইউরোপে রপ্তানি হইয়া থাকে, ঘরের খরচা বাদ দিয়া অবশ্য। সে হিসাবে বিলাতের যুক্তরাজ্য কেবল মাত্র ৫৩ মিলিয়ন পাউণ্ড মূল্যের মুর্গি বিগত ১৯১৯ সালে উৎপাদন করিয়াছে। আমেরিকার বিশাল মহাদেশের মধ্যে ৪৮টা ষ্টেট্‌কলেজে মুর্গিচাষ শিখিবার ব্যবস্থা আছে এবং গভর্ণমেণ্ট দত্ত সাহার্য্যও প্রচুর আছে। আমাদের দীন ভারতে সে সব কিছুই নাই। ভারতবাসী মুর্গিমাংস ও ডিম ধ্বংশ করিতে জানে কিন্তু তাহা আবশ্যকমত উৎপাদন করিয়া জাতীয় ধনাগার পুষ্ট করিতে জানেনা এই সকল দেখিয়াও পড়িয়াও কি সুষুপ্ত ভারতবাসীর জাগরণ হয় না হায় রে দেশ!

মুর্গী পালক সস্তা অকাজের শস্ত কণা, মাংস কুঁচি ইত্যাদি যাহা বাটীর ঝাঁটার মুখে গোবর গাদায় নীত হইয়া নষ্ট হইয়া থাকে, তাহা বিজ্ঞান অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের বিনিময়ে পুষ্টিকর ডিম ও মাংসরূপ মুখরোচক খাদ্যে পরিণত করিয়া কোটী২ মনুষ্যের জীবন ধারণের পথ উন্মুক্ত করিতেছে। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধে লিপ্ত অধিবাসীগণ বেশী পরিমাণ অন্ন জীর্ণ করিয়াছে এবং দুগ্ধ পুল্ট্রী আদিত দপেক্ষা কম খাইয়াছে, তাহার ফলে শস্তের দাম খুব বাড়িয়াছিল এবং এখনও বাড়িয়া আছে, এবং পাখীদের জন্ত খাদ্যাভাব হওয়ায় তাহাদের বেচিয়া ফেলা হইয়াছে ও যুদ্ধক্ষেত্রে নীত হইয়াছিল। সে হ্রাস এখনও পুরণ হয় নাই কিন্তু ২।১ বৎসরের কৃষির উৎপন্নে শস্ত সম্ভারের মূল্য ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে; গব্যজাত সামগ্রী ও পুল্ট্রীর দাম খুব বেশীই আছে। এই সময় কি ভারতবাসীর পক্ষে সমিচিন নহে যে এই চড়াদামের সময় কিছু ধন নিজ ঘরে মুর্গির ব্যবসায়ে আনয়ন করে?

কলে ডিম ফোটার তিনটি স্তর আছে। প্রথম ২০ল্যাম্পযুক্ত কলের ব্যবহার বেশী হইত এবং কৃষকগণ পাশ্চাত্যদেশে ল্যাম্পযুক্ত, ব্রুডার ও গরমজলে তাপবিকীর্ণকরে। ব্রুডার ঘর নির্ম্মাণ করিত (overhead) hot water pipe system of brooder house construction)। তাহার পর ক্রমশঃ২ বড় বড় কয়লাযুক্ত ম্যামথ্ কল

(mammoth coal heated incubator) আবিষ্কৃত হইল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ছুজা (ছানা ও পাঠা মুর্গির ব্যবসা খুবই প্রসার লাভ করিয়াছে। এই ব্যবসারের সঙ্গে ২ গোল হোভার (round hover place of indirect hot water pipe brooding) ও তাহার আনুসঙ্গিক (brooder stove.) তাপদানযন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়া এই ব্যবসারে বিশেষ সাহায্যদান করিতেছে।

পাশ্চাত্যদেশের অধিবাসীগণ যে কাজ আরম্ভ করেন তাহা সবই সুন্দর এবং শৃঙ্খলাযুক্ত ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। তাঁহারা গো, মেষ, অশ্ব, শূকরাদি গৃহপালিত পশুর উন্নতি বিধান অর্থে ভিন্ন ভিন্ন জাতির হিতকল্পে ভিন্ন ভিন্ন সমিতি স্থাপিত করিয়া সেই ২ জাতির পশুগণের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। পশু সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা মল্লিখিত "গোপালবান্ধবে" করিয়াছি। এই টেক্‌নিক্যাল হ্যাণ্ডবুকটি গৃহ-পঞ্জিকারমত প্রত্যেক গৃহস্থের পাঠ করা কর্ত্তব্য। পক্ষি জাতির উন্নতি কল্পে তাঁহারা আপন আপন দেশে সমিতি ও পত্রিকা স্থাপন করিয়া কতই উন্নতি করিতেছেন তাহা বলা যায় না। পুল্‌ট্রি ব্যবসায়টা আমেরিকা প্রদেশের মধ্যে পৃথিবীর মধ্যে সকল দেশাপেক্ষা বেশী তাহা পূর্ব্বতালিকা পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়। আমাদের এই দীন শৃঙ্খলাহীন পদদলিত দেশের নিস্ব অধিবাসীগণের কি এদিকে দৃষ্টি আছে? আমেরিকার পুল্‌ট্রি এসোসিয়েশান প্রকাশিত মুর্গিজাতির "Standard of Perfection" এবং "Reliable Poultry Journal" (আমাদের দেশের বাৎসরিক মূল্য ২।০ ডলার, ২ বৎসরের ৩।০ ডলার এবং ৩ বৎসরের ৪।০ ডলার হইতেছে; সকল পুস্তকাদি ও এই পত্রিকা আমি আনাইয়া দিতে পারি; এক এক সংখ্যা শতাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী; আমি প্রত্যেক মুর্গিচাষী ও ব্যবসায়ীকে "Reliable Poultry Journal, N. Edwards এর কৃত "Poultry Answers Hurst এর" Utility ducks Geese, How to build Poultry Houses, open Air Poultry Houses, Practical Poultry Houses, Successful Poultry Culture. 999 Questions and Answers on Poultry, Profitable Poultry keeping on all branches, Side line Poultry Keeping, Profitable Poultry Production. One man Poultry Plant, Poultry Manuel, How to make poultry pay. American Poultry Doctor, Profitable market Poultry, Poultry Secretes Revealed, money in hens, Duck Culture, Guinea fowl Culture. How to make ducks pay, All about Indian Runner Ducks, প্রভৃতি আরও বহু পুস্তক যাহা মুর্গী, হাঁস, পেরু, খরগোশ, গো, শূকর, কপোতাদি বিষয়ে আছে আনাইয়া দিতে পারি ও পাঠ করিতে অনুরোধ করি। শিক্ষিত পাঠকগণকে বিশেষ অনুরোধ যেন তাঁহারা আমার সহিত দেখা করিয়া পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়া

পাঠ করেন ও কাজও করেন। পুষ্টি ফার্মিংএ সাফল্য লাভকরা পরিশ্রম, সুমার্জিত বুদ্ধি, পুস্তক বা পত্রিকা পাঠ এবং অধ্যবসায়ের সহিত কিছু মূলধনের প্রয়োজন।

ক্রমশঃ এ-চ-স-৩১নং এলগীন রোড।

মাংস কি মানুষের উপযোগী খাদ্য ?—আজকাল খাদ্যের মধ্যে মাংস অতি প্রিয় সামগ্রী হইয়া দাড়াইয়াছে ; কিন্তু আমাদের শরীর ও স্বাস্থ্যের পক্ষে মাংস উপযোগী কি না তাহার বিচার করিয়া কেহই দেখেন না। নিম্নে খাদ্যের বিভিন্ন অংশগুলি দেখাইয়া একটি তালিকা দিলাম—

খাদ্যের নাম।	জল।	নাইট্রোজেন ও কার্ব্বনমূলক পদার্থ।	চর্ব্বী	শ্বেতসার ও শর্করা।	খনিজ পদার্থ।	শরীরের পুষ্টি করিবার উপযোগী সারাংশ।
ছাগ-মাংস	৬৫.২	১৪.৫	১৯.৫	—	০.৮	৩৮.৮
হরিণের মাংস	৭৫.৭	১৯.৭	১.৯	—	১.১	২২.৭
মুরগীর মাংস	৬৭.৪	২৪.২	৬.৬	—	১.৩	৩২.৩
ডিম	৬৪.০	১৪.০	১০.৫	—	১.৫	২৬.০
দুগ্ধ	৮৬.০	৪.১	৩.৯	৫.২	০.৮	১৪.০
মাখন	১২.৬	—	৮৬.৪	—	০.৮	৮৭.২
গম বা ময়দা	১২.৭	১১.৪	১.৩	৭১.০	৩.০	৮৬.৭
যব	১৪.৬	৬.৭	১.৩	৭৫.৫	১.১	৮৪.৬
চাউল	১২.৪	৭.৮	০.৪	৭৯.০	০.৪	৮৭.৬
সাগু	১৪.০	১.৬	০.৬	৮৩.০	০.৪	৮৫.৬

ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, নিরামিষ খাদ্য অপেক্ষা মাছ, মাংস বেশী পুষ্টিকর নহে। কসায়ের দোকানে মানুষের খাদ্যের জন্য যে সকল প্রাণী বধ করা হয় তাহার শতকরা ৫০টি কোন না কোন রোগ গ্রস্ত। অনেকেরই ধারণা আছে যে, অস্থিপেশীর শক্তি বজায় রাখিতে হইলে মাংস খাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। হাতী, ঘোড়া, গরু, মহিষ প্রভৃতি জন্তুসমূহ প্রভুত বলশালী। প্রকৃতি মানুষকে মাংসাশী সৃজন করেন নাই। আমাদের হাত, পা, প্রভৃতি অবয়ব ফল মূল সংগ্রহ করিবার জন্যই ভগবানের অভিপ্রেত। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ (Darwin ডার্বিনের মতে মর্কটগণ) কখনও মাংসাশী ছিলেন না। মাংসও আমাদের স্বাভাবিক খাদ্য হইতে পারে না। রন্ধন দ্বারা মাংসকে যোগাইলে, খাদ্যোপযোগী ও মুখরোচক করিলেও

কাঁচা রক্তাক্ত মাংস আমাদের মনেই বীভৎস ভাবের উদ্রেক করিয়া থাকে। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক Dr. Josiah Oldfield লিখিয়াছেন—"প্রাণীজ খাদ্য শরীরের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রসমূহের কার্য্যে প্রতিবন্ধক উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহাতে যক্ষা, জ্বর, আন্ত্রিক ক্রিমি প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগের বীজাণু বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই মাংস হইতে উৎপন্ন রোগেই শতকরা ৯০ জন লোকের প্রাণনাশ হইয়া থাকে।" ইংলণ্ডের দন্তচিকিৎসক-সমিতির রিপোর্টে দেখা যায় যে, বিলাতের নিম্নতম শ্রেণীর শতকরা ৯০ জন লোক দন্তরোগে ভুগিতেছে। এই গোমাংসে কতটুকু সার রহিয়াছে তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখেন?

গো-মাংসে	শতকরা	২৬	ভাগ সার পদার্থ	৭৪	ভাগ জল
ছানায়	"	৩৪	"	৬৬	"
ভাত, ডাল	"	৮৭	"	১৩	"

শাক-সব্জি-ফল-মূলে যে জল রহিয়াছে তাহা অনেকাংশে বিশুদ্ধ কিন্তু প্রাণীজ রক্তমাংসে যে জল আছে তাহা প্রাণ বাহির হইয়া গেলেই পচিতে আরম্ভ করে। সে জল মানুষের প্রাণ-হানিকর। আমাদের খাদ্যের মধ্যে শরীর পুষ্টি করিবার জন্য যে সকল উপকরণ রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে নাইট্রোজেন ও কার্ব্বনই প্রধান। এই দুইটি জিনিষ সকল খাদ্যের মধ্যেই বর্ত্তমান আছে। আমাদের দেহের শক্তি অক্ষুন্ন রাখিতে হইলে ঐ নাইট্রোজেন ও কার্ব্বনময় খাদ্য নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু মাংসে যে নাইট্রোজেন ও কার্ব্বন আছে তাহা কি নিরামিষ খাদ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? বিজ্ঞান বলিতেছে—না। খাদ্যই যখন আমাদের শরীরে নাইট্রোজেন ও কার্ব্বণ বহিয়া লইয়া যাইবার একমাত্র উপায়, তখন খাদ্য নির্ব্বাচন করিবার সময় আমাদের দেখিতে হইবে যে তাহাতে (ক) যে পরিমাণ নাইট্রোজেন ও কার্ব্বন রহিয়াছে তাহা আমাদের স্বাস্থ্য অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে কি না? (খ) খাদ্য কিনিতে আমাদের যে পরিমাণ অর্থব্যয় হয় তাহার উপযুক্ত পুষ্টিকর সার পাইলাম কি না? (গ) এবং সেই খাদ্য হজম করিতে পাকস্থলীর কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে কি না? নিরামিষ খাদ্যে এই নিয়মগুলি যেরূপ স্বচ্ছন্দে প্রতিপালিত হয় মাংসের বেলায় তাহা হয় না। ঘি-ভাত, লুচি-সন্দেশ এবং তরি-তরকারীর নানাবিধ মুখরোচক রন্ধন বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত রহিয়াছে। মাংসের অভাব আমরা তাহা দ্বারা অনায়াসেই পূরণ করিয়া লইতে পারি।

বিজ্ঞান।

বস্ত্র-সমস্যা

—:*:—

চরকা ও তাঁত

(আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখিত।)

বাংলায় কিছু কিছু চরকা চলিতেছে। যে স্থানে ভাল কাজ হইতেছে সেখানে চরকার সুতায় কাপড় প্রস্তুত হইয়া কলিকাতায় কিছু কিছু কাপড়ও বিক্রয়ের জন্য আসিতেছে। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বরিশাল এই বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চরকা চলার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্ন উঠিতেছে যে, সুতা দিয়া কি করিব— তাঁতি কই যে বুনিব? ইতিমধ্যেই কোন কোনও স্থল হইতে সংবাদ পাইতেছি যে গ্রামে এতটা সুতা হইয়াছে কিন্তু সুতার ক্রেতা নাই। কলিকাতা জিনিষের কেনা বেচার প্রধান কেন্দ্র বলিয়া অনেকে কলিকাতার চরকার সুতার বিক্রয়ের বাজার খুঁজিতেছেন। কিন্তু কলিকাতায় চরকার সুতার চাহিদা নাই বলিলেই চলে। যাঁহারা গ্রামে বসিয়া সুতা করিতেছেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য জোলা দ্বারা ঐ সুতার কাপড় বুনিয়া লওয়া। কাপড় করিয়া কলিকাতায় পাঠাইলে তাহা পড়িতে পাইবে না। যাঁহারা গ্রামে সুতা কাটিতেছেন তাঁহাদের নিজ গ্রামে না হউক নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে যে জোলা পাইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। ১০ নম্বর মিলের সুতার টানা ও চরকার সুতার পড়েন দিয়া কাপড় বুনিয়া লওয়া চেষ্টা করিবেন। অবশ্য দুই দিকে চরকার সুতা দেওয়াই কর্ত্তব্য কিন্তু যে পর্য্যন্ত সুতা কাটার হাত না পাকিতেছে ততদিন একদিকে মিল ও একদিকে চরকার সুতা বুনিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। ভরসা করি অল্প দিনই এই রূপ একদিকে মিলের সুতা ব্যবহার করিতে হইবে। যাহাতে গ্রামে গ্রামে জোলা বসে তাহারও চেষ্টা করিতে হইবে। জোলাদের কারবারের সহিত আমাদের মধ্যবিত্ত ও ভদ্রসম্প্রদায়ের সংস্পর্শ খুব কম। কেন না তাহারা মোটা কাপড় বোনে। আর তাঁতিরা সাধারণতঃ মিহি কাপড় বোনে। চরকার সুতা লইয়া তাঁতির নিকট যাওয়া বিড়ম্বনা। তাঁতিরা মিহি কাপড় বুনিয়া হাত এমন করিয়াছে যে, মোটা সুতার কাজ করিতে চাহে না। তাহা ছাড়া আরও একটা প্রধান কথা এই যে মিহি কাপড় বুনিয়া তাঁতিরা অধিক মূল্যে বিক্রয় করে। দুই টাকার সুতায় যে কাপড় হইবে, তাহা তাঁতি ছয় টাকায় বিক্রয় করিবে। কিন্তু দুই টাকার চরকার সুতা বুনিলে তাহার মজুরি মিহি সুতার অর্দ্ধেকও হইবে না। সেই জন্য যে তাঁতি মিহি সুতা বুনিতেছে তাহাকে দিয়া মোটা সুতার কাপড় করিয়া লওয়া যাইবে না। কিন্তু জোলারা মোটা কাপড়ই বুনিতেছে। তাহারা একখানা কাপড় বুনিয়া

এক টাকা পাঁচ সিকা পাইলেই সন্তুষ্ট। সে একদিনে একখানা কাপড় বুনিতে পারে। অবশ্য স্ত্রীর ও ছেলে মেয়েদের সাহায্য লইয়াই একদিনে একখানা কাপড় বুনিতে পারে। আর এক টাকা পাঁচ সিকা এক পরিবারে উপার্জ্জন করা তাহার পক্ষে পরম লাভ। তাহা হইলেও প্রয়োজন মত চরকার সূতা বুনিয়া উঠিতে পারা যাইতেছে না। তাহার হেতু যোগাযোগের অভাব। একখানা কাপড়ে ৩০ তোলা ১০ নম্বর সূতা লাগিতে পারে উহার মূল্য বারো আনা আর ৩০ তোলা চরকার সূতা উহারও মূল্য ধরুন বারো আনা (২ সের হিসাবে) এই দেড় টাকা সূতার দাম আর মজুরি পাঁচ সিকা ইহাতে মোট দুই টাকা বারো আনায় যে কাপড় জন্মাইবে তাহা আজকালের বাজারে ৩৷০ বা ৩৷।০ টাকায় বিক্রয় হইবে। আর যদি সূতা কাটার তুলা ও মজুরি না ধরা যায় তবে মিলের বারো আনা সূতা জোলার পাঁচ সিকা মজুরি এই দুই টাকাতে গৃহস্থের একখানা কাপড় হইবে সে কত স্থায়ী ও কি জিনিষ যিনি ব্যবহার করিতেছেন তিনিই জানেন।

অনেক গ্রামেই দেখিবেন কাপড় বুনিয়া পোষায় না বলিয়া জোলারা অন্য কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে—কেহ দিন মজুরি করিতেছে কেহ বিদেশে চাকরি করিতেছে। ইহাতে বড় সামাজিক ক্ষতি হইতেছে। জোলার স্ত্রী কন্যারা যে উপার্জ্জন করিত তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। বরিশালের খালিসাকোটা অঞ্চলে যাঁহাদের বাড়ী তাঁহারা জানেন তাঁতীর স্ত্রী কাপড় বোনায় কতটা সাহায্য করে। ঐ তাঁতীকে ওখানে "যুগী" বলে—উহারা হিন্দু। বরিশালের চাষারা এখনও মিলের সূতার মোটা কাপড় পরে। উহা লম্বায় চওড়ায় ছোট। যুগীদের কাপড় বলিয়া উহা পরিচিত। ঐ জিনিষ মিলওয়ালারা এখনও গ্রামে পাঠায় নাই, কাজেই বরিশালের চাষীর জন্য এই যুগীরা এখনও বয়ন কর্ম্মে জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারিতেছে। উহাদের মেয়েদের ঘর ঝাঁট দেওয়া, রান্না করা, বাসন মাজা যেমন নিত্য কর্ম্ম ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন হয়, তেমনি সূতায় কতকগুলি কাজও নিত্যকর্ম্ম মধ্যে গণ্য। মেয়েরা সকালে উঠিয়াই সূতা ভিজায় ও পূর্ব্বদিনের সূতার জল বদলায়। তারপর বেলা ৯।১০টা পর্য্যন্ত মাড় দেয় রান্না ও খাওয়ার পর সমস্ত দুপুর ও বৈকাল পর্য্যন্ত কেহবা নাটায়, সূতা রৌদ্রে দেয়, ও নলী পরে; আর কেহবা নলী পোরা সূতায় টানা হাঁটা করে। এই কর্ম্মে কেবল মেয়েরা নয় ছেলেপুলে ও বুড়োরাও যোগ দেয়। বাড়ীর কর্ম্মঠ পুরুষ তাঁতে বসিয়া বোনে আর হাটে কাপড় বিক্রয় করিয়া নিজের প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনিয়া আনে। সকাল হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাহারা এই কাজ করে। এই করিয়া একখানি তাঁতে মাসিক ৩০।৩৫ টাকা রোজগার করে। খুব কষ্টের রোজগার সন্দেহ নাই—কেননা এক জনের পরিশ্রমে নহে—বাড়ীর সকলের শ্রমে ঐ টাকাটা উঠে। কিন্তু জোলা যুগীরা তাই বা সব যায়গায় পায় কোথায়? পাইলে বাড়ী ছাড়িয়া সহরে চাকরীর জন্য ছুটিত না। এখন যুগী-জোলাদিগকে তাঁতে বসান একটা বড় কাজ। আর যে সব যুবকেরা কলিকাতায় বা

অন্য সহরে চাকরীর জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহাদিগকে আমি বলি গ্রামে ফিরিয়া যাও। ভাই বোন স্ত্রী সকলে মিলিয়া খাটিয়া ঐ যুগী জোলার মত মাসে ৩০।৩৫ টাকাই রোজগার কর। আমার নিকট পুনঃ পুনঃ বি, এ পাশ বি. এ ফেল চাকরে, ঐ ৩০ টাকার চাকরির জন্যই ঘুরিয়া বেড়ায়। কেহ বা বলে আপনার অমুক কারখানায় বিনা মাহিনায় শিক্ষানবিশি কাজ দিন, পরে কর্ম্ম শিখিলে ২৫।৩০ টাকা যাহা হয় বেতন দিবেন। তাঁহাদিগকে যদি বলি, তাঁতের কাজ কর—তখনি যত রকম অজুহাত আরম্ভ হয়। টাকা নাই, মূলধন নাই. কিছু জানি না ইত্যাদি কতই না কল্পিত অসুবিধা বাহির হয়। একটা তাঁত কিনিতে ৩০।৪০ টাকা লাগে। আর সর্ব্বসাকল্যে শতখানেক টাকা মূলধন লাগে তাহাই নাই; যোগাড় করিতে পারে না—আর যে শয্যা তাহার অঙ্গে—৮ টাকার জুতা, তারপর মোজা. ৮।১০ টাকা মূল্যের কোটও ২০।২৫ টাকার আলোয়ান গায়ে দিয়া আছে। সে ঐ শতেক টাকা সংগ্রহ করিতে পারে না। মিছে কথা; ইচ্ছা নাই তাই পারে না। যদি মর্য্যাদা জ্ঞান থাকে. তবে আমি বলি ও-সাজ খুলিয়া ফেল। নিজে উপার্জ্জন করিয়া ওগুলি পরিও। এখন শুধু গায়ে তাঁতি যুগী জোলার বাড়ী গিয়া বিনা মাহিনায় দিন কতক এপ্রেণ্টিশি কর—মানুষ হইবে। বসুমতী

রংয়ের ব্যবসা

যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণী পৃথিবীর রংয়ের ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল। যুদ্ধ বাধিল, জার্ম্মাণী অবরুদ্ধ হইল জার্ম্মাণীর বহির্বাণিজ্য—আমদানী ও রপ্তানী—বন্ধ হইল। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশই তৎপূর্ব্বে জার্ম্মাণীর নিকট হইতে রং কিনিত। তাহারা আর রং পায় না; মহা অসুবিধা উপস্থিত। তখন, নানা দেশে রং প্রস্তুত করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। ইংলণ্ড এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্য তখন বহু চেষ্টার পর রংয়ের অভাব এক রকম করিয়া মিটাইতে পারিয়াছিল, তাহা আমরা জানি। তৎকালে সংবাদ-পত্রে এ সম্বন্ধে অনেক আন্দোলন-আলোচনা হইয়াছিল।

অন্যান্য দেশের ন্যায় জাপানকেও রঙয়ের জন্য ইয়োরোপের উপর নির্ভর করিতে হইত। যুদ্ধ বাধিলে, তাহারও রংয়ের অভাব ঘটিল। কিন্তু জাপান প্রাণবান জাতি। সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র নয়। জাপানে যে সকল উপকরণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে রং প্রস্তুত হইতে পারে কি না, জাপানী বৈজ্ঞানিকেরা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। জাপানের হাচিওজি নামক স্থানে একটী বয়ন ও রঞ্জন

বিদ্যালয় ছিল। তাহারি কর্ত্তারা বিশেষ ভাবে রং প্রস্তুত করিবার প্রণালী অবিষ্কারে লাগিয়া গেলেন। সে উৎসাহ উদ্যম ব্যর্থ হইল না। জাপানীর কৃত্রিম নীল প্রভৃতি রং প্রস্তুত করিয়া উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। রংয়ের অভাবে আমাদেরও কষ্ট কম হয় নাই। শুধু রং নয়, সকল জিনিসের জন্যই ত আমাদিগের বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। যুদ্ধ বাধিতে আমাদের বিপদ অন্য সকল দেশের অপেক্ষা বেশী হইয়াছিল। বিশেষ ভাবে, বস্ত্রাভাবে আমাদের যে কি পর্য্যন্ত কষ্ট গিয়াছে এবং এখনও যাইতেছে, তাহার উল্লেখের আর প্রয়োজন নাই। ভাগ্যিস বাড়ীর পাশে জাপান ছিল; এবং সুবুদ্ধি জাপান জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত জর্ম্মাণ উপনিবেশগুলি অধিকার করিয়া লইয়া, তাহার বহির্বাণিজ্যের পথ খোলসা করিয়া লইয়াছিল; তাই আমরা এ যাত্রা এক রকমে টিঁকিয়া গিয়াছি। আমরা বড় গলা করিয়া বলিতে ছাড়িতেছি না যে, আমরা স্বায়ত্ত-শাসন লাভের যোগ্য হইয়াছি। কিন্তু এরূপ বিপদে আত্মরক্ষা করিবার জন্য, যুদ্ধের কয় বৎসরের মধ্যে, এ দেশের বৈজ্ঞানিকেরা এবং ব্যবসায়ীরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটরা নেতারা কয়টা নির্ম্মাণের উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেশের অভাব মোচন করিতে পারিয়াছেন, সে খবর এখনও পাইলাম না ত!

আমাদের কৃষি ও কৃষিশিক্ষা

কৃষকবন্ধুতে কৃষি এবং কৃষিশিক্ষা সম্বন্ধে আমার লেখা বঙ্গের বহু শিক্ষিত পাঠক বা কৃষিপ্রিয় যুবক বৃন্দ পড়িয়া থাকিবেন। এসম্বন্ধে নূতন বড় কিছু বলিবার নাই; কিন্তু দিন দিন জীবন সংগ্রাম যেরূপ তীব্র হইয়া দাঁড়াইছে, তাহাতে চাকুরীপ্রিয় মধ্যবিত্ত নিঃস্ব বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ কি তাহা চিন্তা করিয়া আমাদের মনে স্বতঃই বড় ভয় হয়। আমাদের অস্তিত্ব পৃথ্বীপৃষ্ঠ হইতে অচিরে লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে যদি না আমরা তাহার সময় মত প্রতিকার করিবার চেষ্টা করি। বাঙ্গলার সাধারণ কৃষকদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে ও পরে নূতন প্রজাস্বত্ব আইন দেশে বিধিরূপে প্রবর্ত্তিত হইলে আরও শোচনীয় হইবে; কারণ প্রজার পক্ষ দেখিবার দেশে বা সরকারী দপ্তরে কেহ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; এবং যাঁহারা প্রজার পক্ষ সংরক্ষণ করিবার ভার লইয়াছেন বা দেশের মধ্যে লইবার শ্লাঘা প্রকাশ করেন, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে এই জটিল প্রশ্ন ও তাহার সমস্যার বিষয় আদৌ কিছু বুঝেন না বলিয়া আমার মনে হয়। আইনদ্বারা দেশের প্রজাদের যদি সংরক্ষণ না করা হয় তাহা হইলে আমাদের দেশে যে "কৃষক সম্প্রদায় বলিয়া একদল চাষী" আছে এবং যাহাদের ভূমির সহিত খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহারা বিলাত বা আয়রলণ্ড দেশের মত ধরাপৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইবে। আমাদের দেশ "রমেটিরিয়ালের দেশ ;" বড় বড় নগর বা সহরগুলি ব্যবসায়িক বা "ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কেন্দ্র" স্বল্প কাল মধ্যে হইতে পারে বটে, কিন্তু সমগ্র পল্লীগুলি বা নগর ছাড়া বাকীস্থান গুলি চিরকালই কৃষি কেন্দ্রই থাকিবে, যেমন আমেরিকায় আছে বা চীন দেশে আছে !! আমাদের দেশের অবস্থা, দেশ কাল পাত্র বিচার করিয়াই আমাদের ঋষিগণ, আইন কর্ত্তাগণ, দেশোপযোগী ব্যবস্থা করিয়া প্রাচীন গ্রন্থে কলম মারিয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহার ব্যতিক্রম করিয়াই দেশে অশান্তি, ও বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিপর্যায় উপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের অর্থকরী অসার সর্ব্বজাতিকে সমকরী ইংরাজি শিক্ষা দেশের কল্যাণ ও হিত সাধন না করিয়া অশেষ প্রকারে অশান্তি আনিতেছে ও আনিয়াছে যাহার ফলে "তীব্র জীবন সংগ্রাম উপস্থিত। ইহার সমন্বয় কোথায় হইবে জানি না কিন্তু ইহার ফল অত্যন্ত বিষময়,—ইহার ফলে ক্ষুদ্রবাঙ্গলা দেশের শ্রমজীবি ও কৃষক সম্প্রদায় বস্তুতই ভীত ও ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

দেশের জমীদার সম্প্রদায় ইংরাজ শাসনের সৃষ্ট পদার্থ। বর্ত্তমান শাসন পদ্ধতি নানা অভাবনীয় কারণে শিথিল ও সেইজন্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজ শাসকগণ টাকা আদায়ের জন্য যে একদল কর্ম্মচারী সৃষ্টি করেন তাঁহারাই জমীদার।

ইংরাজরাজ লোভী হইয়া মনে করিলেন যে এই দলের বড়ই ক্ষমতা, বড়ই টাকা, ইহারা নিঃস্ব প্রজাদের প্রতি অশেষ বিধ অত্যাচার করিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া নগরে আসিয়া বিলাসিতায় ব্যয় করে; এই ক্ষমতা ইহাদের ভাঙ্গিতে হইবে, কাজেই ১৮৮৫ সালের প্রজাসত্ব আইন প্রবর্ত্তিত হইল; কৃষক জোতসত্ব পাইল এবং আরও কত কি পাইল বলা যায় না; তাহার ফলে দেশের মধ্যে যে রাজায় প্রজায় একটা বন্ধুত্ব ও ভাই ভাই সম্বন্ধ ছিল তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া নিস্বকরী মামলা মকদ্দামায় সূত্রপাত হইল; দেশে বহু চৌকী, মুনসফী, সদরআলা ও জজীয়তী আদালতের সৃষ্টি হইল, ষ্টাম্প আইন বসিল, তাহার দিন দিন নবসংস্করণে দেশের অর্থ শোষিত হইবার ফলে তীব্র হইতে তীব্রতর বিধি সকল দেশে জারি হইতে লাগিল এবং প্রজা ও জমীদারগণ দেনার দায়ে প্রপীড়িত হইতে লাগিল। এবং অন্যপক্ষে কৃষকগণ উচ্ছন্ন যাইল এবং তাহাদের জ্যোৎজমী মহাজনের হাতে নীত হইল। দেশের প্রকৃত চাষী কুল "মজুরে বা কিশানে বা শ্রমজীব সম্প্রদায়ে পরিণত হইল যেমন আয়রলণ্ডে হইয়াছে। এই অবস্থায় বিষময় ফলে আয়রলণ্ডের যে অবস্থা হইয়াছে, আমাদের দেশেও তাহাই হইবে যদি সময় মত প্রতিকার না করা হয়। কিন্তু একথা ভাবে কয়জন এবং যাঁহাদের হাতে ইহা ভাবিয়া চিন্তিয়া সকল হিতকর বিধি প্রবর্ত্তনের ভার দেওয়া হইয়াছে তাঁহারাই বা কয়জন জানেন বা ভাবেন; কিন্তু "মুড়ুলী "করিবার ও "নাম কিনিবার" পাত্র সকলেই আছেন। জমীদার দল সদাই প্রাচীন স্বার্থ রক্ষণে প্রয়াসী, প্রজাকুল তাহাদের হিতকর Previleges গুলি রাজার সাহায্যে রক্ষা করিতে এতাবৎকাল কম প্রয়াসী নহেন। তবে ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গের কৃষক কুলের যে বর্ত্তমান অবনতি ঘটিয়াছেও তাহারা ক্রমশঃ নানা Economic কারণে ধ্বংশের পক্ষে অগ্রসর হইতেছে তাহার জন্য দায়ী কয়জন ব্যক্তি? তাই বলি যে হস্তান্তর ক্ষমতা বা গাছ পালা বা পুখুর খুঁড়িবার বা ইটগাড়ী করিবার সত্ব প্রজা আইনবলে পাইলেই যে তাহাদের চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হইবে তাহা বলিতে পারি না। ১৮৮৫ সালের আইন প্রবর্ত্তন সময়ে সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্টের সময় কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব চিফ্‌জাটিস্ মাননীয় গার্থ সাহেব যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহা পাঠ করিয়া দেশ কাল ও পাত্র অনুযায়ী সামঞ্জস্য করিয়া বর্ত্তমান নূতন আইন প্রবর্ত্তন করাইলে সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলজনক হইবে বলিয়া আমার মনে হয়। সেইজন্য বঙ্গের রায়ত ও কৃষক সংঘ, বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতি বা শ্রমজীবি সমিতি এই মহা আবশ্যকীয় আইন প্রবর্ত্তনে মনোযোগদান করুন এই আমার বিশেষ অনুরোধ ও প্রার্থনা।

দেশের চাষের ও কৃষক কুলের যখন পূর্ব্ববর্ণিত অবস্থা তখন কৃষির উন্নতি বা কৃষককুলের অবস্থান্তর কিরূপে সাধিত হইতে পারে? রাজার এদিকে দান নাই দৃষ্টি নাই, জমিদার ধন কুবেরগণের আস্থা নাই, কৃষকগণ নিজেদের অবস্থা বুঝেনা, যাঁহারা

তাহার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া দপ্তরে আসন গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা নিজেরাই ইহার গূঢ় সমস্যা অবগত নহেন, দেশের কৃষক সমিতি সমূহের নেতারা কেবল মিথ্যা হৈ চৈ ও মুড়ুলী করিতেই ব্যস্ত, তখন কি হইবে দেশের কৃষক কুলের ভবিষ্যৎ অবস্থা তাহা জানি না।

এখন দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের কি করা কর্ত্তব্য তাহা মিমাংসা করা আশু প্রয়োজন নহে কি? সেইজন্য আমাদের চাহি দেশে সুলভ কৃষিশিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যে ইহার আনয়ন, কৃষি বিভাগের পুনর্গঠন গোরক্ষা উত্তম গাভী সংজন-ইত্যাদি। লর্ড মেয়োর সময় হইতে কৃষি বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে, এতাবৎকাল মধ্যে কত লক্ষ টাকা নিঃস্ব ভারতীয় প্রজাদের অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, কিন্তু খরচার অনুপাতে কি দেশে লাভ হইয়াছে এই বিভাগের দ্বারা, তাহা ভারতবাসী কি একবার শাসকদের এই নব সংস্কার বিধি প্রবর্ত্তনের দিনে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না?

গোরক্ষা ও প্রাচীন দেশের গোপ্রচার গুলি নব বিধির দ্বারা সংরক্ষণ করা যে একান্ত আবশ্যকীয় তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না এবং এবিষয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতি তথা বঙ্গীয় কৃষক সমিতি এবং অখিল ভারতীয় গো-কনফারেন্স কি করিয়াছেন তাহা ভারতবাসীর অবিদিত নাই। এই অত্যন্ত কৃষির উন্নতি বিধায়ক প্রয়োজনীয় বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের আদৌ কোন আন্তরিক সহানুভূতি নাই। মাননীয় গিরিধারীলাল আগরওয়ালা, পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, সামরথ, মহারাজ নন্দী, লালা সুখবীরসিংহ, অমূল্য ধনআঢ্য, কিশোরীমোহন চৌধুরী প্রমুখ ভারতের গোমাতার রক্ষণাকাঙ্খি বরেণ্য সন্তানগণের বড় ও ছোট দপ্তরের কীর্ত্তিসকল কাহারও অবিদিত নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতি ভারতীয় গো-কনফারেন্স এই কাজের জন্য চারন ও বৃষবিল বিগত জুলাই ও আগষ্ট মাসের সার্ভেণ্ট পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া দেশের মতামত চাহিয়া পাঠাইলে আমরা অমানুষিক কুম্ভকর্ণী নিদ্রা ও নিস্তব্ধতা দেখিয়া বস্তুতই স্তম্ভিত হইয়াছি। এবিষয়ে আমি বিশেষজ্ঞরূপে বলিতে চাহি যে আমরা স্বদেশবাসীগণ এদিকে দলাদলিও আন্তর্গণিক বিবাদ ঝগড়া ত্যাগ করিয়া আশু মনোযোগ দান করুন যাহাতে দেশের কৃষির কল্যাণ সাধিত হয়; ও কৃষককুলের কল্যাণহিত হয়।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দেশের ভাবগতিকের স্রোত যেরূপ প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আর থাকিবেনা এবং চাকুরী জীবি ভদ্রলোকদের কিশানে পরিণত হইতে হইবে। তাহা যদি হয় তবে দেশের লোকের পুনশ্চ লাঙ্গলের "মুঠের" দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। তাহার জন্য শিক্ষা প্রয়োজন। এইরূপ হিতকর কার্য্যকরী শিক্ষার ব্যবস্থা দেশে কোথায় এবং রাজা বা বিশ্ববিদ্যালয় তাহার বিষয় করিয়াছেন কি? আমার মনে হয় যে "কলমপেষা" জাতিদের এদিকে কাজের লোকরূপে গঠন করিতে হইলে "রৌদ্র, জল, বর্ষা, ও পরিশ্রম" "আদির "হাপোরে

"ফেলিয়া সিসন (Season) করিয়া লইতে হইবে; তাহাতে ২।৩ পুরুষ কাল অতি বাহিত হইবে। যাহারা এদিকে আছে তাহাদের উপযোগী প্রকৃষ্ট শিক্ষার ব্যবস্থা দেশে কি আছে আর কি করিতে হইবে তাহা চিন্তনের দিন কি আইসে নাই ভাই বাঙ্গলার কৃষক? এরূপ শিক্ষা প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে আমি ষ্টেটসম্যান, ইংলিশম্যান, সার্ভেন্ট ও অমৃতবাজার পত্রিকার স্তম্ভে এবং কৃষকের পৃষ্টার পূর্ব্বে বহুবার আভাস দিয়াছি কিন্তু আমার হতভাগ্য নভেলী রসে নিমজ্জিত স্বদেশবাসীর কৃপাদৃষ্টি সে দিকে আদৌ পড়ে নাই এই আমার আক্ষেপ। আমাদের স্কুলভূমি চাই, এবং সেই ভূমিতে যাহাতে অধিক পরিমাণ খাদ্য সম্ভার জন্মায় তাহার প্রকৃষ্ট উপায় ও নবকৃষি পদ্ধতি কৃষক কুল মধ্যে প্রচার চাই। গভর্ণমেণ্টে অদুরদর্শী পাশ্চাত্য দেশের পাশ করা কৃষি বিভাগের উচ্চ বেতন ভোগী কর্ম্মচারি পরিচালিত ঢাকা বা চুঁচড়া কৃষি বিদ্যালয় পরিচালিত শিক্ষা আমাদের দেশের নিম্বরক্ষণশীল প্রকৃত চাষা সহজে লইবেনা তাহা আমরা জানি। গভর্ণমেণ্ট যে সব কৃষি স্কুল দ্বারা এইরূপ শিক্ষা দেশেবিস্তার জন্য প্রয়াস পাইতেছেন, তাহা কদাচ সফলতা লাভ করিতে পারে না, যেহেতু সেইগুলি এ দেশের নিম্ন কৃষক কুলের অর্থের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া প্রদত্ত হয় না। বিশেষতঃ কৃষি সচিব যে শিক্ষা দেশে তাঁহার ডিপার্টমেণ্টের লোকের দ্বারা স্কীম করিয়া প্রচার করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন তাহা আদৌ এ দেশের কৃষকদের উপযোগী নহে।

ধান, গম, যই, যব, কড়াই, তরিতরকারী, ফুল ফল ইত্যাদি চাষ, সার প্রদান ইত্যাদির বিষয় সরল ভাষায় শিক্ষার বই ও পদ্ধতি দেশের নিম্ন চাষা ভায়েদের জন্য চাহি। এরূপ বই আমাদের দেশে কোথায় এবং নভেল প্রহসন, রহোন্যাস লেখক ভুরি ভুরি থাকিলেও এইরূপ দেশে হিতকর জীবন ধারণোপযোগী বিষয় শিক্ষার লেখক দেশে কয়টা এবং কোথায়? তাই বলি যে আমার গোরক্ষা, পাখিচাষ, কৃষি সম্বন্ধে যে সব প্রবন্ধ আছে ও ভিন্ন ভিন্ন সংবাদ ও মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সংগ্রহ করিয়া আমার স্বদেশবাসী রাজা মহারাজা ও কৃষক ভাইগণ বা কৃষক সমিতি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়গণ প্রকাশ করিয়া কৃষক কেন্দ্রে কেন্দ্রে সামান্য মূল্য লইয়া বিতরণ করুন। উৎসাহ পাইলে অনেক লেখক এইরূপ উপকারী পুস্তক লিখিতে প্রয়াস পাইবেন।

আমাদের দেশে "কৃষি শিক্ষা "বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যে সহৃদয়ও দেশ হিতৈষী সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রবেশ করাইয়াছেন কিন্তু তাহা কতদূর দেশের হিতকর ও কার্য্যকরী হইবে বলা যায় না। ইহা সাধারণ কৃষক সন্তানদের পক্ষে উপযোগী করিতে হইলে বঙ্গভাষার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টেক্‌নিক্যাল পুস্তক চাই, বাঙ্গলা ভাষায় লেক্‌চার দিতে পারে এমন বিচক্ষণ অধ্যাপক চাই, পাখিচাষ, গোচার, গোপালন-দুগ্ধ ব্যবসার ভিন্ন ভিন্ন শাখায় পারদর্শী অধ্যাপক ও শিক্ষক চাই, এইরূপ বিশেষজ্ঞদের

পাশ্চাত্যদেশে পর্য্যবেক্ষণ জন্য ২।৪ মাস জন্য প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা চাই এবং ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ কৃতবিদ্য বালক বা যুবকগণ যাঁহারা এই সব বিষয়ে ঘরে বসিয়া ডাকযোগে শিক্ষালাভ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের আমেরিকার অথবা ইংলণ্ডের ডাকযোগে শিক্ষাদাত্রী স্কুল, বা কলেজে ফিশ দিয়া ভর্ত্তী হইয়া শিক্ষালাভ করিতে অনুরোধ করি। ইহারা পশু সংজনন, কৃষি, সার প্রদান, পশু ও পক্ষি পালনাদি বিষয় সকল কলায় শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। ইংরাজি জানা থাকিলে আমাদের দেশের শিক্ষিত চাষার ছেলেদের পক্ষে কৃষিশিক্ষা লাভ করিবার বেশ সুবিধা আছে তাহা আমি পূর্ব্বে বহু সংবাদ পত্রে লিখিয়াছি। এই সকল বিষয় শিক্ষার আমি ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি সডাকপত্র যোগে সকল বিষয় জানিলে। আজ এই পর্য্যন্ত। ক্রমশঃ

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার M R AS- M A L L B Vakil H. C. পাখিচাষ ও গোচাষ বিশেষজ্ঞ ৩১নং এলগীন রোড কলিকাতা।

তিলের চাষ

পৃথিবীতে যত প্রকার তৈলপ্রদ শস্যের চাষ আবাদ হইতেছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাগ্রে তিলের চাষই প্রচলিত হইয়াছিল। প্রধানতঃ তৈল উৎপাদনের জন্যই তিলের চাষ করা হইত। প্রথমতঃ তিলের স্নেহময় পদার্থেরই তৈল নাম করণ হয়। সুতরাং তিলের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়াই তিল হইতে "তৈল" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। তৎপরে তিলের ন্যায় সর্ষপ, মসিনা, সরগোজা, রেড়ি, বাদাম ইত্যাদি অন্যান্য শস্য বীজের স্নেহময় পদার্থও তৈল নামেই অভিহিত হয়। কিন্তু তৈল বলিতে যেমন একমাত্র তিল তৈলই বুঝায়, অন্যান্য বীজোৎপন্ন তৈল সম্বন্ধে একথা খাটেনা। এই জন্যই তৈলের পূর্ব্বে তৈলপ্রদ পদার্থেরও নামোল্লেখ করিতে হয়। যথা ;—সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল, রেড়ীর তৈল ইত্যাদি। ভারতবর্ষেই তিলের আদি জন্মস্থান। অতি প্রাচীন সময় হইতেই ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই অল্পাধিক পরিমাণে তিলের চাষ আবাদ হইতেছে। আবাহমান কাল হইতেই তিলকে হিন্দুরা অতি পবিত্র বলিয়া মনে করে। এই জন্যই তিলের এক নাম পবিত্র। অতি প্রাচীন সময়ে দেব পূজায় ও শ্রাদ্ধ তর্পনাদি প্রায় সকল প্রকার ধর্ম্ম কার্য্যেই তিলের এবং খাদ্য রূপে তিল তৈলের ব্যবহার ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল।

ইদানীন্তন-কালে ধর্ম্ম কার্য্যে (দেব পূজাদি) শ্রাদ্ধ, তর্পন, বিবাহ ইত্যাদি কার্য্যে এবং খাদ্যরূপে (তিল পিষ্টক, তিল সন্দেশাদি) সকল স্থানেই তিলের ব্যবহার আছে বটে, ফলতঃ বঙ্গদেশে তিল তৈল কেবল মাখিবার ও সুগন্ধি বা ঔষধ তৈল প্রস্তুত জন্য ভিন্ন খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয়না। অতীত ও বর্ত্তমান সকল কালেই তিলের গাছে জ্বালানীর কার্য্য চলিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সোডা, সাঁজিমাটী. সাবান ইত্যাদির ব্যবহার প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বের ন্যায় ইহাতে যে কাপড় কাচিবার উৎকৃষ্ট ক্ষার হয়, তাহা জানিয়াও কেহ ছাইগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখেনা। এই ক্ষার জলে কোন কোন ঔষধও প্রস্তুত হয়। পুষ্প মিশ্রিত তিল তৈল হইতে নানা বিধ ফুলেল তৈল প্রস্তুত হয়। তদ্ব্যতীত নানা প্রকার ঔষধ তৈল ও গাত্রে মাখিবার জন্য তিল তৈল ব্যবহার করা হয়।

এত দেশ হইতে ইউরোপের মধ্যে ফ্রান্স দেশে ও এসিয়ার মধ্যে আরব দেশে বহু পরিমাণে তিলের রপ্তানী হইয়া থাকে। ফ্রান্সে তিল তৈলে নানাবিধ সুগন্ধি তৈল এবং আরক প্রস্তুত হয়। কেহ কেহ বলেন এদেশে যে জলপাই তৈল (আলিভওয়েল) আমদানী হয়, তাহার অধিকাংশই তিল তৈল ভিন্ন অন্য কিছু নহে। বিলাতে সাবান প্রস্তুত করিবার ও আলোক জ্বালাইবার জন্য তিল তৈল ব্যবহার হয়।

প্রকৃতি ও বর্ণ ভেদে তিল চারি জাতিতে বিভক্ত। (ক) কৃষ্ণ তিল, (খ) সাহেব তিল বা শাঁখি তিল, (গ) কার্ত্তিকে তিল, (ঘ) কাট তিল, চারি জাতি তিলের গাছ, পাতা ফুল ও ফলের গঠন প্রায় একরূপ, কেবল শাঁখি তিল ও কার্ত্তিকে তিলের ফলের আকারে কিছু পার্থক্য আছে। সকল প্রকারের তিল গাছই উর্দ্ধে ২।৩ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। গাছ-গুলি শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট হইলেও নিতান্ত অসার।

আজ কাল ঘানিতে তিল দিয়া তৈল প্রস্তুত করা হইতেছে। কিন্তু তিল বাটিয়া গরম জলে ফেলিলেও তৈল বাহির হইয়া থাকে। যে সময়ে আমাদের গোলা ভরা ধান, ডোলা ভরা দাইল, পুকুর ভরা মাছ, গোয়াল ভরা গরু, ও উঠান ভরা লাউ শশা ইত্যাদি ছিল, খনার মতে সেই "লক্ষীর দশায়" গৃহস্থেরা সেই ২ ক্ষেত্রের তিল হইতে, শেষোক্ত উপায়ে খাদ্য তৈল প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিত। আজ কাল তিলের অভাব ও খাদ্যরূপে ও গাত্রে মস্তকে মাখিবার জন্য সরিষার তৈল প্রচলন, প্রধানতঃ এই দুইটি কারণেই তিল বাটিয়া তৈল প্রস্তুত করিবার প্রথা একরূপ লুপ্ত হইয়াই গিয়াছে। গড়ে একমণ তিল হইতে ১৫।১৬ সের তৈল উৎপন্ন হইতে পারে। কৃষ্ণ তিল হইতেই অধিক পরিমাণে তৈল বাহির হয়, এবং গুণেও ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তিল তৈল বেশ পরিস্কার, স্বচ্ছ, বর্ণ হীন এবং গন্ধ শূণ্য তিলের তৈলে একটু মিষ্ট গন্ধ ব্যতীত অন্য কোন রূপ গন্ধ অনুভূত হয়না। এই তৈলের একটী অনন্য সাধারণ গুণ এইযে ইহার সহিত যাহা মিশ্রিত করা যায়, তাহার গন্ধই ইহাতে বর্ত্তমান থাকে। এই গুণ থাকার জন্য বাদাম তৈল, সরিষার তৈল, ঘৃত

প্রভৃতিতে ইহা ভেজাল দেওয়া চলে, এবং নানা প্রকার গন্ধ দ্রব্যের সংমিশ্রণে সুবাসিত তৈল প্রস্তুত করা হয়।

তিলের ফল শুটীর আকার বিশিষ্ট হইয়া থাকে। ফলের মধ্যভাগ চারি অংশে বিভক্ত। ইহার প্রত্যেক বিভাগেই বহু সংখ্যক বীজ থাকে। বীজগুলি জাতি ভেদে বিভিন্ন রংয়ের হয়, সাদা, কাল, লাল ও ধুসর এই চারি বর্ণের তিলই দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ধুসর ও কৃষ্ণ এই দুই প্রকারে তিলই এতদঞ্চলে বেশী পরিমাণ জন্মে ও ইহারই আদর বেশী, পৌষ সংক্রান্তিতে প্রতি গৃহে গৃহে তিল পিষ্টক, তিল সন্দেশ ইত্যাদি খাদ্য রূপে ব্যবহারের খুব প্রচলন আছে। অন্যান্য সময়েও যথা সম্ভব ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ঐ সময় বহুল রূপে ব্যবহারের প্রথা থাকায়, কোন কোন বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে ।৵০ হইতে ৷৵০ আনা সের তিল ক্রয় করিতে হয়। এই পৌষ সংক্রান্তির এ অঞ্চলে অন্য একটী নাম "তিল সংক্রান্তি"।

প্রায় সকল প্রকার জমীতেই তিল জন্মে. কিন্তু যে জমীতে চূণ বা লবণের ভাগ অধিক, অথবা যে ভূমি ছাইয়ের বর্ণ বিশিষ্ট আঁঠাল, এইরূপ জমিতে তিলের চাষ করিলে গাছ গুলি সতেজে বর্দ্ধিত হইয়া সুফলপ্রসূ হয় না। সরস উচ্চ ভূমি ভিন্ন যে জমীতে বর্ষার জল দাঁড়ায় কিম্বা যে জমী বন্যার জলে মগ্ন হয়, এরূপ জমী তিল চাষের উপযুক্ত নহে। বৃষ্টির জলে তিল গাছের কোন অপকার হয় না, বরং উপকারই সাধিত হয়। কিন্তু সেই জল যদি কোন কারণে জমীতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, তবে অত্যাল্প সময়ের মধ্যেই সমুদয় গাছ মরিয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। এজন্য জমী হইতে জল নিকাশের বিশেষ বন্দবস্ত করিতে হইবে। চৈত্র বা বৈশাখ মাসে বৃষ্টির অভাব হইলে মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্রে জল শেচনের আবশ্যক হয়। কারণ জমী সরস থাকা কর্ত্তব্য। তিলের জমীতে কোনরূপ সার ব্যবহার করিতে হয় না। বেশী সারযুক্ত মাটীতে গাছ ঝাড়াইয়া যায় এবং ফলন কম হয়। ইহার জমী অল্প চাষেই প্রস্তুত হয়, গভীর চাষের আবশ্যক হয় না। ধানের জমীতে যত বার লাঙ্গল দিতে হয়, তিলের জমীতে তত বেশী চাষ না দিলেও চলে। কিন্তু খোলা স্থান ব্যতীত তিল গাছ ভাল জন্মে না।

খনা বলিয়াছেন "চাষ চায়না, বাত চায়," তিল গাছের বাতাস চাহিবার উদ্দেশ্য এই যে, বেশী পরিমাণ বায়ুস্থিত অঙ্গরায় গ্যাস গ্রহণ ব্যতীত ইহার পরিপোষণ ও পুষ্টি সাধনের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত জন্মে। তিলের চাষে যদিও গভীর চাষের আবশ্যক হয় না, কিন্তু জমীর মৃত্তিকা ধুলিবৎ চূর্ণ হওয়া আবশ্যক। এজন্য প্রত্যেক চাষের পর মই দিতে হইবে, তিল গাছের জীবন ধারণের ও পুষ্টির জন্য জল বিশেষ দরকার। ফলতঃ মৃত্তিকার নিম্নস্তর হইতে জল সংগ্রহ করিবার শক্তি ইহার নাই। কারণ এই গাছের শিকড় মৃত্তিকার বেশী নীচে যাইতে পারে না। সুতরাং কর্ষিত মৃত্তিকা ধুলিবৎ চূর্ণীকৃত হইলে তাহা বায়ু হইতে অধিক পরিমাণে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করিয়া, মাটীর জলের অভাব

কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিতে পারে। আবার মাটী যত বেশী চূর্ণ হইবে, ততই তাহা সূক্ষ্ম ছিদ্র বহুল হইবে। ভূমি নিম্নভাগস্থ জলীয়াংশ এই সকল সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে রৌদ্রের তেজে উপরে উঠিয়া শস্যের জলের অভাব অনেকাংশে বিদূরিত করে। এজন্য তিলের জমী ধূলিবৎ চূর্ণ করিয়া দিয়া উহার জল প্রাপ্তির সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। খনার বচনে আছে ;—

"ঘন সরিষা বিরল তিল, নেঙ্গে নেঙ্গে কাপাস।
এমনি করে বুনিশ শন, না ঢোকে বাতাস।"

অর্থাৎ সরিষা ঘন ও তিল পাতলা করিয়া বপন করিবে। আর কার্পাস এক এক ভেগ অন্তর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে লাগাইবে। এবং শণ এমন ঘন করিয়া বুনিবে, যেন গাছ বড় হইয়া উঠিলে, তন্মধ্যে বাতাস প্রবেশ করিতে না পারে। তিলের গাছ শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট হয় ও তাহার পাতার ও গাছে রৌদ্র ও বাতাসের সংস্পর্শ বিশেষ আবশ্যক বলিয়াই, তাহা পাতলা করিয়া বপন করিতে হয়। তিলের বীজ প্রতি বিঘায় দশ ছটাক হইতে দেড় সেরের বেশী লাগে না। যখন কিঞ্চিৎ বেগে বায়ু প্রবাহিত হয়, সেই সময় তিল বপন করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ তিল বড় হালকা জিনিস, সামান্য বাতাসেই উড়িয়া গিয়া এক দিকে পড়িবার সম্ভাবনা। ইহাতে এক স্থানে চারা খুব ঘন ও অন্য স্থানে চারাই জন্মিবে না। দুই এক দিন মধ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকিলে তিল বপন করা কর্ত্তব্য নহে। তিল বপন করিবার পর ২।১ দিন মধ্যে যদি বেশী বৃষ্টি হয়, তবে তিলের চারা প্রায় বাহির হইতে পারে না। চারা বাহির হইলেও তাহা নিতান্ত নিস্তেজ হয়।

ঘোর কৃষ্ণ বর্ণের তিলকে কৃষ্ণ তিল বলে। কৃষ্ণ তিল মাঘী শস্য। ইহাই এদেশে বেশী প্রচলিত। শ্রাবণ মাসের প্রথম ভাগেই কৃষ্ণ তিল বপন করিবার প্রশস্ত সময়। ভাদ্র মাসে বুনিলে নাবি হয়। ফলতঃ সর্ব্বত্র এই নিয়ম খাটিতে পারে না। কারণ চাষের কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নাই, থাকিতেও পারে না। কোন কোন স্থানে আশ্বিনের প্রথম ভাগেও কৃষ্ণ তিল বপন হয়। সুতরাং ধরিতে গেলে শ্রাবণ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত কৃষ্ণ তিল বপন এবং মাঘ বা ফাল্গুন মাসে কর্ত্তিত হইয়া থাকে। শ্রাবণ মাসে বপন করিলে তাহা অগ্রহায়ণ মাসের শেষ বা পৌষের প্রথম ভাগেই পাকিয়া উঠে। কৃষ্ণ তিল পাকিলেই ইহার গাছ কাটিয়া জাগে দিতে হয়, কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্তরে স্তরে গাছগুলি স্তূপাকারে সাজাইয়া পালা দিতে ও তদুপরি খড়, কুটা, অথবা কাঁচা ঘাস প্রভৃতি বিছাইয়া চাপিয়া দিতে হয়। ইহাকেই জাগ দেওয়া বলে। জাগে দিলে, তিলের গাছ গুলি গরমে ভাপিয়া উঠে এবং ১০।১৫ দিন পরে পাতা গুলি বিবর্ণ হইয়া যায়, পচিয়া উঠে ও ক্রমশঃ খসিয়া পড়ে। এইরূপ অবস্থা হইলে জাগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। জাগ হওয়ার পর পালা ভাঙ্গিয়া গাছ গুলি রৌদ্রে শুকাইবার জন্য খামারে

ছড়াইয়া দিতে হয়। পালা ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে খামারের জায়গাটুকু গোময় মিশ্রিত জলে লেপন করিয়া লইবে। নচেৎ অনেক তিল লোকসান হইয়া যায়, এবং তিলে মাটীর ভাগ অনেক বেশী হইয়া পড়ে। ক্রমাগত ৫।৬ দিন খামারে বিছাইয়া দিয়া রৌদ্রের উত্তাপে শুকাইয়া লইতে পারিলে গাছ গুলি নীরস হয় ও ফলের মুখ ফাটিয়া যায়। এই সময় তিল বাহির করা সহজ সাধ্য হয়। ফলের মুখ ফাটিয়া উঠিলেই তিল বাহির করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তখন লাঠী দ্বারা পিটাইয়া ফল হইতে তিল বাহির করিয়া লইতে হয়। তৎপরে শুকাইয়া বিক্রয়োপযোগী করিতে প্রায় এক মাস সময়ের আবশ্যক। ধান্যের ন্যায় কাটিবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ন চিন্তা দূর হয় না। এজন্য কৃষকেরা বলে যে "ধান কেটে ভাত, তিল কেটে উপাস।"

সাধারণতঃ প্রতি বিঘায় ২।৩ মনের বেশী তিল জন্মে না, তবে সুবৎসর হইলে খুব উৎকৃষ্ট জমীতে ৪।৫ মণ পর্য্যন্ত ফলন হইতে পারে। মোটামুটী ব্যয়বাদে প্রতি বিঘায় ১৫।২০৲ টাকা লাভ থাকা সম্ভব। তিলের অভাব হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই দিন দিন উহার মূল্য ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

শ্রীগুরু চরণ রক্ষিত।

মলমূত্র সার

শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরি লিখিত

গোবর।—ঘোড়া, গরু, ভেড়া প্রভৃতি কৃষিক্ষেত্রে পালিত পশুর মলমূত্রকে আমরা গোবররূপে বর্ণনা করিব। সকল পশুর গোবর একরূপ নহে; খাদ্য, বয়স ও স্বাস্থ্য অনুসারে পশুদিগের গোবর ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। গরু ও ঘোড়ার মলের মধ্যে, ঘোড়ার মল অধিক সারবান; কারণ ঘোড়া অধিক পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে। অল্প বয়স্ক বর্দ্ধনশীল বা কৃষাঙ্গ পশুর পুরীষ অপেক্ষা বয়োপ্রাপ্ত বা স্থূলকায় পশুর পুরীষ অধিক মূল্যবান। ইহার কারণ এই যে বর্দ্ধনশীল বা কৃষাঙ্গ পশুর দেহ গঠনের নিমিত্ত অধিক পরিমাণে সারপদার্থের প্রয়োজন হয়; এবং শেষোক্ত পশুদিগের আহারের প্রায় সমস্ত সার-পদার্থ মল-মূত্রের সহিত বহির্গত হইয়া যায়। জিড়ান বলদ এবং ঠাঁরা গাইয়ের গোবর পরিশ্রমী বলদ এবং দোয়াল গাভীর গোবর অপেক্ষা উত্তম সার। পরিশ্রমী বলদের

উপাদান সকল।	গরু।		ঘোড়া।		ভেড়া।		শূকর।	
	মল	মূত্র	মল	মূত্র	মল	মূত্র	মল	মূত্র
জল …	৮৪·০০	৯২·০০	৭৬·০০	৮৯·০	৫৮.০০	৮৬·৫০	৮০·০০	৯৭·৫০
নাইট্রোজেন …	·৩০	·৮০	·৫০	১·২	·৭৫	১·৪০	·৬০	·৩০
ফস্ফরিক এসিড …	·২৫	…	·৩৫	…	·৬০	·০৫	·৫৫	[illegible]

পটাস ও সোডা	...	·১০	১·৪০	·৩০	·১৫	·৩০	২·০০	·৫০	·০২
অন্যান্য পদার্থ	...	১৫·৩৫	৫·৮০	২২·৮৫	৮·৩	৪০·৩৫	১০·০৫	১৮·৪৫	২·০৬
সমষ্টি	...	১০০·০০	১০০·০০	১৯০·০০	১০০০০	১০০·০০	১০০·০০	১০০·০০	১০০·০০

খাদ্যের শতকরা ৯০—৯৫ ভাগ সার-পদার্থ নিঃসৃত হয়। কিন্তু বর্দ্ধনশীল পশু ও দোয়াল গাভীর খাদ্যের ৫০—৭৫ ভাগ সার পদার্থ মাত্র মল-মূত্রের সহিত পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। মূল কথা, যাহাদের জীবন ধারণ করিতে অল্প মাত্রায় পুষ্টিকর পদার্থের প্রয়োজন, তাহারাই অধিক সারবান জিনিস মল-মূত্রের সহিত পরিত্যাগ করে।

উপরিস্থিত তালিকায় বিভিন্ন পশুর মল-মূত্রের উপাদান সকলের পরিমাণ প্রদত্ত হইল।

উল্লিখিত তালিকা দৃষ্টে প্রতীতি হইবে যে, শূকর ব্যতীত অন্যান্য জন্তুর মল অপেক্ষা মূত্র অধিক সারযুক্ত। কিন্তু আমাদের দেশে কোথাও মূত্র রক্ষা করিবার ব্যবস্থা নাই।

নিম্নলিখিত তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে যে, উপযুক্ত আহার প্রাপ্ত প্রত্যেক পশু এক দিবসে কত মলমূত্র পরিত্যাগ করে :—

গরু	...	৩৭ সের
ঘোড়া	...	২৪ „
ভেড়া	...	১৭ „
শূকর	...	৪১ „
গোবৎস	...	৩৩ „

আমরা দিনের মলমূত্র প্রায়ই সংগ্রহ করিতে পারি না। তাহা ছাড়িয়া দিলে, একটী সাধারণ গরু বৎসরে ৭০।৮০ মণ সার প্রদান করিয়া থাকে।

মলমূত্র রক্ষার ব্যবস্থা এদেশে একেবারে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গোময়াদি সাধারণতঃ গোশালার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ফেলিয়া রাখা হয়। তথায় রৌদ্র বৃষ্টিতে ইহার অনেক সার পদার্থ বিনষ্ট হইয়া যায়। বিলাতের রাজকীয় কৃষি-সমিতির সুপ্রসিদ্ধ ভূতপূর্ব্ব রাসায়নিক ডাক্তার ভোলকার পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, ৯ মাস মধ্যে, এইরূপ রক্ষিত সারের প্রায় একতৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সুব্যবস্থামত সার রক্ষা করিলে ইহার একপঞ্চমাংশের অধিক নাইট্রোজেন কখনও বিনষ্ট হইতে পারে না। অন্য দিকে, তাজা গোবর জমীতে দিলে ইহা শীঘ্র পচিয়া দ্রবণীয় হয় না; এমন কি, এঁটেল মাটিতে ইহার কিতকাংশ বহু বৎসর পর্য্যন্ত অদ্রবণীয় ভাবে অবস্থিতি করে।

উক্ত দুই প্রণালী মত সার পরীক্ষা করিয়া ভোলকার সাহেব নিম্নস্থ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন :—

প্রণালী।	যে দিন সার রক্ষিত হয়, ৩রা নবেম্বর, ১৮৫৪	৩০ শে এপ্রেল ১৮৫৫	২৩ আগষ্ট ১৮৫৫	১৫নবেম্বর ১৮৫৫

সাধারণ প্রণালী সারের পরিমাণ	২·৮৩৮ পাউণ্ড	২·০২৬ পাঃ	১,৯৯৪ পাঃ	১,৯৭৪ পাঃ
নাইট্রোজেনের পরিমাণ ...	১৮·২৩ „	১৮·১৪ „	১৩·১৪ „	১৩·০৩ „
বিশেষ প্রণালী সারের পরিমাণ	৩,২৫৮ „	১,৬১৩ „	১,২৯৭ „	১·২৩৫ „
নাইট্রোজেনের পরিমাণ ...	২০,৯৩ „	১৯·২৬ „	১৬·৫৪ „	১৮·৭৯ „

উক্ত তালিকা দৃষ্টে প্রতীতি হইবে যে, দ্বিতীয় পরীক্ষার দিন সাধারণ প্রণালীর নাইট্রোজেনের বিশেষ কোন ক্ষয় ঘটে নাই, ইহার কারণ এই যে, এই দিন পর্য্যন্ত সার বিকৃত হইয়া আদৌ বৃক্ষের গ্রহণোপযোগী হয় নাই; কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ পরীক্ষার দিন ইহার পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে। বিশেষ প্রণালীর সার দ্বিতীয় পরিক্ষার সময়েই বিকৃত হইয়া নাট্রোজেনের পরিমাণ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছে। ভোলকার সাহেব এই সময়েই ইহা জমীতে প্রয়োগ করিতে বলেন। তৃতীয় পরীক্ষার সময়, এই সারের নাইট্রোজনের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ মাত্র বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি বলেন যে, সারের গাদা এত শুষ্ক না থাকিলে, এই বিনষ্ট নাইট্রোজেনের পরিমাণ এত অধিক হইত না। গোময়াদি সার প্রস্তুত করিবার প্রকৃষ্ট উপায় এই :—

দুই হস্ত গভীরতাবিশিষ্ট একটি পাকা চৌব্বাচ্চায় সার জমা করিতে হইবে। রৌদ্র-বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইহার উপরে একখানা চালা দেওয়া আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে কোদালি দ্বারা সার চৌরস করিয়া দিতে হয়। চৌব্বাচ্চা পূর্ণ হইলে, ইহাকে বালুমাটী দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া উচিত। নানা জাতীয় উদ্ভিদাণু কর্ত্তৃক সার বিকৃত হইয়া য়্যামোনিয়া, হিউমিক্ এসিড, প্রভৃতি পদার্থের উৎপত্তি হয়। য়্যামোনিয়া এই সকল পদার্থ ও জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যৌগিক অবস্থায় থাকে। পরে ইহা অন্য এক প্রকার উদ্ভিদাণু কর্ত্তৃক নাইট্রেটের আকারে পরিবর্ত্তিত হয়। সারের স্তূপ জল সিঞ্চন দ্বারা আর্দ্রন রাখিলে, ইহার অধিকাংশ য়্যামোনিয়া উড়িয়া যায়। যদি এই স্তূপ খুব আলগা থাকে তবে ইহার পচন ক্রিয়া অতি ত্বরায় সমাপ্ত হয়; ইহাতে য়্যামোনিয়া বিনষ্ট হয়। আবার সারের স্তূপ খুব জাঁতা থাকিলে, পচনক্রিয়া সুচারুরূপে সমাধা হয় না। যে উদ্ভিদাণু পচন ক্রিয়া দ্বারা নাইট্রেট্ উৎপন্ন করে, তাহার জীবন ধারণ জন্য অক্সিজেন বাষ্পের প্রয়োজন। সারের স্তূপ খুব জাঁতা হইলে, বায়ু অভাবে ইহার কার্য্য হইতে পারে না। অক্সিজেনবিহীন এবং বায়ু বিশিষ্ট স্বল্প স্থানে অন্য প্রকার উদ্ভিদাণুর প্রাদুর্ভাব হয়। এক জাতীয় উদ্ভিদাণু শুষ্কসার হইতে নাইট্রোজেন বিযুক্ত করিয়া ইহার বিলোপ করে। চারি বা পাঁচ মাস পরে, সার ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে। বিলাত প্রভৃতি শীত প্রধান স্থানে সার প্রস্তুত করিতে আরো ২।১ মাসের প্রয়োজন হয়।

সার-স্তূপের মধ্যে মধ্যে জীপসাম চূর্ণ প্রদান করিলে য়্যামোনিয়া রক্ষিত হইতে পারে।

বর্দ্ধমান মহারাজীর কৃষিক্ষেত্রে পূর্ব্বোক্ত বিশেষ প্রণালীমত সার প্রস্তুত করা হয়।

ভারতগবর্ণমেণ্ট-কৃষি-বিভাগের রাসায়নিক ডাক্তার লেদার উক্ত সার এবং বর্দ্ধমানের রায়তদিগের প্রস্তুত সার পরীক্ষা করিয়া নিম্নলিখিত ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন :—

সার	জল	অঙ্গারীয় পদার্থ*	দ্রবণীয় পদার্থ*	বালুকা	ফস্ফরিক এসিড	নাইট্রোজেন
বর্দ্ধমান কৃষিক্ষেত্রের সার ...	৬৫·৫১	১৭·১৯	৩·৫১	১৩·৭৯	০০·৭৩	০০·৬৮
বর্দ্ধমান রায়তের সার ...	৬৫·৬৯	১১·০০	৩·৫২	১৮·৭৯	০০·৩৪	০০·৬১

রায়তদিগের সারে সার-পদার্থ অপেক্ষাকৃত অল্প ; ইহার কারণ এই যে, রৌদ্র ও বৃষ্টি দ্বারা সার-পদার্থের কতকাংশ বিনষ্ট হয়।

উক্ত উভয়বিধ সার গতবৎসর বর্দ্ধমান কৃষিক্ষেত্রে আলু ফসলে প্রয়োগ করিয়া, ইহাদের গুণ পরীক্ষা করা হইয়াছিল। ইহার ফলাফল নিম্নলিখিত তালিকায় দ্রষ্টব্য :—

সার	একরে সারের পরিমান	এক একরে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ
বর্দ্ধমান কৃষিক্ষেত্রে বিকৃত সার	১৯২ মণ	১৭,০৮৮ পাউণ্ড
বর্দ্ধমান রায়তদিগের বিকৃত সার	১৭২ "	২৫,৬২৪ "

উক্ত উভয়বিধ সারেই সমপরিমাণ নাইট্রোজেন ছিল। তথাপি উৎপন্ন ফসলের এত পার্থক্য কেন ? আমাদের বিবেচনা হয় যে, রায়তদিগের সার অনিয়মে প্রস্তুত জন্য, ইহা উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণোপযোগী ভাবে পরিবর্তিত হয় নাই। এই জন্য, উভয় ফসলেব পরিমাণ একরূপ নয়।

বর্দ্ধমান কৃষিক্ষেত্রে ১৯০৩ সন হইতে ১৯০৭ সন পর্য্যন্ত উক্ত কৃষিক্ষেত্রের প্রস্তুত সার ও রায়তদিগের সার সমপরিমাণে প্রয়োগ করিয়া আলু ফসলে নিম্নলিখিত ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে :—

সার		এক একরে সারের পরিমাণ	এক একরে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ
বর্দ্ধমান কৃষিক্ষেত্রের রক্ষিত সার	...	২৪০ মণ	১৪, ৯৩০ পাউণ্ড
বর্দ্ধমান রায়তদিগের সার	...	২৪০ "	১৩, ২৬০ "

গোয়ালের মূত্র রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যহ শুষ্ক মাটী, শুষ্ক পাতা বা ঘাস ছড়াইয়া দিতে হয়। চারি বা পাঁচ মাস অন্তর, এই সকল পদার্থ জমীতে দেওয়া যাইতে পারে।

সার রক্ষা করিবার সুবন্দোবস্ত না থাকিলে, ইহা জমীতে প্রয়োগ করিয়া, কর্ষণ দ্বারা মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত।

গোবর সার প্রয়োগ করিলে, এঁটেল এবং বেলে উভয়বিধ মৃত্তিকারই প্রাকৃতিক গঠন পরিবর্তিত হইয়া সুচাষোপযোগী হয়। ক্রমশঃ
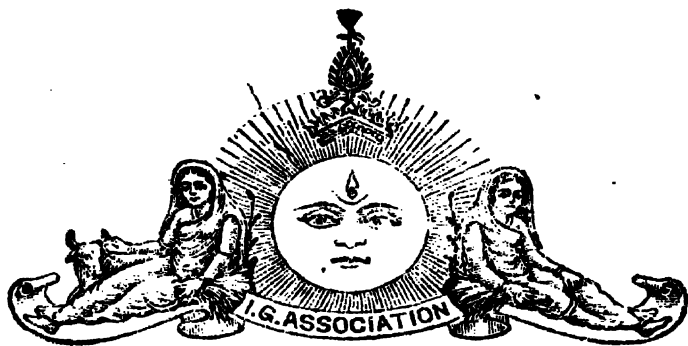
কৃষক—চৈত্র, ১৩২৮ সাল

রোহিতাদি মৎস্যের চাষ

লোনা জলের ভেট্‌কী, ভাঙ্গান, পারসে প্রভৃতি মৎস্য যাহাতে জোয়ার ভাঁটা খেলে এমন নদ নদীতে বা যাহাতে খাল, বিল, জলা যাহাতে লোণা জল প্রবেশ করে এই রূপ জলাশয়ে স্বভাবত জন্মিয়া থাকে। রুই, কাতলা, মৃর্গেল, বাটা প্রভৃতি মিঠা জলের মাছ। নদ নদীতে ইহাদের জন্ম। বর্ষারম্ভে জৈষ্ঠ আষাঢ়ে যখন নদীতে প্রথম জল সামিয়া বাণ আসে তখন এই সকল মাছ নদীতে উজান বহিয়া যায় এবং ডিম ছাড়ে। নদী স্রোতমুখে ঐ সমস্ত ডিম খাল বিলে প্রবেশ করিয়া বহুবিস্তৃত স্থান সমূহ মাছের পোনায় পূর্ণ করে। রোহিতাদি মৎস্যের পোণা স্রোতজল ভিন্ন উৎপন্ন হয় না। গঙ্গা, যমুনা, পদ্মা ব্রহ্মপুত্র দামোদর প্রভৃতি বাঙলার সকল নদ নদীতে বর্ষাকালে মাছের ডিম বা পোনা পাওয়া যায়। মৎস্য কুলের বংশ বৃদ্ধির ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। যাহারা সাধারণ জলাশয়ের রোহিতাদি মৎস্যে সন্তুষ্ট নহেন এবং যাহা নানা কারণে পরিমাণে কমিয়া আসিতেছে তাঁহাদের পক্ষে স্বভাবজাত পোণা সংগ্রহ এবং পুষ্করিনী, বিল সরোবর প্রভৃতি কৃত্রিম জলাশয়ে মাছের আবাদ করা০ কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের মাছের ডিমের বা পোনার এখনও তাদৃশ অভাব হয় নাই সুতরাং এখন স্বচেষ্টায় ডিম জন্মাইবার বিশেষ কোন আবশ্যক দেখা যায় না। এমেরিকা ও ইয়ুরোপে স্রোত জল ব্যতীত পুষ্করিণী ও পাকা চৌবাচ্চায় পোনা প্রস্তুতের ব্যবস্থা আছে কিন্তু তাহা ব্যয় সাপেক্ষ এবং তাহাতে প্রাথমিক খরচই অত্যাধিক। বড় বড় ধনী প্রচুর অর্থ লইয়া একাজে নামিয়া কৃত্রিম উপায়ে মাছের বংশ বৃদ্ধি করা প্রভৃতি কার্য্য শোভন হইতে

পারে, কিন্তু যতদিন তাহা না হয় ততদিন আমাদিগকে স্বভাবের উপর নির্ভর করিতেই হইবে এবং তাহাই কর্ত্তব্য।

কিন্তু নানা কারণে নদনদীর ও স্বাভাবিক স্রোতের মাছ অতিশয় কমিয়া যাইতেছে। অনেকে অনুমান করেন যে নদী সকলে ষ্টিমার যাতায়াত একটি প্রধান কারণ। ষ্টীমার গমনাগমন কালে জলের আলোড়নে অনেক পোনা ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় কারণ মাছ ধরা। মাছের গর্ভ বা ডিম হইলেও সেগুলি অবাধে ধৃত করা হইয়া থাকে মাছের ডিম খাইতে সৌখীন লোকে সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। মৎস্যাদির বংশ বৃদ্ধি স্বাতিশয় অধিক। দশসের একটি মাছ প্রায় ২০ লক্ষ ডিম ছাড়িতে পারে। ঐ প্রকার দশ সেরী মাছ আগে জলাশয়াদিতে অসংখ্য পাওয়া যাইত এখন কিন্তু তাদের সংখ্যা কমিতেছে বলিয়া মনে হয়। ইহা যে সকল ডিমটিই পোনা হইয়া ফুটিতে পায় না। স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক কারণে ইহার অনেক নষ্ট হইলেও যাহা থাকে তাহাও মানুষের কাজ চলার পক্ষে যথেষ্ট।

নদ নদী খাল বিলাদি জলাশয়ে প্রচুর জল থাকিলে সব মাছ কখনই ধরা পড়ে না। যাহারা বাচিয়া বংশ বৃদ্ধি করে তাহাদের পোনায় যথেষ্ট বলিয়া মনে হইত। কিন্তু আজ কাল তাহায় বিপর্য্যয় ঘটিতেছে খাল, বিল মজিয়া আসিয়াছে নদ নদী হইতে চারি দিকে সেচের জলের জন্য খাল বিস্তৃত হইয়া যাওয়ায় নদীর ও জল কমিয়া গিয়াছে। এখন আর দিগন্ত প্লাবী প্লাবন খুব কমই হয়। সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার এই যে কম জলে ছোট বড় সব মাছ ধরা পড়িয়া মানুষের উদর গহ্বরে প্রবেশ করে এবং জন্ম ও মৃত্যুর সামঞ্জস্য এখন আর রক্ষিত হইতে দেখা যায় না। সব মাছের পোনা যদি বাঁচিত তবে জলাশয়ের জলে স্থান সঙ্কুলান হইত না এবং অধিক সংখ্যায় যদি মরিতে থাকে তবে জলাশয় মৎস্য শূন্য না হইয়া পারে না।

অনেকের আর একটা বিশ্বাস আছে—নদ নদীর ও বড় বড় খালের মাছ স্বভাবতর খুব বৃহদায়তন হইয়া থাকে। মৎস্য কুল স্রোতের জলে সচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে এবং স্রোতাদিতে নানা স্থান হইতে মাছের আহার্য্য পদার্থ আসিয়া পড়ে কিন্তু পুষ্করিনী বিলাদি জলাশয় গুলিতে মৎস্যের বিচরনেরও সঙ্কোচ আছে এবং এই সকল জলাশয়ে মাছের খাদ্যাদির অভাব ও সর্ব্বদা লক্ষিত হয়।

. অনেকে মনে করিয়া থাকেন ডিম আনিয়া পুকুরে ছাড়িলেই তাঁহাদের কার্য্য সমাপন হইল। ইহা কিন্তু এক প্রকাণ্ড ভুল ধারণা। জল খাইয়া মাছ জীবন রক্ষা করিতে পারে না—তাহার খাদ্য চাই, তাহা আলো ও বাতাসের আবশ্যক। ইহার সুব্যবস্থা করিতে না পারিলে মাছের আবাদ কর বিড়ম্বনা মাত্র। অনেকে বলিয়া থাকেন যে যে পুষ্করিনী বিশেষে মাছ খুব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সন্ত বৎসরে কোন কোন জলাশয় দেড় দুই সের ওজনে মাছ বাড়িয়া থাকে। ইহা কিন্তু দৈব নহে। ইহার

কারণ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে উক্ত জলাশয়ে মাছের খাদ্য সঞ্চিত ছিল এবং উহাতে রৌদ্র বাতাস পাইবার সুবিধা আছে, এবং উহার জল সর্ব্বদাই আলোড়িত হয়। প্রবল আলোড়নে খারাপ হইলেও মৃদু আলোড়নে উপরের বাতাস জলের তলে প্রবৃষ্ট হইয়া মাছের বৃদ্ধির সহায়তা করে।

যখন ফুটিয়া পোনা হয় তখন সদ্যজাত পোনার একটি গণ্ডাস্থালী থাকে। ইহাতে তাহাদের পোষনাপযোগী ৪।৫ দিনের খাদ্য সঞ্চিত থাকে ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। যেমন বীজ কোষে বীজ অঙ্কুরের খাদ্য সঞ্চয়। তারপরে পোনা গুলি নিজ নিজ খাদ্য সংগ্রহে ব্যাপৃত হইয়া থাকে। জলের উত্তাপের সমতাও একটা প্রধান জিনিষ। মাছের আবাদ সম্পূর্ণ করিতে হইলে তাহাদিগকে প্রচুর খাদ্য ও তাহাদের স্বচ্ছন্দ বিবরণের সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। কৃত্রিম স্রোতের সৃষ্টি করিতে পারিলে মন্দ হয় না। অনুকুল অবস্থায় রোহিতাদি মৎস্যের বৃদ্ধি আশ্চর্য্য জনক কিন্তু প্রতিকুল অবস্থায় তাহারা আদৌ বাড়িতে পারে না।

গোসাপ, ভোঁদড়, বেঙ প্রভৃতি উভচর জন্তু মাছের ভয়ানক শত্রু এই গুলির উৎপাত হইতে পোনা রক্ষা না করিলে মাছের আবাদ সম্পূর্ণ হইবে না। জলেও শাল, শোল, বোয়াল প্রভৃতি মৎস্য ভুক মাছ আছে; ইহারা যেন কোন মতে পুষ্করিণীতে স্থান না পায়। ক্ষুদ্র মাছ এক প্রকার চাঁদা মাছ আছে যাহারা রোহিতাদি মাছের গায়ে আশ্রয় লইয়া কৃমি কীটের মত মাছের রক্ত শোষণ করে। এই ক্ষুদ্র শত্রু হইতে পরিত্রান পাওয়া সুকঠিন হইলেও যতদিন তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিতে না পারা যায় ততদিন সে জলাশয়ে রোহিতাদি মাছের আবাদ হইবেনা। মৎস্য আবাদের আর একটি অন্তরায় আছে তাহা মাছ জলের তলে চরিবার বাধা। জলে সামুক গুগ্‌লি অধিক পরিমাণে হইলে তাহারা জলাশয় তলদেশ সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখে—মৎস্যগণ চরিবার একটুও স্থান পায় না হাঁস পুষিলে গেঁড়ী গুগ্‌লী সামুকের হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায় তাহারা খাইয়া ঐ গুলি নিঃশেষ করিতে পারে।

আমরা উপস্থিত এ প্রসঙ্গ আর বাড়াইব না—জমি আবাদ করিতে হইলে যেমন আগাছা, কুগাছ, কীট পতঙ্গ হইতে ক্ষেত রক্ষা করিতে হয়, মাছের জলাশয় রক্ষা করিয়া অনুকুল অবস্থার প্রবর্ত্তন করা এবং বিঘা প্রতি জলাশয়ে মাছের খাদ্যের খোরাক জন্য অন্ততঃ একমণ শরিষার খোল প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

বাগানের মাসিক কার্য্য

চৈত্র মাস

সব্জীবাগান।—উচ্ছে, ঝিঙ্গে, করলা, শসা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি দেশী সব্জী চাষের এই সময়। ফাল্গুন মাসে জল পড়িলেই ঐ সকল সব্জী চাষের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। তরমুজ, খরমুজ প্রভৃতি চাষ ফাল্গুন মাসের শেষে করিলেই ভাল হয়। সেই গুলিতে জল সেচন এখন একটী প্রধান কার্য্য। ঢেঁড়স স্কোয়াস বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। ভূট্টা দানা এই মাসের শেষ করিয়া বসাইলে ভাল হয়। গবাদি শশুর খাদ্যের জন্য অনেক গাজর ও বীটের চাষ করা হইয়া থাকে। সেগুলি ফাল্গুনের শেষেই তুলিয়া মাচানের উপর বালি দিয়া ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। ফাল্গুনের ঐ কার্য্য শেষ করিতে না পারিলে চৈত্র মাসের প্রথমেই উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। আশু বেগুনের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। কেহ কেহ জলদী ফলাইবার জন্য ইতিপূর্ব্বে বেগুন বীজ বুনিতে থাকে।

কৃষিক্ষেত্র।—এ মাসে বৃষ্টি হইলে পুনরায় ক্ষেত্রে চাষ দিতে হইবে এবং আউস ধানের ক্ষেত্রে সার ও বাঁশ ঝাড়ে, কলা গাছে ও কোন কোন ফল গাছে এই সময় পাঁকমাটি ও সার দিতে হয়। এক্ষনে বাঁশের পাইট সম্বন্ধে একটী প্রবাদবাক্য লোককে স্মরণ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। "ফাল্গুনে আগুন, চৈত্রে মাটি, বাঁশ রেখে বাঁশের পিতামহকে কাটি।" বাঁশের পতিত পাতায় ফাল্গুন মাসে আগুন দিতে হয়, চৈত্র মাসে গোড়ায় মাটি দিতে হয় এবং পাকা বাঁশ না হইলে কাটিতে নাই।

এ মাসে ধঞ্চে, পাট অরহর, আউস ধান বুনিতে হয়।—চৈত্রের শেষে ও বৈশাখ মাসের প্রথমে তুলা বীজ বপন করিতে হয়। ফাল্গুন মাসেই আলু তোলা শেষ হইয়াছে। কিন্তু নাবি ফসল হইলে এবং বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত শীত থাকিলে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাইতে পারে।

ফুলের বাগান।—শীতকালে বিলাতী মরসুমি ফুলের মরসুম শেষ হইয়া আসিল। শীতের শেষ হইল গোলাপেরও ক্রমে ফুল কমিয়া আসিতেছে; এখন বেল, মল্লিকা, জুঁই ফুটিতেছে। এই ফুলের ক্ষেত্রে জল সেচনের বিশেষ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। শীত প্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে মিগোনেট, ক্যাণ্ডিটাফ্‌ট্‌, পপি, ন্যাষ্টারসম, ফ্লক্স প্রভৃতি ফুলবীজ এই সময় বপন করা চলে। পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই সময় সালগম, গাজর, ওলকপি প্রভৃতি বীজ বপন করা হইতেছে, আলু বসান হইতেছে।

ফলের বাগান—ফলের বাগানে জল সিঞ্চন ব্যতীত এখন অন্য কোন বিশেষ কার্য্য নাই। জলদি লিচু এই সময় পাকিতে পারে, সেই লিচু গাছে জাল দ্বারা ঘিরিতে হইবে।